(১৩০২-৩৭)

৩য় খণ্ড। } জানুয়ারি ১৮৯৬। মাঘ ১৩০২। { ১ম সংখ্যা।

লেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র বসু। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বকোষ সম্পাদক,
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি, এল। শ্রীযুক্ত
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ। শ্রীযুক্ত মহারাজ বর্দ্ধমানাধি-
পতির শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ দত্ত এম, এ।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল। শ্রীযুক্ত
বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়। কবিরাজ
শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন এবং
সম্পাদক প্রভৃতি—

সূচীপত্র।

মূল্য ৶৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শুভদিনে শুভক্ষণে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর শুভাগমনে সহকারতরুর সদ্য মুকুলগন্ধ অঙ্গে মাখিয়া "সমীরণ" সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে তৃতীয় বৎসরের ভেরী নিনাদিত করিল। দ্বিতীয় বর্ষাবসানের পর সমীরণের পুনঃ প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া অনেকে ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত আমাদিগকে অনুমান দশসহস্র পোষ্টকার্ড খরচ্ করিতে হইয়াছে। আজি তাহা সার্থক হইল।

কৈফিয়ৎ।

গত আশ্বিনমাসে সমীরণের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, তবে এ বিলম্ব কিসের জন্য?—এই কৈফিয়ৎ প্রায় সকল গ্রাহককেই মাসে দুই তিনবার করিয়া দিতে হইয়াছে। আজি আবার তাহা সকলের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল। পাঠক! বলুন দেখি, প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে—মহাকালের অনন্ত আকাশপথে কোন্ সময়ে সমীরণের প্রথম সৃষ্টি? বসন্তের প্রারম্ভে না হেমন্তের উদয়ারম্ভে? আপনি বলিবেন, বসন্তের প্রারম্ভে।

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে॥"

অমর কবি জয়দেবের এই গীতির কি অর্থ খুলিয়া বলিতে হইবে? কে... কূজন মধুকর গুঞ্জন ও মলয় সমীর নিত্য সহচর। সুতরাং বসন্তের প্রারম্ভ ভিন্ন অ. সময়ে সমীরণের উৎপত্তি সাধন করিয়া না বুঝিয়া আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার দোষে দোষী হইয়াছিলাম, এতদিনে তাহার সংশোধন করিলাম। এক্ষণে "সমীরণ" নাম কালানুমোদিত হইল,—সার্থক হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আয়োজন।

তৃতীয় বৎসরের জন্য সমীরণের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। বঙ্গের যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শনের মধুময় বসন্তে তাহাদের মধুরতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিমাসেই সমীরণের সৌষ্টব সাধন করিবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

৩য় খণ্ড। | সন ১৩০২ সাল। | ১ম সংখ্যা।

ভক্তির উদ্দেশ।

"অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা।"—

শাণ্ডিল্য। ১ সূত্র।

প্র[illegible]ত ভক্তি কি, একথা লইয়া [illegible] বৈদিককালে মহা বাগ বিতণ্ডা চলিত। এজন্য ভক্তিমীমাংসা-শাস্ত্রের আবশ্যকতা হইয়াছিল। যে ত্রিবিধ বিষয় লইয়া বেদ সম্পূর্ণ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—সেই ত্রিবিধ বিষয়েরই মীমাংসা-শাস্ত্র আছে। জ্ঞান লইয়া উত্তর মীমাংসা, কর্ম্ম লইয়া পূর্ব্বমীমাংসা এবং ভক্তি লইয়া শাণ্ডিল্য-বিদ্যা। যেমন বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত সংশয় ও বাদানুবাদ উত্থাপিত হইত, তাহা পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায় সমাধান করা হইয়াছে, তেমনি ভক্তি সম্বন্ধে যে বিচার ও তর্ক উপস্থিত হইত, শাণ্ডিল্য-বিদ্যায় বা ভক্তিসূত্রে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। অতএব ভক্তিমীমাংসা পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার ন্যায়, ভক্তির দার্শনিক তত্ত্ব।

ভক্তি যদি বৈদিক তত্ত্ব হয়, তবেত তাহা অলৌকিক তত্ত্ব। বেদে লৌকিক তত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু ভক্তিমীমাংসাশাস্ত্রে ভক্তির যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে ভক্তিকেও একটি অলৌকিক তত্ত্ব বলিয়াই গণনা করিতে হয়। ভক্তি সামান্য লোকে দৃষ্ট হয় না এবং সামান্য সাধনে ভক্তির উদয় হয় না। পুণ্যবলে সামান্য লোকে শ্রদ্ধা এবং গৌণী ভক্তির বিকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু মুখ্যভক্তি দেখা যায় না। মুখ্যভক্তি অনেক সাধনার ফল। মানব দেবত্বে উঠিলে তবে সেই ভক্তির অধিকারী হয়। তাই যদি হইল, তবে ভক্তি দার্শনিক বিচারে আসিল কিরূপে? দর্শন ত প্রত্যক্ষ এবং অনুমানসিদ্ধ বিচার। ভক্তি সামান্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; কারণ, ভক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে মানবকে দেবত্বে উঠিতে হয়; যখন দেবত্বে উঠিবে, তখন সামান্য প্রত্যক্ষ আর নাই, সুতরাং ভক্তি প্রত্যক্ষীভূত হইল না। ভক্তিকে অনুভূত করিবার নিমিত্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রয়োজন। তবে আর কি করিয়া বলিব, ভক্তি সামান্য

প্রত্যক্ষের বিষয়? যদি তাই না হয়, তবে তাহা অনুমান-গ্রাহ্য হইবে কিরূপে? কারণ, অনুমান প্রত্যক্ষ লইয়াই কার্য্য করে, অনুমান ত প্রত্যক্ষের অতীত নহে।

কিন্তু হিন্দুদর্শনে যে অনুমান-প্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সামান্য অনুমান নহে। বহির্বিষয়ক যে অনুমান, তাহা বাহ্য-জগতের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানমূলক, এজন্য সেই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানকে ব্যাপ্তিরূপে ধরিয়া অনুমান কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু অলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সেরূপ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং অলৌকিক বিষয়ে অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। দার্শনিক অনুমান এরূপ সামান্য অনুমান নহে। দর্শনশাস্ত্রে অনুমানকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রের অনুমান বৈদিক অলৌকিক তত্ত্বমূলক আপ্তবাক্যানুগামী অনুমান। আপ্তগণ এবং সিদ্ধগণ অলৌকিক প্রত্যক্ষে যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, দার্শনিক অনুমান সেই সমস্ত তত্ত্বমূলক বিচার। সে সমস্ত তত্ত্ব ছাড়িয়া দিলে, দার্শনিক কোন কার্য্যেই আইসে না। অতএব, দার্শনিক অনুমান আপ্তবাক্যের অনুগামী। ভক্তি, অলৌকিক বিষয় হইয়াও সেইরূপ অনুমানে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দার্শনিক অনুমান যদি এইরূপ আপ্তবাক্যের অনুগামী হইল, তাহা হইলেও কি ভক্তি অনুমানসিদ্ধ? প্রতিবাদী বলিবেন, ভক্তি যে রসস্বরূপ, ভক্তি যে রাগ, তাহা ত জ্ঞান নহে, যে তোমার অনুমানে আসিবে? যাহা রাগ, তাহা যখন অন্তরে প্রতিবোধিত হয়, তখনই অনুভূত হইতে পারে। সন্দেশের মিষ্টতা কেহ কখন বুঝাইয়া দিতে পারে না; দ্বেষ কি হিংসা কিরূপ, তাহা জ্ঞানগোচর নহে। যাহার হৃদয়ে হিংসার উদয় হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারে হিংসা কি; অন্যে কি বুঝিবে? ভক্তি তদ্রূপ যদি রসস্বরূপ এবং অনুরাগ হয়, তবে তাহা জ্ঞানগোচর কিরূপে হইবে? যদি জ্ঞানগোচর না হয়, তবে তাহা দার্শনিক অনুমানমূলক মীমাংসাশাস্ত্রের বিচার্য্য কিরূপে হইবে?

রস ও রাগের বিচার যেরূপে সম্ভব, ভক্তির বিচারও সেইরূপে সম্ভব। অন্য রস ও অন্য রাগের সহিত ভক্তিরস ও ভক্তিরাগকে পৃথক্ করাই, তাহার বিচার। যাহা ভক্তি নয়, তাহাকে ভক্তিরাগ হইতে পৃথক্ করাই ভক্তির দার্শনিক বিচার। ভক্তিরাগকে পৃথক্ করিতে হইলে দুইরূপে পৃথক্ করিতে হয়।

(১) ভক্তিকে অন্যবিধ রাগ হইতে পৃথক্ করা। অন্যবিধ রাগ হইতে পৃথক করিতে হইলে ভক্তি কোন্ শ্রেণীর রাগ তাহা নির্ণয় করা চাই। দ্বেষ এক শ্রেণীর রাগ, ক্রোধ অন্য এক শ্রেণীর রাগ। দয়া এক শ্রেণীর রাগ এবং প্রীতি অন্য এক শ্রেণীর রাগ। রাগ ও রস এই রূপ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক, ভক্তি কোন্ শ্রেণীর রাগ। ভক্তিকে এইরূপে পৃথক করা তাহার দার্শনিক বিচার।

(২) ভক্তি যে শ্রেণীর রাগ, সেই শ্রেণী মধ্যেও আবার নানা অবান্তর ভেদ আছে। ভক্তি প্রীতি শ্রেণীর রাগ। কিন্তু বিষয়-প্রেম, স্নেহ, মমতা, দাম্পত্যানুরাগ,

পিতৃভক্তি, সখ্য প্রভৃতি সকলই প্রীতির অন্তর্গত। ভক্তিকে এই সমুদায় হইতে পৃথক করা ভক্তির দার্শনিক বিচার।

ভক্তিকে এই রূপে পৃথক করিলেই ভক্তির বিচার শেষ হইল না। ভক্তি যে রূপ প্রীতি, তাহার উপলব্ধি কি রূপে হইতে পারে; কি রূপে ভক্তি সঞ্চারিত হয়; সঞ্চারিত হইয়া কি রূপে তাহা বর্দ্ধিত হয়, এই সমস্ত ক্রম ও পর্য্যায় দেখাইয়া ভক্তির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাও ভক্তির দার্শনিক বিচার। প্রীতি যে রূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়, তাহার সাধন-পথ নির্দ্দেশ না করিয়া দিলে ভক্তির সঞ্চার উপলব্ধি হইতে পারে না। এজন্য, এই সমস্ত পন্থা নির্দ্দেশ করাও ভক্তিমীমাংসার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক, ভক্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্ধারিত করাই ভক্তির দার্শনিক তত্ত্ব।

ভক্তির ধর্ম্মকে এই প্রকার তন্ন তন্ন রূপে বিচার করিয়া দেখাইয়া না দিলে তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। লোকে কুতর্কজালেও ভক্তিকে এরূপ আচ্ছন্ন করিতে পারে, যে প্রকৃত ভক্তিকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। যাহা বাস্তবিক ভক্তি, লোকে তাহাকে ভক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে। ভক্তি এরূপ নহে, এরূপ ভক্তি মুক্তি-প্রদায়িনী নহে, এই রূপ নানা প্রকার কুতর্ক জাল দ্বারা ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিলে, লোকের প্রকৃত ভক্তিপথ হইতে নিবৃত্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই সমস্ত আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই ভক্তিমীমাংসা শাস্ত্রের সৃষ্টি।

কুতর্ক দ্বারা যে অনেকে প্রকৃত ভক্তি-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, একথার প্রমাণ আমরা প্রহ্লাদের উক্তিতে দেখিতে পাই। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

বিষ্ণুপুরাণ—১অং।

হে নাথ! আমি যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করি, সেই সেই জন্মেই যেন তোমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে।

তাঁহার প্রার্থনার অভিপ্রায় এই যে, যেন কোন জন্মে তাহাকে কেহ ভক্তি হইতে বিচলিত না করিতে পারে। তিনি বলিতেছেন, লোকে হাজার আমাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করুক না কেন, আমি যেন সে পথ চিনিয়া তাহাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তাহা অবলম্বন করিয়া জন্মজন্মান্তর, হে হরি, তোমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকি। এই উদ্দেশে ভক্তিমীমাংসার অবতারণা। মীমাংসা শাস্ত্রমাত্রই তিন অংশে বিভক্ত (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ, (৩) পরীক্ষা।

যে জন্য যে মীমাংসাশাস্ত্রের অবতারণা তাহার ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ। এই রূপে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তার পর বিষয়ের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎপরে সেই লক্ষণ ঠিক কি না, তাহার বিচার; এই বিচারের নাম পরীক্ষা। ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত, ত্রিবিধ দর্শনশাস্ত্রই এইরূপ বিষয়-বিভাগ করিয়া বেদের মীমাংসা করিয়াছেন। ভক্তি-মীমাংসা-শাস্ত্রও এই পন্থাবলম্বন করিয়া ভক্তির বিচার সম্পন্ন করিয়াছেন। তাই, কি শাণ্ডিল্য, কি নারদ, উভয়েই ভক্তিশাস্ত্রের উদ্দেশ জ্ঞাপনার্থ প্রথমেই বলিয়াছেনঃ—

"অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা।"—শাণ্ডিল্য।
অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।—নারদ।

যে উদ্দেশ্যে ভক্তিশাস্ত্রের অবতারণা তাহা আমরা উপরেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই উদ্দেশ এই সূত্রদ্বয়ে কিরূপ নিহিত আছে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।—

এই সূত্রের তিনটি বিভিন্ন অর্থ তিনটি বিভিন্ন পদে ব্যক্ত হইয়াছে। (১) অথ (২) অতঃ (৩) ভক্তিজিজ্ঞাসা বা ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যাম। বাদরায়ণ, জৈমিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতি দর্শনকার যে অর্থে অথ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এস্থলে সে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই। এস্থলে অধিকারী ভেদার্থেই "অথ" শব্দের প্রয়োগ। জৈমিনি বলেন, যিনি সম্পূর্ণ রূপে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়াছেন, তিনি আমার মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নে সমর্থ। অতএব, কর্ম্ম-মীমাংসা পড়িবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। যখন বেদপাঠ শেষ হইয়াছে, তখন কর্ম্ম-মীমাংসা পড়া উচিত, তৎপূর্ব্বে নহে। এরূপ প্রতিবন্ধক ভক্তি মীমাংসা পাঠে নাই। মুক্তিকামীমাত্রেই ভক্তি-মীমাংসা পাঠের অধিকারী। এই শাস্ত্র মধ্যে দেখা যায় যে, কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রাহ্মণেতর জাতি, সকলেই এই শাস্ত্রাধ্যয়নের পাত্র। সুতরাং জৈমিনি যে রূপ বাধা উত্থাপিত করিয়াছেন, সেরূপ বাধা ভক্তিসূত্র-পাঠে নাই। সমগ্র বেদাধ্যয়ন না করিলেও ভক্তিসূত্র সবাই পড়িতে পারেন।

বৈদিক কর্ম্ম-মীমাংসার্থীর যেমন সমগ্র বেদজ্ঞান আবশ্যক, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপযোগী হইবার জন্য বিশেষ অধিকার চাই। এ অধিকার বড় সামান্য নহে। (১) যে ব্যক্তি অধ্যয়ন-বিধি অনুসারে বেদ বেদান্তের এক প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্দ্বারা নিত্য বস্তু নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন (২) ইহলোকের সুখ-ভোগ এবং পরলোকের স্বর্গাদিরূপ অনিত্য সুখের প্রতি যাঁহার বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, (৩) নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্ত এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যাঁহার চিত্তশুদ্ধি ও আত্ম-সংযম হইয়াছে এবং এইরূপে যিনি একান্ত (৪) মুক্তিপিপাসু হইয়াছেন, তিনিই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী। এইরূপ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে বেদান্ত দর্শন পাঠের ফল লাভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসুর এই সমস্ত বাধা ভক্তিলাভার্থীর নাই। তবে কি ভক্তিকামীর কোন রূপ অধিকারের আবশ্যকতা নাই? যিনি ভক্তিপথের পথিক হইতে চাহেন, তাঁহার চিত্তাবস্থা এইরূপ হওয়া চাইঃ—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"

শ্বেতাশ্বতরে ৬ অং ১৮ শ্রু।

যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া বেদপ্রদান করিয়াছিলেন, যিনি আত্মস্থ বুদ্ধির প্রকাশ করেন, মুক্তিকামী ব্যক্তি সকল সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম দেবের শরণাপন্ন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন। সেই পরম পিতা প্রসন্ন হইলেই জীবের বিশুদ্ধ বুদ্ধি পরমেশ্বরে আসক্ত হয়।

ভক্তি-জিজ্ঞাসার অর্থ কি? ভক্তি কি জিজ্ঞাস্য বিষয়? ভক্তি কি জ্ঞাতব্য?

বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানগম্য, ভক্তি সেরূপ জ্ঞানের বিষয় নহে। পূর্ব্ব মীমাংসায় ধর্ম্ম যেমন কৃতিসাধ্য, ভক্তি তেমন কৃতিসাধ্যও নহে; তথাপি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে, গৌণী ভক্তির সঞ্চার হইলে, সেই ভক্তি যখন সাধনা-ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিণত হয়, নানা কুতর্ক জালে তখন তাহার নিবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকাতে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রয়োজন। অতএব ভক্তির প্রকৃতি ও ধর্ম্ম নিরূপণার্থ ভক্তি তত্ত্বের বিচার করা উচিত। সেই অর্থে ভক্তি জিজ্ঞাসা—এবং সেই প্রয়োজন বুঝাইবার জন্যই অতঃ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরাই এই কথা বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে দেখা গেল যে, কি জৈমিনির কর্ম্ম-মীমাংসা, কি ব্যাসের জ্ঞান-মীমাংসা, কি শাণ্ডিল্যের ভক্তি-মীমাংসা সমস্ত মীমাংসা-দর্শনই বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী। যিনি ধর্ম্ম-পথে যেমন উন্নত হইতে থাকেন তাঁহার অধিকারও তেমনি উৎকর্ষ লাভ করে। একান্ত নিম্নাধিকারীর জন্য সাধন ভক্তি পথ। কিন্তু ভক্তি পথেরও ক্রম আছে। ভক্তি পথে লোক যেমন উন্নত হইতে থাকেন, তেমনি তিনি ক্রমে ক্রমে জৈমিনির কর্ম্ম মীমাংসা, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র এবং বেদান্তীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হয়েন। সুতরাং এই ভক্তিপথেই ঐ সমস্ত ক্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। নিম্নাধিকারীই ক্রমে মধ্য এবং শ্রেষ্ঠাধিকারী হইয়া উঠেন। ভক্তি যেমন ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি-লাভ করে তাহা এই সমস্ত আসক্তিতে পরিণত হয়—

"(১) গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, (২) রূপাসক্তি (৩) পূজাসক্তি (৪) স্মরণাসক্তি (৫) দাস্যাসক্তি (৬) সখ্যাসক্তি (৭) কান্তাসক্তি (৮) বাৎসল্যাসক্তি (৯) আত্ম-নিবেদনাসক্তি, (১০) তন্ময়াসক্তি, (১১) পরমবিরহাসক্তি রূপেকধাপ্যেকাদশধা ভবতি।"-নারদীয় ভক্তি-সূত্র-৮২।

ভক্তি এই রূপ নানাবিধ আসক্তিতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমে ভগবানের গুণে এবং মাহাত্ম্যে আসক্তি জন্মে; পরে, তাঁহার রূপে ভক্ত মুগ্ধ এবং সেইরূপ দেখিতেই সর্ব্বদা অভিলাষী হয়েন। যিনি তাঁহার সূক্ষ্মরূপে মোহিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে সেই সূক্ষ্মরূপের স্থূলাবয়ব দিয়া সর্ব্বদা সেইরূপ দেখিতে ভালবাসেন।

স্থূলরূপ মানসিক সূক্ষ্মরূপেরই অবয়বী মূর্ত্তি। সগুণ অনন্ত ঈশ্বরের সূক্ষ্মরূপ অশেষ মূর্ত্তিতে ভক্তের হৃদয়-মন্দির শোভিত করে। এই রূপাসক্তি, পূজা এবং স্মরণাসক্তি দ্বয়কে ক্রমে সঞ্চারিত করে। ভক্ত রূপে মোহিত হইয়া সর্ব্বদাই ভগবানকে পূজা এবং স্মরণ করিতে থাকেন। এই আসক্তি চতুষ্টয় ক্রমশঃ তদ্‌পরবর্ত্তী আসক্তি চতুষ্টয়কে আনিয়া দেয়। তখন ভক্ত ভগবানের একান্ত দাস ও সেবক হইয়া তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে উদ্যত হয়েন। দাস্যাসক্তি ক্রমশঃ সখ্যভাবে পরিণত হয়। তখন ভগবান হৃদয়ের সখা; ভগবানের সহিত তখন আপনা আপনি সখ্যভাব আইসে; সখ্যভাব আরও ঘনিষ্টতর হইলে বাৎসল্যের ঘন স্নেহে ভগবানকে ভক্ত আবদ্ধ করেন। কিন্তু এ স্নেহেও ভগবান তত সমীপবর্ত্তী নহেন, যত কান্তাভাবে তিনি ভক্তের

হৃদয়ে অহর্নিশি মিলিত থাকেন। এই কান্তাভাবে (পতিপত্নীর ভাব) উপণীতা হইলে ভক্তি আত্মসমর্পণ করেন। তখন ভগবান হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন। তাঁহাতে হৃদয় সমর্পিত হয়। এই প্রগাঢ়ভাবই আত্মনিবেদনাসক্তি। যখন সমস্ত হৃদয় মন ভগবানে সমর্পিত হয়, ভগবান ভিন্ন ভক্ত আর কিছুই জানেন না, তখন তন্ময়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্ময়তায় ক্ষণকাল বিরহও অসহ। যখন তন্ময়তা ক্ষণকালমাত্র ভঙ্গ হয়, অমনি ভক্ত অস্থির হইয়া পড়েন। সেই তন্ময়ভাব পুনরুদয় হইলে ভক্ত তবে শান্তিলাভ করেন। ভগবান ক্রমশঃ এইরূপে ভক্তের সমীপস্থ হইতে থাকেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ভগবান ও ভক্তে দূরত্ব রহিয়াছে। সামীপ্য যতই নিকটস্থ হউক না কেন তথাপি যেন কথঞ্চিৎ অন্তর থাকে। কিন্তু এই সামীপ্য যখন সারূপ্য লাভ করে, তখন ভক্ত ভগবানের ঐশ্বর্য্যলাভ করেন। তখন জীব, ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া পড়েন। আত্মা ও পরমাত্মার তখন মিলন হয়। ব্রহ্মৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া আত্মা আনন্দে ভোর হইয়া যান।

ভক্তির এত প্রকার স্ফূর্ত্তি। এই স্ফূর্ত্তিভেদেই ভক্তের অধিকার। সকলেই সমান ভক্ত নহে। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির যেরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তিনি সেইরূপ অধিকারী। সগুণ ভগবানের ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভক্ত তাঁহার স্বরূপ্য লাভ করিয়াও ক্ষান্ত নহেন। এখন তত্রকতা জন্মে নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আত্মা ও পরমাত্মার এক হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তির পূর্ণতা হয় না। এই পূর্ণতার জন্য ব্রহ্মের নির্ম্মলজ্ঞানের আবশ্যকতা। আত্মা যখন চিন্ময় রূপে নির্ম্মলজ্ঞানে অন্তর্যামী পরমাত্মার সহিত একতায় উপনীত হন, তখন জীবের মুক্তি, তখন জীব সচ্চিদানন্দময় হয়েন। জীব ব্রহ্মে অভেদ হইয়া যান। ভক্তের মুক্তিকামনা তখন পূর্ণ হয়। তখন তাঁহার জীবত্ব ঘুচিয়া গিয়া নির্গুণ ব্রহ্মত্ব লাভ হয়।

ভক্তের মুক্তিপথ এতদূর সুবিস্তৃত। কোথায় ভক্তি সামান্য ঈশ্বরানুরাগে প্রথমে ঈষৎ আভাসিত, কোথায় সাযুজ্য মুক্তি! এই সমস্ত স্তরের মধ্যে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পথ। এই সমস্ত যোগ সাধন না করিলে জীবের মুক্তিলাভ হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই সুবিস্তৃত ভক্তিযোগ শিক্ষা দেন। শাণ্ডিল্যও ভগবদ্গীতার অনুগামী হইয়া ভক্তির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভক্তির অন্যান্য আচার্য্যগণ এক এক স্তরের উপদেশমাত্র দিয়া গিয়াছেন। নারদীয় ভক্তিসূত্র বিরহাসক্তি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাঁহার ভক্তি লক্ষণে তাহা পরে প্রকাশিত হইবে। ভক্তের অধিকার যখন বিভিন্ন, তখন সেই ভক্তাচার্য্যগণের উপদেশও সুতরাং বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন হইয়াও সকলেই এক এক ভক্তি স্তরেরই শিক্ষা দিয়াছেন। এই ভক্তিস্তরের যে বিভিন্নতা, তাঁহাদের উপদেশেও সেই বিভিন্নতা। নহিলে ভক্তির বাস্তবিক বিভিন্নতা নাই। একই গঙ্গা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামমাত্র লাভ করিয়াছে।

ভক্তির এই প্রকার বিভিন্ন স্তর লইয়া পুরাণের বিশাল দেহ নির্ম্মিত। পুরাণের এক এক দেহে ভক্তির এক এক অঙ্গ পরিদৃশ্যমান। রাজা পরী-

কিত, হনুমান এবং পৃথুরাজায় আমরা গুণমাহাত্ম্যাসক্তির পরিচয় পাই। পৃথুরাজা পূজাসক্ত, প্রহ্লাদ স্মরণাসক্ত এবং হনুমান, বিভীষণ, অক্রুর, বিদুরাদি দাস্যাসক্ত ভক্ত ছিলেন। অর্জ্জুন, সুগ্রীব, উদ্ধব, কুবের এবং ব্রজরাখালগণ সখ্যাসক্ত ভক্তের দৃষ্টান্ত। নন্দোপনন্দ, দশরথ, কশ্যপ, অদিতি, কৌশল্যা, যশোদা এবং মেনকা প্রভৃতি বাৎসল্যের পরিচয়। ব্রজগোপীগণ কান্তাভাবে উন্মত্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বলিরাজের আত্মনিবেদনা সক্তি সকলেরই পরিচিত। নারদ, শুক, কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অহরহ ভগবানের গুণকীর্ত্তনেই মত্ত থাকিতেন। গোপীগণের ক্ষণেক বিরহ কত কষ্টকর, শ্রীরাধিকায় তাহা বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। এক পলকের বিরহ শ্রীরাধিকায় একশত বৎসর বোধ হইয়াছে। এই সমস্ত ভক্ত ভক্তিপথের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁহারা পুরাণে আমাদিগকে ভক্তিপথ শিক্ষা দিতেছেন।

আমরা ও তোমরা।

(১)

আমরা সব—লজ্জা সরম হিঁদুর ধরম,
কোন রকম মানিব না।
পীঁড়ে আসন চাইনে বাসন
সাড়ি বসন পরিব না।
তোমরা সব—যাওনা ভুলে থড়্‌দ ফুলে
কুলের কথা আর তুলনা।
(চেওনা) অন্নখেতে পীঁড়ে পেতে
রাঁদুনীতে না দেবে না।

(২)

রাখ্‌ব সব—চীনের বাসন, নূতন ফ্যাসন,
ঘরের ভূষণ বাবুয়ানা।
টেবিল চেয়ার চেষ্ট ড্রয়ার,
আলমায়ার কোচ বিছানা।
তোমরা সব—পেটরা তোরং সেকেলে ঢং
এবার থেকে আর কিন না।
মাদুর সপ দাও করে লোপ
এবার হ'তে কাজ কি কেনা।

(৩)

আমরা সব—পড়্‌ব নাটক কর্ব্ব চটক
ইংরাজীটক সাত আট আনা
গুরুর নাম গুরু প্রণাম
পরিনামে হবে মানা॥
তোমরা সব—ইষ্টি পূজা, দশভূজা,
সন্ধ্যা বিধি আর মেনো না।
সস্ত্যয়ন সব অকারণ,
এবার থেকে আর করো না।

(৪)

আমরা সব—ইয়ং লেডি পর্ব্ববডি,
বেছে গডি মন ভুলানা।
টাউন হলে মিটিং হলে
কুতুহলে আনাগোনা।
তোমরা সব—আনাও গাড়ি তাড়াতাড়ি,
দেরি করা আর ভাল না।
রেখো ছেলে বেড়াক খেলে,
ভুলনাক দুধ খাওয়ানা।

(৫)

কর্ম্মসব—বিবিয়ানা ষোল আনা,
গহনাতো ছাড়িব না।
উইথ প্রাতে মাতব চীতে
এক টেবিলে লজ্জা বিনা।
দেবে সব—গহনা কত মনোমত,
নাই বলিলে শুনিব না।
বালা হার অনন্ত আর
ছগাছা মল করে দেনা।

(৬)

আমরা আর—কর্ব্বোনা পাক চচ্চড়ি শাক
যাক্ যাক্ যাক্ তা খাব না।
সুরুচি মত খাদ্য যত
টেবিলেতো হবে আনা।
তোমরা সব—আন্‌বে কিনে নিশি দিনে,
সক করে সব দ্রব্য নানা।
বল্‌না নাই, কোথা বা পাই
সে কথাতো শুনিব না।

(৭)

শুন্‌তে পাই—নাই সে বিচার, নূতন আচার
হচ্ছে প্রচার যাচ্ছে শোনা।
নাইকো সেচাল, নাইক সেকাল,
রিফাইন চাল ঐ দেখ না।
এখন সব—দেখে সহর সাহস কর,
কর সবে সভ্যপণা।
রয়না টাকা বাক্স ঢাকা
জমা করে সুখ পাবে না।

(৮)

যাব না আর—গয়া কাশী নই প্রয়াসী,
তীর্থ বাসে সুখ মিলে না।
যাব রেলগাড়িতে বৈদ্যনাথে
স্বামীর সাথে এই বাসনা।
তোমরা সব—অবকাশে দেশ বিদেশে,
বছর বছর নে চল না।
প্রয়াগ গেলে, কেশ মুড়ালে,
হবেনাক চুল ফিরনা।

জন্মাষ্টমী।

(১)

বৈশাখী পূর্ণিমা—নিশীথকাল। সুনীল গগনে রাকা চন্দ্রমা উদার হাস্যে জগৎ হাসাইয়া অতি ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। শুভ্র জ্যোৎস্না জগতে শান্তিসুধা ঢালিয়া দিয়া গঙ্গার বিশাল বক্ষে অঙ্গে অঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছে। ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ তরুরাজি পূর্ণ-চন্দ্রের অমৃত-করস্পর্শে যেন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। দুই একখানি নৌকা নিকটস্থ খড়দহ হইতে ঝুলদোলের পাঁচসাতটী অকালকুষ্মাণ্ড দর্শককে লইয়া শ্রান্ত মন্থর গতিতে কলিকাতার অভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছে। অর্দ্ধস্ফুট স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দাঁড়ের শব্দ তরণী মধ্যস্থিত বারুণী বিভ্রান্ত তরুণতরুণীগণের শ্বাসোৎক্ষিপ্ত উদ্গীর্ণ গীতাংশের সহিত থাকিয়া থাকিয়া নিশীথিনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময়ে শুকচরে গঙ্গার একটী ছোট বাঁধা ঘাটে সর্ব্বনিম্ন সোপানে একটী বালিকা বসিয়া কি করিতেছে! বালিকার বয়স অনুমান দ্বাদশ বৎসর। অঙ্গের গৌরকান্তি যেন জ্যোৎস্নাকে

অধিকন্তর বিমল করিয়াছে। বালিকা সোপানে বীরাসনে বসিয়া দুই হাতে একখানি পিত্তলের শরা ধরিয়া আছে। শরাখানি গঙ্গাজলে দুলিতেছে হেলিতেছে;—হেলিয়া দুলিয়া বালিকার কোমল দুইখানি করপল্লবের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেন সেই সুকোমল স্বর্গীয় বন্ধন অতিক্রম করিবার ইচ্ছা নাই। এই গভীর নিশীথকালে এই নির্জ্জন গঙ্গাতীরে বসিয়া বালিকা একাকিনী একখানি শরা লইয়া কি খেলা করিতেছে?—না, তা কেন? ঐ যে সেই শরাবস্থিত শুভ্র পুষ্পস্তবকের মধ্যে তরঙ্গহিল্লোলে দোদুল্যমান ধাতব পাত্রের সহিত কি একটী কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্য ধীরে ধীরে দুলিতেছে। এটী কি?

বালিকা জল হইতে শরাখানি তুলিয়া লইয়া সোপানে রাখিল; তাহার পর গলায় কাপড় দিয়া তাহার সম্মুখে প্রণাম করিল। মনে মনে কত কি কামনা করিল, সকল কথা শুনিতে পাওয়া গেল না, তবে তাহার দুই চারিটী কথা নিকটস্থ একটী স্ত্রীলোক শুনিল। বালিকা বলিতেছিল, "দীননাথ! আর কতবার পৃথিবীতে আসিতে হইবে? যদি আসিতে হয়, এবার যেন সুগন্ধ ফুল হইয়া জন্মিতে পারি, নতুবা এ পোড়া মানব জন্মে সুখ নাই—" বালিকার কথা শেষ না হইতে হইতেই পার্শ্বস্থ সেই স্ত্রীলোকটী তাহার হাত ধরিল,—ধরিয়া ভৎসনাকটু অথচ সস্নেহে বলিল "বসন! একি মা! এই রাত্রে তুই একলা এই গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিয়া আছিস! ধন্য বুকের পাটা মা!"

বালিকার নাম বসন্তকুমারী। বসন হাসিয়া উত্তর করিল "একলা কি মা! জগতে কেহই একাকী নহে। হরি সকলেরই সঙ্গে আছেন। পাঁচ বৎসরের ধ্রুব যখন গহন বনে ভ্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহার সঙ্গে কে ছিল? একাকিনী সীতা যখন রাক্ষসপুরীতে আবদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহাকে কে রক্ষা করিয়াছিল?"

বসন্তের মা হাসিলেন,—হাসিয়া কহিলেন "যাহ'ক্‌ মেয়ে বটে! সে যা'ক তুই এখানে কি করছিলি?"

"ফুলদোল!"

তাহার জননী বিস্মিত হইলেন বলিলেন "সে কি বসন! ফুলদোল কি?

"কেন আজ ফুলদোল নয়?"

"হাঁ, তাত জানি। তাতে তোর কি?"

"কেন মা, আমিও ফুলদোল করছিলাম।"

"কৈ দোল কোথায়?"

বালিকা গম্ভীরভাবে গঙ্গার তরঙ্গ দেখাইয়া দিয়া বলিল "ইহা অপেক্ষা ভগবানের আর কি ভাল দোলা আছে? তাঁহার শ্রীচরণে যাঁহার উদ্ভব, সেই ত্রিলোকপাবনীর অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গ ভিন্ন অনন্তদেবের আর কি উৎকৃষ্ট দোলা হইতে পারে?"

তাঁহার জননী আর কিছুই বলিলেন না; বালিকার হাত ধরিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(২)

হরিহরপুরে হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস। তিনি কোন গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকুরি করিতেন; চল্লিশ টাকা

মাত্র বেতন পাইতেন। তাহাতে একরূপে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। সংসারে কেহই গলগ্রহ ছিল না; কেবল স্ত্রী ও একটীমাত্র কন্যা পোষ্য। রোগবশতঃ অকর্ম্মণ্য হওয়াতে দশটাকামাত্র পেন্‌শন্ লইয়া এক্ষণে তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছেন। শুকচরে তাঁহার মাসীর বাড়ী। মাসী বৃদ্ধা,—অবীরা, অভিভাবক কেহই নাই; স্নুতরাং হরনাথ আসাতে তাঁহার কতকটা অভাব ঘুচিল। হরনাথের স্ত্রী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার উপর বালিকা বসন্তকুমারীর লাবণ্যময়ী দেহযষ্টি ও অস্ফুট মধুর ভাষা তাঁহাকে বিশেষ আমোদিত করিয়া তুলিল। তিনি বসন্তকে বড়ই ভালবাসিতে লাগিলেন। হরনাথ শুকচরে আসিয়া অসমর্থ হইলেও প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন; মাসীর বাড়ীতে একটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি কম্পিত হস্তে বিল্বপত্র তুলিয়া নিজে তাঁহার পূজা করিতেন যতক্ষণ পূজা করিতেন, বালিকা বসন্ত ততক্ষণ তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত। শিবের ধ্যান, স্তব, প্রণাম, ক্রমে ক্রমে বালিকার হৃদয়গত হইল। বালিকা থাকিয়া থাকিয়া "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিত।

বসন্ত এখন দ্বাদশ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সঙ্গে নবযৌবনের প্রথম লক্ষণসকল তাহার অঙ্গে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে অনেক বালিকার মন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু বসন্তের মনে সেরূপ কোন লক্ষণ প্রতীয়মান হইল না। তাহার সেই ধর্ম্মবিজড়িত অর্দ্ধমুখরিত উদাসভাব যেন সংসারের বিষয়বিষে মিশিতে চাহে না। সে সর্ব্বদা সেই শিবমন্দিরে বসিয়া থাকে; পাড়ার অপরাপর বালিকারা তাহাকে খেলিবার জন্য ডাকিতে আসে, কিন্তু তাহার উদাসভাব দেখিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়। জানি না বসন্তকুমারী মনে মনে কি চিন্তা করে। তাহাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া তাহার পিতা মাতা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। কুলীনকন্যা; পিতামাতার সামর্থ্য নাই যে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করেন। হরনাথ যে দশ টাকা পেন্সন পান, তাহাতে অতি কষ্টে চারিটী লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া আপন আপন পরিচিত ব্যক্তিদিগকে বসন্তের উপযুক্তপাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং আপনারাও নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বহুল অনুসন্ধানের পর শ্রীরামপুরের গোস্বামী পাড়ায় একটী পাত্র স্থির হইল। পাত্রের নাম নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ফুলের মুকুটি শ্রীধর ঠাকুরের সন্তান, স্বকৃত-ভঙ্গের ছেলে, তাহার উপর এম্, এ, পাশ করা। পিতার নাম রমাকান্ত। তিনি ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন না। কুল ভাঙ্গিয়া অনেক গুলি বিবাহ করিয়াছেন, স্নুতরাং শ্বশুরবাড়ীর তৈলবটেই তাঁহার সংসার একরূপ চলিত। সেই টাকাতেই তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। ছেলে এম্, এ, পাশ করিয়াছে। বৃদ্ধের একান্ত ইচ্ছা যে, ছেলে হাকিম হইবে, তিনি পায়ের উপর পা দিয়া কর্ত্তৃত্ব করিবেন এবং শ্বশুরবাড়ীর খাতাখাসি

পুরাইয়া ফেলিবেন। এখন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে সুন্দরী বালিকা দেখিয়া পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন। পুত্রের বয়স ২২ বৎসর। সুতরাং বিবাহ না দিলেই নয়। বসন্তকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। মেয়েটী সুলক্ষণা, পুত্র ভবিষ্যতে সুখী হইবে, এই জন্য তিনি যৎকিঞ্চিৎ সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। হরনাথের প্রতিবেশিবর্গ চাঁদা তুলিয়া বসন্তের বিবাহ দিল। বিবাহ রাত্রে পাড়ার মেয়েছেলে বিবাহ দেখিতে আসিয়া জামাই দেখিয়া বলিয়াগেল;—

"হায়! বিধি পাকা আম ডোমকাকে খায়।"

(৩)

এ সংসারে সুখী কে? যে যাহা চাহে, তাহা পাইলেই যদি সে সুখী হইত তাহা হইলে সংসারে দুঃখের লেশমাত্রও থাকিত না। তাহা হইলে সংসার নন্দনকানন হইত। কথায় বলে সাধিলেই সিদ্ধি; যে যাহা চায় সে তাহার জন্য সাধনা করে। সকলস্থলে সফলমনোরথ না হউক, অনেক স্থলে আশার অর্দ্ধেক ফলও ফলিতে দেখা যায়। সুতরাং তাহাতে তৃপ্তি কৈ? মনোরথ পূর্ণ হইলেও অপার বাসনার তৃপ্তি কৈ হয় বিষয়-বাসনা এমনই অতৃপ্তিকর বটে। কিন্তু যাহাতে প্রকৃত সুখ আছে, তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইলে, পর্ণকুটীরে—বৃক্ষতলে অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিয়া ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় অন্ন দ্বারা উদর পূরণ করিয়াও যে সুখী হয়, তাহার সেই সুখই পরম সুখ, তাহাই অনন্ত বাসনার অনন্ত চরিতার্থতা। অভিমানী সে সুখ পাইবে না। ধনের অভিমানী, বিদ্যার অভিমানী, রূপের অভিমানী—কুলগৌরবের অভিমানী সে সুখ হইতে বহুদূরে স্থিত। তাহারা জানে তাহাদের সে অভিমানের উদ্দীপনায় সুখ, তাহাদের ধারণা তাহাদের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইলে অপমানের সীমা থাকে না। তখন সেই অকিঞ্চিৎকর আত্মাভিমানের বিনিময়ে তাহারা সমগ্র বিশ্বসংসার পদদলিত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপে তাহারা প্রতিনিয়ত অমৃত ভাবিয়া গরল পান করে। সে বিষে তাহাদের জীবন জর্জ্জরিত হয়; তাহাতে সংসার পুড়িয়া ছারখার হয়।

পাঁচ বৎসর অতীত। বসন্তকুমারী এখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ এখন বি, এল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বামিগৃহে থাকিয়া বসন্ত সুখে কি দুঃখে কাল কাটাইতেছে, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, সে যাহা চাহিত তাহা পাইত না। নরেন্দ্রনাথও বি এল, পাশ করিয়া সুখী হইতে পারে নাই। বিদ্যাভিমানের সহিত তাহার মনে গরিমা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারাতে দারুণ অভিমান অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে মুন্সুফীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুইবার কেরাণীগিরী ও ডেপুটীগিরী পরীক্ষা দিয়া "ফেল" হইল। ওকালতী যে আশাপ্রদ, তাহাও বোধ হয় না। সুতরাং তাহার সঙ্গে তাহার পিতা মাতারও আশা পূর্ণ হইল না। এই সকল দেখিয়া—

শুনিয়া—ভুগিয়া নরেন্দ্রনাথ এখন সংসারে বিরক্ত—ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। অমন সোণার প্রতিমা সাক্ষাৎলক্ষ্মী বসন্তকে পাইয়াও সে সুখী হইল না। সে ইংরাজী-নবিশ, দারুণ শিক্ষাভিমানী বসন্তকুমারী অশিক্ষিতা। আজিকালিকার ইংরাজী-নবিশেরা যে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, দুর্ভাগ্যবশতঃ বসন্তকুমারী তাহাতে বঞ্চিতা সে গৃহস্থালীর সকল কাজ জানে, গৃহলক্ষ্মীর যাহা প্রকৃত গুণ, বসন্তকুমারী সেই গুণে গুণবতী, তথাপি স্বামীর প্রীতিদায়িনী হইতে পারিল না। তাহাকে সংসারকার্য্যে সদাই ব্যাপৃতা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ বড়ই ঘৃণা করিত, তাহাকে পূজা আহ্নিক করিতে দেখিলে নরেন্দ্র ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পড়িত; কখন কখন তাহার পূজার উপকরণ সমূহ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এমন কি সময়ে সময়ে তাহার কোমল অঙ্গে স্বীয় চরণের আঘাতকণ্ডুয়ণও পরিতৃপ্ত করিতে ত্রুটি করিত না। সরলা বসন্তকুমারী সহজেই তাহা সহ্য করিত, নরেন্দ্রনাথ রূপে ও গুণে তাহার উপযুক্ত না হইলেও বসন্ত পরম দেবতা জ্ঞানে স্বামীকে পূজা করিত, তাহার সহস্র কুব্যবহার অকাতরে সহ্য করিয়া থাকিত। সে দুবেলা উদর পূরিয়া খাইতে পাইত না; একখানি গহনা কখনও তাহার অঙ্গে স্থান পায় নাই, একখানি ভাল কাপড় কখন সে চক্ষে দেখে নাই। তাহার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর তাহাকে গরিবের মেয়ে বলিয়া সর্ব্বদা তাচ্ছিল্য করিত, ঘৃণা করিত, যন্ত্রণা দিত। স্বামীর মুখ চাহিয়া সরলা সকলই সহিয়া থাকিত। এমন কি সেই স্বামী যখন তাহাকে বিনা কারণে পদাঘাত করিত, তাহার যন্ত্রণার অবধি থাকিত না, সে অসীম অত্যাচারও তাহাকে অধীর করিতে পারিত না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যখন পদপ্রহারে তাহার পূজার উপকরণ গুলি দূরে ফেলিয়া দিত, তাহার পরম আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিত, তখন আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। প্রাণের ভিতর দুর্ব্বিষহ যাতনা হইত। বালিকা অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিত; নরেন্দ্রনাথের ভয়ে প্রকাশ্যে কাঁদিতে পারিত না। মর্ম্মভেদী যাতনায় হৃদয় পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত, সে চক্ষের জল গোপনে মোচন করিত,—কাহাকেও দেখিতে দিত না।

(৪)

আজি জন্মাষ্টমী। হিন্দুমাত্রেই আজ আনন্দে মগ্ন। আজি ভূভার হরণ করিবার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইবেন; জগতের যাতনা ঘুচিবে, পাপতাপ মোচন হইবে; এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গঙ্গাস্নানে যাইতেছে। বসন্তের একান্ত ইচ্ছা সেও গঙ্গাস্নানে যায়। কিন্তু কুলবধূ, নিকটে গঙ্গা হইলেও গুরুজনের অনুমতি ভিন্ন যাইতে পারে না। আশা ছিল যে তাহার শ্বাশুড়ী গঙ্গাস্নানে যাইবেন এবং সে তাঁহার সঙ্গে যাইবে। কিন্তু সে আশাও বিফল হইল। এমন পুণ্য দিনেও নরেন্দ্রনাথের জননীর গঙ্গাস্নানে মতি হইল না। সাহসে বুক বাঁধিয়া বসন্ত একবার শ্বাশুড়ীর কাছে গেল, অনেক চেষ্টা করিয়া একবার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "মা আজ জন্মাষ্টমী গঙ্গাস্নানে

যাইবে না।" শ্বাশুড়ী বিষম বিরক্ত হইয়া যারপরনাই ভর্ৎসনা করিল,—বলিল "যাহার মনে সুখ আছে, সে গঙ্গাস্নানে যাউক।" বসন্তকুমারী আর কিছু বলিল না, ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া নীরবে সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিল। সে যে সুখের জন্ত লালায়িত, পদে পদে সে সুখের পথে কণ্টক পড়িতেছে; তবে তাহার বাঁচিয়া সুখ কি? নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে অবিরত সেই চিন্তাই করিতে লাগিল। কোথা তাহার সেই শৈশবের সুখের শুকচর?—কোথায় তাহার দিদিমায়ের সেই শিবমন্দির?—কোথায় তাহার সেই গঙ্গার সৈকত-আসন? যদি সেখানে গিয়া একবার মুহূর্ত্তের জন্তও বসিতে পারিত তাহা হইলে তাহার আজ এ যাতনা হইত না। স্বামীর অত্যাচার,—শ্বাশুড়ীর তাড়না—শ্বশুরের অবিরত ভর্ৎসনা সকলই ভুলিতে পারিত যদি সে একবার সেই ঘাটে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পাইত। কিন্তু তাহা হইল না। হৃদয়ে দারুণ যাতনা পাওয়াতে সে সে দিনের গৃহস্থালীর কাজ ভুলিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল এখনও রন্ধন হয় নাই। তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না, বসন্তকে অন্তমনে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। তাহাকে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। বসন্তকুমারী তাহাতে দ্বিরুক্তি করিল না। স্নানান্তে সে নীরবে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিয়া নীরবে রন্ধন করিল; শ্বশুর, শ্বাশুড়ী স্বামী সকলকে খাওয়াইল, কিন্তু নিজে কিছু খাইল না। সে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল, তথাপি তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে একবার একটু জল পর্য্যন্তও খাইতে বলিল না। সমস্ত দিনরাত্রি অনাহারে কাটিয়া গেল; কিন্তু তাহাতে বসন্তকুমারীর কোন কষ্ট নাই। তাহার মনের ভিতরে যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার সহিত তুলনায় কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত দিন রাত্রি তাহার মন কি চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? রাত্রিকালে যথানিয়মে রন্ধন করিয়া বসন্ত সকলকে খাইতে দিল, কিন্তু নিজে জলগণ্ডূষও গ্রহণ করিল না। আহারাদি সমাপন করিয়া নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলে বসন্তকুমারী তাহার পদদ্বয় স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া অবিরত রোদন করিতে লাগিল। উষ্ণাশ্রু বিন্দু বিন্দু তাহার চরণে পড়িতে লাগিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল না। তখন বসন্ত তাহার পায়ে মুখ লুকাইয়া সেইরূপ রোদন করিতে করিতে বলিল, "জীবনসর্ব্বস্ব! এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার কেহই নাই। আমি অতিশয় অভাগী; তোমাকে একদিনের জন্তও সুখী করিতে পারিলাম না। কিন্তু নাথ, তোমাকে যদি দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্থান পাই।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; সে স্বামীর চরণে মুখ লুকাইয়া অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তথাপি নরেন্দ্রনাথ একবার তাহাকে একটী মিষ্ট কথা বলিল না। নরেন্দ্র নাথের বাটীর পাঁচ রশি দূরেই ভাগীরথী। পরদিন প্রত্যূষে

বসন্তকুমারী কাহাকেও না বলিয়া পাড়ার কতকগুলি স্ত্রীলোকের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে গেল। ঘাটে নামিবার পূর্ব্বে একবার শুকচরের সেই ঘাটের ও তাহার সম্মুখস্থ শিবমন্দিরের দিকে চাহিল; উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল; তাহার পর সে যে জলে নামিয়া ডুব দিল, আর উঠিল না। পাড়ার সেই স্ত্রীলোকেরা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া গোলযোগ করিতে লাগিল, একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কত লোকে কত অন্বেষণ করিল কিন্তু বসন্তকে আর পাইল না। সেই পরম পবিত্র জন্মাষ্টমীর দিন কৃষ্ণগতপ্রাণা বসন্তকুমারী ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথীর পবিত্র জলে ভগবানের চরণ চিন্তা করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিল।

নরেন্দ্রনাথের, গৃহলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। তাহার পিতা মাতা তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বড় ঘরে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবে বলিল; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আর বিবাহ করিতে চাহিল না। দারুণ অনুতাপে তাহার হৃদয় পুড়িয়া ছারখার হইল; মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। সে সংসার ছাড়িয়া গঙ্গার তীরে তীরে উন্মত্তভাবে কেবল ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনাহারে—মনস্তাপে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হইল, তথাপি নরেন্দ্রনাথ আর ঘরে ফিরিল না।

* * * * *

দশ বৎসর অতীত, তথাপি গঙ্গা-তীরস্থ কোন কোন মহাশ্মশানে শব দাহ করিবার সময় কেহ কেহ এখনও নরেন্দ্রের খর্জ্জুরবৃক্ষ সদৃশ সেই বীভৎস দেহ শ্মশান-সৈকতে ভ্রাম্যমান দেখিতে পায়। সে কখন কখন হঠাৎ অসতর্ক শ্মশানবন্ধুগণের মধ্যে আপতিত হইয়া "Howl—Howl—Howl! Oh! ye are men of stones!" বিকট স্বরে ঐ কয়েকটী কথা বলিয়া তখনই অন্তর্হিত হয়।

"HOWL! HOWL! OH! YE ARE MEN OF STONES!"

কুমারিল ভট্ট

তাঁহার প্রকৃত সময় নিরূপণ।

বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রামাণ্য সংস্থাপনের জন্য, মীমাংসা দর্শন রচিত হইয়াছে। যে সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ জৈনগণের আধিপত্য ও প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাদের যুক্তি ও তর্কবলে যে সময়ে পূর্ব্বে মীমাংসা প্রবর্ত্তিত বৈদিক ধর্ম্ম বিলোপের সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই সময়ে মহাত্মা "কুমারিলভট্ট" ভারতাকাশে সমুদিত হইয়া বিধর্ম্মির প্রবল আক্রোশ হইতে বৈদিক মার্গ উদ্ধার করিয়া ছিলেন। তিনি যে রূপে বৌদ্ধ ও জৈন দিগকে যুক্তি ও তর্ক শাস্ত্রে পরাজিত করিয়া বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন তদ্বিরচিত মীমাংসা বার্ত্তিকে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরম দার্শনিক শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি গান করিয়াছেন। এমন কি মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে দেবাবতার বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বাস্তবিক কুমারিল যে রূপে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, যে রূপে বেদের উপাখ্যান সমুহের রূপকতার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পরিদর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার সে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করা একান্ত অসম্ভব। তবে তিনি কোন সময়ে ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কোন সময়ে তিনি বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই সময় নিরূপণ করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। বহু দিন হইল আমি জন্মভূমি পত্রিকায় শঙ্করাচার্য্যের সময়নিরূপণ বিষয়ক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ছিলাম, তাহাতে আমি প্রমাণ করি যে, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টিয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তি। এরূপ স্থলে কুমারিলভট্ট যে তাহার কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন অনেকেরই সহজে ধারণা হইতে পারে। তৎকালে আমার সামান্য অনুসন্ধানের দ্বারা যে সকল প্রমানাদি সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহারই সাহায্যে আমি ঐ রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। কিন্তু এক্ষণে আনুসঙ্গিক অপরাপর গ্রন্থ সাহায্যে যে রূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে আমার পূর্ব্বমত অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে, মানব মাত্রেই ভ্রমের দাস, অভ্রান্ত পুরুষ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এরূপ স্থলে আমার ন্যায় ব্যক্তি দুই দিন আগে যাহা বলিয়াছি সত্যানুসন্ধানের উজ্জ্বল আলোকে তাহা যে আজ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহা অসম্ভব নহে। আমি সত্য প্রিয় যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব সত্যানুরোধে তাহাই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। যাহা হউক অপরাপর বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন কাজের কথা বলি। এখন আমি অনেক প্রমাণ পাইয়াছি যদ্বারা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি শঙ্করাচার্য্য বা কুমারিল খৃষ্টীয় ৫ম

শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন নাই। তাঁহার বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কি কারণে উভয়েই পরবর্ত্তী হইতেছেন, নিম্নে তাহা প্রমাণ করিতেছি।

শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল উভয়েই বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির নামোল্লেখ ও তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত চীনপরিব্রাজক ইৎসিং ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক। ইৎসিং খৃষ্টীয় ৭ম্ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার মতে বাক্য-পদীয়-রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি ৬৫০ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুমারিল স্ব-রচিত মীমাংসাবার্ত্তিকে বাক্যপদীয় গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে বচনোদ্ধার ও তাহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য সমন্তভদ্র আপ্তমীমাংসায় অর্হতের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জৈন গ্রন্থকার অকলঙ্ক অষ্টশতী নামক আপ্তমীমাংসার টীকায় প্রকাশ করেন যে অর্হতের কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নাই। কুমারিল তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানে আমরা সমন্ত-ভদ্রের মূল ও অকলঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। সমন্তভদ্র আপ্তমীমাংসায় লিখিয়াছেন—

"সূক্ষ্মান্তরিতদূরার্থাঃ প্রত্যক্ষাঃ কস্যচিদ্যথা"

অকলঙ্কদেব টীকায় লিখিয়াছেন, অন্তরিত অর্থাৎ কালবিপ্রকর্ষি "অতীতাদি" কুমারিলভট্ট সমন্ত-ভদ্রের মূল ও অকলঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন—

"এবং যৈঃ কেবলং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াদ্যনপেক্ষিণঃ।
সূক্ষ্মাতীতাদিবিষয়ং জীবস্য পরিকল্পিতম্॥
ন তে তদাগমাৎ সিধ্যের চ তেনাগমো বিনা।
দৃষ্টান্তোঽপি ন তস্যান্যো নৃষু কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে॥"
(তন্ত্রবার্ত্তিক)

আবার জৈনগ্রন্থকার বিদ্যানন্দ জৈন-শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল-ভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"ততো যত্নুপহসনমকারি ভট্টেন
যৈরুক্তং কেবলং জ্ঞানমিন্দ্রিয়াদ্যনপেক্ষিণঃ।
সূক্ষ্মাতীতাদিবিষয়ং সূক্ষ্মজীবস্য তৈরদঃ।"

এই রূপ কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকে অনেক স্থলেই অকলঙ্কের অষ্টশতী-ব্যাখ্যার কথা ও তাহার প্রতিবাদ লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের মত সমর্থন করিয়া, নিজ অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে বহু স্থানেই কুমারিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন।

এরূপ স্থলে অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই আমরা নিঃসন্দেহে কুমারিলের প্রকৃত সময় স্থির করিতে পারিব।

৮৬৩ শকে পম্প কর্ণাটী ভাষায় লিখিত আদিপুরাণে এবং ৮৮২ শকে সোমদেব আপনার যশস্তিলককাব্যে অকলঙ্কদেবকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আবার জিনসেনাচার্য্য ৭৬০ শকে জৈন আদিপুরাণে অকলঙ্কদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। জিনসেনাচার্য্য রাষ্ট্রকূটরাজ ১ম অমোঘবর্ষের গুরু ছিলেন। তিনি আদিপুরাণের এক স্থানে প্রভাচন্দ্রের চন্দ্রোদয় নামক ন্যায়গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্রের ন্যায়-কুমুদচন্দ্রোদয় এবং বিদ্যানন্দের অষ্টসাহস্রী গ্রন্থে উভয় গ্রন্থকারই অকলঙ্কদেবের শিষ্য বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিয়াছেন। এদিকে প্রভাচন্দ্র বাণভট্টের কাদম্বরী ও ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার জৈনগ্রন্থকার ব্রহ্মনেমিদত্ত লিখিয়াছেন,

অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ (১ম) কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক।

গুজরাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূট-রাজ দন্তিদুর্গের তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায়, ৬৭৫ শকে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার খুল্লতাত কৃষ্ণরাজ উত্তরাধিকার লাভ করেন। জিনসেনাচার্য্য উত্তরপুরাণে লিখিয়াছেন, ৭০৫ শকে কৃষ্ণরাজের পুত্র বল্লভরাজ রাজদণ্ড প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ইৎসিংএর মতে ৬৫০ খৃঃঅব্দে বাক্যপদীয়-রচয়িতা ভর্ত্তৃহরির মৃত্যু হয়। কুমারিল বাক্যপদীয়ের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অকলঙ্কদেবের শিষ্য প্রভাচন্দ্র ও বিদ্যানন্দ উভয়েই কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুমারিল অকলঙ্কদেবের অষ্টশতীর অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অকলঙ্কদেব কোন স্থানে কুমারিলের মতের প্রতিবাদ করেন নাই। এরূপ স্থলে কুমারিল ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তী, অকলঙ্কদেবের সমসাময়িক এবং অকলঙ্কদেবের শিষ্য বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্রের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজের সময়ে ৬৭৫ শকের পরে এবং ৭০৫ শকের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং কুমারিল-ভট্টও ঐ সময় আবির্ভূত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা অসম্ভব নহে। শঙ্করাচার্য্য যখন কুমারিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তখন শঙ্করাচার্য্যও যে ঐ সময়ের পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

আত্ম-পরতা।

আত্ম এবং আত্মেতর, এই দুইকে অবলম্বন করিয়া, এই দুইকে ভিত্তি করিয়া, দ্বিবিধ নীতি-প্রণালী পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। এক প্রণালীর শিক্ষা—পরের হিত দেখিবার আগে আপনার হিত দেখ; নতুবা আপনার হিত ত সাধিত হইবেই না—পরের হিতও হইবে না। আর এক দল বলেন—আপনাকে পরের জন্য বিসর্জ্জন কর, তাহাতে পরলোক আয়ত্ত হইবে। এক দলের কথা, আত্মানং সততং রক্ষেৎ। আর এক দলের কথা—পরের জন্য জীবন ধারণ করিও (Live for others). এক দল বলেন—আত্মপরতা জগতের প্রধান ও মূল ধর্ম্ম; অন্য দল বলেন—আত্মপরতা মহাপাপ। হিন্দু নীতিবিদ্ বলিয়াছেন—

> বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ।
> পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপাঃ দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ॥
> নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা—ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিনঃ।
> সর্ব্বে স্বার্থবশাজ্জনোহভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

ইহার অর্থ—বৃক্ষ ক্ষীণ-ফল হইলে পাখী উড়িয়া যায়, সরোবর শুষ্ক হইলে সারস চলিয়া যায়, পুষ্প পর্য্যুষিত হইলে ভ্রমর ছাড়িয়া যায়, বন দগ্ধ হইলে জীব সরিয়া যায়, পুরুষ নির্দ্ধন হইলে গণিকায় ত্যাগ করে, রাজা শ্রীভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রী অন্য পথ দেখে;—সকলেই ত

আপনাপন স্বার্থবশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ভাল বাসা কে কার?

এই নীতির বিরুদ্ধ কথা স্নেহ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রচার করিয়াছিলেন, এবং আগষ্ট কোম্‌ত্‌ সেই ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যেরা এখনও তাহা প্রচার করিতেছেন। কৌতুক এই যে, যিনি পরার্থপরতা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্যেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরস্বাপহরণে রত।

সে যাহা হউক, বিচার্য্য এই যে, আত্মত্যাগনীতি মনুষ্যের পক্ষে অবলম্বনীয় কি না। বিষয়টা অতি গুরুতর; সেই জন্য ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হওয়া উচিত। আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা আমরা বলিতে চেষ্টা করিতেছি, অন্যরূপ বক্তব্য কিছু থাকিলে তাহা শুনিতে পাইলে সুখী হইব। আমরা অবিসম্বাদিত সত্য প্রচারের অহঙ্কার রাখি না; বাদ প্রতিবাদ সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

আমাদের প্রথম কথা এই যে—আত্মনিরক্তি, আত্ম-প্রকটন, আত্ম-সমর্থন যে জগতের প্রথম ও প্রধান নিয়ম তাহা, শুদ্ধ মনুষ্য জাতি বলিয়া নহে, জগতের সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান। ভূরস গ্রহণে পাদপ কখন পাদপান্তরের জন্য আপনাকে বঞ্চিত করে না; কুসুম কখন কুসুমান্তরের মুখ চাহিয়া আপনার প্রস্ফুটিত সম্পূর্ণতা সঙ্কুচিত করে না; ধূমকেতু কখন বিপ্লব পরিহারের জন্য আপনার গতিরোধ করে না; গ্রহ কখন গ্রহান্তরের জন্য আপন কক্ষপথ ছাড়িয়া দেয় না। তুমি সুখাতিশয্যে চঞ্চল, উন্মুক্ত, উৎফুল্ল; জগতকেও সুতরাং তোমার আনন্দোৎসবের সহায়রূপে পাইতে ইচ্ছা কর; কিন্তু জগৎ ত তোমার মুখ পানে চাহে না—মেঘ বর্ষণ করিতে ছাড়ে না, অমাবস্যা অন্ধকার করিতে ভুলে না, তোমার জন্য জগতের কেহই আপনা সম্বরণ করে না। তুমি হয় ত দুঃখ ভারে কাতর, অবসন্ন, মৃতপ্রায়; কিন্তু তথাচ চন্দ্র উঠে, নক্ষত্র ফুটে, জ্যোৎস্না হাসে, বায়ু খেলে, লতা দুলে, কোকিল ডাকে, মানুষ হাসে, নাচে, গায়। আত্ম-প্রকটন জগতের প্রধান নিয়ম।

যাঁহারা পরার্থপরানীতি প্রচার করেন, তাঁহারাও এ কথা স্বীকার করেন যে, আত্ম-পরায়ণতা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম, কেননা এরূপ স্পষ্ট সত্য অস্বীকার করিবার পথ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা বলেন যে, জীব স্বভাবতঃ আত্মপরায়ণ বটে, কিন্তু এই আত্মপরতা পশুধর্ম্ম। মানবের ন্যায় বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন-জীবের কর্ত্তব্য যে, এই পশুবৃত্তির উন্মূলনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রয়াস করে। ইহার উন্মূলনেই মনুষ্যত্ব—ইহাই পুরুষার্থ—ইহাই ধর্ম্ম।

কথাটা বড়ই গুরুতর। সেই জন্য ইহার তন্ন তন্ন বিচার হওয়া উচিত। সে বিচার হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে তাহা এই প্রবন্ধে প্রকটিত হইল।

এতৎসম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, কার্য্য করিবার পূর্ব্বে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। জীবন রক্ষা ব্যতীত কার্য্য করা সম্ভব হয় না। আপনাকে রক্ষা

করা এবং আপনার কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করা, ইহাই মানুষের প্রথম এবং প্রধান কার্য্য। ইহা না করিলে আত্ম-শক্তির অপচয় ঘটে। ভাবিয়া দেখিলে, আত্মশক্তির অপচয়াত্মক কার্য্য প্রণালী এবং আত্মহত্যা প্রায় এক কথা। বরং ইহা বলা যায় যে, যেরূপ জীবন প্রণালীতে আত্মশক্তির অপচয় ঘটে বা ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা আত্মহত্যার অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। আত্মহত্যায় আপনারই লোপ হয়—তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; কিন্তু শক্তির অপচয় কেবল ব্যক্তিগত পাপ নহে—ইহা একটা সামাজিক পাপ। বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, এবং উত্তরাধিকার নিয়ম যাঁহারা বিশ্বাস করেন—বিশ্বাস না করিবার আর উপায় নাই*—তাঁহারা জানেন যে, মানুষের উৎকর্ষাপকর্ষ বংশাবলীতে সঞ্চারিত হয়। আত্মাবহেলায় যে শক্তির অপচয় ঘটে, তাহা কেবল আপনাতে পর্য্যবসিত হয় না, বংশানুক্রমে তাহা উত্তরাধিকৃত হয়। সুতরাং যে জীবন প্রণালী আত্মশক্তির ক্ষয়কারক, তাহা কেবল ব্যক্তিগত পাপ নহে, সামাজিক পাপ। আত্মাবহেলা যে কেবল ব্যক্তিগত ও সামাজিক পাপ নহে, পরন্তু জাতীয় পাপ, একটু তলাইয়া বুঝিলেই তাহাও হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্যক্তিগত সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল, জাতিগত রক্ষার উপায় সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। বিজ্ঞান এই কথা বলে যে, যেরূপ কার্য্যের দ্বারা আত্মোন্নতি সংসাধিত হয়, সেই কার্য্যই সেই জাতির উন্নতিকল্পে অনুকূল। মনুষ্য জাতি যে, অন্য সকল জীব ছাড়িয়া এত উন্নত পদবীতে উন্নীত হইয়াছে, সেও কেবল আত্মানুকূল ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া। যাহাতে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতেই উন্নতি হইবে। অর্থাৎ—উন্নতি হইয়াছে আত্মপরতায়, উন্নতি হইবেও আত্মপরতায়। ইহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিলে ফলও যে বিপরীত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যত্নে এবং অনুশীলনে সকলই পরিপুষ্ট হয়, এবং অবহেলায় সকলই বিনষ্ট হয়।

উপরে যাহা বলা গেল, তাহা হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, অযথা আত্মাবহেলা ও আত্মত্যাগের প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ফল, আত্মশক্তির অপচয় ও তন্নিবন্ধন স্বকীয় ও পারিবারিক অশান্তি এবং দুঃখ ; এবং ইহার দূর ফল, সামাজিক বিশীর্ণতা, ও পরিণাম-জাতিগত ধ্বংশ। সুতরাং অযথা আত্মত্যাগ, আত্মদ্রোহ ত বটেই, তাহার উপর সমাজ-দ্রোহ এবং জাতি-দ্রোহ। অযথা আত্মত্যাগ এতটা দোষাবহ হইলেও আমরা যে কেন তাহার অনিষ্টকারিতার দিকে দৃষ্টিপাত করি না, বা দেখিয়াও দেখি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, প্রচলিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্ম বা নীতি প্রণালী অনিষ্ট-গর্ভ হইলেও মানুষ সহজে তাহার বিলোপসাধন বা বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা করে না। এতদ্ব্যতীত কোন নীতি প্রণালীর অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়ও নহে।

জৈবণিক হিসাবে আত্মপরতা দোষাবহ হওয়া দূরে থাকুক, বরং জীবনোপায়রূপে সর্ব্বথা অবলম্বনীয়, তাহা দেখা গেল।

* Galton on Hereditary Genius.

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখের হিসাবেও যে তাই, তাহার আলোচনা করা যাউক। আত্মাবহেলার যে আত্মশক্তির অপচয় হয়, তাহা দেখা গিয়াছে। শক্তির অপচয় যে নিজের পক্ষে দুঃখমূলক, তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও তদ্বিষয়ে দুই একটা কথা বলা যাউক। শক্তির অপচয়ে বুঝায় এই যে, যাহা তুমি সহজে ও সানন্দে করিতে পারিতে, তাহা করিতে বড়ই আয়াস ও বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে; এবং এতটা করিয়াও বাসনা বা আদর্শানুরূপ যে করিতে পারিবে না, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ। আত্মশক্তির সহজ, সুতরাং, প্রফুল্ল ব্যবহারে জীবমাত্রেরই আনন্দ। আত্মশক্তিকে টানিয়া বুনিয়াও অভীপ্সিত রূপ সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলে জীবমাত্রেরই দুঃখ। যে জীব আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিয়া সহজেই কৃতকার্য্য, সে জীব যুদ্ধ করিতে বড়ই প্রফুল্ল এবং অগ্রসর। যে জীব পলায়ন করিয়া সহজেই শত্রুর কবল এড়াইতে পারে, তাহারা শত্রুর মুখ হইতে পলায়নে প্রফুল্লতা অনুভবের পরিচয় দেয়। ইতর জীব-জগতে যে নিয়ম সত্য, মানুষের ভিতরেও তাহাই দেখা যায়। যে মানুষ যাহা ভাল করিতে পারে, সে তাহা সহজেও করে এবং আগ্রহ সহকারে করে; কেননা তাহাতেই তাহার সচ্ছন্দতা ও প্রফুল্লতা। যে যাহা ভাল করিতে পারে না, অর্থাৎ যে বিষয়ের সম্পাদনকল্পে তাহার উপযোগিতা নাই, সে তাহা দায়ে ঠেকিয়া হয়ত কষ্টের সহিত করে, এবং অতি কষ্টে করিয়াও অকৃতকার্য্যতার বিড়ম্বনা ভোগ করে। অতএব এরূপ আত্মত্যাগ, যাহাতে আত্মশক্তির অপচয় বুঝায়, তাহা যে অসুখকর তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়।

তাহার পর ধর পরের সুখ। অযথা আত্মত্যাগে যে নিজে অসুখী হইতে হয়, তাহা দেখা গেল। যে নিজে অসুখী, সে অপরকে সুখী করিতে পারে না। সুখ এবং দুঃখ, অনেকটা সংক্রামক। এক একটা লোক দেখিতে পাওয়া যায়—শরীরে স্বাস্থ্যের উচ্ছ্বাস, মুখে প্রফুল্লতার উচ্ছ্বাস, চক্ষে হাস্যের উচ্ছ্বাস—সে যেখানে যায়, যেখানে থাকে, একটা আনন্দের লহরী তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায় এবং থাকে। এইরূপ লোককেই নিত্য ব্যবহার্য্য বাঙ্গালায় "মজলিশি" লোক বলে। আর একরূপ লোক দেখা যায়—একটা বিষাদের কালিমা তাহাদের প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত—তাহারা যেখানে যায়, একটা অপ্রফুল্লতার ঘনান্ধকার যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এমন অনেক সময় দেখিতে পাইবে যে, কোন স্থানে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু একটা লোক আসিল, আর সব নিবিয়া গেল,—বাক্যের স্রোত বন্ধ হইয়া গেল, প্রদীপ্ত চক্ষু মলিনাভ হইয়া গেল, বহু আলোক প্রদীপ্ত, বহু জনাকীর্ণ রঙ্গমঞ্চে যেন অকস্মাৎ শেষ যবনিকা পড়িয়া গেল; কোযাগর পূর্ণিমার অনন্ত প্রফুল্ল রাত্রে যেন অকস্মাৎ মেঘাগমে সব ঢাকিয়া গেল, মুখের প্রফুল্লতা কোথায় মিলাইয়া গেল। ইহা যে এই দ্বিবিধ লোকের ক্ষমতা তারতম্যের ফল, তাহা নহে। অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে, একশ্রেণীর লোক আত্মপরতার দিকে যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া

আপনাকে অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে—আর একশ্রেণীর লোক যেরূপেই হউক আত্মত্যাগ করিয়া আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে ত বটেই—তাহার উপর আপনার সুখোপযোগিতারও বিঘ্ন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আত্মাবহেলায় কেবল যে আত্মবিহীনতার সংক্রমণ হয়, তাহা নহে; পরহিত সাধনের শক্তিও কমিয়া যায়। পরের হিত করিবার আগে ইহা আবশ্যক যে, পরের হিত সাধনের উপকরণ সংগ্রহ করা চাই—অর্থাৎ, স্বাস্থ্য চাই, ধন চাই, বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, এবং কার্য্য করণোপযোগী উদ্যম চাই। এ সকল না হইলে, পরের হিত সাধনের অনুষ্ঠান করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব পরহিত সাধনের পারগতা পক্ষেও ইহা আবশ্যক যে, নিজের দৈহিক, মানসিক, এবং নৈতিক পূর্ণতা রক্ষিত হয়। ইহার অর্থ—যদি তুমি পরের হিত-সাধন ভাল করিয়া করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে আত্মপর হইতেই হইবে।

যিশুখ্রিষ্ট এবং "আগস্তকোম্‌ত উভয়েই বলিয়াছেন যে, পরার্থ-পরতাই ধর্ম্ম। এই উপলক্ষে এই কথা সম্বন্ধে আমাদের একটা বক্তব্য আছে। সে কথা এই যে, যাহা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না বা হইলেও অসম্ভব হয়, তাহা কখনই ধর্ম্মপদ বাচ্য হইতে পারে না। কথা এই যে, পরার্থপরতা সার্ব্বজনীন হইলে সম্ভব হয় কিনা। দাতার অস্তিত্ব থাকিবার পক্ষে গৃহীতার অস্তিত্ব আবশ্যক—গ্রহণ করিবার লোক না থাকিলে দান করা চলে না। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক দান পরায়ণ হয়, তাহা হইলে ত গ্রহণ করিবার লোক থাকে না। যদি গ্রহণ করিবার লোক থাকে, তাহা হইলে ইহাই বুঝায় যে, পরার্থপরতার অনুশীলনে আত্ম-পরতার বৃদ্ধি অনিবার্য্য। অতএব ইহা বুঝা গেল যে, সার্ব্বজনীন পরার্থ-পরতা কখনই সম্ভব নহে,—ধর্ম্মের পদবীতে উন্নীত হওয়া ত দূরের কথা।

তবে কি মানুষ কেবল আত্মপর আত্ম-নিমগ্ন, আত্মৈকসর্ব্বস্ব হইবে? তাহা কে বলিতেছে! যেমন সম্পূর্ণরূপে পরার্থপর হওয়া অসম্ভব, এবং হইলে পৃথিবী চলে না, তেমনি সম্পূর্ণরূপে আত্মপর হওয়াও অসম্ভব এবং হইলেও পৃথিবী চলে না। কেন অসম্ভব, কেন চলে না, তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব।

রত্নহার।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ, বালিকা ও বালক।

একটী মনোহর অট্টালিকার অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে, মুকুলিত সহকার-তলে দাঁড়াইয়া, এক বৃদ্ধ মৃগ-শিশু লইয়া খেলা করিতেছিল। নিকটে, এক হস্তে হৈম-ঘট, অন্য হস্তে আম্রমুকুল ধরিয়া, একটী দশম বর্ষীয়া বালিকা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের ক্রীড়া দেখিতেছিল। অলক্ষিত-দৃষ্টি-চাঞ্চল্যে একবার মৃগ শিশুর পানে চাহিতে ছিল, আর বার বৃদ্ধের করভারনমিতশাখাসংলগ্ন মুকুলগুচ্ছের সহিত মৃগশাবকের মৌখিক ভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল।

বালিকার নাম নারায়ণী। ছোটনাগপুরস্থ অনন্তপুরের রাজা বীরচন্দ্র সাহী দেবের একমাত্র পৌত্রী। বৃদ্ধের নাম রতন রায়—বীরচন্দ্রের বিশ্বস্ত, অনুচর বাল্যসখা বাঙ্গালী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। নারায়ণী শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। মহারাজা বালিকার পালন ভার রতনের করে সমর্পণ করিয়াছেন। পরের ধন করিলে নারায়ণী বাঁচিয়া থাকিবে, এই আশায় পুত্রশোকাতুরা মহারাণী ব্রাহ্মণের করে নাতিনী সমর্পণ করিয়াছেন। রতন রায়ের আপনার বলিতে কেহ নাই। কাজেই ঈর্ষাপরতন্ত্র বিধাতা নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ বয়সে এই আপনার ধন দিয়া জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের তপ, যপ, হোম যাগ এখন এই ক্ষুদ্র কুসুম-কিঞ্জল্কসমা বালিকা।

নারায়ণী বড় অভিমানিনী। বালিকার কথায় কথায় অভিমান, কথায় কথায় ধুল্যবলুণ্ঠন, কথায় কথায় কিন্নর কণ্ঠে সপ্তস্বরের বেলয় ঝঙ্কার। মাতামহীর সঙ্গে তার নিত্যই কলহ হইত। সেই কলহের পরিণাম রতনের পৃষ্ঠে যখন তখন সংরক্ষিত হইত।—পৃষ্ঠ কর্ণ ও নাসিকা যখন সমস্ত ফুলাইয়া উঠিতে পারিত না, তখন বৃদ্ধ নারায়ণীকে উদ্যানে আনিয়া পাথর লোফালুফি করিয়া, বড় বড় বৃক্ষের গুঁড়ি নাড়িয়া, শাখাভগ্ন করিয়া—কখন বা কৃষ্ণসারের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া, তরু সঞ্চালনে পাদপাশ্রিত পাখীকুলের নীরবাবস্থানে বাধা দিয়া বালিকাকে ভুলাইয়া দিত। বৃদ্ধ ঔপন্যাসিক বলবান।

আজ বালিকা পিতামহীর জপেরমালা কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই মালা লইয়া বিবাদের সূত্রপাৎ। অপরাধের মধ্যে মালা কোথা ফেলিয়াছিস বলিয়া পিতামহী নাতিনীর মুখপানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছিলেন।' এই অপরাধে তাঁহার কুচারগাছি পক্ককেশ স্থানচ্যুত হইয়াছে, গণ্ডস্থল বালিকার নখপীড়নে

ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। অবশেষে আর কিছু করিতে না পারিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া নিজের পক্ষ সমর্থন করিবার লোক সংগ্রহ করিল। রতন নারায়ণীকে উদ্যানে আনিয়া, সর্ব্বংসহ পৃষ্ঠদেশে বিচারভার গ্রহণ করিয়া বালিকাকে শান্ত করিয়াছেন। বালিকার অভিমানভারাবনত বদনকমলে অর্দ্ধবিশুষ্ক লোচনজল, অরুণকিরণস্পর্শী প্রভাত বাত্যাভিহত শিশির বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

বালিকা দূর হইতে মৃগশাবকের ক্রীড়া দেখিতেছিল। মৃগশিশুর আদরপীড়ন তাহার বড় ভাল লাগিত না। সে নারায়ণীকে দেখিলেই দূর হইতে আস্ফালন করিত, অজাতশৃঙ্গমস্তকে তাহার উদর, পৃষ্ঠ, বক্ষ কণ্ডুয়ণ করিত, রসনা দিয়া কর্ণ, মুখ, নাসিকা লেহন করিত।—এক কথায় হরিণ শিশু নারায়ণীকে গুড়ের গাছ পাইয়াছিল। হরিণ শিশুর নারায়ণী-অঙ্গ ভাল লাগিলে কি হইবে, নারায়ণীর তাহার আদর ভাল লাগিত না। তাই বালিকা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল।

বৃদ্ধ কিন্তু বালিকাকে ভুলাইতে যাইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। হরিণের সহিত খেলা করিতে করিতে তিনি আপনার পক্বকেশ, ও তদ্বৎশুভ্র আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু-বার্দ্ধকের দেহোপকরণ ভুলিয়া গিয়াছেন। বালস্বভাবসুলভ চপলতার সহিত এক একবার আম্রশাখা আকৃষ্ট করিয়া মৃগ শিশুর মুখের কাছে ধরিতে ছিলেন। ব্যগ্রতা সহকারে সে যেমন মুকুলগুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইয়া প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল, অমনি শাখা পরিত্যাগ করিতেছিলেন। অর্দ্ধারূঢ় মুকুলগুচ্ছ সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিধারে কণাবর্ষণ করিতে লাগিল। মৃগ কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শাখালগ্ন পল্লবরাজি এ তার ঘাড়ে পড়িয়া, সে তাহাকে জড়াইয়া, কিন্তু সকলেই একবাক্যে সরসর করিয়া পলায়ন নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। বৃদ্ধ একমনে এই বালোচিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন।

হায়রে বাল্যকাল! তোর সুখ স্মৃতি আগে ভাগে পাঠাইয়া, মানব মনকে ওতপ্রোত করিয়া, অলক্ষপদসঞ্চারে এমন করিয়া মানব হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার করিস্, যে সে সময় মানব স্বর্গের কথা ভুলিয়া যায়। নৈয়ায়িক 'পর্ব্বতো বহ্নিমান' ভুলিয়া, যোগী আত্মতত্ত্বে জলাঞ্জলী দিয়া, বৈয়াকরণ 'মুখ্যো ঢে চত্বমাপ্নুয়ু,' বিস্মৃত হইয়া, ভৌগলিক উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা কমলালেবুটীকে জগন্নাথকে সমর্পণ করিয়া, ইকড়ি বিকড়ি খেলিতে থাকে। তস্কর সিঁদকাটী হাতে করিয়া প্রতিবেশি ধনাঢ্যের গৃহ প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায় না। বৃদ্ধিলোভী মহাজন টাকার থলিয়াটী নিজায়ত্তে আনিয়া, পেটিকাভ্যন্তরে সপ্তস্তর ছিন্নবসনের তলদেশস্থিত ক্ষুদ্রবাক্স ভ্রমে ধরণীর পৃষ্ঠে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয়। প্রণয়িণী প্রণয়ীপ্রদত্ত নাকছাবীটী কুণ্ডলে দোলাইয়া, কোথায় ফেলিলাম কোথায় ফেলিলাম বলিয়া নাসিকা অন্বেষণের পর কবরী খুলিতে থাকে। যুবতী বেলফুলের বাড়ী যাইতে যাইতে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

গুরু শিষ্যের কাছে মস্তকাবনত করে, স্ত্রী স্বামীকে প্রিয় সম্বোধন করিতে

তুলিয়া যায়, পিতা, পুত্রের সখিত্ব কামনা করে। কিন্তু হায়, সে কতক্ষণ!

বৃদ্ধ আত্মবিস্মৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য নারায়ণীকে ভুলিয়া রহিলেন।

মৃগশাবক দেখিতে দেখিতে নারায়ণী এদিক ওদিক এক একবার মুখ ফিরাইতে আরম্ভ করিল। অদূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরুতোরণতলে দাঁড়াইয়া একটী বালক তাহাদের ক্রীড়া দেখিতেছিল। বালিকা এদিক ওদিক সেদিক মুখ ফিরাইয়া, তরুলতা পুষ্পবন নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইল। বালকও অমনি তরু অন্তরালে লুকাইল। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া নারায়ণী সেই দিকে অগ্রসর হইল।

বালক তাহা দেখিল। অগ্রসর হইবে কি পিছাইয়া যাইবে ভাবিতে লাগিল। ভাবনার শেষ না হইতেই দেখিল সম্মুখে নারায়ণী।

নারায়ণী বলিল "মুকু—"

বালক থতমত খাইয়া গেল, উত্তর করিল না।

দক্ষিণকরের আম্রমুকুল ঘটমুখে প্রবিষ্ট করাইয়া, ছুটিয়া আসিয়া নারায়ণী বালকের হাত ধরিয়া টানিল।

বালক কহিল—"আমি যাইব না।"

"চল দোলায় দুলিব।"

"দুলিব না।"

"হরিণ ধরিব।"

"আমায় ছাড়িয়া দাও। ঘরে ফিরিয়া যাই।"

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিয়া দুই হস্তে বালকের এক হস্ত সবলে ধরিয়া, আকর্ষণ করিল। বালক বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও।" বালিকা বলিল "ছাড়িব না—কখনই ছাড়িব না। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

বালকের বল লোপ পাইল। নারায়ণীর সহিত ধীরে ধীরে কুঞ্জের বাহিরে আসিল।

বৃদ্ধের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন নারায়ণী নাই। ডাকিলেন "নারায়ণী"। নারায়ণী বলিল "কেন?" বৃদ্ধ দেখিলেন নারায়ণী মুকুন্দের হাত ধরিয়া রহিয়াছে। বালককে দেখিয়াই বৃদ্ধের লোচন ক্রোধ-রাগরঞ্জিত হইল। গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন "নারায়ণী"!

সেই গম্ভীরস্বরঝঙ্কারে কানন প্রতিধ্বনিত হইল; বালক স্তম্ভিত হইল। তাহার করের দৃঢ়-বন্ধন—নারায়ণীর কোমল করাঙ্গুলি বলয় খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ আবার বলিল "চলিয়া আয়"। মুকুন্দের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। এক এক পদ করিয়া পিছাইয়া যেই একটু অন্তরালে পড়িল, অমনি ছুটিয়া পলাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভোগাভিলাষ।

মুকুন্দ বীরচন্দ্রের দেওয়ান আনন্দদেবের পুত্র। আনন্দদেব রাজার আত্মীয়। প্রথমে রাজসংসারে সামান্য চাকুরী করিতেন। পরে কার্য্যকুশলতায় রাজাকে তুষ্ট করিয়া দেওয়ান হন।

বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অল্প বয়সে মারা পড়েন। পুত্রবধূ স্বামীশোক সহ্য করিতে না পারিয়া অল্প দিনের ভিতরেই তাহার অনুগামিনী হন। রাজা পুত্রের

মৃত্যুর পর, সমুদায় রাজকার্য্য-ভার আনন্দদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া ধর্ম্ম-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। স্থির করিয়া রাখিলেন মুকুন্দের সহিত পৌত্রীর বিবাহ দিবেন।

আনন্দদেব অত্যন্ত কুটনীতি বিশারদ ছিলেন। রাজকার্য্যের সমুদায় ভার পাইয়া তাঁহার রাজা হইবার অভিলাষ হয়। সেই উদ্দেশ্যে দেওয়ান, ইংরাজের সহিত ঘনিষ্টতা করিলেন। ঘনিষ্টতার ফলে তাঁহার খুব মান যশ প্রতিষ্ঠা হইল, রাজার প্রভুত্ব খর্ব্ব হইল, কিন্তু রাজা হওয়া হইল না।

দেওয়ানকে কেহই চিনিতে পারে নাই। চিনিয়াছিল কেবল একজন। সে ওই বাঙ্গালীব্রাহ্মণ রতন। রতন অমানুষিক অন্তর্দৃষ্টি বলে যে, আনন্দদেবকে চিনিয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। সে চিনিয়াছিল আনন্দদেবের টেরচা আঁখি দেখিয়া। রাজার সঙ্গে তাহার দেখা হইলেই বলিত, "টেরচা আঁখ, কোতা গরদান তাংপিসানি, বদমাইসকো ওই নিশানি"। রাজা সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিতেন। কিন্তু কথানুযায়ী কার্য্য কখনও করেন নাই।

যাহাই হউক রতন যাহা ভাল বুঝিত, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে ছাড়িত না। আনন্দদেবকে দেওয়ান করিবার সময়েও প্রতিবাদ করিয়াছিল। রাজকার্য্যের সমস্ত ভার দিবার সময়েও আপত্তি তুলিয়াছিল। কথায় কথায় বলিত, "সরল কুটীল চিনিতে বাঙ্গালী যেমন পারদর্শী, ভারতের মধ্যে এমনটী আর কেহই নাই"। তাহার বিজ্ঞতা তাহারই কাছে থাকিত। সে বিজ্ঞতা-পরিচালিত হইয়া রাজা কখন কার্য্য করেন নাই।

ক্রমে রাজার চক্ষু ফুটিল। ক্রেগুলি-বুচার, কিং কবলার, প্রভৃতি মহাপ্রভুগণের আসা যাওয়া, নাওয়া খাওয়া মৃগয়া দেখিয়া রাজার মনে সন্দেহ হইল। আনন্দদেবের হস্ত হইতে রাজকার্য্যভার পুনর্গ্রহণের অভিলাষ করিলেন। দেখিলেন কার্য্যভার পুনঃপ্রদান করা এখন আনন্দদেবেরও সাধ্যাতীত। রাজা ব্রাহ্মণ রতনকে সর্ব্বজ্ঞ বোধে তাহার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। রতন বলিল শক্তি আর ফিরিবে না। রাজ্যভার রাঘব বোয়ালে গ্রাস করিয়াছে। রাজা চারিদিক শূন্য দেখিলেন। রতন সংসারের সকলই অনিত্য বোধে, রাজাকে সেইমত বুঝাইয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে বলিল। বলিল যখন মরিতেই হইবে তখন রাজ্য থাকা না থাকা উভয়ই সমান। অবশ্য এ কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন না। এ কথায় কেই বা কবে তুষ্ট হইয়াছে? রাজার, নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের কথায় মন মানিলনা; তা না হইলে বার্দ্ধক্যে আবার তাঁহার ভোগাভিলাষ কেন? রাজ্য রাজ্য করিয়া প্রাণে এত অশান্তি কেন? মাঝে মাঝে রাজা রতনকে দেখিলেই প্রতিকারের পরামর্শ করিতে চাহিতেন। রতন সাজী দেখাইত ফুল দেখাইত, ফল দেখাইত, বদ্ধাঞ্জলী দেখাইত, আর আকাশ দেখাইত। আর বলিত"—মহারাজ মণি বিসর্জ্জন দিয়া কাচে এত লোভ কেন? বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হারাইয়া তুমি উন্মাদের ন্যায় এ কি করিতেছ?" রাজার মনে শান্তি আসিল না। রাজা ক্ষিপ্তবৎ অস্থির হইলেন।

রতন সর্ব্বদা রাজার সঙ্গে থাকিতে পারিত না। রাজকুমারী নারায়নীকে লইয়া তাহাকে মাঝে মাঝে এদিক সেদিক বেড়াইতে হইত। নারায়নীকে দুগ্ধপান করাইতে হইলে তাহার সাহায্য প্রয়োজন হইত। কাজেই রতনকে মাঝে মাঝে রাজার নিকট হইতে অন্যত্র যাইতে হইত। কিন্তু রতন বুঝিয়াছিল, রাজার নিকট সর্ব্বদা অবস্থান তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ সকলের প্রিয় ছিল। প্রিয় ছিল না কেবল আনন্দদেবের। রতন তাহা বুঝিত। রতনও তাহাকে ঘৃণা করিত। আনন্দের কুটীলাচরণে ব্রাহ্মণের ঘৃণা, শেষে বালক মুকুন্দেরও উপর গড়াইয়া ছিল। রতন নিকটে থাকিলে আনন্দদেব রাজার কাছে আসিতে সাহসী হইতনা। যখন না থাকিত তখন চকিতের মত আসিয়া রাজার কর্ণে দুই একটা গুপ্তমন্ত্র ঢালিয়া যাইত। আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমান দিত ও প্রতিকারের দুই একটা পরামর্শ করিত। দেওয়ান বুঝিয়াছিল, রাজাকে কিস্তিদিতে ভাড়া করিয়া উচ্চৈঃশ্রবা আনিয়া নিজেই চালমাত হইতে বসিয়াছে। এখন নিজে ছাড়িতে চাহিলে, কম্লি ছাড়িতে চাহে না। নিরুপায় হইয়া দেওয়ান প্রতিকারের পরামর্শ করিত। আর রতন আসিবার পূর্ব্বেই রাজার নিকট হইতে চলিয়া যাইত।

রতনকে এত ভয় কেন? স্বরাষ্ট্রে, প্রজামণ্ডলী মধ্যে অগণ্য সেনা সহায় দেওয়ানজীর একক ব্রাহ্মণকে এত ভয় কেন? ভয়ের অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ ঔপন্যাসিক বলবান। দ্বিতীয়—সরল হৃদয় ব্রাহ্মণ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে শৈলের বাধাও গ্রাহ্য করিতনা। ব্রাহ্মণের মরণের ভয় ছিলনা, হৃদয় ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান ছিল। তৃতীয়—ব্রাহ্মণের তিন কুলে কেহ ছিল না।—কাঁদিবার কাঁদাইবার লোক ছিল না, চতুর্থ অর্থের প্রলোভন ছিল না; এই কারণ চতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণ কিছু নির্ম্মম ছিল। ব্রাহ্মণের ক্রোধোদ্দীপনে কিছু জীবনের আশঙ্কা থাকিত। অবশ্য ব্রাহ্মণ কখন নরহত্যা করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া লোকের আশঙ্কা দূর হইত না। পঞ্চম কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিত। অবশ্য ব্রাহ্মণ আয়সাস্ত্র কখনও ব্যবহার করিত না। কিন্তু ব্রাহ্মণের নখ হইতে মুখের কথাটী পর্য্যন্ত অস্ত্রের কার্য্য করিত। অনন্তপুরের আবাল বণিতা বৃদ্ধ সকলেই জানিত, ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রাণ দিয়াছিল। ব্রাহ্মণের হুঙ্কার গর্জনে আরণ্যসিংহও ভয়ে গহ্বর প্রবিষ্ট হইত। ষষ্ঠ কারণ ব্রাহ্মণ সকলের প্রিয় ছিল। কিন্তু আনন্দদেব, রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে, কিম্বা তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে আনন্দদেব সাহস করিতেন না। কাজেই ব্রাহ্মণ যখন নিজ কার্য্যে যাইত, তখন আনন্দদেব আসিয়া রাজার সহিত দুই একটী পরামর্শ করিয়া যাইতেন। এইরূপ তিনবৎসর পরামর্শ চলিল। সেই পরামর্শের ফলে রাজার ভোগাভিলাষটা একটু পাকিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ।

কিছু দিন হইল সোমরা কোল ছোটনাগপুরের একজন সাহেবের সঙ্গে শীকার করিতে যাইয়া, জনার জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া গাছের উপর একটা কি দেখিয়া বিকট চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সাহেবের অন্যান্য অনুচরবর্গ কারণ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া সজ্ঞানে হাঁ করিয়া রহিল। হাতী, চালকের প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া নীরবে মাথা নাড়িতে লাগিল। বাঘ বাহির হইয়াছে কি? সম্মুখে সুবর্ণরেখার জল তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে—বাঘ কই? পার্শ্বে যতদূর দেখা যায়, দেখা গেল কেবল গাছ—বাঘ কই? সাহেব সোমরার মোহ প্রাপ্তির মর্ম্ম অবগত হইতে পারিল না। না পারিয়া গোটাকতক বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। বন্দুকের শব্দে বাঘ ভল্লুক যে যার বাসায় যাইয়া মরিয়া গেল। অনুচরবর্গ বিপদ গুরুতর ভাবিয়া এসংসারে দেখিবার কিছু নাই স্থির করিয়া চক্ষু মুদিল। সোমরা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বলিল—"ওই হুজুর ওই"। সোমরা গাছ দেখাইল। সাহেব দেখিলেন এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ শাখায় একটী নরকঙ্কাল সংলগ্ন কহিয়াছে।

সাহেব হো হো করিয়া হাসিল। পরে সোমরার পৃষ্ঠে চাবুক লাগাইল। প্রহার মদিরামত্ত সোমরা পলাইবার পথ না পাইয়া গাছে উঠিল। উঠিয়া ত সাহেবের আদেশে সেই কঙ্কাল পাড়িয়া আনিল। সাহেব দেখিল, কঙ্কাল সুবর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাহেব প্রথমে বিস্মিত হইল। পরে আপনি কি স্থির করিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিস দিল। সিসের কল্যাণে ও গুন গুন গানে আপনাকে আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা কলম্বসের অবতার স্থির করিয়া, সেবারকার মত সেই শীকার লইয়াই নগরে ফিরিল।

নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কমিসনরের হাতীটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। ডেপুটী কমিসনরের ঘোড়া জোত খুলিয়া ছুটিল। আর চেয়ারাসীন পুলীসকর্ত্তার বুট মৃত্তিকা স্পর্শে আপনা আপনি ঠক্‌ঠক্ করিতে লাগিল। কেরাণীকুল একস্থলে বসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে নিরুপায় হইয়া কবির গান ধরিল। আসলকথা সেই নরকঙ্কাল সুষুপ্ত রাঁচী নগরীকে একদণ্ডে কোলাহলময়ী করিয়া তুলিল।

রাঁচি এমন হইল কেন? নরকঙ্কালের কি কোনও বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল? কঙ্কাল সম্বন্ধে কমিসনর হইতে আরম্ভ করিয়া কোলনারী পর্য্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু তর্ক করিয়াছিল। এ কঙ্কাল কার? কেহ হাসিয়া ছিল, কেহ অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল, কেহ গোঁফে চাড়া দিয়াছিল, কেহ বা কিছুই করিল না, কেবল কতকগুলি ভূতের গল্প করিল। এ কঙ্কাল কার?

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পণ্ডিত সেই সময়ে কোলজাতির আদিপুরুষ নির্দ্ধারণ করিতে ছোটনাগপুর গিয়াছিলেন। তাঁহারা রামগড়ের পাহাড়ে একখানা পাথর কুড়াইয়া সেইখানাই কোলজাতির আদিপুরুষের ভগ্নাবশেষ স্থির করিয়া, তাহার উপর চকমকি ঠুকিতেছিলেন।

সাহেব বহুমূল্য সুবর্ণশৃঙ্খলটী শীকারের সহায় হইবে বিবেচনায়, নিজের কাছে রাখিয়া, কঙ্কালটী পরীক্ষার জন্য তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

প্রবলবেগে পরীক্ষা চলিল। কেহ কঙ্কাল-হৃদয়াভ্যন্তরে গোলকের গান শুনিতে পাইলেন। কেহ বা সূক্ষ্মদর্শনে দেখিলেন হাড়ের ভিতরের আণবিক কম্পন লম্বভাবে না হইয়া আড়ে হইতেছে। সুতরাং উহা গান নয় আদি কোলের প্রতিভার আলো। কোন মহাত্মা তুষার সন্নিভ অস্থি-অঙ্গে মসীবর্ণের ছায়া দেখিতে পাইলেন।

তখন স্থির হইল এইটীই কোলজাতির আদিপুরুষের কঙ্কাল। ছোটনাগপুরের সোণার খনি কঙ্কালের গায়ে লাগিয়া, ভুলিয়া শিকল হইয়া কেমন করিয়া শালবীজে জড়াইয়াছিল। শেষে মাটী ফুঁড়িয়া গাছের সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়াছে।

স্থির হইতে হইতে হইল না। আর এক মহাত্মা কঙ্কাল পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন বক্ষপঞ্জরের পঞ্চম অস্থিতে একটী তারকা অর্দ্ধপ্রভ হইয়া ঝিকমিক করিতেছে। অমনি সকলের মত ফিরিয়া গেল।

অবশেষে স্বর্ণ শৃঙ্খলের সহায়তায় এবং দেশের জল বায়ু ও মানব চরিত্রের অকাট্য প্রমাণে স্থির হইল, ইহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কোন রাজার দেহকঙ্কাল। দার্শনিকের কুটীল দৃষ্টি আনন্দে উৎসাহে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সরল হইয়া গেল। ক্রমে দিব্য চক্ষু ফুটিল। কেহ তারকার বামে কে, সি, কেহ দক্ষিণে এস, আই দেখিতে পাইলেন। কিন্তু মূর্খ যদি কেহ সেখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, হাড়ে দূর্ব্বা গজাইয়াছে।

সেই সপ্তাহের কোন বিশিষ্ট সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হয় ;—"জনার ভীষণ অরণ্যে বৃক্ষশাখা বিলম্বিত অনন্তপুরের বিদ্রোহী রাজা বীরচন্দ্র দেবের কঙ্কাল এতদিনে আবিস্কৃত হইল। হতভাগ্যের মুখে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। 'পাপিষ্ঠের করাঙ্গুলি-কঙ্কালের শোণিত চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। চল্লিশ বৎসরের ধারা বর্ষণেও সে কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই। বিকৃত বদনের বিকট দন্তবিকাশ অবলোকন করায়, সাহসী বীরপুরুষ হইলেও আবিষ্কারককে ভয় পাইতে হইয়াছিল।' অতএব এবার হইতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, যে অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়ার পরিবর্ত্তে, জীবন্তে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হউক। তাহা হইলে মরিবার পূর্ব্বে হাড় কয়খানা জলিয়া যাইবে।"

এই সংবাদ শুনিয়া ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী কতিপয় নেটিভ সেই কঙ্কাল দেখিবার জন্য ছোটনাগপুর যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাহারও কামনা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেই বিশ্বাসঘাতক নরকঙ্কাল কাশীপুরে পলাইয়া আসিয়া টরণর মরিসনের কলের চিনি পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

মহারাজ বীরচন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। দিনকয়েক ইংরাজদিগের প্রাণে উদ্বেগ তুলিয়া, স্বহস্তপ্রজ্জলিত অনলে আপনাকে আহুতি

দিয়াছিলেন। বিদ্রোহ শান্তির পূর্ব্ব-ক্ষণেই আপনার পরাজয় নিশ্চয় বুঝিয়া রাজা অরণ্যে পলায়ন করেন।

কর্ত্তৃপক্ষ বহুদিন ধরিয়া বীরচন্দ্রের সন্ধান করেন। আনন্দদেব রাজাকে ধরাইবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। চারিদিকে চর ছুটিয়াছিল চারিদিকে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল প্রভূত পুরস্কারের প্রলোভন দেখান হইয়াছিল। কিছুতেই কিছু হয় নাই। নাগপুরস্থ কত অরণ্য আলোড়িত হইয়াছিল, পুলীসকর্ম্মচারী গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল তবু বীর-চন্দ্রের সন্ধান হয় নাই। অনেক দাড়ী পুড়িয়াছিল, অনেক জটা মুড়িয়াছিল, অনেক সন্ন্যাসী গৃহস্থ হইয়াছিল, অনেক গৃহস্থ সংসার অনিত্য ভাবিয়া গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পথে বসিয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সংবাদ মিলিল না। প্রতি-দিন রাঁচি নগরে দলে দলে কত বীর-চন্দ্র আসিতে লাগিল। কিন্তু নগরে আসিয়াই কেহ বালমুকুন্দ হইল, কেহ রাম হইল, কেহ দুর্ব্বলসিং পাঁড়ে হইল। কেহ বীরচন্দ্র হইল না। ভয় পাইয়া কত বৃদ্ধ শ্মশ্রু মুণ্ডণ করিল, চুলে কলপ লাগাইল। অনেক করিয়াও যখন কিছু হইল না দেখিল, তখন পুলীস মরা বাঘের পেট চিরিয়া, অস্থি অন্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিল। ক্রমে নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল রাজা পলাইয়া আসিয়া স্বকীয় প্রাসাদ মধ্যস্থ একটী চোরকুটুরীতে লুকাইয়াছিলেন। সেই গৃহ মধ্যে বহুকাল হইতে অবস্থিত একটা অজা-গর রাজাকে ধরিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া আপাদ মস্তক উদরস্থ করিয়াছে। কেহ বলিল রাজা সুবর্ণরেখা সন্তরণে পার হইতে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি-বেশি গণ্ডমূর্খ দুঃখীদাস সুবর্ণরেখার জলে রাজার হাতের আংটী পাইয়া একদিনে ধনী হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বা রাজা ব্যাঘ্রমুখে প্রাণ দিয়াছেন এই কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিল। যে ব্যাঘ্র রাজার ঘৃতপুষ্ট দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহার গায়ের রোম উঠিয়া গিয়াছে। গাত্রদাহে অস্থির হইয়া শার্দ্দূলপ্রবর যন্ত্রণা-প্রতিকার প্রত্যাশায় আনন্দদেবের পৈত্রিক অন্নভোক্তা হিতকামী হনুমান-সিংএর গৃহের চারিধারে নিশায় নিশায় ঘুরিয়া বেড়াইত। ব্যাঘ্র বোধ হয় কাহারও কাছে শুনিয়াছিল হনুমান-সিংএর বাটীতে বহুদিনের পুরাতন ঘোল আছে। এইরূপে কথায় কথায় রাজার মৃত্যু সাব্যস্ত হইল। তখন কাহারও গৃহে লোষ্ট্র প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কাহারও গৃহের সযত্নরক্ষিত বরফি কে নিত্য খাইয়া যাইতে লাগিল। নিশাগমে রাজপ্রাসা-দের সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভেকির মার কাণ ভোঁ ভোঁ করিয়াছিল, জানকীর বুক ধড় ধড় করিয়াছিল— তাহারা বড় সাহসিনী তাই সজীবন বাড়িতে ফিরিয়াছে। কেহ কেহ বা রাজার প্রেতাত্মাও দেখিতে পাইল। রাজা মরি-য়াছে এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আনন্দদেব বুঝিয়া রাখিল বৃদ্ধ রতন বীরচন্দ্রকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে।

বীরচন্দ্রের সব গেল। পরম হিতৈষী রতনের কথায় কাণ না দিয়া ধর্ম্ম ভুলিয়া ভগবানের নাম ভুলিয়া, বৃদ্ধ বয়সে

রাজ্য রাজ্য মান মান করিয়া উন্মত্ত রাজার সব গেল। স্বাধীনতা পরাধীনতার প্রভেদ বুঝিতে অসমর্থ, কামনাধীন রাজা সব নষ্ট করিল। স্বাধীনতাধনে জন্মেরমত জলাঞ্জলি দিয়া অপঘাত মরণের পথ প্রশস্ত করিল। রাজত্ব ত গেলই, শেষে ভিখারীও যে ধনে ধনী সে ধনও রাজার রহিল না। অসহায় বার্দ্ধক্যে জগতে স্থান রহিল না—জীবন্তে, সহস্র লোকের জীবনদাতার, লোক চক্ষে অস্তিত্বই রহিল না।

রহিল কি? রাজ্য ইংরাজে লইয়াছে, ধন যে পাইয়াছে সেই লইয়াছে। মান রাজার আশার সহিত অতলজলে ডুবিয়াছে। আজ রাজা প্রকৃতির ক্রীড়নক, শার্দ্দুলের ভক্ষ্য, দুর্ব্বলের বধ্য, পিশাচের ঘৃণ্য। তস্করও রাজাকে ধরিতে পারিলে ধনী হইয়া সমাজের নেতা হইতে পারিত। নারকীও রাজার প্রাণনাশ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিত—নরকের ভয় দূর করিতে পারিত—দশজনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারিত।

এমন হতভাগ্যের সংসারে আপনার বলিবার রহিল কি? রহিল তিন জন। রহিল দারিদ্র্যে নিস্পেষিত হইবার জন্য, অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট হইবার জন্য "কি ছিলাম, কি হইলাম, কেন এমন হইলাম"—ভাবিয়া ভাবিয়া দিবানিশি চক্ষু জল ফেলিবার জন্য, স্বামী পাপের ফলভাগিনী সর্ব্বস্বহীনা' একাকিনী অনাথিনী বর্ষিয়সী রাণী মধুমতি। আর রহিল পিতামহীর নয়নে নয়ন রাখিয়া, কুয়াসা প্রহতা উন্মেষোন্মুখী কমলকোরকসমা বালিকা নারায়ণী। আর রহিল রতন।

আনন্দদেবের ইচ্ছা ছিল রতনকে কোনও প্রকারে বিদ্রোহাভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু বিদ্রোহের সময় রতন তিন জন সাহেবকে দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া আনন্দদেব সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

শেষ রক্ষা।

"দৃষ্ট্বা জন্মজরা-বিয়োগ-মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে।
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ।"

সম্মুখে প্রত্যহ শত শত জীব জন্ম গ্রহণ করিতেছে, শত শত প্রাণী মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া ইহলোক হইতে অন্তরিত হইতেছে; যৌবনের বিকচপ্রসূনবৎ কান্তিচ্ছটা জরা ও বার্দ্ধক্যের বিকট ভীষণতায় পর্য্যবসিত হইতেছে; পুত্রকলত্রাদির লীলাবিলাসে যে গৃহ সুখের সদন, শান্তির নিকেতন, গৌরবের দীপ্ত গগনরূপে এককালে শোভা ধারণ করিয়াছিল, আজি তাহা শোকান্ধকারে ব্যাপ্ত; তথাপি কাহারও ভয় নাই! মোহময়ী মদিরা পান করিয়া জগৎ-সংসার এমনই উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেহই প্রকৃত অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখিতেছে না। একদা এই গভীর চিন্তা শাক্যসিংহের মনে উদিত

হইয়াছিল। তিনি মহোচ্চ রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিপুল রাজ্যৈশ্বর্য্য, অতুল বিষয় বিভব, অনুপম যৌবন সৌন্দর্য্য ;—বামে নিষ্কলঙ্ক লাবণ্য-প্রতিমা প্রেমময়ী বনিতা, ক্রোড়ে স্বর্গীয় সৌকুমার্য্যের আদর্শ শিশু তনয় ; তাঁহার কিসের অভাব ? তথাপি শাক্য সুখী হইতে পারেন নাই ! যে মোহান্ধকারে জগৎ-সংসার ব্যাপ্ত, তাহা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, সেই জন্য তিনি নিজের ও সমগ্র মানবসমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি গভীর মোহ-তিমির স্বহস্তে অপনীত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যদিও সফল হইয়াছিল, কিন্তু চিরস্থায়ী সুফল প্রসব করিতে পারে নাই।

শাক্যের পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণ তদীয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত করিয়া তদানীন্তন সভ্যজগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। সিংহল হইতে স্কন্দনভ, চীন ও সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ) হইতে যোন রাজ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সকলে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিসুধা পান করিতে লাগিল ; তথাপি জগতের মোহান্ধকার দূর হইল না ;—শোক তাপ দুঃখ দারিদ্র্য তথাপি অপনীত হইল না। জগৎ আবার পরমতত্ত্ব ভুলিয়া ঘোরতর নীচ স্বার্থে মগ্ন হইল,—পুত্রকলত্র ও বিষয়বিভবের কুহকজাল আবার তাহাকে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করিল।

শাক্যের পর শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইলেন। মানবের মোহান্ধকার দর্শনে বাল্যেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল :—তিনি জনকের শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন :—

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতঃ প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনম্।
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্নদিবসা কালো জগদ্ভক্ষকঃ॥
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবনম্।
তস্মাত্বং শরণদ মাং রক্ষ রক্ষাধুনা॥

দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ আয়ুক্ষয় হইতেছে, যৌবন ফুরাইয়া আসিতেছে, যে দিন একবার চলিয়া যায়, আর তাহা ফিরিয়া আইসে না ; সৌভাগ্যলক্ষ্মী জলতরঙ্গবৎ চঞ্চলা এবং জীবন বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির, অতএব হে শরণাগতরক্ষক ! আমাকে রক্ষা করুন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু জগদ্‌গুরু শঙ্কর বালকশঙ্করের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার সেই সুকুমার হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল। তিনি গম্ভীরস্বরে জগতে সংসারের অসারতা ঘোষণা করিলেন :—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ ?
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ !
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ ?
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ !

হিন্দু যে যে অবস্থায় ছিল, নবীন সন্ন্যাসীর এই তত্ত্ব-জ্ঞানোন্মেষক অনুপম গীত-শ্রবণে সেই সেই অবস্থাতেই সংসার ত্যাগ করিল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই বৈরাগ্য উপস্থিত হইল ;—দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর দল পুষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে সংসার-বৈরাগ্য বলবৎ হইল বটে, কিন্তু কয়জনের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইল ? বুঝি সংসার ত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ হইবে, বুঝি অর্থলালসা বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ;—এইরূপ ধারণাই অধিকাংশ হিন্দুর হৃদয়ে

বদ্ধমূল হইল। কিন্তু বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র কি এবং প্রকৃত সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা অনেকেই বুঝিল না, বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। সুতরাং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সুবিশাল মুক্তিসোপান নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার ভিত্তি দৃঢ় হইল না। কালক্রমে লোকের কুসংস্কার-রূপ কুঠারাঘাতে তাহার মূল ছিন্ন হইয়া পড়িল; হিন্দুস্থানে কতকগুলি ভণ্ড পাষণ্ডের দল বৃদ্ধি পাইলমাত্র, আর কোন সুফল ফলিল না।

জগতে সকল বিষয়েরই প্রতিক্রিয়া আছে, পাপের পর পুণ্য এবং দুঃখের পর সুখ পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া থাকে। "চক্র-বৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" সাম্যাবস্থায় কিছুই থাকিতে পারে না জগতের অর্থই নিত্য বিবর্ত্তন। এই জাগতিক ব্যাপার সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হইলেই অর্থাৎ ইহার আর বিবর্ত্তন না হইলেই ইহার ধ্বংস হইয়া থাকে। তাহাই জগৎকর্ত্তা নারায়ণের সুপ্তি-অবস্থা। যে নিয়মে জগৎকারণের নিত্য পরিবর্ত্তন হয়, সেই নিয়মেই মানবের সমাজ ও ধর্ম্ম জগতেও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্যের পর হিন্দুসমাজে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, তন্ত্র সমূহ সেই প্রতিক্রিয়ার পরিণাম-ফল। লোকে সংসারে থাকিয়াই পঞ্চ মকারের সেবা করিয়া মোক্ষলাভে প্রয়াসী হইল, ক্রমে লোকে ঘোরতর নিষ্ঠুর ও বিষয়ী হইয়া পড়িল;—ধর্ম্মের পবিত্র বেদিকায় ধর্ম্মের পবিত্র নামে কতস্থানে কত প্রকার নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল; তান্ত্রিক, কাপালিক ও বামাচারিগণের ভয়ে অনেক হিন্দু নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারিত না। কিন্তু ভগবানের অব্যভিচারী চিরন্তন নিয়মানুসারে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া হইলে, ভগবান্ চৈতন্য ত্রাণকর্ত্তারূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন লোকের মোহান্ধকার, দুঃখযাতনা দূর হইল। সাত্বিক ধর্ম্মের বিমল আলোকে সনাতন হিন্দুত্বের সার মর্ম্ম সকলে পাইল। চৈতন্য ভগবানের অবতার রূপে পূজিত হইলেন।

কিন্তু কালে সেই পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও প্রতিক্রিয়ারম্ভ হইল। হরি নামের প্রকৃত মহিমা কালে অনেকে ভুলিয়া গেল। এক দিকে যেমন অনেকে সংসার ত্যাগ করিতে লাগিল, অপর দিকে সেইরূপ আবার তাহাদেরই মধ্যে সঙ্করত্ব অযথা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপ কালক্রমে হিন্দু সমাজে আর একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। তাহারা হিন্দু সমাজের শোণিতে পুষ্ট হইয়া সেই শোণিত পান করিতে লাগিল।

বিবর্ত্তন ধর্ম্মের এইরূপ নিত্য প্রতি-ক্রিয়া প্রভাবে হিন্দু সমাজ জীর্ণ ও ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ইহার যে আবার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের ন্যায় স্থিতিস্থাপক ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ইহার যে কখনই ধ্বংস হইবেনা, ইহার প্রাচীনত্বই তাহার প্রদীপ্ত পরিচয়। ইহার পর আর কত স্থানে কত ধর্ম্ম উদ্ভিন্ন হইল—মিশর, ব্যাবিলন, ফিনি-শিয়া, পারসিক, গ্রীস ও রোম—কতদেশে কত নব নব ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচারিত হইল, কিন্তু এখন সেসকল ধর্ম্ম কোথায়?—কচিৎ কোনটীর সামান্য ছায়া মাত্র দেখা

যাইতেছে। কিন্তু এই সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম অত্রি ও বশিষ্ঠেরসময়ে যেরূপ ছিল, এখনও প্রায় সেই-রূপই রহিয়াছে। শত শত বিঘ্ন, সহস্রসহস্র অত্যাচার,—লক্ষ লক্ষ নির্যাতন সহ্য করিয়াও সেই জীর্ণ স্থবির হিন্দুধর্ম্ম আজিও জগতে বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক বিবর্ত্তনের সহিত ইহার প্রসর বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। বল দেখি এরূপ স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মের কি ধ্বংস আছে? ধ্বংস নাই সত্য, কিন্তু আজি যে প্রবলা প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে, ইহা কি প্রাকৃতিক? ইহার সূচনা কি বর্ত্তমান হিন্দুগণের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়াছে? অথবা কেবল বাহ্য চাক্‌চিক্যে,—বহিরাড়ম্বরে পরিপূর্ণ? ত্রিকালদর্শী মহাত্মা মুনিগণ ভারতের ভাবী পরিণাম পরম যোগবলে তন্ন তন্নরূপে বিশ্লেষিত করিয়া বলিয়া গিয়াছেনঃ—

শূদ্রাঃ ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ পর্য্যুপাসকাঃ।
শূদ্রাঃ পরিচরিষ্যন্তি ন দ্বিজান্ যুগসংক্ষয়ে॥
ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ বেদনিন্দকাঃ।
ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ॥
পুত্রঃ পিতৃবধং কৃত্বা পিতা পুত্রবধং তথা।
নিরুদ্বেগো বৃহদ্বাদী ন নিন্দামুপলপ্স্যতে॥
সত্যং সংক্ষিপ্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ।
স্থবিরা বালমতয়ো বালাঃ স্থবিরবুদ্ধয়ঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রকর্ম্মাণস্তথা শূদ্রা ধনার্জ্জকাঃ।
ক্ষত্রধর্ম্মেণ চাপ্যত্র বর্ত্তয়ন্তি গতে যুগে॥
নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়া দণ্ডাজিনবিবর্জ্জিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বভক্ষ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥
অজপা ব্রাহ্মণাস্তাত শূদ্রা জপপরায়ণাঃ।
বিপরীতে তদা লোকে পূর্ব্বরূপং ক্ষয়স্য তৎ॥

এই সকল শ্লোকের অর্থ সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই জন্য এস্থলে ব্যাখ্যাত হইল না। তথাপি যদি কেহ বুঝিতে না পারেন, তিনি টীকা * দেখিবেন। ভাবিতাত্মা মুনিগণ যোগবলে ভারতের ভাবী অবস্থার যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঠিক সেইরূপই দেখা যাইতেছে। সেই ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যা বর্জ্জিত হইয়া, ব্রত হোম ত্যাগ করিয়া ঘৃণিত দাসের ন্যায় শূদ্রের ও যবনের সেবা করিতেছে, শূদ্র অনায়াসে তাহাদের অবমাননা করিয়া, স্বল্প বিদ্যালাভে পণ্ডিতম্মন্য হইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছে, ধার্ম্মিকের পরাভব ও অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, শঠতা, ভণ্ডতা, ধর্ম্মধ্বজিতা হিন্দুসমাজের সর্ব্বস্তরেই দৃশ্যমান হইতেছে! ইহার গভীর অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে? কে বলিয়া দিবে, পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন প্রায়?

হার্ব্বার্ট স্পেন্সরী বিবর্ত্তবাদীরা বলিবেন পৃথিবী ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে, সেই জন্য লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জগতের সভ্যতা ক্রমে স্ফুটতর হইতেছে। এরূপ মত স্বতোবিরুদ্ধ. যদি পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি না হইল, যদি সকল সমাজই সমান উন্নতিলাভ করিতে না পারিল,

---

* তাৎপর্য্য।

যুগসংক্ষয়ে শূদ্রগণ দ্বিজগণের সেবা করিবে না; তাহারা স্বস্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবে, এবং ধর্ম্মধ্বজা হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতে থাকিবে। ব্রাহ্মণগণ হেতুবাদে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া বেদের নিন্দা করিবে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে ব্রত হোমাদির অনুষ্ঠানে তাহাদের আদৌ আসক্তি থাকিবে না। পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে বধ করিতে থাকিবে। সত্যের গৌরব সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে এবং মিথ্যার গৌরব-বৃদ্ধি হইবে।

তাহা হইলে evolution theory'র সার্থকতা কৈ? মানব শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমরূপ স্ফূর্ত্তি না পাইলে যেমন তাহাকে সম্পূর্ণ অঙ্গ বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ সমাজরূপ বিরাট পুরুষের সর্ব্বাবয়ব সমভাবে পরিস্ফুরিত না হইলে তাহাকে সম্পূর্ণ সমাজ বলা যাইতে পারে না। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, মানব-শরীরের এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি আছে, তাহার প্রত্যেকের যথোপযুক্ত স্ফূর্ত্তিতেই সেই সেই অঙ্গের এবং সেই অঙ্গে সমগ্র শরীরের উন্নতি হইয়া থাকে, সেইরূপ সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সম্যক সমাধানে সেই বৃত্তির স্ফূর্ত্তি এবং সেই অঙ্গে সমগ্র সমাজের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়। হিন্দু সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজ একরূপ নহে; সুতরাং হিন্দুর সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা একরূপে পরিমাপিত হইতে পারে না। ইংরেজ বা ফরাসী যাহাকে সভ্যতা বলিবে, হিন্দু হয়ত তাহাকে সভ্যতা বলিয়া আদৌ স্বীকার করিবে না। জাতিভেদেই হিন্দুর সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূল, জাতিভেদেই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যতদিন এই পরম মঙ্গলময় ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন হিন্দুর সভ্যতা অক্ষুব্ধ ছিল,—যেদিন হইতে তাহার অবনতি আরব্ধ হইয়াছে, সেই দিন সেই অতুলনীয় সভ্যতার বিক্ষোভ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আজি তাহা দীন হীন দশায় পতিত। সেই জন্য আজি আমরা পিতৃপুরুষগণের সভ্যতা হারাইয়া দীন দরিদ্রের ন্যায় যাবনিক সভ্যতার অনুকরণে আগ্রহান্বিত হইয়াছি। যদি কেহ হিন্দু সমাজের এইরূপ অবস্থাকে উন্নত অবস্থা বলিতে চান তাঁহাকে আমি অদ্বিতীয় অতুলনীয় সমাজবীর বলিয়া উপচার করিব! তিনিই ধন্য! তিনিই প্রকৃত হিন্দু!

আজি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই ইহার ওতপ্রোতভাব, সেই দিকেই প্রচণ্ড বিপ্লব দেখিতে পাই। এই প্রচণ্ড বিপ্লবে জীর্ণ ও ভগ্ন সমাজ-শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে কি না, বলিতে পারি না। প্রাচীন ঋষিগণ যাহাকে যুগসংক্ষয় অথবা জগতের ধ্বংসের পূর্ব্ব সূচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যদি হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা তাহাই হয়, তাহা হইলে ভয়ের কোন কারণই নাই, আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বুঝিব হিন্দুসমাজরূপ জগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—আসন্নপ্রায়।

শবদর্শনে।

১

বাঁশের খাটুলীপরে
লম্বমান কলেবরে
অভিমানে বসনেতে ঢেকে চন্দ্রানন।
এ সংসার তেয়াগিয়ে
চলিয়াছ পথদিয়ে
কে তুমি হে কার তুমি হৃদয়ের ধন ?
ভাবি সুধাপারাবার
রূপের সায়রে কার
সাধে সাধে ঝাঁপ দিয়ে শিশুর মতন
লাজ মান তেয়াগিয়ে
প্রাণ মন সঁপেদিয়ে
দিবানিশি করিয়াছ গরল সেবন!
বল কার প্রেমফাঁদে
প্রাণ সঁপে সাধে সাধে
গলে দিয়ে ছিলে সাধে মরণের ডুরি!
হৃদয় কলিজা, ভাই
পোড়াইয়ে করে ছাই
জেনেছ জগতে প্রেম শুধুই চাতুরি!
কার তরে হে নাগর
রচিতে সুখের ঘর
খাটিয়াছ দিবানিশি ভূতের ব্যাগার ?
বল বল কার তরে
ঘুরিয়াছ চরাচরে
পুরাইতে আজীবন উদর কাহার ?
দিবানিশি অনাহারে
ঘুরিয়াছ দ্বারে দ্বারে
একমুষ্টি অন্ন আশে পাগলের প্রায়
কাকুতি মিনতি করি
কত জনে পদে ধরি
বলিয়াছ নিজ দুঃখ—উদরের দায়!

কেউ শুনে দেছে গালি,
কেউ দেছে করতালি
টিট্‌কারি দেছে তোমা নিঠুর সংসার!
নীরবে নয়ন দিয়ে
শত ধারা বহে গিয়ে
কঠিন মাটির ধরা করেছে পাথার!
ফেটে গিয়ে অন্তঃস্থল
উঠেছে সে অশ্রুজল
এক ফোঁটা শত ফোটা রক্ত কলিজার!
সেই তার মূল্য জানে
যে জন মরেছে প্রাণে
হয়েছে সোণার হৃদি যার চুরমার!
কঠিন পাষাণ পরে
যদি সেই অশ্রুঝরে
সম্ভব কালেতে তাহা হবে বিগলিত
কিন্তু শত যুগ ধরে
যদি কেহ কেঁদে মরে
অসম্ভব গলিবে সে মানুষের চিত!
যা দেখ ও সমুদয়
কিছু রক্ত মাংস নয়
আপাদ মস্তক সব বজ্রের গাঁথনী
ভুগে মরে বেশ জানি
তার মাঝে মন খানি
প্রাণ হর বিদ্যুৎ ও গরলের খনি!
কিছু কি চাহিতে আছে
পোড়া মানুষের কাছে ?
যাহারা কাড়িয়া খায় মুখের গরাস!
কভু দাসত্বের আশে
গেলে মানুষের পাশে
দয়াহলে বিনা মূল্যে রাখে ক্রীতদাস!

আত্মঘাতী হবে বলে'
যদি চাও হলাহলে
তাহাও কিনিতে হবে করে মূল্যদান!
ভাবিতে শিহরে গাত্র
এমনি প্রেমিক পাত্র
জগতের শ্রেষ্ঠজীব মানব মহান্!
তাই বুঝি দেখে শুনে
চলেছ বিষণ্ণ মনে
চলেছ বিরাগী হয়ে ত্যজিয়ে সংসার!
তাই বুঝি ভগ্নপ্রাণে
চলিয়াছ অভিমানে
এক বস্ত্র বংশশয্যা করিয়াছ সার!
ত্যজি দারা পুত্র মায়া
এমন ননীর কায়া
তাই বুঝি শোয়াইয়ে রেখেছ হেলায়
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা
তাই ব্রজ লীলাখেলা
ভেঙ্গে দিয়ে চলিয়াছ প্রেম মথুরায়!

২

কথা রাখ মাথাখাও
ফের ফের কোথা যাও
পাছে পাছে ছুটেছে কে পাগলিনী প্রায়!
কে ওই রমনী হায়
ঘন বক্ষ চাপড়ায়
কভু উঠে কভু ছুটে ভূমেতে গড়ায়!
কে রমণি শোকাকুলা
হাতেছিঁড়ে চুলগুলা
কঠোর ক্রন্দন স্বরে ধরণী কাঁপায়
কঠোর ক্রন্দন স্বর
উঠেছে গগণ পর
ফেটেছে রবিরবুক রয়েছে মূর্চ্ছায়!
জগৎ স্তম্ভিত হয়ে
আছে যেন ভয়ে ভয়ে
প্রেত আত্মা শত শত চমকে জাগিয়ে
নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে
কঠোর ক্রন্দনারাবে
শুনিতেছ কাণপেতে মুখ বাড়াইয়ে!
কভু রবি-শশী-আলা
দেখে নাই কুল-বালা
আঁধারে লুকায়ে ছিল হীরকের কণা!
নির্জন নিভৃত কক্ষে
গোপনে মুকুর বক্ষে,
নিজরূপ দেখে চক্ষে কেটেছে রসনা!
আজ পাগলিনী পারা
নয়নে সহস্র ধারা
বেরিয়েছে রাজপথে বিমুক্ত বদনে।
বিসর্জ্জিয়ে এসংসার
ভেঙ্গে চূরে কারাগার
ছুটিয়াছে রাজপথে আকুল ক্রন্দনে!
হে নাগর! কে রমণী?
যেন মণি হারা ফণি
তব পাছে ছুটে ছুটে চলিয়াছে হায়!
হবে বুঝি তব দারা
তব হৃদয়ের ধারা—
তব সুখে দুখে চির ঢেলেছে যে কায়!
কি হবে কোথায় যেয়ে?
ফের এর মুখ চেয়ে
এত রাগ সাজে কিহে কভু সংসারীর!
পাষাণ বাঁধিয়ে বুকে
থাক বিশে সুখে দুখে
ত্যজি মান ফের—কথা রাখ এ নারীর!
"বলহরি হরি বোল"
উঃ কি ভীষণ রোল!
প্রতিশব্দে সেরে সেরে শোণিত শুকায়!
বিষম বিষের বাণ
করিতেছে খান খান
প্রতিশব্দে প্রতিপলে হৃদি কলিজায়!
শাখী শাখে বসে পাখী—
পাতায় বদন ঢাকি
চেয়ে আছে মুখে আর সরেনা কাকলী

সেই ধ্বনি ঘন ঘন
শুনে যেন সমীরণ
থমকে দাঁড়ায়ে আছে স্তব্ধ বনস্থলী।
জাহ্নবী সে কত দেশে
রবিকর যেন এসে
ভয়েতে নীরবে আছে যেন অচেতন!
দয়াময়ী ভাগিরথী
যেন ব্যাকুলিতা অতি!
নাহি দেখি তার বক্ষে তরঙ্গ ভীষণ!
যেন কুল কুল স্বনে
চলিয়াছে ভগ্ন মনে
বলিতে এ শোক বার্ত্তা সাগরের কাণে।
মাতার স্নেহের প্রায়
অম্বু রাশি সমুদায়
ছুটিয়াছে মিশিবারে সাগরের প্রাণে!
ওকি ওকি ওকি হেরি
কেন চিতা শয্যাপরি
এমন নধর কায়া শোয়াইছে হায়?
ওই দেখি মুদে আঁখি
অঞ্চলে বদন ঢাকি
পতীর বদনে সতী অগ্নি দিতে যায়!
সম্বর সম্বর নারী
থাক পল দুই চারি
একটি কথায় কর উত্তর প্রদান!
ওই বুকে বুকে শুয়ে
ওই মুখে মুখ থুয়ে
দিবানিশি মুখ সুধা করেছ না পান?
ওই বাহুলতা দিয়ে
ওই দেহ জড়াইয়ে
সুখে সুখে করেছ না নিশা অবসান?
ওই প্রেমিকের গেহ
ওই প্রাণ ওই দেহ
দিবানিশি ছিল নাকি তব ধ্যান জ্ঞান?
ও মুখে আগুন দিতে
ব্যথা কি বাজেনা চিতে?
হে রমণি পায়ে পড়ি দিওনা অনল!

জ্বলিল শবের মুখ
জ্বলিল শবের বুক
শতধিক হে সমাজ সুনীতি কৌশল!
বিবসা বিকলা অতি
হায় অভাগিনী সতী
অচেতনে ভূমে পড়ে গড়াগড়ি যায়
ধূ ধূ ধূ ধূ। জ্বল জ্বল
জ্বলি ওই চিতানল
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিতে ধায় লোলুপজিহ্বায়!
কভু সতী জ্ঞান পেয়ে
বাহুতুলে যায় ধেয়ে
করিতে শবের মুখে উদ্‌ভ্রান্ত চুম্বন!
ছুটে পাগলিনী প্রায়
কভু করিবারে যায়
চিতানলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন!
যেন ছিন্নমস্তা প্রায়
কভু নারী নেমে যায়
ডুবিতে জাহ্নবী জলে জুড়াতে জীবন!
অন্তরীক্ষে দেবগণ
বিষম ব্যথিত মন—
চিতাপরে দিব্য পুষ্প করে বরিষণ!

* * * *

উর্দ্ধে উর্দ্ধে ফিরে চাও
মুক্ত আত্মা যাও যাও
ওই দেখ মহাআত্মা আছে প্রতীক্ষায়
মহান চরণে তার
রাখ তব দেহভার
মিশে যাও মহোল্লাসে ওই মহাকায়।
বলি তোমা শেষ বার
এসোনা এসোনা আর
কালকূটে ভরা এই মাটির ধরায়
এখানে যাহারা চরে
প্রতি পলে পলে মরে
জগৎ বেড়িয়ে আছে মৃত্যুর ক্ষুধায়!

হেথা প্রেম ভালবাসা
শুধুই মৃত্যুর বাসা
চুম্ব আলিঙ্গনে মৃত্যু মৃত্যু অশ্রুজলে !

মৃত্যু হাসি পিপাসায়
মৃত্যু আশা নিরাশায়
হায়রে সমান মৃত্যু সুধা হলাহলে !

—◇◇—

প্রেম।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং তত্রবৈ মঙ্গলং ধ্রুবং।"

মনু।

"সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান।

দীনবন্ধু মিত্র।

প্রেম কি প্রেমিকে সুধু সুখী করে জগতে ?
পারে না তুষিতে পরে, হিত কিছু শিখাতে ?
কুসুম সুরভি দানে
শোভা বিভা বিতরণে
মোহে যথা বহু জনে একাসনে থাকিয়া
আসে যেন রূপ লয়ে অপরের লাগিয়া।

১

সেই রূপ নিরমল প্রেমধন ভূতলে
দুজনার প্রাণে থেকে সুখী করে সকলে
যত কিছু ভাল আছে
দাঁড়ায় না এর কাছে
সুনিভৃত স্থান যাহা অন্তরের অন্তরে
সুশীতল করে প্রেম অমৃতের শীকরে।

২

হৃদয় জুড়ায় আর শুনায় যে কাহিনী
পাবে না কোথাও আর খুঁজিয়া এ অবনী
"আপনা পাশর, তবে
"স্বর্গসুখ লাভ হ'বে
"পরগত প্রাণ যার মানুষ সে কেবলি
"বিশ্বপ্রেমে সুখময় নিরখে সে সকলি"

প্রিয় জনে ভালবেসে আপনারে ভুলিয়া
যতনে প্রাণ প্রসূনে অবশেষে তুলিয়া
প্রাণের পরাণ যিনি
অগাধ প্রেমের খনি
রাতুল চরণে তাঁর উপায়ন করিতে
প্রেমের মতন আর কে পারে রে শিখাতে।

৫

এই মহা উপদেশ শিখাইয়া সকলে
কত সুখে রাখে লোকে সে প্রণয়ী যুগলে
প্রীত ক'রে হিত করে
হেন আর চরাচরে।
পাবে কোথা মনোহর শুভকর রতনে ?
তাই বলি প্রেমধন অতুল এ ভুবনে।

৬

এ প্রেমের ধারা যবে উঠে প্রাণ ভেদিয়া
সমাজের শত পাশ নিজ বলে ছেদিয়া
জগত মাতায়ে তোলে
স্বরগীয় পরিমলে
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি মরুময় অন্তরে
ফোটাইয়া পারিজাত সুকঠিন প্রস্তরে।

৭

প্রেমের ভাষার তুলা দেখি মাত্র কোরকে
লাজে সব ফোটে না'ক ঢেকে রাখে পুলকে
একটুকু হাসি হাসি'
লুকায় সে রূপরাশি
জুড়ায় সৌরভে কিন্তু ঝলসে না নয়নে
গুণবলে পরাজিয়া প্রস্ফুটিত প্রসূনে।

৮

ভাবুক যে সেই বুঝে এ ভাষার মহিমা
(ভক্ত যথা দেখে যটে ইষ্টদেব প্রতিমা।)
মধুর কাকলি স্বরে
সুজনে আকুল করে
ফোটে না তাহার ধ্বনি অপ্রেমিক হৃদয়ে
সে যে শুধু শব্দদাস, বোঝে নাক বিষয়ে।

৯

তুমি সখে, কলকণ্ঠে গেয়েছ যে গীতিকা
সে গানে বুঝিবে প্রাণে প্রেমিক ও প্রেমিকা
সুধা ধারা ঢালি কাণে
জুড়ায়েছ পোড়া প্রাণে
তাই যাচি যোড়ে করে বিশ্বেশ্বর চরণে
সদা সুখে যেন থাকে প্রিয় প্রিয়া-মিলনে।

তেলে জলে ঠাণ্ডা হয়।

বহুকাল হইতে হিন্দু ও ম্লেচ্ছ লইয়া আমাদের দেশ গঠিত। ভারত-ভূমি হিন্দুর দেশ হিন্দুর ভাগ অবশ্যই অধিক কিন্তু নানা জাতীয় ম্লেচ্ছ নানা দেশ হইতে নানা কারণে আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। বাস করিতেছেন বটে কিন্তু হিন্দুদের সহিত কখন সম্পূর্ণ মিশিতে পারিতেছেন না। হিন্দু ও অহিন্দু সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথক্ রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুর গ্রামে মুসলমানপাড়া, খৃষ্টানপল্লী পৃথক্। কাছাকাছি হইতে পারে কিন্তু একটু পৃথক্ থাকিবেই থাকিবে। হিন্দু ও ম্লেচ্ছ যে উপাদানে গঠিত, যেভাবে শিক্ষিত, যে নিয়মে চালিত তাহাতে মিশিতে পারে না, কখনই মিশিবে না হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ না করিলে অথবা ম্লেচ্ছকে সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবাপন্ন না করিতে পারিলে এই একীকরণের কোন উপায় নাই। তেল ও জল যেমন কোন প্রকারে মেশে না হিন্দু ও ম্লেচ্ছও সেই প্রকার। হিন্দু জল—ম্লেচ্ছ তেল। সুতরাং মিশাইবার চেষ্টা করা বৃথা। এক পাত্রস্থ করিলে তেল ভাসিয়া উঠে জল নীচে পড়িয়া থাকে। আমাদের চিরদিনই এই দুর্দ্দশা। আমাদিগকে নীচে পড়িয়া থাকিতেই হইবে; সেটা আমাদের প্রকৃতিগত দোষ। এই দুইটা জিনিস মেশে না বটে কিন্তু মিশাইবার চেষ্টা বহুকাল হইতে চলিতেছে। আমরা অতি শিশু-কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি তেলে জলে ঠাণ্ডা হয়। তেল জল একত্র লেপন ও ঘর্ষণ করিলে তাহার ফল বড় স্নিগ্ধ-কর। হিন্দু ও অহিন্দুর একীকরণের ফলও বড় স্নিগ্ধকর, শান্তিময়। কিন্তু হয় কৈ? তেল ও জল একত্র করিলে নৈসর্গিক নিয়মাধিনে তেল ভাসিয়া উঠে জল নীচে পড়িয়া যায়। নিতান্ত জোর করিয়া একত্র করিবার চেষ্টা করিলেও ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করে বটে কিন্তু পরমাণুতে পরমাণুতে পৃথক্ থাকে, প্রকৃতপক্ষে একীকরণ হয় না যাহা হয় কেবল বাহ্যিক উপর উপর দেখিতে যেন বেশ মিশিয়াছে। ইহা মনুষ্যের চেষ্টা বহির্ভূত। ভগবান্ পৃথক্ জিনিস করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবের সাধ্য কি এক করেন। কিন্তু মানুষ গড়িতে না পারেন ভাঙ্গিতে বড় মজবুত। সংশ্লেষণ কার্য্যে অপারগ হইলেও বিশ্লে-

বণে পটু হইয়াছেন। যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তৈল ও জলীয়পদার্থে সৃষ্ট, তাহা হইতে মানব বুদ্ধি কৌশলে তেল ও জল পৃথক্ করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছেন। দুগ্ধ হইতে ঘৃত পৃথক্ করিয়া জলীয়াংশ প্রত্যহই পৃথক্ করা দেখিতেছি, সর্ষপাদি অনেক পদার্থ নিষ্পেষিত করিয়া তৈল ও অতৈলাংশ পৃথক্ করিতে পারা যায়। এই অতৈলাংশ সকল সময় জলীয় পদার্থ না হইলেও জলের সহিত মিশ্রিত হইবার মত পদার্থ। আমাদের দেশে অনেকে যে চেষ্টা করেন সেটাও সেইরূপ উল্টা রকমের—হিন্দু ও অহিন্দুকে পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা। তাহাতে হিন্দুর হিন্দুত্ব, ম্লেচ্ছের ম্লেচ্ছত্ব ঠিক্ বজায় থাকে বটে ; কিন্তু একত্র করিতে পারিলে যে স্নিগ্ধকর, শান্তিময় ফল ফলিত তাহা ঘটে না। আজকালকার ইংরাজ শাসনের মতি গতিটা সেই প্রকার, অনেক মুসলমান সম্রাটও সেই প্রকার ভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছেন।

নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলে ফকির সীতারামকে তাঁহার নূতন রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সীতারাম তাহাই করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি তেলে জলে মিশিল ? মিশিল না। নামে মিশিল মাত্র তাহাতে কিছুই ফল হইল না, বঙ্কিম বাবুও ফলাইতে পারেন নাই। একীকরণের মূলমন্ত্র বুঝিয়াছিলেন আকবর বাদশাহ, তাই তিনি রাজ সভায় সকল ধর্ম্মের পণ্ডিতগণকে আশ্রয় দিতেন, হিন্দু অহিন্দুর সমান আদর করিতেন, কোন ধর্ম্মকে নির্য্যাতন বা ঘৃণা করিতেন না, কোন ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহও দেখাইতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মই এই সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ কার্য্যের মূলযন্ত্রী। ধর্ম্মই এই দুই দল মানবকে এইরূপ পৃথক করিয়াছে এবং ধর্ম্মই এক করিতে সমর্থ। আমার বোধ হয়, সেই সময় হইতেই এই একীকরণ মানসে অন্ততঃ একের প্রতি অন্যের ঘৃণা প্রবৃত্তির হ্রাস করিবার ও শ্রদ্ধা বাড়াইবার উদ্দেশেই সত্যপীরের নাম ও সত্যনারায়ণের শির্ণীর সৃষ্টি হয়। বিজাতীয় ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মের মূল কথা —সকল জীব ও সকল পদার্থে হিন্দুর আরাধ্য পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে ও পূজা করিতে হিন্দু ভুলিয়াছিল। সত্যনারায়ণের কথায় হিন্দু শিখিলেন— যে রাম, সেই রহিম। সন্ন্যাসীও যেমন পবিত্র, ফকিরও তেমনি পবিত্র। ঈশ্বর সন্ন্যাসী বেশের ন্যায় ফকিরের বেশও ধারণ করিতে পারেন। ম্লেচ্ছ পদ্ধতিতে পূজা করিলেও নারায়ণ সন্তুষ্ট হন। সুতরাং কোন ধর্ম্মাবলম্বীর অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে ঘৃণা করা উচিত নহে বরং আদর করা কর্ত্তব্য। সত্যনারায়ণের কথা—এই উদার উপদেশে পরিপূর্ণ। আবার সত্য নারায়ণ পূজার পদ্ধতি— পাঁচজন আত্মীয় বন্ধু লইয়া একত্র কথা শুনিবে, প্রসাদ (শির্ণী) খাইবে। তাহাতেও উপদেশের তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যায়। এ সকল কেবল একীকরণের চেষ্টা মাত্র। এই প্রকার চেষ্টাই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট চেষ্টা। ধর্ম্মের বিনা সাহায্যে মানুষের সাধ্য কি, এই একীকরণ কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়! অথচ দুইটী ধর্ম্ম এত বিরোধী, মূলে বিরোধী না হউক, প্রকরণ পদ্ধতিগুলি এত বিপরীত যে, একীকরণ

অসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। তাই, যখনই সত্যনারায়ণের কথা শুনি, তখন যিনি প্রথম এই পূজার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার, অমানুষিক উদারতার, অসাধারণ অপক্ষপাতিতার প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু সেই উদার উপদেশের তাৎপর্য্য এখনকার লোকে ক্রমশঃই ভুলিতেছে, ফলও বিপরীত ঘটিতেছে। বোধ করি হিন্দু অহিন্দুর মেশামিশি ভগবানের অভিপ্রেত নয়, তাই এমত হইতেছে। তেল ভাসিতে থাকিবে, তেল দেশ আলো করিয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইবে। আর জল গুহা গর্ত্ত খুঁজিয়া সেই খানে নিশ্চিন্ত হইয়া স্থির থাকিবে ও কালে বালুকার মধ্যে ভূগর্ভে মিলাইয়া যাইবে। ইহাই বুঝি বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা। নতুবা কেন এরূপ হিতে বিপরীত ঘটিবে!

পাঁচ কথা।

একজন সৈনিক তাহার মুখে অস্ত্র-ক্ষত চিহ্নের কথা বলিয়া জুলিয়াস্ সিজরের কাছে আত্মগৌরব করিতেছিল। সিজর জানিতেন যে লোকটা অতিশয় ভীরু। তিনি বলিলেন—"সেটা তোমার নিজেরই দোষ, রণক্ষেত্র হইতে পলাইবার সময় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহ কেন?"

আরাগণের রাজা আলন্সো বলিতেন—"পুরাতন চারিটা জিনিষ ভাল। পুড়াইবার জন্য পুরাতন কাষ্ঠ ভাল, পান করিবার জন্য পুরাতন সুরা ভাল, বিশ্বাস করিবার জন্য পুরাতন বন্ধু ভাল, এবং পাঠ করিবার জন্য পুরাতন গ্রন্থকার ভাল।"

স্বামী। দেখ প্রাণাধিক, বড়ই দুঃখের বিষয় যে তোমায় আমায় কথা বার্ত্তা হইলেই ঝকড়া হয়।

স্ত্রী। সুখের বিষয় এই যে, ঝকড়া হইলে আর কথা বার্ত্তা হয় না।

একজন ভদ্র বংশজাত গুলিখোর ভিক্ষার্থ এক অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"মহাশয় আমার বড় দুরাদৃষ্ট" অধ্যাপক বলিলেন—"তা আকারেই টের পেয়েছি।

গ্রীক পণ্ডিত থেলিস্ একদা বলিতেছিলেন যে, জীবন এবং মৃত্যু উভয়ই তুল্য। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে আপনি মরেন না কেন? থেলিস বলিলেন—"উভয়ই তুল্য বলিয়া।"

বিয়াস্ নামক পণ্ডিতকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মানুষের কিরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত? বিয়াস্ উত্তর করিলেন—"সেইরূপে, যেন চিরকালই বাঁচিতে হইবে বা শীঘ্রই মরিতে হইবে।

এপিকটেটস বলিতেন—"কোন বিপদ বা অমঙ্গল ঘটিলে, অশিক্ষিত লোকে পরের উপর দোষ দেয়, অল্প শিক্ষিতেরা আপনার দোষ দেয় আর যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাহারা কাহাকেও দোষ দেয় না।"

স্বামী। কাল রাত্রে যে কথাটা বলিয়াছিলাম, কাহারও কাছে বল নাইত, কথাটা অত্যন্ত গোপনীয়?

স্ত্রী। তা বলিব কেন? গোপনীয় তাহাত তুমি বল নাই।

এক বিবাহের মজলিসে একটী ধনগর্ব্বিত বাবু সাজ-সজ্জা করিয়া বসিয়াছিল। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই সভায় আসিয়া তাঁহার হাত খাণেক দূরে বসিল। মলিনবসন ব্রাহ্মণকে নিজের এত কাছে বসিতে দেখিয়া বাবু হাড়ে চটিয়া গেল, কর্কশস্বরে বলিল—"ওহে ঠাকুর তোমাতে ও গাধাতে প্রভেদ কি?" ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে বলিলেন "বোধ হয় এক হাতের বেশী হইবে না।"

বিখ্যাত কবি ড্রাইডেন সর্ব্বদাই পুস্তকাদি লইয়া বিদ্যা চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ, আমি যদি পুস্তক হইতাম তাহা হইলে ভাল হইত; তাহা হইলে তোমার দেখা শুনা অধিক পাইতাম।" ড্রাইডেন উত্তর করিলেন, "তা যদি হও তবে, পঞ্জিকা হইও, যেন প্রতি বৎসর বদলাইতে পারি।"

অগষ্টস্ সিজার যখন রোমের সম্রাট, —সেই সময়ে রোম নগরে এক জন যুবা পুরুষ আসিয়াছিল, তাহার আকৃতি অবিকল সম্রাটের ন্যায়। এই আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যের কথা শুনিয়া সম্রাট তাহাকে দেখিবার জন্য রাজ সভায় আনিতে আজ্ঞা করেন। রাজ সভায় আসিলে, সকলেই সম্রাটের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিবার জন্য সম্রাট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মাতা কি কখন রোম নগরে আসিয়াছিলেন"? যুবক উত্তর করিল—"মাতা কখন আসেন নাই; কিন্তু পিতা মধ্যে মধ্যে আসিতেন।" শুনিয়া সভাস্থ সকলে অধোবদন।

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর চান—

"আমি যখন এলাম
তুমি তখন এলে না;—
এলে, সর্ব্বস্ব খেলে
যাবার সময় মনোদুঃখ দিয়ে গেলে"

চুনার।

"ছিল বটে আগে, তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহির গুলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ॥"

চুনার বা চুনারগড় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটী ষ্টেশন; মোগলসরাই হইতে ১০ ক্রোশ, হাবড়া হইতে প্রায় ২৪০ ক্রোশ। Change (জল হাওয়া পরিবর্ত্তন)—বাঙ্গালীর এখন একটী প্রধান রোগ হইয়া উঠিয়াছে, এই রোগের হ্যাঁপায় পড়িয়া অনেকেই এখন অনেক স্থানে যাইতেছেন। আগে আগে মধুপুর, বৈদ্যনাথ গেলেই অনেকে শান্তি পাইতেন, কিন্তু এখন ওস্থান গুলিও আর মনে ধরে না; স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া জলবায়ু পরিবর্ত্তনের পক্ষে চুনার এখন বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুতরাং চুনার সম্বন্ধে দু এক কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

স্থানটী বাস্তবিকই মনোহর। একে পাহাড়ময়, তাহাতে আবার গঙ্গার উপর অবস্থিত, সুতরাং বাহ্যদৃশ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহা একটী উৎকৃষ্ট স্থান। এক সময়ে কৈলাসনাথ প্রসঙ্গক্রমে পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—"নীম নিসিন্দা যেথায়, মানুষ মরে কি তথায়?" কথাটী কেহ পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন না, কথাটীতে নীম নিসিন্দার গুণ বিশেষ রূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সেই নীম নিসিন্দায় চুনার পরিপূর্ণ। জলকষ্ট এখানে কখনই নাই। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী ইহার একপ্রান্তে প্রবাহিতা, মধ্যে জার্গো নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদী সন্নিকটস্থ পাহাড়ের ঝরণা হইতে উৎপন্ন হইয়া, চুনার অতিক্রম করিয়া প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন ইন্দারা বা কূপ সকল স্থানেই আছে। 'বুচায়া' ও 'দার্গা' নামক দুইটী কূপ এখানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। মোগল বাদশাহগণের সময়ে এই দুইটী কূপ খনন করা হইয়াছিল। সেই অবধিই ইহাদের জল ব্যবহৃত হইতেছে, এখনও জলের অপ্রাচুর্য্য নাই। পানীয়রূপে ইহাদের জল অতিশয় স্বাস্থ্যকর; রোগীগণকে এই জল ব্যবহারে উপদেশ দেওয়া হয়। জঙ্গল ও জঞ্জাল এখানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

পূর্ব্বে ইংরাজদিগেরই সময়ে যখন এখানে সৈন্যাদির বাস ছিল, তখন চুনার খুবই জমজমা। প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যাইত। খৃষ্টান মিসনরীগণও এখানে সেই সময় অনেক লীলা করিয়াছেন। খৃষ্টানগণের জন্য দুইটী উপাসনা-মন্দির এখনও বিদ্যমান, তাহাতে কাজকর্ম্মও চলিতেছে। একটী রোমান ক্যাথলিক ও অপরটী প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের জন্য। যৎসামান্য আয়-সম্পন্ন কতকগুলি ইংরাজ এখনও এখানে বসবাস করিতেছেন। ইহারা যে অংশে বাস করেন, সেটীকে 'লোয়ার রেঞ্জ' ও 'ব্যারাক্' বা সাদা কথায় বারিক বলে। নিশানা (লক্ষ্য) শিক্ষার জন্য চাঁদমারীও একটী আছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটী কিছুই নাই। মিউনিসিপ্যাল আপীষ,

টাউনহল তহসীলখানা, ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের আদালত, কোতোয়ালী বা থানা, একটী মিসনরী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়, দোকান পসারী, বাজার, ফেরীওয়ালা প্রভৃতি সবই আছে। পাথরের কাজটা এখানে খুব, পাথরও বিস্তর। ভারতের অনেকস্থানেই এই অঞ্চল হইতে পাথর রপ্তানী হয়। বেঙ্গল ষ্টোন কোংর ডিপো এখন এখান হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। এখানের 'গ্লেজড্ আর্থেন অয়ার' বা চাকচক্যশালী মাটীর দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ। ঠাকুর কোং কর্ত্তৃক সুন্দর সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরময় দ্রব্যাদিও এখানে প্রস্তুত হইতেছে। এই ত গেল চুনারের মোটামুটী আধুনিক পরিচয়।

তবে এখন দেখিবার শুনিবার এখানে কি কি আছে ও তাহাদের পরিচয় ও প্রাচ্য ইতিহাস কীর্ত্তনে বিশেষ দোষ হইবে না। প্রাচ্য ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা কিছু শোনা গেল, তাহাই লিখিতেছি; প্রমাণ বিশেষ কিছুই নাই। যিনি ইচ্ছা করেন, বিশ্বাস করিবেন নতুবা তর্ক তুলিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করাইতে চাহি না। রামায়ণ, মহাভারতের কথার কি কিছু প্রমাণ আছে? তবে যাঁহাদিগের হৃদয়ে এখনও অন্ধকারের রেখামাত্রও আছে, যাঁহারা এখনও সম্পূর্ণ আলোক প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগের জন্যই কবিবর হেম চন্দ্রের কবিতার উপরিউক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

চুনারগড়।—রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণে এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে সম্মুখেই এখানের কেল্লা অবস্থিত। রেলগাড়ি হইতেও ইহা লক্ষিত হয়। ভাগীরথীর দক্ষিণপূর্ব্বতীরে একটী পাহাড়ের উপর এই কেল্লা নির্ম্মিত। পাহাড়টী একপ্রকার বেলে পাথরের। দুর্গের সীমা দৈর্ঘ্যে উত্তর দক্ষিণে ৭৭৬ গজ আর প্রস্থে গঙ্গাতীরস্থিত উত্তরাংশ * ২৪০ গজ; পাহাড়ের উপর দুর্গপ্রাকারের বেষ্টন ১৮৫০ গজ। গঙ্গার জল হইতে ইহার প্রাকার একবারেই ১০৪ ফিট উচ্চ; জ্যামিতির লম্বরেখার ন্যায় কেল্লার প্রাকারও ভাগিরথীর বক্ষ হইতে একবারে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। নদী তীর হইতে কেল্লার ভিতর ২০০ দুই শত গজ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত স্থানটী ১৪৬ ফিট উচ্চ। কেল্লার এই স্থানটীই সর্ব্বোচ্চ।

ত্রেতাযুগ হইতেই এই কেল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায় †। বামনরূপী ভগবান রাজা বলীর দর্প খর্ব্ব মানসে ত্রিপদ ভূমি ভিক্ষা লইয়া বিরাটরূপে তিন পদে তিন লোক অধিকার করেন। কথিত আছে তাঁহার প্রথম পদ এই স্থানে পড়িয়াছিল, এই জন্য ইহার একটী নাম হইয়াছে 'চরণাদ্রি'। যে পাহাড়ের উপর কেল্লা নির্ম্মিত, তাহারও আকার অনেকটা চরণের ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'চরণাদ্রি'ও বলে।

দ্বাপরে মগধের রাজা জরাসন্ধ উক্ত পাহাড়ের উপর রাজগিরি নামে গড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অনেক রাজাকে

* কেল্লার ভিতর এই স্থানটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

† তবে কেল্লাটীর গঠন যে তখন এরূপ ছিল না, এ কথা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কোন্ সময়ে যে কেল্লাটী বর্ত্তমান আকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, মনোযোগপূর্ব্বক অবধান করিলে পাঠক ক্রমে সবই স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

বন্দী করিয়া রাখেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে জরাসন্ধকে নিহত করিয়া ভীমার্জ্জুন ঐ সকল বন্দী রাজগণকে উদ্ধার করিয়া হস্তিনায় লইয়া যান। জরাসন্ধের কয়েদখানা ঘর নাকি ম্যাগজিনের পার্শ্বে এখনও বর্ত্তমান।

রাজা ভর্ত্তরী * স্ত্রীর ব্যবহারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রাজধানী উজ্জয়িনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরণাদ্রি পাহাড়ে আসিয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হয়েন। রাজা বিক্রমাদিত্য বহু অনুসন্ধানের পর এই স্থানে তাঁহাকে পাইয়া পুনরায় উজ্জয়িনী প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করেন কিন্তু ভর্ত্তরী কিছুতেই আর প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মত হইলেন না। স্থানটী ভয়ানক জঙ্গলময় ও শ্বাপদসঙ্কুল এবং গড়ের দুরবস্থা দর্শনে ভর্ত্তরী অনেক খেদ করিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এই কারণে গড় মেরামত করিয়া এই স্থানে নগর স্থাপন করেন ও নগরের নাম প্রদান করেন 'ভর্ত্তরী কি নগরী'। ম্যাগজিনের নিকট ভর্তৃহরীর বেদী এখনও বর্ত্তমান। লোকে তাহাকে 'ভর্ত্তরী চবুতর' বলে। শুনা যায়, ঐ মণ্ডপে নাকি অনেকে অনেক তৈল ঢালিয়াছেন, কিন্তু এক বিন্দুও বাহিরে পড়ে নাই।

১০২৯ সনে সহদেব নামে এক রাজা এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন ও গড়ের স্বত্বাধিকারী হয়েন। শোন্‌বা নামে তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। রাজা প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার কন্যারত্ন লাভ করিবেন। মহোবার রাজা জাসনের পুত্র ওদল যুদ্ধে সহদেবকে পরাস্ত করিয়া শোনবা লাভ করেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিবাহের ছাঁদলাতলা ও শোনবার মহল— গড়ের ভিতর দ্রষ্টব্য।

১৪৮৮—১৫২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত চুনার বীরসিংহ ও বীরভানসিংহ নামক রাজদ্বয়ের অধীনে থাকে। তাঁহাদের রাজমন্দিরাবলী রাণীঘাট ও দেবল ম্যাগজিনের ভিতর ভর্ত্তরীর চবুতরের নিকট বর্ত্তমান। ১৫২৯ খৃঃ বাবর বেনারস দখল করিয়া চুনারগড়ে তাঁহার লোক লস্কর রাখেন ও নিজে আসিয়াও সকল পরিদর্শন করিয়া যান। সে সময় গড়ের আশপাশ ভয়ানক জঙ্গল ও গণ্ডার, বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদে পরিপূর্ণ বলিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ষে বাবরের মৃত্যু হইলে শেরখাঁ গড় দখল করিয়া তথায় বাস করিবার জন্য বাটী ও স্নানাগার নির্ম্মাণ করান। তাহার নাম 'শিলহখানা'। গড় শেরখাঁর হস্তগত শুনিয়া হুমায়ুন সসৈন্য আসিয়া ছয়মাসকাল যুদ্ধের পর পরাস্ত † হইয়া প্রস্থান করেন। শেরখাঁর মৃত্যুর পর গড় আবার হুমায়ুনের অধিকারভুক্ত হয়। তদীয় উত্তরাধিকারী চিরস্মরণীয় বাদশাহ আকবর গড়ের ভিতর একটী দ্বার নির্ম্মাণ করান। দ্বারে সন বর্ষ খোদিত আছে। লোকে ঐ দরজাকে পানিঘাটের দরজা বলে। জাহাঙ্গীরের সময় ইপ্তিয়ারখাঁ

* ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত ইতিহাস্ পাওয়া যাইবে।

† ১৫৩৯ খ্রীঃ হুমায়ুন কর্ত্তৃক গড় একবার অধিকৃত হয় বটে কিন্তু কিছু দিনের পরই সেরখাঁ আবার উহা দখল করিয়াছিলেন।

এখানের নাজির নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারই বৈঠকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এখানের কাছারী বসাইয়াছিলেন *। ঔরঙ্গজেবের সময় মির্জা বহরাম নাজির হয়েন। তিনি গড়ের ভিতর ভৈরবুর্জ্জের নিকট যে মসজিদ নির্ম্মাণ করান, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান।

কথিত আছে, একদা জনৈক ব্রাহ্মণ হস্তিনাপুরে একটী লৌহশলাকা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাজা পিথৌরাকে বলেন যে, ঐ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে, সে দুর্গ চিরস্থায়ী হইবে; কারণ উক্ত শলাকার দ্বারা বাসুকির ফণা বিদ্ধ হইয়াছে। রাজা তাঁহার কথায় বড় বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে উহা তুলিয়া লইলেন। উক্ত লৌহশলাকার অগ্রভাগ রক্তময় দেখিয়া রাজা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ব্রাহ্মণের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বিনয় রচনে তাঁহাকে শান্ত করিয়া পুনরায় উক্ত শলাকা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিতে অনুরোধ করেন। যে লগ্নে উহা প্রোথিত করা হইয়াছিল, সে লগ্ন গত হওয়ায় কোন ফল হইবে না বলিয়া আর উহা প্রোথিত হইল না। গমনকালে তিনি পিথৌরাকে বলেন যে, ইচ্ছা করিলে পিথৌরা চরণাদ্রি গড় মেরামত করিয়া দিতে পারেন, ইহাতে চরণাদ্রি গড় পৃথিবীতে কিছুকাল স্থায়ী হইবে। ব্রাহ্মণের আজ্ঞামত পিথৌরা চুনার গড় মেরামত করিয়া নূতন নাম রাখিলেন 'পিথৌরা গড়'। লোকমুখে ক্রমে উহা 'পাথর গড়' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমেদ সা ডুরানির ভারতাক্রমণের পর মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থায় ১৭৬৪ খৃঃ অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌলা চরণাদ্রির স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার নিকট হইতেই ইংরাজগণ ইহার স্বত্ব পাইয়াছেন। ১৭৬৫ খৃঃ ইংরাজ সেনাপতি মেজর মন্‌রো ইহা অবরোধ করেন কিন্তু দেশীয় সেনাগনের দোষেই নাকি সেবার তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে ইংরাজী সাহসে নির্ভর করিয়া দ্বিতীয় বার তিনি চুনার গড় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এবার আবার বিলাতি সাহসেও কুলাইল না, অবশেষে টুটিল; ইংরাজ সৈন্যগণের মধ্যে ভীরুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল সুতরাং এ আক্রমণেও কোন ফল দর্শিল না। তবুও মন্‌রো ভগ্নোৎসাহ নহেন, এবারে তিনি আর আক্রমণ না, করিয়া স্থায়ী অবরোধ সংকল্পে চুনারে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত স্থাপনা ও সব সুবন্দোবস্ত করিয়া জেনেরাল কার্ণ্যাকের অধীন প্রধান সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইতে স্বয়ং বেনারস যাত্রা করিলেন। সুজাদ্দৌলাও এই সময়ে বেনারসে আসেন। সম্মুখ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্‌রো চুনার হইতে সৈন্যাদি উঠাইয়া লইলেন। চুনার গড় অধিকারের খ্যাতি তাঁহার অদৃষ্টে নাই। শীঘ্রই তাঁহাকে ভারত ত্যাগ করিতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের চুনার গড় অধিকারের সংকল্প সাধনও স্থগিত রহিল।

১৭৬৫ খৃঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোংর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কার্ণ্যাক ইহার পুনরবরোধ করেন। প্রথম রাত্রির আক্রমণে তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হয় কিন্তু পরে অন্য

* এখন কাছারী পূর্ব্বের গ্যারিজন্ হাঁসপাতালে অবস্থিত।

একরাত্রিতে নিকটস্থ গদাপাহাড় হইতে অনবরত গোলা বর্ষণ করিয়া ইংরাজ গড়ের প্রাকারের দক্ষিণপশ্চিম কোনের এক স্থান ভগ্ন করেন। সুজাদ্দৌলার সৈন্যগণ আর আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া, আত্মসমর্পণ করে। পরে ১৭৬৮ খৃঃ অযোধ্যার নবাব ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া চুনারগড় ও চুনারের স্বত্ব ইংরাজগণকে প্রদান করেন।

কেল্লা ইংরাজাধীনে আসিলে কিছু-কালের জন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে চুনার-গড়ই ইংরাজের প্রধান ম্যাগজিন ও অস্ত্রাগার হইয়াছিল। ১৮১৫ খৃঃ এই দুর্গ ষ্টেট্ প্রিজন্ রূপে পরিণত হয়। ত্রিম্বাকজী দেংলিয়া ইহার প্রথম কয়েদী। ইনি ১৮১৭-১৮ খৃঃ রাজদ্রোহী মহারাষ্ট্র-দলের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। এখন ইহা সাধারণ জেল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দুর্গের ভিতর জলের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই নাই। গঙ্গার জলই এখন পানীয়। ভিতরে একটা কূপ আছে বটে কিন্তু তাহার জল অপেয়। কূপটার ব্যাস ১৫ ফিট্।

কদম-রসুল বা চরণ পাদুকা।—কেল্লার নিকটে টীকোর মহল্লাতে সেখ ইমাম বক্সের মসজিদের একটী ঘরে এখন উহা সযত্নে রক্ষিত। একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরে চরণের সম্মুখস্থ অর্দ্ধাংশের (অঙ্গুলী সমেত) চিহ্নের স্থায় একটা চিহ্ন বিদ্যমান। ইংরাজ আমলে কেল্লার ভিতর হইতে দেবাদির মূর্ত্তি যখন স্থানান্তরিত করা হয়, মুসলমানগণ সেই সময় কেল্লার ভিতর হইতে উক্ত প্রস্তরখানি লইয়া মসজিদে স্থাপিত করেন। মুসলমানগণ ইহার নাম দিয়াছেন 'কদম রসুল,' হিন্দুগণ চরণ পাদুকা' বলেন। হিন্দু ও মুসলমানের ইহার প্রতি সমান শ্রদ্ধা।

হিন্দুগণের মতে, ভগবানের যে দুইটী চরণ পৃথিবীর উপর পতিত হয়, তন্মধ্যে দক্ষিণ চরণের চিহ্ন উক্ত প্রস্তরে পতিত হইয়াছিল আর বামপদের চিহ্ন গয়ায় আছে।

মতান্তরে শুনা যায়, জরাসন্ধের বন্দী-রাজগণকে চুনারগড় হইতে উদ্ধার করিয়া হস্তিনায় লইয়া যাইবার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন উক্ত প্রস্তরে পতিত হয়। সেই অবধিই উহা হিন্দুর আদরের ও ভক্তির সামগ্রী।

মুসলমানগণও আবার 'কদম-রসুল' তাঁহাদের বলিয়া দাবী করেন। সেই দাবীর হিসাবেই ইংরাজ উহা নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে মুসলমানগণ সযত্নে মস্‌জিদে রক্ষা করেন। ইহারা বলেন, ফরখ্ সাহার রাজত্বকালে মারুফ নামক জনৈক হাজী—মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দুইটী কদম-রসুল (চরণার্দ্ধ) লইয়া আসেন *। তন্মধ্যে একটী বাদসাহকে উপঢৌকন দিয়া হাজীসাহেব জায়গীর স্বরূপ চুনার প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয়টী তিনি গড়ের ভিতর রাখিয়াছিলেন। সেই অবধিই ইহা গড়ের ভিতর ছিল।

মস্‌জিদে স্থাপিত থাকিলেও দর্শন মানসে অনেক হিন্দুযাত্রী এখানে আগমন করেন। কাশীধামের মহারাজা মাসিক বৃত্তি দিয়া উহার সেবার জন্য একটী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ইহার তত্ত্বাবধান এখন তাঁহারই অধীন।

* হিন্দু তীর্থ যাত্রীগণের অনেকেও গয়ায় গিয়া প্রস্তরের বা পিত্তলের বিষ্ণুপদ লইয়া আসেন। কদম রসুল আনাও সেই হিসাবে।

দর্গাহ।—এটী একটী কবর-স্থান। কাসেম সুলেমানি নামক এক ফকিরের এই স্থানে সমাধি হয়। পেশ-ওয়ার—ইহাঁর জন্মস্থান। মনের বৈরাগ্যে শিষ্যাদি সমভিব্যাহারে তিনি দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত বহুসংখ্যক অনুচর দর্শনে শঙ্কিত হইয়া জনৈক রাজ-কর্ম্মচারী এ বিষয় বাদশাহের কর্ণগোচর করেন। প্রবল প্রতাপশালী আকবর তখন দিল্লীশ্বর। আকবর কর্ম্মচারীর শঙ্কার কারণ অবগত হইয়া তাঁহার হস্তে ঢাল, তরবারী ও হাতকড়ি, বেড়ি দিয়া আজ্ঞা দিলেন, কাসেম যুদ্ধে অগ্রসর হইলে ঢাল তরবারী ব্যবহার করিবে নতুবা তাহাকে শির নত করিয়া হাত-কড়ি ও বেড়ি গ্রহণ করিতে বলিও। কাসেম—ফকির, যুদ্ধে তাঁহার কি কাজ সুতরাং বাদশাহের আজ্ঞানুসারে হাত-কড়ি ও বেড়িই তিনি নতশিরে গ্রহণ করিলেন। বন্দীভাবে তাঁহাকে লাহোর হইতে চুনারে পাঠান হইল। চুনারে গড়ের নীচে একটী মস্‌জিদে তিনি সায়ং-কালীন নেমাজ পড়িবেন, হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ি আপনা হইতে খুলিয়া গেল স্বচ্ছন্দে তিনি উপাসনা করিয়া লইলেন। উপাসনা শেষ হইয়া গেল, আবার তিনি যে বন্দী—সেই বন্দী; হাতকড়ি ও বেড়ি যথা স্থানে আবদ্ধ হইল। প্রত্যহই এই ঘটনা। ক্রমে সকলেই উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। কাসেম সাধারণ ফকির নহেন বলিয়া লোকের মনে ধারণা হইল। আরও একটী অদ্ভুত ঘটনা ইহাঁর সম্বন্ধে শুনা যায়। মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া, তিনি এক দিন সকলকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি একটী তীর নিক্ষেপ করিবেন, তীরটী যেখানে পতিত হইবে, সেইস্থানেই যেন তাঁহার কবর দেওয়া হয়। নিক্ষিপ্ত তীর গড়ের নিকটেই নিপতিত দেখিয়া তিনি আদেশ করিলেন, "টুক আউর" অর্থাৎ আরও একটু যাও। আদেশক্রমে তীরও পুনরায় উর্দ্ধমুখ হইয়া আরও কিছু দূর গিয়া ভূমে পতিত হইল। তীরটী যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই অঞ্চলটী টীক্কোর মহল্লা নামে খ্যাত। কাসেমের 'টুক আউর' উক্তি হইতেই টীকোর মহল্লার 'টীকোর' সংজ্ঞা উৎপন্ন। চৈত্রমাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে নেমাজ পড়িতে দর্গাহে অনেক মুসলমানের সমাগম হয়।

মস্তরাম সাধু —দেব-দানবে চির-বিরোধ। আদিকাল হইতেই এই বিরোধের কথা শুনা যায়; কোন কালে কি ইহার শান্তি হইবে না? অনন্ত-কালই কি এইরূপ চলিবে। কলিতে দেব-মাহাত্ম্য কদাচ প্রত্যক্ষীভূত হইলেও দেবদ্বেষিগণ ত স্বকার্য্যসাধনে অমনোযোগী নহেন। বিজিত হিন্দু-জাতির সহিত হিন্দু দেব-দেবীগণও কি শক্তিহীন? নতুবা তাঁহারাই বা নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিবেন কেন? অথবা এইরূপে তাঁহারা ক্ষমা ও ধৈর্য্য-গুণ শিক্ষা দিতেছেন, মানুষে কিছুতেই বুঝিতেছে না? জেতা ইংরাজ হিন্দু-দেব-দ্বেষী। তাঁহাদের নিকট দেবদেবীর আদর কতদূর সম্ভবে? হিন্দুর আমলের দেব-মূর্ত্তি সমূহ ইংরাজ আমলে চুনারগড়ে আর স্থান পাইলেন না। সুতরাং নূতন স্থানে নূতন করিয়া আবার ঐ সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই কারণে

একটী নীম বৃক্ষের তলায় ভৈরোজীউ স্থাপিত হইলেন। এই স্থানে এক সাধু থাকিতেন, নাম মস্তরাম। নামে যেমন, ইঁহার কার্য্যকলাপও সেইরূপ। শুনা যায়, হস্তী যাইতে দেখিয়া সময়ে সময়ে ইনি লাঙ্গুল ধরিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিতেন। এক দিন ইনি কোতোয়ালীর নিকট দিয়া আসিতেছেন, মানখাঁ নামক জনৈক পাঠান তাঁহাকে আপন দুঃখ জানায়। মস্তরাম হাত ধরিয়া মানখাঁকে কোতোয়ালীতে বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে তিনবার আঘাত করিয়া বলেন "যা, শীঘ্রই তোর এ দুঃখের অবসান হইবে। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তিন পুরুষ তোরা কোতোয়াল হইবি।" কিছু দিন পরেই মানখাঁ সহর কোতোয়াল নিযুক্ত হইল। তাহার পুত্র ও পৌত্রগণও ঐ কার্য্যে জীবনাতিপাত করিয়াছে।

কালীমন্দির।—কলিকাতার সিদ্ধেশ্বরী, আনন্দময়ীর ন্যায় টীকোরে এক কালীমূর্ত্তি আছেন, জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার সেবায় দিনাতিপাত করেন। পূজাদি অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী দেখা যায় না।

গদাপাহাড়।—টীকোরে অবস্থিত। গদাসাহ নামক এক ব্যক্তি এই স্থানে সমাধি লয়েন বলিয়াই গদাপাহাড় নামে ইহা খ্যাত। ইহার কবরের চতুঃপার্শ্বে হস্তঘর্ষণ করিলে চন্দনের গন্ধ পাওয়া যাইত বলিয়া শুনা যায়। ইংরাজগণ এই পাহাড় হইতেই গোলা বর্ষণ করিয়া গড়ের প্রাকারের কিয়দংশ ধ্বংস করেন।

মতিকণ্ঠ তেওয়ারী।—ইনি একজন অপই দীক্ষিত কুলের শিষ্য, নিরাস খট্‌খরিয়া মৌজায়। গড়ের নীচে গঙ্গাতীরে বসিয়া একদিন ইনি জপ করিতেছেন, নিকটে এক ব্যক্তি জাল ফেলিয়া জালে কি উঠিবে—ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে ইনি বলিলেন "তোর জালে শশক উঠিবে।" জাল গুটাইয়া সে ব্যক্তি দেখিল, প্রকৃতই একটী বন্য শশক উঠিয়াছে।

দুর্গের নিকটে ইহার আশ্রম ছিল, তাহার অনতিদূরে কেল্লার জনৈক কর্ম্মচারী বাস করিতেন। একদিন রাত্রিতে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় উক্ত কর্ম্মচারীর সিপাহী বল পূর্ব্বক মতিকণ্ঠকে ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার ঘর অধিকার করে। মতিকণ্ঠ গড়ের ভিতর গিয়া ভর্থরীদেবের প্রার্থনায় নিশা যাপন করেন। প্রাতে সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইল, উক্ত সিপাহীর মৃতদেহ ঘরের ভিতর খাটীয়ার নীচে পড়িয়া আছে, খাটীয়াখানিও উল্‌টান রহিয়াছে।

ক্রমশঃ—

শম্ভু-সংবাদ।

অদৃষ্ট সুন্দরীর কলঙ্ক দুরপনেয়। মানুষে যদি অদৃষ্ট সুন্দরীর মোহিনী মূর্ত্তিখানা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কোন্‌কালে কত কি কাণ্ডই না ঘটিত! মানুষের টিট্‌কারি-বাণ-জর্জ্জরিতা ভামিনী অভিমানভরে কোন্ দূর বনে যাইয়া অঙ্গ ঢাকিত। সেখানে তাহাকে বাঘে খাইত কি ক্ষুধানলে পোড়াইত, কে বলিতে পারে? অথবা কোন পর্ব্বতের কোন দুর্গম শিখরে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত শত নবীনা নির্ঝরিণীরই না সৃষ্টি করিত! অথবা পলাইতে পলাইতে পথের মাঝে কোন বাঙ্গালী লেখকের চোখে পড়িত। তাহা হইলে আরও সর্ব্বনাশ হইত। কামিনীর কিসলয়-কোমল অঙ্গখানি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বীরবরের লেখনী-কণ্টকে গাঁথিয়া যাইত।

চারিধারেই শুনিতে পাই, বাঙ্গালী লেখক বড় অন্ধকারবাদী—Pessimist কথাটার অর্থ খুঁটাইয়া তর্জ্জমা করিলে হয় পেজোমী। বাঙ্গালীর বাঙ্গলা লেখা ঐ রকম একটা কুরুচি-রসব্যঞ্জক।

বাঙ্গালী লিখিয়া সুখ পায় নাই; কাজেই বাঙ্গালী সুখের কথা লিখিতে শিখে নাই। যে দুই একজন সুখী, তাহারা কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের দুঃখ পরের স্কন্ধে চাপাইয়া। তাহারা অতি সন্তর্পণে পরের প্রাণে দুঃখের আবরণ দিতে জানিত, তাই নিজেরা সহানুভূতির বিনিময় পাইয়া কিছু সুখী হইয়াছিল। দুঃখ ভোগে যা কিছু ওই একটু সুখ। অধিকাংশের কি? তাহাদের দুঃখ তাহাদেরই কাছে। সহানুভূতি কয়জনের ভাগ্যে মিলিয়া থাকে! কাজেই বাঙ্গালী লেখক অদৃষ্টের নিন্দা করিয়াই জীবন কাটাইতেছে। সে অদৃষ্টকে দেখিতে পাইলে কি আস্ত রাখিত? অদৃষ্টের বড় অদৃষ্ট তাই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অদৃষ্টের নিন্দা কোথায় নাই। লক্ষপতির প্রাসাদ-শিখরে, ভিক্ষুকের কুটীরে, বিচারকের মঞ্চোপরে, কারাগারে—অদৃষ্টের নিন্দা কোথায় নাই? স্থলে অদৃষ্টের নিন্দা গড়াগড়ি খাইতেছে। জলে ভাসিতেছে, অন্তরীক্ষে উড়িতেছে। প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া পর প্রভাত পর্য্যন্ত প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ সমীরণ অদৃষ্টের বিরুদ্ধে পিটিশন বহন করিয়া ভূমি হইতে উপরে—আরো উপরে—নিকট হইতে দূরে বৈদ্যুতিক বেগে ছুটিতেছে। তবু কি নিন্দার শেষ করিতে পারিতেছে! অদৃষ্টের নিন্দা কখন্ নাই?

ক্ষুদ্র বালিকার কাঁপনি-ভরা হৃদয়ের স্তরে স্তরে অদৃষ্টের নিন্দার মুকুল গজাইতেছে; কেন না কাল সে পাশ করা স্বামীর ঘরে যাইবে। তাহাকে পার করিতে বাপকে অদৃষ্টের কত নিন্দা করিতেই সে না দেখিয়াছে! অদৃষ্টের জ্বালাময়ী উল্কারূপিনী তাহাকে গৃহ-প্রাঙ্গণে পাইয়া তাহাকে কত পোড়াই না পুড়িতে হইয়াছে! কত লোকের দ্বারস্থ না হইতে হইয়াছে! কেহ তাড়া দিয়াছে, কেহ তাড়াইয়াছে,—কেহ দূর হইতে অঙ্গ প্রতিশ্রুত হীরার খাটের সোণার ছবি দেখাইয়া, তাহার সুবর্ণ

প্রতিমা নন্দিনীকে প্রেতিনীর সহিত তুলনা, করিয়াছে। সেই কন্যা পাশ-করা স্বামীর ঘরে যাইবে। অদৃষ্ট! সেকি এর পরে তোর মুখে দুধের বাটী ধরিবে? বলি সুশীলা আমাদের কি করিতেছ? সুশীলার বাপ শশুর শ্বশুর সশাশুড়ী? তাই বলি বালিকার হৃদয়ে মুকুল গজাইতেছে। যেমনি যাইবে, অমনি স্বামী ফেল্ হইবে। তখন কি হইবে? অমনি হৃতিকা শ্বশুর-গৃহগতা নবীনার হৃদয়ের প্রতি লোমকূপে শিকড় গাড়িয়া ভুবনব্যাপী শাল হইবে। আর পাশ হইলেই বা কি? সে ত সেই আদালত সম্মুখে বটবৃক্ষতলে শামলা-মণ্ডিতশির প্রাণেশের লোচন-সুধার ধার। অদৃষ্টের নিন্দা ধারায় ধারায় তরঙ্গিনী।

দেখাইয়া দাও, কে অদৃষ্টের দোষ না গাহিয়া জল খায়! নিশিখণ্ডিতা প্রণয়ীর মুখ দেখিতে পায় না, স্বাধীনভর্ত্তৃকা স্বামীর ঘরে যায় না। রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া কাঁদিতেছে। আয়ান অদৃষ্টকে দেখিতে পাইলে হাড় একস্থানে মাংস একস্থানে করিবে বলিয়া লাঠী হাতে করিয়া ঘুরিতেছে। ভিখারিণী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়াও— ক্ষুধার্ত্ত, ব্যাধি-দুর্ব্বল ভিখারীর আহার যোগাইতে পারিতেছে না। রাগী উদরাময়ক্লিষ্ট নরেশ্বর প্রাণেশ্বরের ভাঙ্গা উদরে—অতি যত্নে স্বহস্তে পাক করিয়াও—জীবিত মৎস্যের ঝোল-টুকু রাখিতে পারিতেছে না। পেটে না পড়িতে পড়িতে মাছটা তড়াক করিয়া লাফাইয়া বিলে পলাইয়া যাইতেছে। কেন এমন হয়? কাহার দোষ? এ সকলই অদৃষ্টের দোষ।

কার্য্যবীর! তুমি বলিবে অদৃষ্ট নাই। দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াও পুরুষকার বলে তুমি রাজা হইয়াছ। ধুলিমুঠা ধরিয়াছ, কড়িমুঠা পাইয়াছ। তুমি ত অদৃষ্টকে মানিবেই না। এইটুকু অদৃষ্টের অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু যে তোমার মত কার্য্য-বীর—তোমার মত কার্য্য করিয়াও ফল পায় নাই, যে কড়িমুঠা ধরিয়া ধুলিমুঠা পাইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমন হয়? সে বলিবে অদৃষ্টের দোষ।

বর্ত্তমান শতাব্দীর কার্য্যবীর ভূবিজয়ী নেপোলিয়ন—কার্য্য যাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, রণক্ষেত্রে শত্রুমণ্ডলী মধ্যে সাত দিনব্যাপী জাগরণের পর বল্লমে ভর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মুহূর্ত্তের জন্য ঘুমাইয়াও যে তৃপ্তিলাভ করিত,—সহস্র রণরঙ্গের নায়ক সেই নেপোলিয়নও ত অদৃষ্টের নিন্দা করিতে করিতেই মরিয়াছিল। তড়িদ্‌বেগা সর্ব্বনাশী আভালাঞ্চীভরা দেবদুরবিগম্য আল্পস্‌গিরিগহ্বরে যে কামান তুলিয়াছিল, ইটালী মারিয়াছিল, স্পেন, হলাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি বড় বড় রাজ্য যে ভাইকে, আত্মীয় কুটুম্ব, গঁদান সম্পর্কীয় যাহাকে পাইয়াছিল, তাহাকেই দান করিয়াছিল,—বল দেখি ভাই, তার কি সকল থাকিতে—যৌবনের সকল উষ্ণ শোণিতবিন্দু, সেই শক্তি, সেই মহত্ত্ব, সেই কার্য্যকুশলত্ব—সকল থাকিতে, তার কি সাগরতরঙ্গে ঘেরা ক্ষুদ্র সেণ্ট হেলেনার জনশূন্য, আড়ম্বর-শূন্য, উইলোতরুতলের চৌদ্দপোয়া জমি মাত্রই পরিণাম? সম্রাট কপালে করাঘাত করিত, আর বলিত "Is it Fate or Grouchy betrayed!" গ্রাউসির দোষ বুঝিলে সম্রাট তাহাকে গিলটিনে

চাপাইত, অদৃষ্টকে দেখিতে পাইলে শূলে দিত।

নেপোলিয়ন-জয়ী ওয়াটারলুর বীর ওয়েলিংটন, রিফরম বিলের বিপক্ষতা করিতে যাইয়া ভক্তস্বদেশবাসীর ঢিল খাইয়াছিল। সেদিন বীরবর অদৃষ্ট-সুন্দরীর সহিত মনে মনে আলাপ করিয়া, কল্পনার মূর্ত্তি গড়িয়া করমর্দ্দনচ্ছলে কোমলার করখানি ভাঙ্গিয়া দিতে কি ছাড়িয়াছিল?

আর কত বলিব? এই যে সহিষ্ণু পাঠক, আফিসের কাজ ফেলিয়া, তামাকু-সেবন বিস্মৃত হইয়া, পাড়াপড়শীর নিন্দা ছাড়িয়া, গৃহিণীর নানাছাঁদের আদর কথা উপেক্ষা করিয়া এতটা অদৃষ্টকাহিনী পাঠ করিলে, এটা তোমার অদৃষ্টের দোষ। এই যে পাঠিকা ঠাকুরাণি! খিট্‌মিটিণী শ্বাশুড়ীমাগীর রাঁধিয়া বাড়িয়া আহারের অনুরোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া—অভিমানিনী, ঘরে খিল দিয়া শান্তি পাইবার আশায় হতভাগ্য শম্ভুর জীবনেতিহাসের দুই ছত্র পড়িয়াই জ্বলিলে, আর অদৃষ্টের নিন্দা করিতে করিতে আমাদের এত যত্নের শম্ভুকে দূরে নিক্ষেপ করিলে—এটাও আমাদের অদৃষ্টের দোষ।

হায়! আমি কোথায় কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর খরস্রোতে নায়ক নায়িকা ভাসাইব, তাহাদের চাঁদপানা মুখে চাঁদের আলো ফেলিয়া চাঁদে চাঁদে ধুলপরিমাণ করিব, কোথায় শশীর সঙ্গে কালমেঘের ছায়া জড়াইব—ছায়ার সঙ্গে সমীরণের বুকনি দিব, কুলে তুলিব, ঝড় আনিব, বাঁশি বাজাইব, গান গাওয়াইব, কখন ডুবাইব, কখন বা উঠাইব। কোথায় কুমুদিনী, মনোজ-নাথ, সতীশচন্দ্র, হেমলতা, প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বর—চিরফুল্ল গোলাপবেলার মালা গাঁথিব, নব্য পাঠককে দেখাইব আর নব্যা পাঠিকার করকমলে অঞ্জলী দিব—শেষে রাজনীতি, সমাজনীতিতে ঠোকর দিয়া, যৌবনের রীতি বুঝাইতে ষোড়শী সন্ন্যাসিনী কমলিনীর মুখের দুটা গীতি শুনাইব—আর সকলের শেষে কালীদহের কমলেকামিনী—করীবর উগারিণী—দিল্লীকা লাড্ডু সেই নিষ্কাম ধর্ম্ম-চরণশীলা বিনোদিনীর মোহন বেণীতে সমগ্র গীতাখানা বাঁধিয়া সকলকে মজাইব, আর দূর হইতে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক কাঞ্চনমূল্য লইয়া ঘরে বসিয়া মজা দেখিব,—না একটা তীব্রগন্ধ টগর হাতে, বৃন্ত ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইলাম! ইহা হইতে বঙ্গ সাহিত্যের অদৃষ্টের দোষ আর কি হইতে পারে?

আর আমাদের শম্ভু! সেই বা কোথায়, বি, এল, পাশ করিয়া, কোন একটা প্রকাণ্ড দিগ্‌গজ জজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া, রেলিংএ ঘুসী মারিয়া, কপালে করাঘাত করিয়া—যেমন করিয়াই হউক, হয়কে নয় করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবে; মেসের ভাত খাইয়া কংগ্রেসে বক্তৃতা করিবে; স্বর্গের চাঁদ হাতে আনিয়া মেকেঞ্জি লায়ালের সেলে বিক্রয় করিবে, সে চাঁদের দাম হইল না দেখিয়া রেসে বাজী ধরিবে; অবশেষে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া গৃহে ফিরিবে, গৃহিণীর গাল খাইয়া হেঁচে কেশে অস্থির হইয়া স্বরবিকৃতি করিয়া বালিশে ঠেস দিয়া জ্বরের ভাণ করিবে, আর আমাদের বাধ্য করিয়া অনুপ্রাসে

আশ মিটাইতে ব্যবস্থা করিবে—না কোথায় কি না সেই শম্ভু এত লেখা পড়া শিখিয়া বাংলা লিখিয়া মহামূল্য জীবনটাকে হাসির খোরাক করিতে চলিল! হায়রে অদৃষ্ট, তোরে আর কি বলিব?

অদৃষ্টদোষে শম্ভু লেখক হইলেন। অদৃষ্ট-দোষে বাঙ্গালী পাঠকের অনুগ্রহের উপর আত্মনির্ভর করিলেন। বুঝিলেন না, উপযাচক হইয়া ক্ষীরমোহন দিলেও বাঙ্গালী জিবে ঠেকাইয়াই তেতো বলিয়া ফেলিয়া দেয়। আর দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলে, কুইনাইনের নিরেট বড়ী, কমল মধুর মিছরি বলিয়া লেহন করে, আর আবেশে চোখ মুদে,—সঙ্গীকে বুঝিতে দেয় না, আর বিদ্রূপকারী স্বাদেন্দ্রিয়কে গালাগালি দিতে দিতে আবার চাহিয়া বার বার, কতবার খায়। বুঝিলেন না, বাঙ্গালী পরের চোখে দেখে, পরের কাণে শোনে। নিজের কথা পরকে দেয়, পরের কথা আপনি লয়। বুঝিলেন না দ্বিসপ্তকোটীধৃত-খরকরবালা বাঙ্গালা অবলা। বুঝিলেন না, এখানে প্রকৃতি বিপর্য্যস্তা পণ্ডিত সস্তা। পেচকে গান গায়, কোকিলে ক্যাঁ ক্যাঁ করে। এখানকার দুই হাতে ঢাল তরবারযুক্ত—প্রহরীকে চোরে শুধু হাতে ধরিয়া লইয়া যায় প্রহরীবর হাত ছাড়াইবার অবকাশ পায় না। হতভাগ্য শম্ভু কিছুতেই বুঝিলেন না, এখানে পাঠক হইতে লেখকের সংখ্যা অধিক। এখানে জীবন্ত কবি শুকাইয়া মরে, ভাড়া খায় দ্বারে দ্বারে। আর মরা কৃত্তিবাসকে বাঁচাইবার জন্য চাঁদা ওঠে ঘরে ঘরে।

অদৃষ্ট সুন্দরি! ভারতের সাধের ধন, শিপ্রাজলকল্লোলকোলাহলমুখরিত উজ্জয়িনীকুঞ্জের চিরমুখর, অনন্ত জীবন ভ্রমর রতন কালিদাস কোথায়? কেহ বলে সে কাশ্মীরের রঙ্গিনী প্রকৃতির সুন্দর ললাটে টীপ হইয়া আছে। কেহ বলে, ভোজরাজের প্রাসাদপ্রাঙ্গনে সমীরণে আজিও সে বোঁ বোঁ করিতেছে। কেহ বলে, উজ্জয়িনীর কেলিকাননে একটা লুতাজালে জড়াইয়া হাত পা বাঁধা পড়িয়া আছে। কতকগুলা অভিসারিকা তাহাকে দেখিয়া পথে পথে কবরীর ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে যে যার ঘরে পলাইয়া যাইতেছিল। একখানা নিবিড় ভ্রমরকৃষ্ণ মেঘ আঁধারে অঙ্গ ঢাকিয়া মাথার উপরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; আজিও পর্য্যন্ত সে সংবাদ উত্তরদিকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। কালিদাস কোথায়? কেহ বলে সে রাজা হইয়াছে; কেহ বলে, কবির অদৃষ্টে যাহা ঘটে—ঋণ দায়ে জড়াইয়া ভারতের কোন এক স্থানের কোন এক প্রমোদার গৃহে বাঁধা পড়িয়াছে। আর সেই এভন তীরের চিত্ত বিনোদন বংশীধর সেক্সপিয়র? তার বাড়ী ঘর লইয়া কত তত্ত্ববিদের কত নিশাই না অনিদ্রায় কাটিয়া গিয়াছে! শেষে যেখানে যেখানে সন্দেহ হইয়াছে, লোকে সেই সেইখানেই এক একটা গম্বুজ খাড়া করিয়াছে। ইহারা কোথায়? ইহাদের সঙ্গে অজ্ঞাতকুলশীল, আরও কত সহস্র সহস্র কবিকুল কোথায়? ব্যাস বাল্মীকির কথা ছাড়িয়া দিই—তাহারা গৃহশূন্য, স্থান শূন্য—নিষ্কাম যোগী—মানুষের অগোচরে কোন্ ঘোর বনে দেহ-

ত্যাগ করিয়াছে। সেখানে শত মন্বন্তরের সহস্র সূর্য্য এক সঙ্গে উঠিয়াও একটা রশ্মিরেখার ভগ্নাংশও চালাইতে পারে নাই। তাদের কথা ছাড়িয়া দাও। বলি গ্রীক সরোবর কেলিহংস হোমর কোথায়? সাত সাতটা নগর আমার আমার করিয়া সমবেত বিদ্বজ্জনমণ্ডলী মধ্যে আজিও পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছে।

ফের বলি, তাহারা কোথায়? বাড়ী বাড়ী তত্ত্ব লও, ঘরে ঘরে সন্ধান কর, গৃহস্থের প্রতি হৃদয় তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, দেখিবে বাড়ী বাড়ী, ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শত সহস্র লক্ষ অগণ্য প্রকোষ্টে, শিরা ধমনীতে, শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে ঘর বাঁধিয়া বসিয়া আছে। বলি সেক্ষপিয়রের নাটমন্দির কয়জনে দেখিতে পায়? কিন্তু তুমি আমি কি সেই মহাকবিকে ইংলণ্ডের এভনতীর হইতে ধরিয়া আনিতে ভিটাচ্যুত করি নাই? সে মন্দির কি ভাবুক হৃদয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে ছাড়িয়াছে? কাল অনন্ত, পৃথ্বী বিপুলা মানব হৃদয়রাজ্য অবিনশ্বর, ভাব অক্ষয়— তবে যে জাতি সোণার দেহ পোড়াইয়া ভস্মকণা পর্য্যন্ত তটিনী-স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, যে জাতির এক একটা দিগ্‌গজ কবি অনেক মস্তিষ্ক ব্যয় করিয়া ভাল ভাল অলঙ্কার রচনা করিয়া ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহাকবিগণের মহা কাব্যাঙ্গে পরাইয়া দেয়; পরাইয়া আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দেয়, —সে জাতির জন্য, সে জাতির কল্পান্ত স্থায়ী ঋষিকুলের জন্য আবার ক্ষণবিধ্বংসী মাটীর কীর্ত্তিস্তম্ভ কেন? তাহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি দেখাইবার নিদর্শন রহিল না বলিয়া এত হায় হায় কেন? মায়াত্যাগী বীরকুলের প্রাণের জন্য এত মায়া কেন? আধুনিক বিজ্ঞের মত ধরিলে, ভগবদ্গীতা ব্যাসের নয়, প্রক্ষিপ্ত। তবে এমন সুন্দর ভগবদ্বাক্য ভারতের মুখে কে ফুটাইল? সেই মহাপ্রাণের অস্তিত্ব কোথায়? তবে এই যে সর্ব্বত্যাগী, মায়ামোহত্যাগী, গৃহত্যাগী, স্বাধীনতা-ত্যাগী জীবন-ভিক্ষু পরানুগ্রহভোগী আর্য্যমহাতরুর প্রকাণ্ড শাখায় কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা খেয়াল ফুটিল—ওঝার প্রেতাত্মা কীর্ত্তি ফণিনীর ফোঁস ফোঁস গর্জ্জনে কাতর হইল,—এটা কি বাঙ্গালী কবির অদৃষ্টের দোষ নয়? অদৃষ্ট, তোর সকল দোষ! তোর ক হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণমালায় অক্ষরে অক্ষরে দোষ। কেন সে অর্থ শম্ভুকে দেওয়া হইল না? তা হইলে ত আমাদের শম্ভু কবি হইত না।

অদৃষ্টের দোষে শম্ভু কবি হইলেন।

৯

শম্ভু কবি হইলেন। নায়ক নায়িকা আসিল—আসিয়া দেখিল শম্ভু গীতি কবিতা কাঁদিয়াছেন। তখন সে কবিতা গৃহে অনধিকার প্রবেশ হইবে বিবেচনায় আবার আসিব বলিয়া আশ্বাস দিয়া নাটক নভেলাদি তরণীগণ মধ্যে যেটা হ'ক একটাতে চাপিয়া ধান ভানিতে চলিয়া গেল। পথে অপোগণ্ড শিশু হইতে গলিতাঙ্গ, স্খলিতদন্ত বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সেই সকল নৌকা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। যাক্ সে কথা আর এখন নয়। শম্ভু এখন নায়ক নায়িকা-শূন্য ফুল কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

মাঝ হইতে একটা কথা কহিয়া যাই। শম্ভুর কবিতা-রসোদ্দীপিকা কে? আমি তুমি, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ—সকলেই বলিবে সুশীলা সুন্দরী। কিন্তু তাও কি কখন হয়? কবে কোথায় হইয়াছে?

রাধার নামে মুরলীধরের বেণু বাজিত, লছিমাদেবী পরমাণে বিদ্যাপতির বংশী মুখরিত। কবিতা কি অমনি আসে? কবিতা কি অমনি কেহ কখন আনিতে পারিয়াছে? নির্দ্দয় নরঘাতক দস্যু রত্নাকরের সেই রাম বলিতে অক্ষম মুখে 'মা নিষাদ' কে ফুটাইল? সেই নীরস, ভীষণ, অন্ধকারময় চোখে মন্দাকিনীর জল কে ঢালিল? সকলেই জানে? সে—ক্রৌঞ্চী। সেত বহুকালের কথা। ইতিহাস সেখানে পঁহুছিতে পারে নাই। অনুসন্ধিৎসা সেখানে আমল পায় নাই। পাইয়াছিল কিম্বদন্তী। কিম্বদন্তী বলে, সেটাত ব্যাধশরহত স্বামীর শোকে রোরুদ্যমানা, জ্ঞানশূন্যা ইতস্ততঃ উড্ডীনা ক্রৌঞ্চী। কিন্তু এ পোড়া ভারতের কিম্বদন্তী রাম জন্মিবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণের সৃষ্টি দেখিয়াছিল। বানরকে বেদ আওড়াইতে শুনিয়াছিল। কিম্বদন্তী ঠানদিদি দেখিয়াছে, রাবণ যখন রামের সহিত সারা দিন যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরিত, তখন রক্ষকুল-বধূ সকল আসিয়া তাহার অঙ্গসেবা করিত। কুড়িজনে কুড়িটা হাতে হাত বুলাইত, দশজনে দশটা মাথার পাকাচুল তুলিত, দুইজনে পা টিপিত। কোমল করস্পর্শে রক্ষেশ্বরের যখন ঘুম আসিত, যখন আবেশে কুড়িটা চক্ষু বুজিয়া যাইত, তখন দশটা নাসিকা-চলের বিংশতি গুহা হইতে সশব্দে বহির্গত প্রভঞ্জন সাগর ডিঙাইয়া কাল-বৈশাখী মূর্ত্তিতে গরীব বাঙ্গালীর ঘর দোর, আশা ভরসা সব ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু আমরা বলি, আবেশভরে রক্ষোরাজ একদিনের জন্যও কি পাশ ফিরে নাই? আর পাশ ফিরিতে সর্ব্বশেষের একদিকের মাথাটা কি আকাশে গিয়া ঠেকে নাই? তাহা হইলে অঙ্গবিলগ্না সুন্দরী সেই মাথার সঙ্গে উপরে উঠিয়া টাল খাইয়া মাটীতে পড়িয়া কি হাত, পা, মাথা, কিছুই ভাঙ্গে নাই? কিম্বদন্তী ঠাকুরাণী বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর গল্প করে, গজ কচ্ছপের যুদ্ধের সংবাদ দেয়, শুক শারীর কথা শুনিয়া কত রাজকুমার রাজকুমারীর বিবাহের ঘটক হয়। তুমি কি সকল কথা বিশ্বাস কর? তুমি কি বলিতে পার, ভুবনমোহন রূপরাশী লইয়া পাঞ্চালী আগুনের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল, অনলোদ্ভূতার রূপের টানে পৃথিবীর লোক দ্রুপদের দ্বারে হত্যা দিয়াছিল? তোমার গৃহিণীর আগুনের আঁচটী সয় না। আগুনের নামে তাঁর অম্লরোগের উৎপত্তি! ভয়ে তোমাকে ঋণ করিয়া রাঁধুনি রাখিতে হইয়াছে। তুমি কি এ কথায় বিশ্বাস করিবে? নিত্য রুগ্ন ভগ্নদেহে তুমি পাঁচসের তুলিতে হাঁপাইয়া যাও। আর অঞ্জনানন্দন মাথায় গন্ধমাদন, বগলে তপন ধরিয়া শ্রীরাম চরণে শরণ লইল। আরে ছি কিম্বদন্তী ঠাকুরাণী! এমন মিছা গল্পও করিতে হয়। তবে নাকি শোক হইতে শ্লোকের উৎপত্তি সেই জন্যই ধরিলাম, বাল্মীকির কবিতা-রসোদ্দীপিকা ক্রৌঞ্চী। তা না হইলে বলিতাম, নিষাদরূপী শমন-প্রহারে নষ্ট-স্বামিকা সুতরাং

য়োঙ্কস্তমানা, সরস্বতীরস্থ কোন অভাগিনী ভূমি সঞ্চরণশীলা ক্রৌঞ্চীর বিষাদ মলিন বদন দেখিয়া, বাল্মীকির হৃদয় কবাট খুলিয়া গিয়াছিল। ঈষদুন্মুক্ত বাতায়ন পথে বসিয়া শমনকে নিষাদ সম্বোধনে বাগীশ্বরী করুণ রাগিণীতে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। যাক্ সে কথাই না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু হায় এমন করিয়া কয়জনের কথা ছাড়িব? তাই বলিলাম বাল্মীকির কবিতারসোদ্দীপিকা ক্রৌঞ্চী।

ব্যাসের অরণি। সকলেই বলে এই অরণি গর্ভ হইতেই মহাযোগী শুকদেব সম্ভূত! কিন্তু অরণি একটা জড়পদার্থ! আমাদের বিস্ময় রাখি, স্থান কই!

তাহা হইলে লজ্জা সরম বিসর্জ্জিয়া, স্বর্গীয় প্রেমের দোহাই দিয়া তর্ক ছাড়িয়া বলিয়া যাই,—বাল্মীকির ক্রৌঞ্চী, ব্যাসের অরণি, কালিদাসের বিদ্যোত্তমার অলক্তক রাগ রঞ্জিত চরণ দুখানির স্বামীঅঙ্গস্পর্শ সুখ কুহরিতা শিঞ্জিনী, বিদ্যাপতির লছিমা রাণী, চণ্ডিদাসের রজকিনী, সেক্সপিয়রের ডেভনাণ্ট জননী, কাউপারের অনউইন্ গৃহিণী। আর কত বলিব? আর বড় বড় বৈষ্ণব কবির কোন নয় দুই একটা আখড়া বিহারিণী। সকলকারই এক একটা ইনী, কিন্তু কেহই ত নয় সহধর্ম্মিনী! তাহা হইলে শম্ভুর কিনী? আমরা বলিয়াছি শম্ভুর সেই সরলা পতিগতপ্রাণা ব্রাহ্মণী। বোধ তাই হইয়াছিল। তাহা না হইলে শম্ভুর কবিতা লইয়া বঙ্গরাজ্যে একটাও কথা নাই কেন? তার জন্য তার কবিতার পশার জমাইবার জন্য আমাদের এত ওকালতী কেন? ক্রমশঃ—

সমালোচনা।

বিদ্যাসাগর অর্থাৎ সমালোচনা সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী। শ্রীবিহারীলাল সরকার সঙ্কলিত। এতদিনের পর মহাত্মা বিদ্যাসাগরের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালীমাত্রেরই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। "যাঁহার করুণায় শত শত নিরন্ন নিরাশ্রয়, অন্নাশ্রয় পাইত, যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অগণিত অনাথ আতুর দীনহীন দুঃস্থ দরিদ্র অসহায় আত্মীয় নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত, যাঁহার জলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্তে অতি বড় কুপুত্রও অতুল মাতৃভক্তি শিক্ষা পাইত, যাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ, অকুণ্ঠিত নির্ভীকতা, অসীম কর্ত্তব্যপরায়ণতা," প্রভৃতি লোকবিস্ময়কর গুণগ্রাম দর্শনে বিদেশী প্রবাসী লোকেও ভক্তির সহিত মস্তক অবনত করিত, সেই মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? যিনি এরূপ মহাত্মার জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি মানবমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ক্ষণভঙ্গুর মানবজন্ম লাভ করিয়া অদম্য অধ্যবসায়, অটল সাহস ও অতিমানুষী প্রতিভার সাহায্যে যাঁহারা বিশ্বের বিশালরাজ্যে এক একটী প্রচণ্ড বিপ্লবের উদ্ভাবন পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলপন্থা সূচিত বা প্রসারিত করিয়া যান, তাঁহারা মানবমাত্রেরই আরাধ্য, তাঁহারাই প্রকৃত

বীর। সেরূপ বীরের জীবনী লোক-শিক্ষার প্রধানতম প্রকৃষ্ট উপায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাবত্তায় বঙ্গে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিতে না পারিলেও সাত্ত্বিক দয়া ও দাক্ষিণ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রূপে পূজিত হইবার উপযুক্ত। জগতের ইতিহাসে এরূপ দানবীরের সংখ্যা অধিক নহে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি উৎকৃষ্ট হৃদ্বৃত্তিনিচয়ের সহিত প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি বিদ্যাসাগরের জীবনে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, হিন্দুর এই অধঃপতি অবস্থায় হিন্দুস্থানে সেরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহাতেই মহাত্মা বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সরকার দয়া ও প্রতিভার অবতার এই মহাপুরুষের জীবনী সঙ্কলন করিয়া দেশের এক মহোপকার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়—অনুষ্ঠান শ্লাঘনীয়। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, আজি পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কয়েকখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, এখানি তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কি রচনার পারিপাট্য, কি বিষয়ের প্রতিপত্তি, কি ভাবের স্ফূর্ত্তি সাধন সকল বিষয়েই তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল রচনা আবেগময়ী, প্রণালী সুব্যবস্থিত।

যে সকল অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনা স্রোতের ঘূর্ণীপাকে পতিত হইয়া বিদ্যাসাগর স্বীয় অদম্য অধ্যবসায় ও অটল সাহসে সংসার সিন্ধুর বেলাসৈকতে শ্রীচরণাঙ্ক পাষাণরেখায় অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন, বিহারী বাবু তন্ন তন্ন করিয়া নিরপেক্ষভাবে সেই সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। আমরা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম তাঁহার সেই পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি তিনি নীরোগ শরীর হইয়া অল্পদিনের মধ্যে এই গ্রন্থের সুসংস্কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করুন। গ্রন্থের কলেবর বৃহৎ, কিন্তু মূল্য খুব কম, সুতরাং সকলের পক্ষেই সুলভ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের ন্যায় সেই মহাপুরুষের এই অপূর্ব্ব জীবনচরিত বঙ্গের গৃহে গৃহে পঠিত হউক।

প্রতিধ্বনি—ইহা একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার কলেবর ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রতিমাসে অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। প্রতিধ্বনির প্রথমাংশে নূতন নূতন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, অপরাংশে বর্ত্তমান বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা সমূহ হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে। প্রতিধ্বনিতে প্রতিমাসে যে সকল নূতন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সকল প্রবন্ধে লেখকের গভীর গবেষণা ও নিরপেক্ষ বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সাময়িক পত্রিকাপুঞ্জের এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিধ্বনি দীর্ঘজীবন লাভ করুক, ইহা আমাদের কামনা।

আয়ুর্ব্বেদ।

বিসর্প *।

রক্ত, লসিকা, ত্বক ও মাংস দূষিত হইয়া শরীরের স্থানে স্থানে যে প্রদাহ উদ্ভূত ও সত্বর নানাদিকে বিস্তৃত হয় তাহা বিসর্প নামে অভিহিত।

প্রকার।

বিসর্পঃ সপ্তধা জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ।

এই রোগ সর্ব্বাঙ্গে বিসর্পিত অর্থাৎ বিস্তৃত হয় বলিয়া ইহা বিসর্প নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহা সাত প্রকার।

বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ।
চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দজাস্ত্রয়ঃ॥
আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যঃ কফবাতজঃ।
যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ॥

অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বাতপৈত্তিক বাতশ্লৈষ্মিক এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক। ইহাদের মধ্যে বাতপৈত্তিক বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লৈষ্মিক বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে। কিন্তু অল্প কথায় বিসর্প সহজাত ও ক্ষতজ এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

এই রোগ অতিশয় সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক। বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি ভয়াবহ পীড়া সকল যেমন বৈশেষিক বিষ বীজ হইতে উদ্ভূত হয়, অনেকে বিসর্পেরও সেইরূপ বৈশেষিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু এই মত অদ্যাপি সকলে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

নিদান।

রক্তং লসীকা ত্বঙমাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়োমলাঃ।
বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ হেতবঃ সপ্তধাতবঃ॥

রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংস এই চারিটী দূষ্য পদার্থ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ, যুগপৎ বিকৃত হইয়া বিসর্প রোগ উৎপাদন করে। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে সেবন করিলে বাতাদি দোষের প্রকোপ হইয়া বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়। সংক্রামণ, আঘাত, জলবায়ুর দূষিত অবস্থা, উৎকট আর্দ্রতা, শৈত্য ও উত্তাপ, এক গৃহে একত্রে বহুলোকের স্থিতি, সর্ব্বপ্রকার মল দূষিত খাদ্য ও পানীয় জল ইহার কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণ।

এই রোগে শরীর তাপ প্রায় সমানই রহিয়া যায়; কখন কখন তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

---

* বিসর্পকে ইংরাজিতে এরিসিপেলস্ (Erysipe'as) কহে।

নাড়ী দ্রুত এবং প্রায়ই কোমল ও নমনীয় দেখা যায়; সময়ে সময়ে তাহা দ্বিঘাত এবং ক্ষণবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে রোগীকে প্রায়ই শিরঃপীড়া ও অনিদ্রায় কাতর হইতে দেখা যায়। সেই সময়ে কখন কখন প্রলাপ হইয়া থাকে। তাহার ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণা ও বিবমিষা বৃদ্ধি পায়, কখন কখন বমন হইতে থাকে। সে প্রায়ই অতিসারে কষ্ট পায়; তাহার মলে উৎকট দুর্গন্ধ। মূত্র অতি অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।

বাতিক বিসর্প।

তত্র বাতাৎ পরীসর্পো বাতজ্বর সমব্যথঃ।
শোথস্ফুরণ নিস্তোদভেদায়ামার্ত্তিহর্ষবান্॥

বায়ু জন্য বিসর্পে বাতিক জ্বরের ন্যায় মস্তক, হৃদয়, গাত্র ও উদর এই সকল স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ, এবং শোথ, স্ফুরণ, লোমহর্ষ এবং সূচীবেধবৎ, বিদারণবৎ ও আকর্ষণবৎ যাতনা উপস্থিত হয়।

পৈত্তিক।

পিত্তাদ্ দ্রুতগতি: পিত্তজ্বরলিঙ্গো ঽতিলোহিতঃ।

পিত্তজন্য বিসর্প অতি লোহিত বর্ণ এবং শীঘ্র প্রসরণশীল। ইহাতে পিত্তজ্বরের সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক।

কফাৎ কণ্ডুযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্।

শ্লৈষ্মিক বিসর্প কণ্ডুবিশিষ্ট, চিক্কণ এবং কফজ্বরের সমস্ত লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক।

সন্নিপাত সমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গসমন্বিতঃ।

সান্নিপাতিক বিসর্পে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণ মিলিত ভাবে একত্রে উদ্ভূত হয়।

বাতপৈত্তিক।

বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারতৃড্‌ভ্রমৈঃ।
অস্থিভেদাগ্নি সদনতমকারোচকৈর্যুতঃ॥
করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ॥

বাতপৈত্তিক বিসর্পে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা অতিশয় তৃষ্ণা, ভ্রম, অস্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই রোগে সমস্ত অঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা আকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প দেহের যে যে স্থানে বিসর্পিত হয়, সেই স্থান নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ, কিংবা রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে। অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে যেরূপ স্ফোটক সমূহ উত্থিত হয়, ইহাতে সেই রূপ হইতে দেখা যায়।

এই প্রকার বিসর্প দ্রুতবেগে হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মস্থান আক্রমণ করে। বায়ু অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠে। দারুণ অঙ্গবেদনা, চেতনালোপ, নিদ্রানাশ, শ্বাস, হিক্কা এই সকল উপদ্রব আসিয়া দেখা দেয়। রোগী কোন প্রকারেই ক্ষণকালের নিমিত্তও কিঞ্চিৎ আরাম পায় না। ভূমি-শয্যা প্রভৃতিতে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। এইরূপ ক্রমাগত নানা অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া সকল ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পায়। এই রূপ বিসর্প অগ্নিবিসর্প নামে অভিহিত।

বাতশ্লৈষ্মিক।

কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্ত্বা তং বহুধা কফম্।
রক্তং বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্‌শিরা স্নায়ুমাংসগম্॥
দূষয়িত্বা তু দীর্ঘাণু বৃত্তস্থূলখরাত্মনাম।
গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং রক্তানাং তীব্ররুগ্‌জ্বরাম্॥

কফরুদ্ধ বায়ু কফকে বহুধা ভেদ করিয়া এবং রক্তাধিক্য থাকিলে ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকেও দূষিত করিয়া দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, বর্ত্তুলাকার, স্থূল ও কঠিন রক্তবর্ণ গ্রন্থিশ্রেণী উৎপাদন করে। ইহাতে অতিশয় বেদনা, প্রবলজ্বর, শ্বাস, কাস, অতিশয়, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, বিভ্রান্তচিত্ততা, মূর্চ্ছা, বিবর্ণতা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। ইহার নাম গ্রন্থি বিসর্প। ইহা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক।

কফপিত্তাজ্জ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজা।
অঙ্গাবসাদবিক্ষেপৌ প্রলাপারোচকভ্রমাঃ॥

পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পে জ্বর, দেহের স্তব্ধতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মস্তক-বেদনা, অঙ্গের অবসন্নতা, আক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে বিদারণবৎ পীড়া, পিপাসা, ইন্দ্রিয়গুরুতা, আমপুরীষ নির্গম এবং স্রোতঃ সকলের লিপ্ততা, এই সকল লক্ষণ উদ্ভূত হয়। এই প্রকার বিসর্প প্রায়ই আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া এক দেশবিসর্পী হইয়া থাকে। ইহা পীত, লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ, পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শোথযুক্ত গুরু এবং অতিশয় তাপবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা প্রথমে অন্তর্ভাগে থাকে। স্পর্শ করিলে আর্দ্রও বিদীর্ণ হয়। ইহা পঙ্কের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও গলিত মাংস হইয়া ক্রমশঃ স্নায়ু ও শিরাসমূহকে আক্রমণ করে এবং সর্ব্বশরীরকে শবগন্ধযুক্ত করিয়া ফেলে। ইহাকে কর্দ্দম বিসর্প কহে।

ক্ষতজ।

বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ সরক্তং পিত্তমীরয়ন্।
বিসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থ সদৃশৈশ্চিতম্।
স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজাদাহাঢ্যং শ্যাবশোণিতম্।

শস্ত্রপ্রহার এবং হিংস্র জন্তুর দন্ত ও নখাদির আঘাত প্রভৃতি আগন্তুক কারণ দ্বারা ক্ষত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করে, তাহাতে কুলত্থ কলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত বিসর্প উৎপন্ন হয়। আক্রান্ত স্থানের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং শোথ, জ্বর, বেদনা ও দাহ এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

উপদ্রব।

জ্বরাতিসারৌ বমথুস্ত্বঙ্মাংসদরণক্লমা।
অরোচকাবিপাকৌ চ বিসর্পাণামুপদ্রবাঃ॥

জ্বর, অতিসার, বমি, ত্বক্ ও মাংসের বিদারণ, ক্লান্তি, অরুচি ও ভুক্তান্নের অপরিপাক এইগুলি বিসর্পের উপদ্রব।

ভাবী ফল।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প সাধ্য। সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। পৈত্তিক বিসর্পে রোগী কজ্জল-বর্ণ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। মর্ম্ম-স্থানজাত সকল প্রকার বিসর্পই অসাধ্য।

চিকিৎসা।

সাধ্যা বিসর্পাস্ত্রয় আদিতো যে
ন সন্নিপাতক্ষতজো হি সাধ্যৌ।
সাধ্যেষু তৎপথ্য গণৈর্বিদধ্যাদ্
ঘৃতানি সেকাংশ্চ তথোপ দেহান্॥

পূর্ব্বে বলা হইল যে, এক দোষজ বিসর্প সাধ্য এবং সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। সাধ্য বিসর্প সমূহে তত্তৎ প্রশমক দ্রব্য সমুদায়ের প্রলেপ তদ্‌যুক্ত সেচন ও তৎপ্রস্তুত ঘৃত প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

বিসর্প রোগের প্রথমাবস্থায় দোষানুসারে বিরেচন, বমন লেপন, সেচন ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা।
ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ॥

বায়ুজ বিসর্পে রাস্না, নীলোৎপলের মূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

কসেরু শৃঙ্গাটক পদ্ম গুন্দ্রৈঃ
সশৈবলৈঃ সোৎপল কর্দ্দমৈশ্চ।
বস্ত্রান্তরৈঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে
লেপো বিধেয়ঃ সঘৃতঃ সুশীতঃ॥

পৈত্তিক বিসর্পে কেশুর, পানিফল, পদ্মমূল, শরমূল, শৈবাল, সুন্দিমূল ও কর্দ্দম এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দিত ও বস্ত্রের অভ্যন্তরস্থ করিয়া প্রলেপরূপে সংযোজিত করিয়া রাখিবে।

ত্রিফলা পদ্মকোশীর সমঙ্গা করবীরকম্।
নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পাক॥

শ্লৈষ্মিক বিসর্পে হরীতকী, আমলা বহেড়া, বেণারমূল, লজ্জালু, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

দোষসম্মিলনাজ্জাতে পরীসর্পে ভিষক্ ক্রিয়াম্।
তত্তদ্দোষপ্রশমনীং যুক্ত্যা বুদ্ধ্যাথচারয়েৎ॥

দোষসম্মিলন হইতে উদ্ভূত বিসর্পে যুক্তি অনুসারে বিবেচনা করিয়া তত্তদ্দোষনাশক চিকিৎসা করিবে।

পরিষেক প্রলেপশ্চ শস্যতে পঞ্চবল্কলৈঃ।
পদ্মকোশীরমধুকৈঃ সর্ব্বত্রাপি চ চন্দনৈঃ॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই সকলের অথবা পঞ্চ বল্কলের প্রলেপ ও সেচন সকল বিসর্পেই হিতজনক।

ভূনিম্ব বাসা কটুকা পটোলী
ফলত্রয়ৈশ্চন্দন নিম্বকৈশ্চ।
বিসর্পদাহ জ্বর শোথকণ্ডু
বিস্ফোট-তৃষ্ণা-বমিহৃৎ কষায়ঃ॥

চিরতা, বাকসছাল, কট্‌কী, ঝিঙ্গার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল এই সকলের কাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডূ, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা ও বমির শান্তি হয়।

কুষ্ঠাময় স্ফোট-মসূরিকোক্ত
চিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্ বিসর্পান্।
সর্ব্বান্ বিপক্কান্ পরিশোধ্য ধীমান্।
ব্রণক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্॥

বিসর্পরোগে কুষ্ঠ, স্ফোটক ও মসূরিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পাকিলে শোধনক্রিয়া করিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

পথ্যাপথ্য।

তিক্ত বর্গো হ্যখিলশ্চৈব পানান্নমবি দাহকৃৎ।
দ্রব্যং শোণিতসং শুদ্ধিকরং চন্দনলেপনম্॥
অনুদ্বেগকরং কর্ম্ম বিসর্পে পরমং হিতম্।
বিপরীতং বিজানীয়াৎ ক্লেশদং গদবৃদ্ধিকৃৎ॥

বিসর্পরোগে সমস্ত তিক্ত দ্রব্য, অবিদাহক অন্ন ও পানীয়, শোণিত-বিশোষক দ্রব্য, আক্রান্ত স্থান সকলে ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন লেপন এবং অনুদ্বেগজনক কর্ম্ম হিতকর। ইহার বিপরীত ক্লেশপ্রদ ও পীড়াবর্দ্ধক।

ভৈষজ্য তত্ত্ব।

অশ্বগন্ধা।

(Withania Somriofera)

পর্য্যায়।

গন্ধান্তা বাজি নামাদি হ্যগন্ধা হয়াহ্বয়া।
বারাহকর্ণী বরদা বদরী কুষ্ঠগন্ধিনী॥

এতদ্ব্যতীত ইহার আরও অনেকগুলি নাম দেখা যায়, যথা, হয়গন্ধা, বল্যা, তুরগগন্ধা, কঞ্চুকা, অশ্বাবরোহিকা, কম্বুকাষ্ঠা, অবরোহিকা, তুরগী, বনজা, বাজিনী, হয়া, পুষ্টিদা, বলকা, পুষ্টি, পীবরা, পলাশপর্ণী, বাতঘ্নী, শ্যামলা, কামরূপিণী, কালা, প্রিয়করী, গন্ধপত্রী হরপ্রিয়া, বারাহপত্রী।

গুণ।

অশ্বগন্ধা নিলশ্লেষ্মশ্বিত্র শোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্তা কষায়োষ্ণা তি শুক্রলা।

অর্থাৎ ইহার আস্বাদন তিক্ত ও কষায় এবং ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বিত্র, শোথ, কাস, শ্বাস, ব্রণ, জরা, ও ক্ষয় নাশ করে; ইহা বলকারক, রসায়ন ও শুক্রবর্দ্ধক।

উৎপত্তিস্থান। ভারতবর্ষের সকল শুষ্ক প্রদেশে ইহা উদ্ভূত হয়; বঙ্গদেশে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

অশ্বগন্ধার মূল দীর্ঘ, পীন, ও মসৃণ; ইহার বর্ণ বহির্ভাগে পাটল, অভ্যন্তরে শ্বেত। কথিত আছে, ইহার মূলে অশ্বের গন্ধ পাওয়া যায়, সেইজন্য ইহা অশ্বগন্ধা নামে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল বৃক্ষে সেরূপ গন্ধ পাওয়া যায় না।

আময়িক ক্রিয়া—ইহার মূল ও শাখাদি সমস্তই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্র কবোষ্ণ এরণ্ড তৈলে সিক্ত করিয়া দুষ্টব্রণে সংলগ্ন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহার বীজ মূত্রকারক ও বেদনাহারক, মূলেরও এইরূপ গুণ বর্ণিত আছে, রাজপুতগণ অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া অজীর্ণ ও বাতরোগে বাহ্য প্রলেপরূপে ব্যবহার করিয়া

থাকে। বাত, ব্রণ, শ্বিত্র ও শোথরোগে ইহার মূল ও শাখাদি বাহ্য প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়, শ্লেষ্মা, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় পীড়ায় ইহার অরিষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জরাজন্য ক্ষয় ও দৌর্ব্বল্য নাশার্থ ইহার অরিষ্ট বিশেষ উপকারী। কেহ কেহ বলেন, সমস্ত গুল্মটী কুট্টিত করিয়া তাহার রস এক বা দুই" আউন্স পরিমাণে সেবন করিলে বাতরোগ হইতেনিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়।

অন্যান্য। বঙ্গেপ্রদেশে দুধ জমাই-বার নিমিত্ত ইহার বীজ ব্যবহার করিয়া থাকে। পঞ্জাব ও সিন্ধুরাজ্যে দুষ্টা রমণী-গণ ইহার মূল দ্বারা গর্ভপাত করে।

অপামার্গ।

(আপাঙ)

Achyran this Aspera.

পর্য্যায়ঃ

শৈবরিক, ধামার্গব, ময়ূরক, প্রত্যক্-পর্ণী, ক্ষীশপর্ণী, কিণিহী, খরমঞ্জরী অধামার্গর, কেশপর্ণী, স্থূল মঙ্গরী, প্রত্য-কপুর্ণী, ক্ষারমধ্য, অধোঘণ্টা, শিখরী, দুর্গ্রহ, অধসল্য, কার্ত্তীরক, মর্কটী, দুর-ভিগ্রহ, বাশির, পরাক্পুষ্পী, কণ্টী মর্কট পিপ্‌পালী, কটুমঞ্জরিকা, অথাট, ক্ষরক, পাণ্ডুকঞ্চক, নালীকণ্ট ও কুব্জ।

গুণ।

ইহা তিক্ত, উষ্ণ ও কটু। কফ, অর্শ, কন্ডু, উদরাময় ও বিষরোগ নাশক। ধারক, বমণকারক, বায়ুজ্বর, গর্ভপাত-কারী বিষ্টম্ভী ও রক্ত পিত্তনাশক।

উৎপত্তিস্থান।—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহা পাওয়া যায়।

আময়িক প্রয়োগ।—অপামার্গের মূল, বল্কল ও পত্রাদি সমস্তই ধারক ও মূত্রকারক অতিসার, প্রবাহিকা ও আর্ত্ত-বাধিক্যে ইহার প্রয়োগে সুফল লাভ হয়। শোথ ও উদরীরোগে ইহার কাথ বিশেষ উপকারী, কেননা ইহা মূত্র বৃদ্ধি করিয়া শরীরের জলীয় অংশ কমাইয়া দেয়।

পত্র ও বীজ।—ইহার পত্র ও বীজ শান্তিকর, জলতঙ্ক রোগে ও সর্পদংশনে প্রযুক্ত হয়। ইহার মঞ্জরি পেষণ করিলে যে রস নির্গত হয়, বৃশ্চিক দংশনে তাহা অনেকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। স্ফোটক ও বক্ষবাত জনিত বেদনা ইহার পত্র বীজ নাশ করে। দন্তশূলে ফলগুলির রস প্রয়োগ করিলে বেদনার উপশম হয়। শ্বাস পীড়ায় শুষ্ক পত্রের ধূম পান বিহিত এবং উদরী-গ্রস্ত রোগীকে তাহা বাঁটিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার কচিপাতা, মরিচ ও রসুন একত্রে বাঁটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিলে তাহা উৎকৃষ্ট পর্য্যায়নিবা-রক; জ্বরাগমের পূর্ব্বে তাহা ব্যবহার করিলে অনেকস্থলে সুফল পাওয়া যায়, ইহার কচিপাতা, ননি ও মিছরি একত্রে বাঁটিয়া তরুণ আমাশয় পীড়ায় উপশম হইয়া থাকে। পাতার রস রৌদ্রে শুকা-ইয়া একটু ঘন হইলে তাহার সহিত অহিফেন মিশাইয়া উপদংশের প্রাথমিক ক্ষতে প্রয়োগ করিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

৩য় খণ্ড। } ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬। ফাল্গুন ১৩০২। { ২য় সংখ্যা।

লেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী। শ্রীযুক্ত হরি সাধন মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতি ফুলকুমারী বসু। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত * * *

শ্রীযুক্ত রমেশ্চন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন এবং সম্পাদক প্রভৃতি—

সূচীপত্র।

মূল্য ৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শুভদিনে শুভক্ষণে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর শুভাগমনে সহকারতরুর সদ্য মুকুলগন্ধ অঙ্গে মাখিয়া "সমীরণ" সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে তৃতীয় বৎসরের ভেরী নিনাদিত করিল। দ্বিতীয় বর্ষাবসানের পর সমীরণের পুনঃ প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া অনেকে ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত আমাদিগকে অনুমান দশসহস্র পোষ্টকার্ড খরচ করিতে হইয়াছে। আজি তাহা সার্থক হইল।

কৈফিয়ৎ।

গত আশ্বিনমাসে সমীরণের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, তবে এ বিলম্ব কিসের জন্য?—এই কৈফিয়ৎ প্রায় সকল গ্রাহককেই মাসে দুই তিনবার করিয়া দিতে হইয়াছে। আজি আবার তাহা সকলের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল। পাঠক! বলুন দেখি, প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে—মহাকালের অনন্ত আকাশপথে কোন্ সময়ে সমীরণের প্রথম সৃষ্টি? বসন্তের প্রারম্ভে না হেমন্তের উদয়ারম্ভে? আপনি বলিবেন, বসন্তের প্রারম্ভে।

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে॥"

অমর কবি জয়দেবের এই গীতির কি অর্থ খুলিয়া বলিতে হইবে? কোকিলকূজন, মধুকর গুঞ্জন ও মলয় সমীর নিত্য সহচর। সুতরাং বসন্তের প্রারম্ভ ভিন্ন অন্য সময়ে সমীরণের উৎপত্তি সাধন করিয়া না বুঝিয়া আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার দোষে দোষী হইয়াছিলাম, এতদিনে তাহার সংশোধন করিলাম। এক্ষণে "সমীরণ" নাম কালানুমোদিত হইল,—সার্থক হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আয়োজন।

তৃতীয় বৎসরের জন্য সমীরণের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। বঙ্গের যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শনের মধুময় বসন্তে তাহাদের মধুরতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিমাসেই সমীরণের সৌষ্টব সাধন করিবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

৩য় খণ্ড। সন ১৩০২ সাল। ২য় সংখ্যা।

শ্রীমদ্রূপ সনাতন।

(প্রয়াগে শ্রীরূপ-শিক্ষা।)

শ্রীরূপ কনিষ্ঠভ্রাতা অনুপমের সহিত গৃহত্যাগ করিলেন; একথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

যখন কোন প্রেমোন্মাদিনী রমণী কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পথে বাহির হয়, যখন উদ্ভ্রান্ত চিত্তে ভ্রমিতে থাকে, তখন তাহার যেরূপ অবস্থা ঘটে, শ্রীরূপের তখনকার অবস্থা তদ্রূপ। তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্য কিছু নাই, স্নানাহারের নিয়ম নাই, দেহে আস্থা নাই, বহির্জ্জগতে দৃষ্টি মাত্র নাই। তখন তাঁহার একচিন্তা,—মহাপ্রভুর সহিত কি সম্মিলিত হইতে পারিবেন? তখন তাঁহার এক ধ্যান—শ্রীমহাপ্রভু কি তাঁহাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন? শ্রীরূপের চিত্তে তখন আর কোন দেবতার স্থান ছিল না, শ্রীরূপের চিত্ত বিত্ত তখন শ্রীচৈতন্যের অধিকৃত।

সম্ভোগে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা,—সম্মিলনে ইহার সন্তৃপ্তি। ভজন সাধন কি? ভজন সাধন অন্য কিছু নহে, ইহাই ভজন সাধনের মূল। ভগবানে একান্ত অনুরাগ এবং তাঁহার সহিত সম্মিলনের অনন্যমুখী চেষ্টাই ভজন সাধন। সম্মিলনে চেষ্টারাহিত্য বা সিদ্ধি।

শ্রীরূপের এই যে গৌরাঙ্গ ভজন, ইহার ফলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিল; অচিরেই তিনি তাঁহার অভীপ্সিত দেবতার সহিত সম্মিলিত হইলেন।

শ্রীমহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিতেছিলেন; তখন তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হইয়াছেন। সমস্ত প্রয়াগ তখন উন্মত্ত, প্রভু প্রদত্ত প্রেম-প্রবাহে আপ্লাবিত। যেখানে যাও, উচ্চৈঃ হরিধ্বনি বা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বই শুনিতে পাইবে না।

শ্রীরূপ প্রয়াগে পৌঁছিয়াই বুঝিতে পারিলেন, প্রয়াগের এরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের হেতু, তাঁহার চিরাভীষ্ট গৌর সন্ন্যাসী ব্যতিত অপর কিছু নহে। অনতিবিলম্বে শ্রীরূপ সে সংবাদ শুনিতে পাইলেন।

শ্রীরূপের হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল! কেন? ভয় কি গোঁসাই! যাঁর তরে ঐশ্বর্য্য সম্পদ, বিলাস বৈভব ত্যাগ

করিয়াছ, যাঁর তরে মান সম্ভ্রম পায়ে ঠেলিয়াছ, যাঁর তরে কায়িক শত ক্লেশকেও ক্লেশ গণ্য কর নাই, তাঁর সহিত আজ মিলিবে, তবে বিশ্বস্ত হৃদয়ে দুরু দুরু ধ্বনি কেন?

ইহা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য কি ভয় নহে। ইহা প্রেমের একটী অবান্তর অবস্থা, প্রেমের ভাষায় ইহা ব্যভিচারী লক্ষণ। ইহাতে প্রণয়াস্পদের প্রীতি পরিমাণ পরিজ্ঞাত হইতে পারে। আরও কত কি অনুভূত হইতে পারে, তাহা বলিয়া বুঝানর অপেক্ষা অনুভবই ভাল। যা'হোক এই অবস্থায় সভ্রাত শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

মহাপ্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে গিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোক, প্রবাহের ন্যায় তাঁহার দর্শনে, তাঁহার সহিত মিলিতেছে। সহস্র সহস্র নর নারী প্রেম বিগলিত চিত্তে হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রেমোচ্ছাসে নগর টলমলায়মান। কেহ কেহ কান্দিতেছে, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে, কাহারও বা বিভিন্ন রূপ প্রেমবিকার প্রাদুর্ভূত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

"গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে"

শ্রীরূপ ও অনুপম এই লোক প্রবাহ ভেদ করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা দূরে থাকিয়া "প্রভুর মহিমা দেখি" চমৎকৃত হইতেছেন। তাঁহারই অঙ্গুলী সঙ্কেতে লক্ষ লক্ষ লোক যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে, রূপানুপম তাহাই দেখিতেছেন। এই ভিড়ের মধ্য হইতে, একটী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে আপন আলয়ে লইয়া গেল; কীর্ত্তন কোলাহল নিবৃত্ত হইল।

শ্রীরূপ ও অনুপম ধীরে ধীরে বিপ্র গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরূপের চক্ষে ধারা বহিতেছে; ভাবিতেছেন—'প্রভুর কি দয়া! আমি পশু হইতেও অধম, প্রকৃতি পশুবৎ, কিন্তু তিনি ত দর্শন দিলেন? দয়াময় ত বঞ্চিত করিলেন না?' দৈন্য, জীবন দুই ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করিলেন, এবং সেই অবস্থায় প্রভুর চরণোদ্দেশে ভূমে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। প্রভুকে ছুইতেছেন না, ভাবিতেছেন,—তাঁহারা ম্লেচ্ছ সেবী, পতিত—তাঁহারা পাপী। কিন্তু তখনই আবার প্রেমে প্রকম্পিত হইতেছেন, অঙ্গে নানাবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। প্রভু কি আর বসিয়া থাকিতে পারেন?—উঠিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তিনি তাঁহাদের মনভাব অবগত হইয়া নিম্নোক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন।—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্ত শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচপূজ্যো যথাহ্যহং।"

অর্থাৎ ভক্তি বর্জ্জিত চতুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতও আমার ভক্ত নহে, কিন্তু ভক্তিযুক্ত হইলে চণ্ডালও আমার প্রিয় হয়। এরূপ ভক্তকেই দান কর উচিত এবং তাহার দানই গ্রাহ্য; এরূপ ভক্ত আমারই ন্যায় পূজ্য।

প্রভু আরো বলিলেন—

"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয় কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজন॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীরূপ মনে ভাবিতেছেন—'আর আচ্ছাদন কেন, তুমি কি লুকাইবার বস্তু?' কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, তবে করযোড়ে স্বকৃত শ্লোকে তিনি যে স্তুতি করিতে

লাগিলেন, তাহাতেই তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ পাইল। শ্রীরূপ পুনঃ প্রণাম করিলেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

মহাপ্রভু সহাস্যে তাঁহাকে নিকটে আনিয়া বসাইলেন ও সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ কহিলেন—"তিনি রাজ দ্বারে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, আপনি উদ্ধার করিলেই মুক্ত হন। মহাপ্রভুর চারুবদনে আবার হাস্য-কুসুম বিকশিত হইল, তিনি কহিলেন—"সনাতন মুক্ত হইয়াছেন, শীঘ্রই আমাদের সহ সম্মিলিত হইবেন।" শ্রীরূপ আনন্দিত হইলেন। পরমানন্দে সে দিবস সকলে তথায়ই রহিলেন। ইহাই শ্রীরূপের সম্মিলন, এই উপলক্ষেই কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন—

"যঃ প্রাগেব প্রিয় গুণ গণৈর্গাঢ় বদ্ধোপি মুক্তো.
গেহাধ্যা সান্দ্রস ইব পরমূর্ত্ত এবাপ্য মূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈ দৃঢ়তর পরিস্বঙ্গ রঙ্গৈ প্রয়াগে,
তং শ্রীরূপং মমনুপমে নানুজ গুহদেব॥"

প্রেমদাসের অনুবাদ—

"পূর্ব্ব হৈতে বদ্ধ হন প্রিয়গুণ গণে।
গেহাধ্যাস হৈতে তভু বিমুক্ত হইয়া।
প্রভু পাদ-পদ্মে আইলা সানুরাগ হঞা॥
রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-রস যদ্যপি অমূর্ত্ত।
শ্রীরূপ গোসাঞি রূপে তিহো হৈলা মূর্ত্ত॥
দেখি প্রভু প্রেম পূর্ব্ব আলাপ করিলা।
বাহু প্রসারিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥"

বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বল্লভী সম্প্রদায়ের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, ইহাঁরা বালগোপাল উপাসক। ইহাঁদের আদি প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য। বল্লভাচার্য্য পরম জ্ঞানী ও ভক্তিমান ব্যক্তি। বল্লভ অম্বুলীতে থাকেন। মহাপ্রভুর মহিমা শুনিয়া তিনি প্রয়াগে আসিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। "জহুরীই রত্ন চিনে," নবীনসন্ন্যাসীটিকে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ বস্তুটী সামান্য নহে। এত বড় প্রবীন ধর্ম্মাচার্য্যের মস্তক আপনাআপনি ভূমে অবনত হইয়া পড়িল, মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন ও আলিঙ্গন করিলেন। ভগবৎ প্রসঙ্গে উভয়ে নানা কথা হইতে লাগিল, কথা কহিতে কহিতে প্রেমে ক্ষণে ক্ষণে প্রভুর অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু বল্লভভট্ট জ্ঞানাভিমানী, তাই প্রভু প্রেমবেগ যথামতি সম্বরণ করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণধী ভট্ট এই ভাব বিলোকনে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

প্রভু রূপানুপমকে আচার্য্যের সহিত মিলাইয়া দিলেন, ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দিতে গেলে, তাঁহারা "ছুইবেন না—আমরা পতিত," বলিয়া দূরে সরিয়া পড়িলেন। দুই ভাইয়ের এতাদৃশ নম্রতা ও নিরভিমান ব্যবহারে ভট্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রভুও মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কৌলীন্যাভিমানী ভট্টের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "ইহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না, ইহারা পতিত নীচ; আপনি পরম যাজ্ঞিক ও কুলীন।" ভট্ট এই কথাটীতে প্রভুর "কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী" আছে জানিয়া উত্তর করিলেন "এ দুজনার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণ ধ্বনি হইতেছে, ইহাঁরা অধম নহে, উত্তম। শাস্ত্র বলেন

অহোবত শ্বপচোদৃতো গরীয়ান,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপ স্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ,
ব্রহ্মানুচূর্ণাম শৃণন্তি যে তে।”

অর্থাৎ যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত তপস্যা করেন, হোম করেন, এবং তীর্থস্নান করেন।

প্রভু বলিয়া উঠিলেন “সত্য, সত্য, লোকলোচন-রঞ্জনার্থ জীবন বিহীন প্রতিমাকে বিভূষিত করা যেমন বৃথা, ভগবদ্ভক্তি বিহীন জনের সৎকুলে জন্ম, শাস্ত্র জ্ঞান এবং জপ তপ তদ্রূপই অকর্ম্মণ্য। কিন্তু ভক্তির প্রদীপ্ত তেজে যাহার জন্মজনিত দোষ তিরোহিত হইয়াছে, বেদজ্ঞ নাস্তিক হইতেও সেই নির্ম্মল হৃদয় চণ্ডালই পণ্ডিত-শ্লাঘ্য।”

কথাবার্ত্তার পর বল্লভভট্ট সগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। একখানি নৌকা যোগে সকলকে বাড়ী লইয়া চলিলেন। অম্বুলী (আড়াইল) যমুনাতীরে অবস্থিত, যমুনাবক্ষে নৌকা, তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিল। যমুনার সুচিক্কণ শ্যামল বারিধারা দর্শনে প্রভুর মনে কৃষ্ণোদ্দীপন হইল, তিনি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সকলে বাড়ী পৌছিলেন। বাড়ী গেলেও প্রভুর সে বিহ্বলতা গেল না। আবার নানা স্থান হইতে প্রভুর দর্শনে লোকশ্রেণী আসিতে লাগিল। এই অবস্থায় কোন দিন প্রভু, কৃষ্ণভ্রমে কৃষ্ণবিরহে যমুনার নীলজলে ঝাপ দেন, সকলের মনে এই ভয় জন্মিল। এমন একবার হইয়াও ছিল। অতএব ভট্ট, সশঙ্কিত চিত্তে পুনরায় প্রভুকে প্রয়াগে রাখিয়া আসিলেন।

ত্রিবেণীর উপরেই শ্রীমহাপ্রভুর জন্য বাসস্থান নিদৃষ্ট হইয়াছিল; শ্রীরূপ ও অনুপমও প্রভুর গৃহ পার্শ্বেই থাকিবার স্থান পাইয়াছিলেন। এইখানে প্রভু দশ দিন যাবৎ শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেন। শ্রীরূপ, শিক্ষার (ভক্তি তত্ত্বের) স্থূল তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

প্রভু বলিলেন—

“সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ” এই শ্রুতি অনুসারে জীব-স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। কেশাগ্র শতভাগের শতাংশৈক ভাগাপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলিয়া (অণুত্বে) পরিকল্পিত হয়। জীব অসংখ্য, জীব সুমহান্ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য স্বরূপের কণা স্বরূপ; ভগবৎ সাদৃশ্যে, চিৎকণ জীব পুঞ্জায়মাণ প্রদীপ্ত বহ্নির স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। ঈশ্বর নির্ব্বিকার, জীব ঔপাধিক রূপে বিকারময়; ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়মিত; ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, জীব পরিমিত; ঈশ্বর শাস্তা, জীব শাসনাধীন; ঈশ্বর নিত্য প্রভু, জীব নিত্য দাস; অতএব ঈশ্বরের সহিত জীবের নিত্য-ভেদ। “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্,” “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং,” “প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশ,” “তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং” ইত্যাদি বহুবিধ বেদবচনে জীবের নিত্যভেদ অবধারিত। আবার “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি,” প্রভৃতি অভেদপক্ষীয় অনেক শ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ শাস্ত্র মতে— সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ইহার কোন অংশই মিথ্যা নহে। জীবের নিত্য অভেদত্ব সত্য এবং

নিত্য ভেদত্বও অতি সত্য। এই জন্যই উভয় নিষ্ঠ শ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব জীব নিত্যাভেদাভেদ স্বরূপ। "নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া" এই শ্রুতি অনুসারে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত এবং তৎসম্বন্ধে বিতর্ক অযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি মানবের পরিমিত জ্ঞানের অতীত; যাঁহার প্রসাদে মানব জ্ঞান কণিকা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকে জ্ঞানের আয়ত্বাধীন করিতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার, ইহাতে সত্য নির্দ্ধারিত হয় না, কুতর্কই হয়। অতএব জীবসৃষ্টি ভগবানের নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ, শ্রুতিবাক্য সত্যজ্ঞানে ইহাতেই বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তব্য।

জীবসৃষ্টি স্থাবর জঙ্গমাত্মক। ইহার মধ্যে জঙ্গমে তীর্যক স্রোত, স্থলচর, জলচর ভেদে বিভাগিত হইয়া থাকে। কেবল স্থলচরই বিচার কর, গণনার অতীত পুঞ্জ পুঞ্জ স্থলচর সহ মানবের পার্থক্যে তুলনা কি হয়? শব্দ বন্ধনে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, অসংখ্য স্থলচরের, মধ্যে মনুষ্য অতীব অল্প। এই অল্প সংখ্যকের মধ্যে অধিকাংশই (ম্লেচ্ছ যবনাদি) বেদ বহির্ভূত। যাহারা বেদাধীন, তাহাদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় যে, অধিকাংশই মুখে মাত্র বেদ বিধি স্বীকার করে, কার্য্যে বিধি নিষিদ্ধ দোষ দোষত্বে গণ্য করে না। যে অল্প সংখ্যক বেদ মানে, তাহাদের অধিকাংশকেই কর্ম্ম নিষ্ঠ দেখা যায়। অনুসন্ধানে এইরূপ কোটী কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একজন মাত্র প্রকৃত জ্ঞানী লোক অবলক্ষিত হয়। জ্ঞানীর মধ্যেও মুক্ত পুরুষ দুর্লভ, "কোটীত্রে গুটী," অর্থাৎ একটী মাত্র মিলে। এতাদৃশ দুর্লভ মুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একাধিক ভক্ত সুদুর্লভ। হরিভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত; ভক্ত ব্যতীত মুক্ত্যাদি ফলকামীগণ অশান্ত। ভক্ত সুদুর্লভ, ভক্তির একটী নাম সুদুর্লভা। এই ভক্তি লাভ কৃষ্ণ কৃপাতেই ঘটে বলিতে হইবে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।
মালী হঞা, সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হয় ফলে প্রেম ফল।
ইহা মালী নিত্য সিঞ্চে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছেড়ে তবে শুখি যায় লতা।
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতির যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু লতার অঙ্গে যদি উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখার গণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হয় মূলশাখা বাঢ়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়।
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেম ফল রস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত।)

এইরূপকটীতে ভক্তি বর্দ্ধনের উপায় পরিস্কৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

জীব সকল অনাদি কালাবধি কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গে ভ্রমণ করিতেছে, কর্ম্মার্জ্জিত সুকৃতি বলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিলেই সদ্‌গুরু আশ্রয় গ্রহণ করে। আমাদের প্রকৃতিই গুরুকৃপাপেক্ষী, গুরু কৃপা ব্যতিরেকে মানুষ (সহস্র দম্ভ করুক না কেন) একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। ভগবানের প্রসাদে, গুরুদেবের কৃপায়, জীবের হৃদয়ে ভক্তিলতা বীজ রোপিত হয়। বীজ রোপিত হইলেই অঙ্কুরিত হয় না, ক্ষেত্রে জল সেচন আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে জীবই মালী, এবং হরি নামাদি শ্রবণ, হরি নাম গুনাদি কীর্ত্তন, এবং হরি লীলাদি চিন্তনই জল সেচন। মালী (মনুষ্য) কর্ত্তৃক শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ জল অভিসিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জড় জগৎ ভেদ করতঃ বিজ্জগতের সীমা (স্বরূপ বিরজা) পার হয়, তদনন্তর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক অতিক্রমপূর্ব্বক বিদ্বিলাসময় পরব্যোমধাম প্রাপ্ত হয়। তদুপরি শুদ্ধ সত্বধাম পূর্ণতমলোক গোলোক। এই কৃপাবলেই ভক্তিলতা ততদূর পৌঁছিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। ভক্তিলতা বিস্তৃত হইয়া তথনি প্রেমরূপ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে; অর্থাৎ ভগবচ্চরণ অপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ভক্তি প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে না। কিন্তু তত্তাবৎকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষমূলে জলসেচন আবশ্যক।

যেকালে লতা অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন মালীকে একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কুসুমলতিকাকে আবরণবেষ্টণে বিশেষ সতর্কে না রাখিলে উদ্ভিজ্জভোজী পশ্বাদির ভয় থাকে। ভক্তিলতাকে গ্রাস করিবার জন্য যদি কখন বৈষ্ণবাপরাধ (সাধুভক্তের প্রতি দ্বেষাদি) রূপ মত্তহস্তী মস্তকোত্তলন করে, তবে ভক্তিলতা ছিন্ন ও বিশুষ্ক হইয়া যায়, অতএব আদৌ তাহাকে দমন করিতে হইবে, অতএব সাধুদ্বেষ সর্ব্বথা সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য।

প্রীতি প্রণয়পাত্র যুগলকে সমতলক্ষেত্রে একত্রিত করিয়া সমত্ব বিধান করে, পরস্পর প্রণয়ীযুগল একপ্রাণ—অভেদ। শাস্ত্র বলেন ভগবান্ এবং তাঁহার প্রিয়ভক্তে ভেদ নাই। ভগবানের প্রিয়ভক্তের দ্বেষ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই দ্বেষ করা হয়। এই জন্যই শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে সাধুবিদ্বেষ নিষেধ করিয়াছেন, অতএব সাধুদ্বেষ সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য।

আর একটী প্রতিবন্ধক আছে। অকর্ম্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীবহিংসা, শঠতা, পাপাচার, কুবাসনা, ভোগ ও মোক্ষ বাঞ্ছাদিরূপ উপশাখা (পরগাছা) কখন কখন লতিকাঙ্গে উৎপন্ন হয়। লতার উপরে পরগাছা জন্মিলে মালীপ্রদত্ত সেকজল এই পরগাছাগণই আকর্ষণ করিয়া লয়। তখন উপশাখাগণই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মূলশাখা বা লতিকা ক্রমশঃ নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। অতএব উঠিতে না উঠিতেই অতি সাবধানে ঐ উপশাখাগণকে ছেদন করিয়া ফেলিবে। এইরূপ করিলে লতা (জড়জগৎ অতিক্রম করতঃ) অপ্রাকৃত গোলোকধাম লাভ করে। তখন প্রেমফল পক্কতাপ্রাপ্ত হয়, পাকিয়া নীচে পড়িতে থাকে, মালী পরমানন্দে তখন

তাহা ভোগ করেন। এই প্রেমই পরম পুরুষার্থ —ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইহার তুলনায় তৃণতুল্য। বস্তুতঃ অনিমাদি সিদ্ধি সকল, মুক্তি এবং অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ সে পর্য্যন্তই চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করে, সে পর্য্যন্তই ইহা লোকের ভজনীয় হইতে পারে, যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণৌষধি স্বরূপ প্রেমের সুধাস্রাবি সুগন্ধ প্রাপ্ত হওয়া না যায়।

(অতঃপর প্রেম স্বরূপাদি কথিত হইতেছে)

"সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতি শয়াঙ্কিতঃ।
ভাব স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে॥"

যদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটে, সে ভাব অতিশয় মমতাসম্পন্ন, গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলেন।

শুদ্ধা ভক্তি হইতেই প্রেম জন্মে। অন্যাভিলাষ শূন্য, জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাচ্ছাদিতরূপে যে কৃষ্ণানুশীলন তাহাই শুদ্ধাভক্তি। মুক্ত্যাদি বাসনারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত ভক্তি উদিতা হন না। ভক্তিলতা অতীব কোমল, হৃদয়ক্ষেত্র আগাছায় (বাসনাদিতে) পূর্ণ থাকিলে সে লতা আদৌ জন্মে না। ভক্তিলতা উৎপাদন করিতে হইলে হৃদয়ক্ষেত্রের কর্ষণ চাই, আগাছা উৎপাটন করা চাই এবং মূলে জলসেচন চাই। ইহারই নাম সাধন ভক্তি।

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য ভাবা সা সাধনভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধত্যা॥

(ভাব ও প্রেম সাধ্য বলায়, ইহা কৃত্রিম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; বস্তুতঃ ইহা নিত্য সিদ্ধ। হৃদয় নিহিত প্রেমোদ্দীপনের নামই সাধন।)

সাধন ভক্তি হইতে রতির উৎপত্তি। অন্তরের সন্দিগ্ধ আশক্তিই ভক্তি শাস্ত্র মতে রতি। (ব্যক্তং মসৃণ তেবান্তর্লক্ষতে রতি লক্ষণং)

রতি জন্মিলে শ্রীভগবান ব্যতিত অন্য বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান হয়। সেই উল্লাসময়ী রতিতে আত্যন্তিকী মমতাবিভূ́ত হইলেই প্রেম হইয়া দাঁড়ায়। প্রেমবিশ্বাস-ময় হইলে প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয়; প্রণয় রসে সম্ভ্রম ভাব থাকে না। চিত্তের অত্যন্তদ্রবতা-রূপ প্রেমই স্নেহ। প্রিয়ত্বে অত্যাভিমানে প্রেম বৈচিত্ররূপ প্রণয়, মান হইয়া পড়ে; তাহাই অভিমানাত্মক হইলে রাগ হয়; রাগোৎপন্নে ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। রাগ যখন স্ববিষয়কে নবভাবে অনুভব করে এবং স্বয়ং নবভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা অনুরাগ। অনুরাগ প্রগাঢ় বা স্থায়ীভাবে অবস্থিতি করিলেই ভাব নাম প্রাপ্ত হয়। তাহাই অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতার সহিত উন্মাদনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মহাভাব বলে। এই মহাভাবই চরম অবস্থা; শ্রীরাধা প্রেমের চরম আদর্শ মূর্ত্তি, তিনি মহাভাব স্বরূপা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

ভক্তি শাস্ত্রানুসারে এই কএকটীই প্রেমের বিভাগ যথা—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

ইক্ষুরস ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া যেমন গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, শিতামিশ্রি, এবং উত্তম মিশ্রি নাম প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ প্রেমই প্রবৃদ্ধানুক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়,

রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব নাম প্রাপ্ত হয়।

এ সকল কৃষ্ণ ভক্তির স্থায়ীভাব। ইহার সহিত বিভাব (আলম্বন, উদ্দীপন), অনুভাব (ভাবপ্রকাশক বিকার) এবং সাত্ত্বিক (সত্ত্বোৎপন্ন ভাব) আদি ভাবাবলী সম্মিলিত হইলে ভক্তিরস অমৃতআস্বাদনীয় হয়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভেদে কৃষ্ণভক্তি পাঁচ প্রকার। এই পাঁচটীই প্রধান। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ও ভয়, এই সাতটী গৌণ রস। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভাব স্থায়ী, শেষোক্ত সাতটী আগন্তুক; কারণাধীনে উৎপন্ন ও স্থায়ীভাবে সহায়তা করে। যিনি যে রসাশ্রিত, তাহাতে সেই রসেরই প্রাবল্যতা ঘটে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে পঞ্চবিধ ভক্তির আদর্শও প্রদর্শিত হয়।

১। সনকাদি ঋষি, শান্ত ভক্ত।

২। হনুমানাদির ভক্তি, দাস্য ভক্তি।

৩। শ্রীদামাদি ও ভীমার্জ্জুন সখ্য রসের ভক্ত।

৪। নন্দ যশোদা বাৎসল্য ভক্তির উপাসক।

৫। দ্বারকাতে মহিষীগণের এবং ব্রজে গোপীদের যে ভক্তি, তাহা মধুর ভক্তি।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রা এবং কেবলাভেদে ঐ ভক্তিকে আবার দ্বিধা বিভক্ত করা যায়। মথুরা দ্বারকাদ্যে মহিষীগণের যে ভক্তি, তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ভক্তি। মাধুর্য্যময় কেবলারতির আদর্শস্থল একমাত্র বৃন্দাবন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান কৃষ্ণভক্তি প্রীত্যাত্মিকা রহিত; তাহাতে ভয় সমন্বিত প্রভু ভাবেরই আধিক্য লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে শান্ত ও দাস্য রস উদ্দীপিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রসকে সঙ্কোচিত করে। কেবলা রাগাত্মিকা কৃষ্ণরতি কখনও ঐশ্বর্য্য স্বীকার করে না; সে সদা মাধুর্য্যময়।

পরস্পর দুই বন্ধুতে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; উনি বড় লোক, আমি ছোট, প্রকৃত বন্ধুত্বে এ ভেদ জ্ঞান নাই। সপ্রণয় সমত্ব জ্ঞানই সখ্য রসের মূল। এই সমত্ব তিরোহিত হইলেই আর সখ্যত্ব থাকে না; তখন দাস্য রসের আবির্ভাব হয়।

দৃষ্টান্ত কৃষ্ণার্জ্জুন। উভয়ে উভয়ের সখা, ভেদ বিরহিত। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, কৃষ্ণপ্রতি অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভক্তির উদয় হইল; অমনি মাধুর্য্যময় কেবল সখ্যরস চলিয়া গেল। অর্জ্জুন প্রভুজ্ঞানে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং।
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি॥
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি,
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং,
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং॥"

(গীতা)

৪। পুত্র যত কেন বড় হউক না, পিতা মাতার কাছে শিশু বই নহে, সর্ব্বাবস্থায়ই সে পিতা মাতার স্নেহপাত্র। যদি কোন কারণে পিতা মাতার মনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের উদয় হয় তবে এই স্নেহপ্রবণ প্রীতিরসের সঙ্কোচ ঘটে।

ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। দেবকী ও বসুদেব, কৃষ্ণকে কখনই ভগবান জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু একদা তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণকে জগদীশ্বর জ্ঞান হওয়ায় তাঁহারা পূর্ব্ববৎ আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না, বদ্ধাঞ্জলী হইয়া রহিলেন। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান তাঁহাদের চিরাচরিত বাৎসল্য প্রীতির সঙ্কোচ সাধন করিল। যথা

"দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃত সম্বন্ধনৌ পুত্রৌ-সম্বজাতেন শঙ্কিতৌ॥"
- (শ্রীমদ্ভাগবত)

৫। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে মধুর রসেরও সঙ্কোচ বিধান করে।

একদা শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীসহ পরিহাস করেন। রুক্মিণী বুঝিলেন—কৃষ্ণ চলিয়া যাইবেন। তাঁহার মনে ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন—'কৃষ্ণ ভগবান, স্বতন্ত্র পুরুষ, ভগবান কাহারও অনুরোধ—বাধ্য নহেন।' এইরূপ মনে হওয়ায় তিনি নিশ্চেষ্টা ও অবশাঙ্গী হইয়া রহিলেন। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের উদয়ে পরম মধুর পতী পত্নী সম্বন্ধ এবং পরস্পর বাধ্য বাধকতা তাঁহার মনে স্থান পাইল না, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ রহিলেন।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানোদয়ে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস সঙ্কোচিত হয়, এ তিনটীই তাহার উদাহরণ। কিন্তু কেবলা—কৃষ্ণরতি ঐশ্বর্য্য জানে না, ঐশ্বর্য্য উদয় হইলে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য দেখিলেও কেবল ভক্ত তাহা মানেন না।

শ্রীদামাদি কেবল—সখ্য রসাস্বাদী সখ্য—ভক্ত। অলৌকিক কত কাণ্ড চক্ষের উপর হইতে দেখিয়াও শ্রীদামাদির কৃষ্ণ প্রতি ঐশ্বর বুদ্ধি জন্মে নাই। তাঁহারা অলৌকিক কার্য্য দেখিলে ভাবিতেন, "আমাদের সখা কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যা অবশ্যই জানে।" বরাবর তাঁহারা কৃষ্ণ সহিত খেলিয়াছেন, কাঁধে পর্য্যন্ত চড়িয়াছেন।

নন্দ যশোদার শ্রীকৃষ্ণে কেবলা বাৎসল্য প্রীতি। শত শত ঐশ্বর্য্য দর্শনেও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের আব্দারকারী অবুঝ ছেলে বই, অন্য জ্ঞান হয় নাই। যে বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন "সখেতি মত্বেতি" বলিয়াছিলেন, সেই বিশ্বরূপ দর্শনেও যশোদার কৃষ্ণ প্রতি অন্য বুদ্ধি হয় নাই।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণ প্রতি কখনই জার বুদ্ধি ত্যাগ করেন নাই। একদা বনে চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহারা তন্নিকটে "কৃষ্ণ কোথা গেলেন" ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

এ সকলই কেবলা কৃষ্ণরতির দৃষ্টান্ত।
(পুনর্ব্বার স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে)

১। অদ্বয় জ্ঞানে ভগবানে নিষ্ঠা, কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য তৃষ্ণা ত্যাগই শান্ত রসের কার্য্য। শান্ত ভক্তের শ্রীভগবানে মমতামাত্র নাই, তিনি পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ইত্যাকার জ্ঞানই তাহাতে প্রবল। কিন্তু শান্ত ভক্ত কৃষ্ণ ব্যতীত স্বর্গ ও মোক্ষকেও গণ্য করেন না। ভগবানে নিষ্ঠা এবং বাসনা ত্যাগই এই রসের গুণ। কেবল শান্ত বলিয়া নহে, ভক্তমাত্রেই এই দুই গুণ বিদ্যমান।

২। দাস্যরসে ভগবানে (সম্ভ্রম) প্রভু জ্ঞান। তিনি সর্ব্বাধিপতি, শাস্তা, সর্ব্বশক্তিমান, তিনি প্রভু, তৎসেবাই করণীয়, ইহাই দাস্যরসের প্রাণ। দাস্য ভক্তি প্রীতির বন্ধন নহে, কিন্তু ভয় সম্ভ্রম মূলক। দাস্য ভক্তিতে শান্তের কৃষ্ণ

নিষ্ঠাদি গুণ বিদ্যমান তদ্ব্যতীত সেবনাকাঙ্ক্ষা-অতিরিক্ত।

৩। সখ্যরসে ভগবানে (বিশ্বাসময়) সমত্বজ্ঞান। আমি যেমন, তিনি তেমন,—উভয়ে যেন এক প্রাণ, সঙ্কোচ নাই—ভেদ নাই। সখ্যরসে সখার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা আছে, সখার (সুখ-সাধনার্থ) সেবনও আছে। সখ্যরস বিশ্বাস প্রধান হয়, কিন্তু সম্ভ্রম ভাব ইহাতে কিছুমাত্র থাকে না। সখ্যে শান্তের নিষ্ঠাদি ও দাস্যের সেবাকাঙ্ক্ষা আছে, তদ্ব্যতীত মমতাযুক্ত সমতাজ্ঞান অধিক।

৪। বাৎসল্যরসে ভগবানে (মমতাযুক্ত) প্রতিপাল্য জ্ঞান। প্রাণ দিয়াও শিশুকে সুখে রাখিতে হইবে, এভাবই বাৎসল্যের প্রাণ। ইহাতে শান্তের নিষ্ঠা আছে, দাস্যের সেবনও আছে। স্নেহ সংযোগে এই সেবনই এখানে লালন পালন। ইহাতে সখ্যের অসঙ্কোচত্ব আছে, মমতাধিক্য হেতু তদ্বৎ ভর্ৎসন তাড়নও আছে। তদ্ব্যতীত এ রসে আপনাকে পালক ও ভগবানে পাল্য বুদ্ধি অধিক।

৫। মধুররসে ভগবানে (আত্মসমর্পণ) পতি বা উপপতি জ্ঞান।

শান্তের নিষ্ঠা ইহার মূল, দাস্যের সেবা ইহার কাণ্ড, সখ্যের অসঙ্কোচতা ইহার শাখা, বাৎসল্যের স্নেহ সমন্বিত লালন বা মমতাধিক্যতা ইহার মুকুল, এবং নিজাঙ্গ অর্পণে সেবাই ইহার সুপক্ক ফল। মধুর রসে শান্তাদি চারি রসের গুণাবলী বিদ্যমান, তদ্ব্যতীত ইহাতে আত্ম নিবেদন অধিক।

পতি পরিচর্য্যা নিরতা রমণীর কার্য্যে নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচতা, মমতাধিক্যতা থাকে, পতি পরিচর্য্যার্থে মধুরভাবে ভগবদুপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহিত। মধুরভাবে উপাসনাই চরম উপাসনা।

আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি সহকারে পৃথিবীতে যেমন পাঁচ গুণেরই সমাবেশ দৃষ্ট হয়, শান্তাদির গুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ মধুর রসেই সমস্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব মধুর রসের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

ভগবদ্ভক্তি বিচার অপার, সমুদ্রের তুলনায় কণিকা যেমন, এখানে তদ্রূপই তাহার বর্ণনা করা গেল।

শ্রীরূপের সহিত এতদূর পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া প্রভু প্রেম পরিপ্লুতান্তঃকরণে শ্রীরূপকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে শ্রীরূপের কেশাগ্র পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি এক অভিনব সরসভাবে বিভাষিত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে সমস্ত ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল, তিনি সমস্ত ভক্তি রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলেন। ইহারই নাম শক্তিসঞ্চার। পাঠক, "Will force." বা ইচ্ছাশক্তির কথা শুনিয়া থাকিবেন, এই শক্তি প্রভাবে একের চিত্তক্ষেত্রে অপরের ভাব সংক্রমিত করা যাইতে পারে। সামান্য মানবেরই ইহা আয়ত্বাধীন হয়, মহাপ্রভু ত পুরুষোত্তম পূর্ণতম এবং আদর্শ।

শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু কহিলেন "শ্রীরূপ! ভক্তিরসের দিগ্দর্শন মাত্র করা গেল, দম্ভ করিয়া বা বিদ্যা-গৌরবে কেহই ভক্তি রহস্য বুঝিতে পারে না। ভক্তি ভাবগম্য এবং অনুভবের বস্তু। ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে

নির্ম্মল চিত্তের প্রয়োজন, ভগবানের কৃপা ভিক্ষা আবশ্যক। ভগবানের কৃপাই মূল, ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ কৃপায়, অজ্ঞও ভক্তিলাভ করিতে পারে, আত্মাভিমানী পণ্ডিতও পারেন না।

দশ দিবস ধরিয়া শ্রীরূপকে প্রভু শিক্ষা দিলেন। তৎপরদিন তিনি কাশী যাইতে উদ্যত হইলে, শ্রীরূপ তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন "প্রভো! যদি অনুমতি করেন, তবে দাস সঙ্গে গমন করে।" শ্রীরূপ আর বলিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

প্রভু কহিলেন "শ্রীরূপ! তুমি আমি সুখের জন্য আসি নাই। তুমি আমার বিরহে দুঃখ পাইবে সত্য, কিন্তু আমারও ত তোমার বিরহ আছে? আমার কথা শুন, শ্রীরূপ! কার্য্যের জন্য আসিয়াছ কার্য্য করিতেই হইবে। দেখ, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ছারেখারে গিয়াছে; তীর্থাদি বিলুপ্ত, মতবাদ লইয়াই লোক সকল উন্মত্ত এবং সদা পাপাশক্ত। তোমার কি দুঃখ হয় না? তোমাকে অনুরোধ, আমার একটী কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, গিয়া তথাকার বিলুপ্ত তীর্থ সকলের উদ্ধার কর, শাস্ত্র তোমার সহায়কারী হইবে। ভগবান্ অন্তরে থাকিয়া তোমায় উপদেশ দিবেন।

প্রভু আর বিলম্ব করিলেন না, কাশীর জন্য নৌকারোহণ করিলেন। শ্রীরূপ সংজ্ঞা রহিত, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দাক্ষিণাত্য বিপ্রটী যথাসাধ্য তাঁহার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

প্রহেলিকা।

রামশরণ ঘোষের স্ত্রী বিয়োগ হইবার পর নানাদিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সদর অন্দরে ঘটক ঘটকীর পদ-ধূলিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্দরের মধ্যে অপর স্ত্রীলোক আর কেহ নাই সওয়ায় রামশরণের বিধবা ভগিনী ইচ্ছা-ময়ী দাসী। ঘটকীদের মধ্যে খোদ কর্ত্তা-টীর কাছে যাহারা বিফল মনোরথ হইল—তাহারা অন্দরে গিয়া ইচ্ছাময়ীর কাছে উৎপাৎ আরম্ভ করিল।

কেহ বলিল মেয়েটী দেখিতে পদ্ম-ফুলের ন্যায়। রং ঠিক চাঁপাফুলের মত—ভ্রমরের ন্যায় ঘন কৃষ্ণ কেশ, যেন রাজ-রাজেশ্বরী প্রতিমা। কেহ বলিল দেখিতে যেন স্বর্গের পরী—গুণেও ততোধিক। সংসারের কাজে এই বালিকাবয়সেই কত মত দক্ষ। মায়া মমতা, স্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ। অমন সোনার বউ যদি এ সংসারে আসিতে পায় তবে মা লক্ষ্মী চিরকাল বাঁধা থাকিবেন; ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু কিছুতেই রামশরণের ভগিনী ইচ্ছাময়ীর আসন টলিল না।

না টলিবার অনেক কারণ ছিল। জীবন যাত্রার প্রথমে—রামশরণের অব-স্থাটা আদৌ ভাল ছিল না। ইচ্ছাময়ী রামশরণের কনিষ্ঠা হইলেও তাহার জ্যেষ্ঠার মত সম্মান পাইত—কেননা সে রামশরণের সুখ দুঃখে তাহার

সঙ্গে সমান ভুগিয়াছে। রামশরণ যখন এক বেলার ভাত জলদিয়া অপর বেলায় ডালভাতে লঙ্কা দিয়া সুরশাল ব্যঞ্জনের সাধ পুর্ণ করিত সামান্য ছেঁড়া মাদুরে মলিন শয্যায় শুইয়া দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যার সুখ অনুভব করিত; তখন হইতে ইচ্ছাময়ী তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভুগিয়াছে। আজ না হয় রামশরণ অদৃষ্ট গুণে একজন বড় লোক হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি? বড় লোক হইলেও পূর্ব্বস্মৃতি মোছা যায় না। মোছা চুলোয় যাক্—তখন অতীত জীবনের কথা গুলি বড়ই জাগ্রত ভাবে ফুটিয়া উঠে।

যাক্ এখন আদত কথা বলি। ইচ্ছাময়ীর দাদার বিবাহে অমত করিবার অনেক কারণ ছিল। সবে মাত্র আজ সাত মাস হইল তাহার ভ্রাতৃবধু ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছে। এর মধ্যে বিবাহ দিলে লোকে বলিবে কি?

দ্বিতীয় কারণ—দশবৎসর পূর্ব্বে রামশরণের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তার পর ঘটনা ক্রমে এক পিতৃ মাতৃহীন কন্যা তাহার গলায় পড়িল। রামশরণ অনিচ্ছা স্বত্বেও বিবাহ করিলেন। ইচ্ছাময়ীর জেদেই সেই বিবাহ হইয়াছিল।

নববধু গৃহে আসাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন "মা লক্ষী" রামশরণকে কৃপা করিলেন। রামশরণ বাঙ্গলা দপ্তরের কাজ ভাল জানিতেন। এতকাল চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই কিন্তু এক্ষণে যেন "স্ত্রীভাগ্যে ধন" এই কথার সার্থকতা করিবার জন্যই তাঁহার একটী গোমস্তাগিরি চাকরী জুটিল। রামশরণের কুঁড়ে ঘরের স্থানে মাটির দেয়াল হইল, দুই এক গোলা ধান হইল, পৈতৃক দুই চারি বিঘা ছিল তাহাতে, কড়াই, তিল, সরসে প্রভৃতি জন্মিয়া কিছু উপকার দিল। তার পর গোমস্তাগিরি চাকরি—বৎসর খানেকের মধ্যে একটা নূতন মহলে দুই তিনটা ফৌজদারি করিয়া প্রজাবশের দ্বারা যশ কিনিয়া রামশরণ জমীদার বাবুদের নিকট হইতে হাজার টাকা বক্‌শীশ পাইলেন।

এসব যে নববধুর পয়ে হইতেছে তাহা ইচ্ছাময়ীর দৃঢ় বিশ্বাস। ইচ্ছাময়ী কেন রামশরণের মনের বিশ্বাসও তদ্রূপ। দিন দিন বধুর আদর যত্ন বাড়িল তাহার গুণপনায়, গৃহস্থালীতে শারীরিক পরিশ্রমে—আর ইচ্ছাময়ীর গৃহিণীপনায় রামশরণের মাটীর দেয়াল শীঘ্র পাকা হইয়া পড়িল।

জমীদার বাবুদের যিনি নায়েব ছিলেন, তিনি সহসা বুকে বেদনা ধরিয়া মারা গেলেন; লোকে বলে রামশরণের ভাগ্যে লোকটা মরিল। যাহাই হউক রামশরণ ঘোষজা মহাশয় নায়েবী পাইয়া বেশ গুছাইতে লাগিলেন। তাহার পরের বৎসর চণ্ডীমণ্ডপ বাঁধিয়া জগদ্ধাত্রী পূজা করিলেন।

কিন্তু সংসারে বুঝি সব সুখ একাধারে হয় না, তাহা হইলে "দুঃখ" বলিয়া এ পদার্থটা একেবারে যে নির্ব্বাসিত হইয়া যায়। রামশরণের অনেক সুখ হইয়াছে কিন্তু সকলের শ্রেষ্ঠ সুখ পুত্র মুখ দর্শন কিছুতেই ঘটিতেছে না। ইচ্ছাময়ী ত বৎসরাবধি ধরিয়া ঠাকুর দেবতার পুজা মানিয়া ব্রত উপবাস করিয়া অনেক দেবতার সাধ্য সাধনা করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই ত দেবতার কৃপা হয় না।

যাই হ'ক শেষ দেবতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন। বধু অন্তঃস্বত্বা হইলেন। খুব ঘটা করিয়া নিয়মিত সময়ে সাধ হইয়া গেল। নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে—ভুষিতা হইয়া, সেই সুন্দর লজ্জাবতী—লতার ন্যায় সংকুচিতা অতুল রূপ শালিনী ব্রীড়া মণ্ডিতা বধু যখন কুলাঙ্গনাদের মধ্যে বসিয়া সাধ ভক্ষণ করিলেন, ইচ্ছাময়ীর জীবনের একটা সাধ সেই দিন পূর্ণ হইল।

চন্দ্রে কলঙ্ক, সূর্যকিরণে দাহিকাশক্তি, পুষ্পে কীট, কমলে কণ্টক, প্রেমে। বিরহ, আনন্দে নিরানন্দ, আশায় নিরাশা, হর্ষে বিষাদ—সুখে দুঃখ—যেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে লাগিয়া আছে। রামশরণের সুখ—প্রবাহ রুদ্ধা প্রবাহ ফল্গুর ন্যায় ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে ছিল একথা কেহই জানিতে পারে নাই। মানুষের সাধ্য কি—যে কোন্ গূঢ় শক্তির উপায়ে ইহা জানিতে পারে!

রামশরণের অন্তস্বত্বা পত্নী প্রসবের মুখে মারা গেলেন। সুখের স্রোত সহসা ভিন্ন দিকে ফিরিল—সহসা চন্দ্রালোক বিভাসিত গগণে কাল মেঘচ্ছায়া বিস্তারিত হইল। স্থির সমুদ্রে ঝটিকা বহিল। সাজান কুসুমোদ্যান শ্মশানে পরিণত হইল।

যে বৌটি গেল তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছে ইহাই ইচ্ছাময়ী ধারণা। তাঁহার মৃত্যুর পর সবে মাত্র সাত মাস অতীত হইয়াছে—পূর্ব্ব স্নেহ মমতা মায়া দয়ার আসনটা শূন্য থাকিলেও ইচ্ছাময়ী এই সকল কারণে একটা নূতন অংশীকে তাহা উপভোগ করিতে দিতে সম্মতা ছিলেন না।

কিন্তু কালে বৃহৎ পাষাণও ক্ষয় হইয়া উপল খণ্ডে পরিণত হয়, সুদৃঢ় মহীরূহ কীটভক্ষিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, প্রকাণ্ড সৌধও সুদৃঢ় ভিত্তিমূল সহিত লয় প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছাময়ীর প্রবল ইচ্ছার সেইরূপ হইল। কিন্তু একটী ঘটনা সে বিশেষ বিষয়ের সহায়তা করিল তাহা বলিতেছি।

(২)

ইচ্ছাময়ী একদিন আহারান্তে রামশরণের বাঁধা দালানের উপর পা বিছাইয়া প্রতিবাসীর এক কুমারী কন্যার চুল বাঁধিয়া দিতেছেন—এমন সময়ে তাঁহার প্রতিবেশিনী কালীর মা আসিয়া বলিল "দিদি! একবার দেখে যা"। কি দেখব বলিয়া ইচ্ছাময়ী প্রশ্ন করিল। কালীর মা তাহার উত্তর দিল না। বলিল "এখন বলিব না একবার আমাদের বাটীতে আয় তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবি।

চুল বাঁধা শেষ হইয়াছিল—একটী খয়েরের টিপ পরাইয়া মেয়েটীকে অব্যাহতি দিয়া ইচ্ছাময়ী প্রতিবেসিনীর গৃহে চলিল। তখন তাহাদের মৃৎকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া—এক অতুলনীয়রূপ সম্পন্না প্রফুল্ল পদ্মফুলের মত একটী কন্যা। কালীর মা ইচ্ছাকে বলিল দিদি—"এই মেয়েটীকে দাদার বউ করিতেই হইবে।"

ইচ্ছাময়ী সমস্ত কথা বুঝিতে পারিল। দাওয়ার উপর বসিয়া সেই অনিন্দ্য মুখকান্তি দেখিল। সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, সেই ভ্রমর কৃষ্ণ বেণী সম্বদ্ধ কেশরাজি, সেই কামের শরাসন ভ্রূযুগ সেই সুন্দর, সুগোল রূপরাশি মণ্ডিত—মাধুরী উচ্ছসিত দেহ খানি—সেই সুন্দর অতি

সুন্দর মুখ খানি—বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিল। দেখিবা মাত্রই তাহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প টলিল। ইচ্ছাময়ী জিজ্ঞাসা করিল —"কাদের মেয়ে গা ?"

কালীর মা বলিল মেয়েটী আমাদের গাঁয়ের নয়। এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দুর জয়রামপুরের মল্লিকদের মেয়ে। আমার সম্পর্কে বোনঝি হয়। আমি যোগাড় করিয়া দাদার বৌ করিব বলিয়া ইহাকে আনাইয়াছি।"

যাহ'ক খানিক ক্ষণ কথা বার্ত্তার পর ইচ্ছাময়ীর মনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা দ্রবীভূত হইয়া গেল। ইচ্ছাময়ী সমস্ত ঠিক করিবার আদেশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার সময় রামশরণ গৃহে আসিয়া আহারে বসিলে—গরম না থাকিলেও একখানি পাখা হাতে করিয়া পাতের কাছে বসিয়া—দুই চারি বিন্দু অশ্রু চক্ষে লইয়া মলিন মুখে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ইচ্ছাময়ী দাদার কাছে পূর্ব্বোক্ত কাহিনীর ভনিতা আরম্ভ করিল। সে উচ্ছাসটা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিলে সকল কথা রামশরণকে খুলিয়া বলিল। জন্মমৃত্যু বিবাহ—বিধাতার ইচ্ছাধীন—যখন ঘটিবার ঘটিবে আবার রামশরণের শূন্য গৃহের শূন্য আসন এক অপরিচিতের দ্বারায় পরিপূরিত হইবার সুচনা হইল। ভগিনীর অবস্থা দেখিয়া আর কি জানি কোন কারণে রামশরণ সম্মতি দিলেন।

আবার একদিন শুভক্ষণে শাঁখ বাজিল আবার হুলুধ্বনি উঠিল—আবার ইচ্ছাময়ী আনন্দাশ্রু বলুন আর বিষাদাশ্রুই বলুন চক্ষে লইয়া বরণ করিয়া নূতন বধু ঘরে তুলিলেন। আবার সেই শ্মশানবৎ গৃহে প্রমোদ কাননের ছায়া পড়িল, আবার বিষাদ ও বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে আনন্দ ও প্রফুল্লতা আসিয়া রামশরণের গৃহে দেখা দিল।

জগতে প্রতিমুহূর্ত্তে কত শত কর্ম্মসূত্র সৃজিত হইতেছে। কত শত ভবিষ্যত মহাব্যাপারের বীজ রোপিত হইতেছে—কে জানে কোথায় গিয়া কাহার শেষ হইবে ? কি হইতে কি হইবে ? যাহা হইবার তাহা হইয়া যায়, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যায়। অলক্ষ্যে অন্যের অদৃষ্ট ভাবে অজ্ঞাতে যাহা ঘটে—ভবিষ্যতে কত ছোট বড় কার্য্য তাহার সহিত অবিচ্ছেদভাবে সম্বন্ধ থাকে।

তাই বলি! হে কর্ম্ম! জগতে তুমিই বলীয়ান। বিধাতা কে ? তিনি ত নিয়মের অধীন। তাঁহার ক্ষমতা ত তোমার তুলনায় সীমাবদ্ধ! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; হে মহৎহইতেও সুমহৎ! তোমার মহিমা সাধ্য কি আমার যে বুঝিতে পারি ?

আমার সহিত রামশরণ ঘোষের কি সম্বন্ধ তাহা বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে আমি তাহার ঘরের এত কথা কেমন করিয়া জানিলাম—এ সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে। এটার মীমাংসা আগেই প্রয়োজন।

রামশরণের সহিত আমার আলাপ আহিরিটোলায়। আমার পাটের কারবার ছিল। রামশরণ যে জমীদারের নায়েব ছিলেন তাঁহার জমীদারীতে পাটের চাষ বড় বেশী ছিল। রামশরণ কলিকাতায় অনেক আড়তে পাটের চালান দিতেন। ব্যবসাসূত্রে তাহার সহিত আমার গদীতেই প্রথম আলাপ হয়।

যখন তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হইয়াছে তাহার দুই এক মাস পরেই আমার সহিত আলাপ। জগতে কেহ কাহারও আপনার নহে কেহ কাহারও পর নহে। ব্যবহারেই সব। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা, আপনার পর সবই ব্যবহারের উপর। ব্যবহার ভাল না হইলে ঔরসজাত সন্তান, একগর্ভজাত সহোদর প্রাণাধিকা বনিতা, প্রিয়তম বন্ধু সবই দূরে থাকিয়া যায়।

রামশরণ ঘোষের সহিত আমার আত্মীয়তা ঘোর বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তিনি কলিকাতায় আসিলে আগে আমার বাড়ীতে আসিতেন। আমি মফস্বলে যাইলে তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিতাম। ঠিক যেন আমরা আজন্ম বন্ধুত্বে পরিপুষ্ট হইয়াছি।

উক্ত বিবাহ ঘটনার দুই বৎসর পরে আমি একবার রামশরণের গৃহে যাই। সাত আট দিন সেখানে থাকি। সেই সময়ে এক দিন আমি আমার বন্ধুর প্রকৃতির সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি।

ঘোষজা বরাবরই ধীর প্রকৃতি ও স্থির বুদ্ধি। তাহার সুন্দর মুখ, প্রশান্ত ললাট, সুগঠিত শরীর—দেখিলে তাহাকে লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে এক দিন আমি লক্ষ্য করিলাম রামশরণ কিছু চঞ্চল। তাহার সে স্থিরতা গাম্ভীর্য্য যেন ক্রমশঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে। কেন এইরূপ হইতেছে তাহা সেই দিন রাত্রেই কোন অদৃষ্ট, অভুত পূর্ব্ব অচিন্তিত উপায়ে জানিতে পারিলাম !!

আমি বাহিরের ঘরে শুইতাম। বাহিরের ঘরের লাগাও চণ্ডীমণ্ডপ। আমার ঘরের পার্শ্বে ও চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে একটী দরওয়াজা আছে। এই দরওয়াজাটী দ্বারা অন্দরে যাওয়া যায়।

গভীর রাত্রি—সমস্ত নিস্তব্ধ! চারিদিক ব্যাপিয়া নৈশান্ধকার নৃত্যকরিতেছে। আকাশ—নীরব নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে অসংখ্য তারকা মণ্ডিত হইয়া সমস্ত কার্য্যের সাক্ষ্য স্বরূপে সে নীলিমাময় গগণের আদ্যোপান্ত উজ্জ্বলিত করিয়া আছে। আমি সেদিন কেন জানিনা ভালরূপে নিদ্রা যাইতে পারি নাই। সহসা শুনিলাম কে যেন ঐ চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী দ্বার খুলিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল।

আমি দ্বার খুলিলাম পা টিপিয়া টিপিয়া তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম। ঘোর অন্ধকার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি অতি সন্তর্পণে আন্দাজে আন্দাজে চলিলাম।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশেই এক বাগান। দেখিলাম এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া দুইজনে কথা কহিতেছে। একজন বলিতেছে "আজকাল কর্ত্তার যেরূপ উৎপাত বাড়িয়াছে তাহাতে আর ঘরে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। অকারণ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে পারি না। তোমায় রোজই বলিতেছি ইহার যাহা হয় একটা কর কিন্তু তুমিও ত কিছুতেই মনোযোগ দাও না।" আর এক জন বলিল গলার আওয়াজে বোধ হইল—পুরুষ,—"আমি কি করিব বল তোমার সুখ দুঃখ আমার হাতে থাকিলে তোমার আশা এতদিনে পূর্ণ হইত? দেখ কি আশা করিয়াছিলে কি ঘটিল। যাই হ'ক তুমি যখন বলিতেছ তখন ইহার একরূপ বিহিত করিতেই হইবে।"

স্ত্রীলোকটী বলিল—"যাই হ'ক আর অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিব না আমি আজ যাই। তুমিও চলিয়া যাও। এই সপ্তাহের মধ্যে যাহা হয় একটা বিহিত করিও।"

স্ত্রীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে বাগান অতিক্রম করিল। ক্রমে চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির উপর উঠিল। আমিও ফিরিলাম। স্ত্রীমূর্ত্তি সেই চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া সপ্তর্পণে নিঃশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আমি-গৃহ প্রবেশ করিলাম—আমার হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঘটনাটা যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল ভাবিলাম কি সর্ব্বনাশ! ইহাও কি সম্ভব! না না কথনই না। রামশরণের স্ত্রী কলুষিত চরিত্রা একথা বিশ্বাস করিতেও আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি চক্ষু বুজিলাম না। স্ত্রীলোকটী যে রামশরণের স্ত্রী এরূপ বিশ্বাসের কারণ; সওয়ায় ইচ্ছাময়ী, বাটীতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। এক দাসী ছিল সে কাজকর্ম্ম সারিয়া নিজেরবাড়ীতে শুইত। বিশেষতঃ কণ্ঠস্বর যুবতীর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে-শয্যাত্যাগ করিলাম। আমার-বিশুষ্ক মুখ মলিনশ্রী দেখিয়া রামশরণ বড় আশ্চর্য্য হইল। আমি তাহার মলিন ও চিন্তাযুক্ত মুখ দেখিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য হইয়া ছিলাম-সেও বোধ হয় তদ্রূপ। কিন্তু আমি একপদ অগ্রসর হইয়াছি। আমি কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিলাম তাই বলিতেছি আমি একপদ অগ্রসর হইয়াছিলাম।

রামশরণ জিজ্ঞাসা করিল "কেন ভাই! মুখ অত শুষ্ক কেন? আমি কিছুই জবাব দিলাম না। কি ছাই জবাব দিব—খুজিয়া পাইলাম না। শুধু বলিলাম—ভাল নিদ্রা হয় নাই।

সেই দিন আমি তাহার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা আসিলাম। সমস্ত পথই সেই চিন্তা। রেল গাড়ীতে কত লোক উঠিতেছে, আসিতেছে যাইতেছে ক্রমে কত ষ্টেসন্ ছাড়াইতেছি তবুও কিছুতেই হুঁস নাই। জগৎ যেন মরীচিকা ময় বোধ হইতে লাগিল। সবই যেন তিক্ত—ঘোর বিরক্তিতে আবৃত। আমি কলিকাতায় পৌছিলাম।

ক্রমশঃ

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে—হিন্দুসমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতে ব্রাহ্মণজাতি চতুর্ব্বর্ণের গুরুস্বরূপ সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতির গুরুভার গ্রহণ করিয়া আচার ব্যবহারে ও রীতি নীতিতে সমাজ পরিচালনে নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। যে ধর্ম্মবন্ধন সমাজের অস্থি মজ্জা, যে ধর্ম্মজীবনে সমাজ অনুপ্রাণিত, যে ধর্ম্মবলে সমাজ বলীয়ান্ সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি সমস্ত পারমার্থিক ব্যাপারের ভার এই জাতির উপরেই ন্যস্ত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারাও একবাক্যে ইহাঁকেই সমাজের শীর্ষস্থান প্রদান করিয়া "বর্ণানাম্ ব্রাহ্মণো গুরুঃ" এই বাক্য বলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন—

> "মুখাদ্ভুবা জ্যৈষ্ঠাদ্ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ
> সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণ প্রভু:
> ভূতানাম প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠ প্রাণিনাম বুদ্ধিজীবিনঃ
> বুদ্ধিমৎসু নরাশ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাস্মৃতাঃ॥"

ইহার ভাবার্থ এই, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম সকল বর্ণের অগ্রে এবং তিনি বেদ ধারণ করেন বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সৃষ্টির ধর্ম্মশাসনে প্রভু। সৃষ্টপদার্থের মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণী মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবির মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ আর সেই মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া, পার্থিব ভোগ লালসা হইতে সুদূরবর্ত্তী থাকিয়া এই জাতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মানবের প্রাণের প্রাণ আত্মার উন্নতির গুরুভার লইয়া সমাজের প্রভু হইয়া আসিতেছেন। ক্ষত্রিয়গণ বাহুবলে ও প্রয়োজনীয় অর্থাদি সাহায্যে, বৈশ্যগণ গবাদি পশুপালনে এবং শূদ্রগণ ভৃত্যবৎ সেবা করিয়া ইহাঁর এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে সহকারী হইলেন আর ব্রাহ্মণও ভোগেচ্ছা বিমুখ হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে যাগযজ্ঞ, তপস্যাদি ব্যাপারে নিরত রহিলেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য শাসনাদি ভার প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ ও আজ্ঞানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। অন্য বর্ণদ্বয়ও এইরূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যে নিযুক্ত রহিলেন। সমাজ এইরূপ সুযোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া সকল প্রকারেই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল।

সমাজ মাত্রেই এক একটী বিস্তৃত রাজ্য বিশেষ, রাজ্যের ন্যায় সমাজকেও অক্ষুন্ন ও সুশৃঙ্খল রাখিতে হইলে সামাজিক শাসননীতি ও সেই নীতি পরিচালন জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন হয়, অন্যথা সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। রাজশক্তি তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের হস্তে থাকিলেও তাঁহারা—ব্রাহ্মণগণের আদেশে শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থার পরিচালনে রাজশক্তির ও দণ্ডনীতির সম্যক পরিচালনা করিতেন। তৎকালে রাজ্য ও সমাজ উভয়ের শাসনভার এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকিত; উভয় ব্যাপার এক

দণ্ডনীতির অন্তর্নিহিত ছিল। তাঁহারা জানিতেন সামাজিক উন্নতিই জাতীয় উন্নতির মূল ভিত্তি আর ধর্ম্মোন্নতিই সেই সামাজিক উন্নতির মূলভিত্তি; সুতরাং সমাজস্থ জন সাধারণের ধর্ম্মোন্নতির দিকে—আত্মার উন্নতির দিকে ও তদুপযোগী বিধিব্যবস্থার পরিচালনে তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত, তাই সামাজিক রীতির সামান্য ব্যভিচারেও গুরুতর রাজদণ্ড প্রযুক্ত হইত। এইরূপে হিন্দুরাজার রাজত্বে রাজশক্তি ও সামাজিক শাসন একত্রে কার্য্য করিয়া হিন্দুসমাজে সুশৃঙ্খলা স্থাপন পূর্ব্বক অব্যাহত প্রভাবে, সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে, হিন্দুরাজার সুশাসনে হিন্দুসমাজ বিদ্যা বিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকারেই উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। সামাজিক কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা, কোন প্রকার ব্যভিচার, কোন প্রকার গোলযোগ সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না।

কালের বিচিত্র লীলা, কালবশে সকল বস্তুরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির এই সুদৃঢ় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুর সামাজিক ভাবেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। কালে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব, সমাজের বিরক্তিকর হইতে লাগিল। স্বাধীন চিন্তা, সাম্য ভাব সমাজে প্রবেশ লাভ করিল। সমাজের ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলেও রাজশক্তি, সমাজ শাসনের অনুকূল থাকায় একবারে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব লোপ পাইল না বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব অসহ্য বোধ হওয়ায় সমাজে সাধারণ অতৃপ্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশেষে অতৃপ্ত হিন্দু সমাজে নানাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া সমাজকে পীড়িত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল, এবং সমাজশক্তি প্রবল হইয়া রাজশক্তিকেও নিস্তেজ করিয়া দিল। সমাজে বিষম ব্যাধি প্রবেশ করিল।

কিন্তু যেমন ব্যাধি হইলেই ঔষধের ব্যবস্থা হয় তদ্রূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেই এক একজন সমাজ সংস্কারক কোথা হইতে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এই নিয়ম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। এই নিয়মে হিন্দুসমাজের এই বিশৃঙ্খলার সময় "বুদ্ধদেব" অবতীর্ণ হইয়া অতৃপ্ত হিন্দুসমাজে তৃপ্তি আনয়নার্থ সমাজে পূর্ণ শান্তি স্থাপনার্থে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার স্থাপিত বিধিব্যবস্থায়, সাম্যভাব, স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়া অনেকে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সমাজে আংশিক ভাবে শান্তি স্থাপিত হইল। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃত্ব অনেকাংশে খর্ব্ব হইল কিন্তু একবারে নষ্ট হইল না। রাজশক্তিও এই সময়ে বৌদ্ধ নীতির সহিত মিলিত হওয়ায় সমাজে এই আচার ব্যবহার বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হইতে লাগিল, কিন্তু এখানেও কাল তাহার পরিবর্ত্তন কার্য্য সাধনে বিরত হইল না। কাল বশে আবার সমাজে বৌদ্ধ রীতির ব্যভিচার ঘটিতে লাগিল, আবার ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। সমাজ একবার ঠেকিয়া শিক্ষা পাইল; সমাজ বেশ বুঝিল যে শাস্ত্রবিৎ দেবোপম ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন সমাজের সুশাসন আশা নাই, জাতীয় উন্নতির আশা নাই, শান্তির

আশা নাই। তাই সমাজে আবার ব্রাহ্মণ প্রভুতা স্থাপনের চেষ্টা হইতে লাগিল চারিদিকে আবার তর্ক বিতর্কের, বাদানুবাদের বিরাট ব্যাপার আরম্ভ হইল; মহামতি শঙ্করাচার্য্যের যত্নে আবার সমাজে হিন্দুভাব স্থাপিত হইল; ব্রাহ্মণ প্রভুতা আবার দেখা দিল।

কিন্তু যাহা একবার ভাঙ্গে তাঁহা জোড়া দিলে কখনই পূর্ব্ববৎ হয় না। যে ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে একবার আঘাত লাগিল তাহা হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইল না। বৌদ্ধধর্ম্মে, সমাজে যে স্বাধীন ভাব, যে সাম্য, যে ব্যভিচার প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা একবারে বিদূরিত হইল না; তবে রাজশক্তি, শাসন দণ্ড হিন্দুর হস্তে থাকায়, ভক্তিতে বা ভয়ে আবার সমাজে ব্রাহ্মণ প্রভুতা স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল। কালবশে আবার ব্রাহ্মণগণও স্বীয় কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া অনেকানেক ব্যভিচার অনাচার আনয়ন করিতে লাগিলেন; ভোগবিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারাও ধর্ম্মের ভানে অধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বিধি ব্যবস্থার নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল কিন্তু রাজশক্তি সতেজ থাকায় প্রকাশ্য ভাবে কেহই ব্রাহ্মণ প্রভুতা একবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে সাহসী হইল না। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে কাল বশে হিন্দুর স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইল, রাজশক্তি সামাজিক শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল; হিন্দুসমাজ বৈদেশিক বিধর্ম্মীর অধীন হইল।

পরাজিত জাতি অনেকাংশে বিজিত জাতির অনুকরণ করে, "এই সত্য ইতিহাস স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিতেছে॥ এই সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু সমাজ বৈদেশিক বিজিত জাতির অনুকরণে ব্যগ্র হইল। আচার ব্যবহার, রীতি নীতিরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। রাজ্যশাসন ও সমাজ শাসন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ সমাজ শাসনে রাজশক্তির সমবায় না থাকায় সামাজিক বন্ধন, সামাজিক প্রথা ও সামাজিক শাসন শিথিলতর হইতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণগণও লোভ পরবশ হইয়া অনর্থের মূল অর্থের প্রয়াসী হইতে লাগিলেন এবং পরমার্থ চিন্তার পরিবর্ত্তে অর্থ চিন্তায় মনঃ—সংযোগ করিয়া স্বীয় মান্য ব্রহ্মতেজ ও সাধারণের ভক্তির মূলে আঘাত করিতে লাগিলেন। এক কথায় বিদেশীয় বিলাস পরায়ণ জাতির সংশ্রবে এই সময়েই হিন্দু সমাজে ও তাহার নেতা ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও এই বিলাসিতা প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু সমাজকে অন্তঃসার শূন্য করিতে লাগিল। মানব যত আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইবে ততই পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর সুখ তাহার অকিঞ্চিৎ কর বোধ হইবে, আর পক্ষান্তরে যতই পার্থিব সুখে আকৃষ্ট হইবে ততই আধ্যাত্মিক জগত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে, ততই তাহার মন অন্তর্জগৎ হইতে বহির্জগতে আসিয়া পড়িবে। এইরূপ, অন্তর্জগৎবাসী দেবোপম ব্রাহ্মণ জাতি বহির্জগতের লোভ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া—অবনতির দিকে-সর্ব্বনাশের দিকে চালিত হইয়া, হিন্দুসমাজকেও সেই দিকে চালিত করিতে লাগিলেন। যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় তাহা হইলে আর মঙ্গল কোথায়?

উৎপত্তি, লয়, উন্নতি অবনতি—কালের বিচিত্র লীলা। জয়শ্রী নিয়ত চঞ্চলা; তিনি চিরদিন কাহারও প্রতি সুপ্রসন্না থাকেন না। কালের এই বিচিত্র লীলা বশে ভূমণ্ডলের কত জাতি উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া আবার অবনতির গভীর নীরে নিপতিত হইতেছে। এইরূপ একের অবনতি অন্যের উন্নতি; একের পতন অন্যের অভ্যুত্থান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যে প্রাকৃতিক নিয়মে ভূমণ্ডলের কত জাতি উৎপন্ন হইয়া উন্নত হইয়া আবার জলবিম্বের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে লীন হইয়াছে, সেই নিয়মে এই ব্রাহ্মণ জাতির প্রভুত্ব, সমাজের নেতৃত্ব, অসীম তেজ—উৎপন্ন, উন্নত হইয়া আবার কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে। চিরকাল কি থাকে!!!

এইরূপে বর্ত্তমানে একদিকে ব্রাহ্মণগণ যেমন আচার ভ্রষ্ট হইয়া, কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া, ভোগলালসার পরিতৃপ্তির জন্য শূদ্রের ম্লেচ্ছ যবনের পদানত হইয়া নিজ, মান সম্ভ্রম, নিজ অভিজাত্য নষ্ট করিয়া "মণিহারা ফণী" হইয়াছেন; সেইরূপ শূদ্রাদি হীন বর্ণও স্বাধীন ভাবের সাম্যভাবের বিজাতীয় ধ্বজা উড়াইয়া, শিক্ষাভিমানে মত্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ জাতির মস্তকে আরোহণ পূর্ব্বক সমাজের নেতা হইতে, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতে শাস্ত্রের টীকা করিতে আর পদে পদে সেই দেবোপম জাতির লাঞ্ছনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন। যে সমাজনেতা, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজে দেব মানব, যক্ষরক্ষ কম্পিত হইতেন, যে ব্রহ্মমন্যুর ভয়ে সসাগরা ধরণীশ্বরও নিয়ত শঙ্কিত থাকিতেন যাঁহার দেবোপম গুনগ্রামে মুগ্ধ হইয়া শূদ্রগণ ভৃত্যবৎ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেন আজ সেই ত্রিলোক পূজ্য, বেদধারণক্ষম ব্রাহ্মণ জাতির ব্রহ্মতেজ নির্ব্বাপিত, বেদাদি শাস্ত্রালোচনা তিরোহিত এবং মান সম্ভ্রম দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। অহো! বিধি বিড়ম্বনা।

রাজা হীনপ্রতাপ হইলে যেমন প্রজাবর্গ স্বাধীন হইয়া, স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজ্যমধ্যে নানাবিপ্লব আনিয়া ফেলে, রাজ্য নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ সমাজরাজ্যেরও উপযুক্ত নেতা অভাবে বা নেতার হীন প্রতাপে নানাপ্রকার ব্যভিচার, বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া সমাজকে একবারে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলে। এই হিন্দুসমাজ বর্ত্তমানে এই জন্যই অধোগতির দিকে ধাবিত হইতেছে আর সামাজিক অবনতিতেই জাতীয় অবনতি ঘটিতেছে।

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণের অর্থাদি অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, আবশ্যকও হইত না। যাগ যজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্যের ও প্রাণ ধারণের উপযোগী অর্থাদির সাহায্য তাঁহারা রাজন্যবর্গের নিকট হইতে আদেশ করিবামাত্রই প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা যে মানব হিতকর গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার জন্য অর্থদানে সর্ব্বদা সকলেই মুক্তহস্ত থাকিতেন। অতি পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া তৎপরবর্ত্তীকালেও এমন কি যবন অধিকারকালেও ব্রাহ্মণগণের জীবিকার জন্য অধ্যাপনাদির জন্য অর্থ সাহায্য করিতে, ভূমিদান করিতে রাজামাত্রেই,

ধনীমাত্রেই, ভূস্বামীমাত্রেই উদ্যোগী হইতেন। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণেরও আর সে সকল গুরুতর কার্য্যে মতি গতি বেদাদিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সেরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নাই। পূর্ব্বে ধনীগণ যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দ্বারা নিয়ত সাহায্য করিতেন, বর্ত্তমানে যদি তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সম্পাধিত হইত তাহা হইলে কখনই তাঁহারা অর্থ সাহায্যে পশ্চাদপদ হইতেন না। পূর্ব্বভূস্বামী বা রাজপ্রদত্ত বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণগণ আজিও সেই বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু যে মহৎকার্য্যের জন্য যে সাদৃশ্যের নিমিত্ত তাঁহারা সেই বৃত্তি প্রাপ্ত হন তৎসাধনার্থ তাঁহারা কিছু চেষ্টা করেন না অথবা তৎসংসাধনে ক্ষমতা তাঁহাদের আদৌ নাই। এরূপস্থলে তাঁহারা কি জন্য, কেমন করিয়া, কোন্‌মুখে সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন। তাঁহাদের ব্যভিচার, অনাচার দেখিয়াই অন্যান্য বর্ণ তাঁহাদের উপযুক্ত মান্য দিতে বা অর্থাদি সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন না। ব্রাহ্মণগণ সেই জন্যই বর্ত্তমানে জীবিকার জন্য, ভোগলালসা তৃপ্তির জন্য নিজের মান সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াও শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন, শূদ্রের প্রভুত্ব সহ্য করিতেছেন আর সকল বিষয়েই শূদ্রের প্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণজাতির ঈদৃশ শোচনীয় অধোগতিই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজের অবনতির কারণ, আর সামাজিক অবনতিই জাতীয় অবনতির মূল। এক্ষণে এই অধঃপতিত হিন্দুসমাজকে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে সমাজে সেই আবহমানকাল প্রচলিত ব্রাহ্মণ প্রভুতা পুনঃস্থাপিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া আপনাদের শোচনীয় বর্ত্তমান অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভোগ বিলাসিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আবার ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মতেজ অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হন যদি তাঁহারা মানব হিতে সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত হইয়া আবার স্বীয় কর্ত্তব্যে নিরত হন তাহা হইলে ভগবানের কৃপায় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কখনই এই সকল অতি তুচ্ছ, হেয় ও নিষিদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না। এখনও অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জীবিত আছেন, এখনও হিন্দুর হিন্দুত্ব লুপ্ত হয় নাই, এখনও পবিত্র আর্য্যশোণিত হিন্দুর শীরায় প্রবাহিত হইতেছে। এই মহাত্মাগণের সমবেত চেষ্টায় এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই সহায় হইবেন। ভারত-গগণে আবার হিন্দুর সুখসূর্য্য উদিত হইবে, আবার সনাতন আর্য্যধর্ম্মের জয় নিনাদে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইবে-আবার হিন্দু জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

উপহার।

কি আছে ভুবনে বল,
হেন সুখ-শোভা-সার
ও পদ যুগলে দেব!
দিব তাই উপহার;
বসন্ত কুয়াষা ঢাকা,
মলয়—গরল মাখা,
কোকিলের গীতি শুধু—
অব্যক্ত অসার ছবি;
অলীক বর্ণনা শুধু,
মূর্খ কবি কল্পনার।

শশীতে কলঙ্ক-কালি,
লেখা আছে রাহু-গ্রাস,
ফুটন্ত কুসুমে শুধু
অসংখ্য কীটের বাস;
মৃণাল কণ্টক স্বরে,
নলিনী নিহারে মরে,
কুমুদী শুকায় দিনে;
উপবন শ্যামিকায়,
উদাস প্রকৃতি জাগে;
কি যেন কি ভাব তায়।

ভালবেসে কখনও,
পুরে না মনের সাধ,
বিরহ বেদনানলে
ভাঙ্গে পিরীতের বাঁধ।
কি এক কামনা র'য়,
ব্যাপি সদা হিরদয়,
জগতের প্রতি কাজে
সদা অপূর্ণতা ভাসা,
একটী মানস প্রাণে,
কখনো পুরে না আশা।

ধরণীর প্রতি ধারা,
কেবলই দুঃখ ময়,
নিরাশার তপ্তনীরে,
সতত পরাণ দ'য়।
তবে;—
কি আছে ভুবনে আর,
দিব তাই উপহার,
"প্রাণের আরাধ্য দেব!"
চিরুনীর যে নয়নে,
লও তবে;—
শোক নীর উপহার
দিতেছি তব চরণে।

হিন্দুমহিলা।

লোপামুদ্রা।

"পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমানা
দোষা বস্তো রুষসো জরয়ংতীঃ।
মিনতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্য
সুপত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ॥

ঋগ্বেদ, ১ম, ১৭৯ সূক্ত।

ভগবতী লোপামুদ্রা মহর্ষি ভগবান্ অগস্ত্যের ভাগ্য গগনের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ;—তাঁহার অতিমানুষ ভয়াবহ শবসাধনের আত্মা মহীয়সী শক্তি। যে শক্তির প্রভাবে তিনি গঙ্গাদ্বার হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত রাক্ষসশূন্য করিয়াছিলেন, যে শক্তির সাহায্যে তদানীন্তন আর্য্য ভারতকে দস্যুদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ভগবতী লোপামুদ্রা সেই মহীয়সী শক্তির আধার। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার আদিমকালে এই বিশ্ববন্দনীয়া দেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যৎকালে আর্য্যাবর্ত্তেরও সকল স্থানে আর্য্য প্রভুতা অপ্রতিহত হইতে পারে নাই, শ্রুতর্বা ও ব্রধ্নশ্ব, যযাতি ও ত্রসদস্যু প্রভৃতি নরপতিগণ যৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের স্থানে স্থানে বিরাট হিন্দুরাজ্যের ভিত্তিশিলা স্থাপন করিতেছিলেন, ভগবতী লোপামুদ্রা সেই সময়ে বিদর্ভ রাজবংশে উদ্ভূত হয়েন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে মহাভারতে এই অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা প্রকটিত আছে।

একদা মহর্ষি অগস্ত্য একটী বিবর মধ্যে কতকগুলি মানবকে অধোমুখে লম্বমান দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাঁহারা বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন, "আমরা তোমার পিতৃলোক; সন্তানার্থী হইয়া এই গর্ত্ত মধ্যে লম্বমান রহিয়াছি। হে পুত্র অগস্ত্য! তুমি যদি আমাদিগের উত্তম অপত্য উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমরা এই যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।"

সত্যধর্ম্মপরায়ণ তেজস্বী অগস্ত্য কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আমি আপনাদের এই বাসনা পূর্ণ করিব। আপনারা মনোদুঃখ দূর করুন।" এতদিন অগস্ত্য দারপরিগ্রহের বিষয় একবারও চিন্তা করেন নাই, কিসে আর্য্য সন্তানগণের দুঃখ দূর হয়, কিসে আর্য্যাবর্ত্ত দানবশূন্য ও নিষ্কণ্টক হয়, এতদিন তাঁহার ইহাই একমাত্র ধ্যান ছিল। সেই জন্য তিনি ঋষি হইয়াও ক্ষত্রিয়বীরের ন্যায় সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিতেন, ব্রাহ্মণ হইয়াও নিরন্তর দানবমেধ যজ্ঞ করিতেন। তাঁহার সেই মহতী শবসাধনা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। অনেক রাক্ষসরাজা নিপতিত হইয়াছে। তিনি এখন ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন:

"সনা তা ত ইংদ্র নব্যা আগুঃ
সহো নভোঽবিরণায় পূর্ব্বীঃ।
ভিনৎপুরো ন ভিদো অদেবী
র্ননমো বধরদেবস্য পীয়োঃ॥"

হে ইন্দ্র! নব্য ঋষিগণ তোমার সনাতন প্রসিদ্ধ বীরকর্ম্মের স্তুতি করে, তুমি অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিবারণের

জন্য বিনাশ করিয়াছ। তুমি দেবরহিত বিপক্ষ নগর সকল ভেদ করিয়াছ এবং দৈব রহিত শত্রুর অস্ত্র নত করিয়াছ। *

এখন বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল দস্যু আছে, ক্রমে তাহাদিগের বিনাশ করিলে চলিবে; এক্ষণে পিতৃ-পুরুষগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত সন্তা-নোৎপাদন একান্ত আবশ্যক, অতএব দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি আপনি যে, পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন, এতাদৃশী স্ত্রী দেখিতে পাইলেন না। ইহার পরযে যে প্রাণীর যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর, সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ পূর্ব্বক তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটী কন্যা নির্ম্মাণ করিলেন। তৎকালে বিদর্ভাধি-পতি পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিতে-ছিলেন, মহাতপস্বী অগস্ত্য মুনি আপ-নার নিমিত্ত নির্ম্মিতা সেই কন্যাটী বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। সেই শুভাননা সুভগা কন্যা রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীর-সৌন্দর্য্যে সৌদা-মিনীর ন্যায় কান্তিমতী হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৈদর্ভ মহীপাল কন্যা জন্মিয়াছে দেখিয়া অতিশয় হর্ষ সহকারে দ্বিজাতিদিগকে তাহা বিজ্ঞাপন করি-লেন। দ্বিজগণ ঐ কন্যার নাম লোপা-মুদ্রা রাখিলেন।

এই বিবরণ পাঠ করিলে সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ভূতভাবন মহাত্মা মুনিগণের অদ্ভুত যোগ-বলের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাদের কোন কার্য্যই অবিশ্বাস্য বলা যায় না। যিনি মহর্ষি অগস্ত্যের এই কার্য্যে আস্থা স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, তিনি অন্ততঃ ইহাও বিশ্বাস করিতে পারেন যে, বিদর্ভ-রাজ সন্তানের নিমিত্ত মহাত্মা অগস্ত্যের পূজা করিয়া তাঁহার বরে সেই লোক-ললামভূতা কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, জগতের প্রধান প্রধান প্রাচীন রমণীগণের উৎপত্তি এইরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য উভয় জগতেরই পৌরাণিক গাথা সকল এইরূপ একই সুরে বাঁধা।

অনুপমরূপলাবণ্যবতী শুভলক্ষণা লোপামুদ্রা পাকশিখা ও সলিলস্থ উৎ-পলিনীর ন্যায় আশু বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত এক শত কন্যা ও এক শত দাসী তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। উচ্চ রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া উপাদেয় বিলাসভোগে লালিত হইয়া যে যৌবন বয়সে ললনাগণ কেবল প্রণয়চিন্তাতেই নিমগ্না থাকেন, রাজ-কুমারী লোপামুদ্রা সেই বয়সে একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার সচ্চরিত্র্য, সদাচরণ ও সুশীলতায় তদীয় পিতা ও স্বজনগণ সর্ব্বদাই পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। ধার্ম্মিকার অগ্রগণ্যা সেই তরুণীর তপঃশুদ্ধ দেহ হইতে এমনই তেজঃপুঞ্জ বিস্ফুরিত হইত যে, তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত অনেক রাজা লালায়িত হইলেও ভয়ে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিত না। লোপা-মুদ্রার পিতা তাঁহাকে তদ্রূপ শীলাচার সম্পন্না ও যুবতী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ঈদৃশী কন্যা কাহাকে প্রদান করি।"

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদ।

মহর্ষি অগস্ত্যের সময়ে আর্য্যজাতি প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলেও বর্ণভেদ বা জাতিভেদের কোন নিদর্শনই তাৎকালিক কোন বৃত্তান্তে দেখা যায় না। ঋগ্বেদে অগস্ত্যরচিত যতগুলি সূক্ত আছে, প্রায় তৎসমুদায়েই "রাজা" "প্রজা", "যজমান", "অধ্যর্য্যু" প্রভৃতি শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার কোনটীতেই "ব্রাহ্মণ", "ক্ষত্রিয়", "বৈশ্য" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই। এরূপ হইলেও তৎকালে ঋষিকুল ও রাজকুল যে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ প্রকটিত আছে। সেই সকল ঋষি অনেকস্থলে রাজকন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিতেন। ইহার বহুল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে কপিল জননী ভগবতী দেবহূতি ও অগস্ত্য-বনিতা লোপামুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্যা। সেই সকল লোকবিশ্রুতা মহিলাগণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তদানীন্তন নৃপতিগণ ঋষিদিগের সহিত কন্যার বিবাহ. অধিকতর সম্মানকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। হিন্দুসমাজে জাতিভেদ দৃঢ়ভিত্তির উপর ন্যস্ত হইলেও ঐ প্রথা বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল,—এমন কি পাণ্ডবদিগেরও সময়ে ইহার অল্প বিস্তর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। ক্রমশঃ—

চুনার।

(২)

আচার্য্যকূপ।—আজ অগ্রহায়ণ মাসের ২রা তারিখ *। শুনিলাম, চুনারে আজ বড় সমারোহ—আচার্য্যকূপের অন্নকূটের মেলা। অন্নকূট উপলক্ষে ৺বৃন্দাবনে মহাসমারোহ হয়। চক্ষে না দেখিলে সে আনন্দ অনুভূত হয় না। কলিকাতা সহরে বাগবাজারে মদনমোহনের বাটীতেও কম সমারোহ হয় না। মনে বড় সাধ ছিল, এবার বৃন্দাবনধামে অন্নকূট দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, চুনারে থাকিয়াই মনে মনে আজ সে দৃশ্য অনুভব করিয়া লইতে হইবে। মন বড় খারাপ। সর্ব্বদাই যেন বোধ হইতেছে—

> কি করি, কোথায় যাই, কোথা গেল মন,
> হারায়েছি যেন চির যতনের ধন।

বেলা ৩টা বাজিল, আমি ও আরও জন ছয় বাঙ্গালী বাবু মিলিয়া মেলা দেখিতে চলিলাম। দূর হইতেই মেলার গোলমাল শুনা গেল, নিকটে গিয়া দেখি, এ সকল স্থানের পক্ষে মেলাটী নিতান্ত ছোট নয়। এক্কার ভিড় হইয়াছে খুব, তারপর মানুষের জনতা। যত খোট্টা ও মাড়োয়ারী লইয়াই মেলা। যে বাটীর ভিতর আচার্য্যকূপ আছে,

* বৃন্দাবনে ও কলিকাতায় ,৩রা কার্ত্তিক অন্নকূট হইয়া গিয়াছে, চুনারে কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে এই মেলা হয়।

তাহারই বহিঃপ্রাঙ্গণে মেলা বসিয়াছে। ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদির দোকানই অধিক, শাকসবজী তরকারী প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে বিক্রিত হইতেছে; মনিহারী, খেলানা, মাটীর জিনিষ, বাসন প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যাদিরও অভাব নাই। লোক জমিয়াছে প্রায় আড়াই হাজার। শুনিলাম রাত্রিকালে আরও লোক হইবে। মেলা তিন দিন থাকে। এই তিন রাত্রি অনবরত জুয়া খেলা চলে। এলাহাবাদ, মির্জাপুর, কাশীধাম প্রভৃতি অনেক অনেক স্থান হইতে জুয়ারীগণ জুয়া খেলিতে আসিয়াছে। দেশের লোকের ত কথাই নাই। সমস্ত দিন পরিশ্রমে যে যাহা উপার্জ্জন করে, রাত্রিকালে জুয়া খেলাতেই তাহা নষ্ট করে, তারপর কপর্দ্দকশূন্য অবস্থাতে ভিক্ষা করে। প্রমাণ হাতে হাতে দেখিলাম। এ তিন দিন ভদ্র ও বাবুবেশধারী অনেক ভিক্ষার্থীর আমদানী। ইহাদের অনেকেই বদমায়েস্ লোক; সুবিধা পাইলে ছলে, বলে, কৌশলে নিরীহ লোকের নিকট হইতে যাহা কিছু পায়, আদায় করিতেও ইহারা বিরত নহে। গবর্ণমেণ্ট হইতে এ তিন রাত্রি জুয়ারীগণ জুয়া খেলিতে আদেশ প্রাপ্ত হয়।

বাটীখানি সুন্দর, স্থানে স্থানে প্রস্তরময় মূর্ত্তি স্থাপিত, চতুর্দ্দিকে বাগান, দুইটী বেশ পুষ্করিণীও আছে। এসকল দেশের পক্ষে এ পুষ্করিণী দেখিবার উপযুক্ত বটে; বাঁধান ঘাটও আছে। পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরা বা বাগানের পুষ্পচয়ণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। বাহিরের প্রাঙ্গণে একটী ধর্ম্মশালা আছে। তথায় অনেক অতিথিও পাকাদি কার্য্য সমাধা করিতেছেন, দেখিলাম। বেলা প্রায় ৫টার সময় একটীদল ভজন গাহিয়া গেল; এটীও অন্নকূট উৎসবের একটী অঙ্গ। রাত্রিকালে সমস্ত রাত্রিই প্রায় ভজন গীত হয়। শুনিতে মন্দ নহে।

শুনা যায়, পূর্ব্বকালে দক্ষিণদেশে পুরুষোত্তম ভট্ট নামে এক সাধু ছিলেন। ব্রহ্মদর্শন লাভ প্রত্যক্ষ করিবার মানসে তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপিত হইলে দৈববাণী হয় যে, স্বয়ং ব্রহ্ম নরদেহে তাঁহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য স্বামী নামক ঐ বংশের জনৈক ব্যক্তি কাশীধামে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুকাল পরে তীর্থ দর্শনেচ্ছা প্রবল হওয়ায় সস্ত্রীক তিনি তীর্থ পরিদর্শনে বহির্গত হয়েন। স্ত্রী তাঁহার তৎকালে পূর্ণ গর্ভবতী। চুনারে আসিয়া পথিমধ্যে উপরোক্ত কূপের নিকট তাঁহার স্ত্রী একটী সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে পরিভ্রমণ অসাধ্য ও অনুচিতজ্ঞানে বল্লভাচার্য্য সদ্যোজাত শিশুকে উক্ত কূপের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া গন্তব্যপথে পুনরায় চলিলেন। তীর্থাদি পরিদর্শনে তাঁহাদের অনেক দিন কাটিল; তৎপরে গৃহ প্রত্যাগমনকালে উক্ত কূপের নিকট পঁহুছিয়া তাঁহারা দেখেন যে, কূপ সন্নিধানে জনৈক পুরুষ একটী সুন্দর বালক কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। সমীপস্থ হইবামাত্রেই পুরুষটী বল্লভাচার্য্যের স্ত্রীর ক্রোড়ে বালকটীকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন এই তোমার সেই সদ্যোজাত কূপনিক্ষিপ্ত শিশু সন্তানকে লও। এই বলিয়া তিনি

কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, আর দেখা গেল না। ঐ বালককে স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানে বল্লভাচার্য্য তাঁহার নাম রাখিলেন—বিট্টল নাথ; আর কূপের নিকট তাঁহার আদি-গদি স্থাপন করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাঁর ৭টী গদি; ৮ কাশীধামে ও অন্যান্য স্থানেও ইহাঁর গদী আছে। তাঁহারই বংশধরগণ এই বাটী, বাগান, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং "কূপটী প্রস্তরময় করিয়া নাম দিয়াছেন আচার্য্যকূপ"। শ্রাবণমাসের প্রতি রবিবারে এখানে মেলা হয়। স্নানের জন্য অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। আর অন্নকূটের সময় প্রতি বৎসর যেরূপ মেলা হয়, তাহার আভাস ত পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

গঙ্গেশ্বরনাথ।—এক্ষণে যে স্থানে গঙ্গেশ্বরনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, শুনা যায়, বহুদিন পূর্ব্বে তথায় একটী মৃত্তিকা স্তুপ মাত্র ছিল। এক সময় বন্যায় গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় উক্ত স্তুপ জলমগ্ন থাকে। মৃত্তিকা স্তুপের ভিতর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ও তাঁহাকে লইয়া পঞ্চদেবের সহিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বলিয়া স্বপ্ন-যোগে এক ব্যক্তি আদিষ্ট হন। তিনি উক্ত শিবলিঙ্গ উত্তোলনের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু বহুদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা খনন করিলেও শিবলিঙ্গের অন্ত পাওয়া গেল না। বাধ্য হইয়া তিনি তখন সেই স্থানেই মন্দির নির্ম্মান করাইয়া দিলেন। গঙ্গার জল বৃদ্ধি হেতু শিবলিঙ্গ প্রকাশ হওয়ায় নাম হইল—গঙ্গেশ্বরনাথ।

হিন্দুধর্ম্মের পরম শত্রু, হিন্দুদেবদ্বেষী যবন বাদসাহ আরংজীব চুনারে আসিয়াই গঙ্গেশ্বরনাথের ধ্বংশ সাধনে কৃতযত্ন হয়েন কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া 'য পলায়তি, স জীবতি' বাক্যের সার্থকতা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মৃত্তিকার ভিতর হইতে শিবলিঙ্গ উত্তোলনের জন্য তিনি অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই কেহ উহা উঠাইতে পারিল না দেখিয়া অবশেষে মুদ্গর প্রহারে উক্ত মূর্ত্তি ভগ্ন করিতে আদেশ দিলেন। শিবলিঙ্গের মস্তকে সবলে আঘাত করিতে লাগিলেন। এ আবার কি! প্রস্তরের ভিতর হইতে, রুধির নির্গত হয় যে! সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। কিন্তু তাই বলিয়া প্রহারে বিরাম দিলে চলিবে কেন? এক পক্ষে সম্রাটের আদেশ পালন, পক্ষান্তরে কাফের হিন্দুর দেব-মূর্ত্তি ধ্বংসে ধর্ম্মার্জ্জন। আঘাত করিবার জন্য যবন অনুচরগণ উত্থিতহস্ত কিন্তু আর কাহাকেও প্রহার করিতে হইল না, হস্তের মুদ্গর হস্তেই রহিল। অকস্মাৎ মন্দিরের ভিতর ভৈরব মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ভয়ানক বিভীষিক প্রদর্শন করিতে লাগিল। আরংজেব প্রস্থান করিলেন, অনুচরবর্গও তাঁহার অনুসরণ করিয়া জীবন রক্ষা করিল।

চক্রদেবীর স্থান।—ইহাঁরও মন্দির গঙ্গেশ্বরনাথের মন্দিরের নিকট। মন্দিরের ভিতর একখানি চক্র আছে, তাহাতেই চক্রদেবীর আবির্ভাব আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। গঙ্গেশ্বরনাথের মূর্ত্তির সহিতই মৃত্তিকার অভ্যন্তরে এই চক্রখানি ছিল।

কথিত আছে, জনৈক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত মূর্খ ছিল বলিয়া মনের ক্ষোভে সে চক্রদেবীর নিকট হত্যা দেয়। সূর্য্যা-

স্তের পর চক্রদেবীর স্থানের নীচে দণ্ডায়মান থাকিতে তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছিল। আদেশমত সন্ধ্যার সময় সে তথায় দাঁড়াইয়া আছে, একটী বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া চক্রদেবী তথায় আসিয়া ব্রাহ্মণের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণেরও দিব্যচক্ষু উন্মিলিত হইল। "মা নিষাদ ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ—যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মাবধী কাম মোহিতঃ" বাক্য উচ্চারিত হইয়া বাল্মীকির কবি হওয়ার ন্যায় ইনিও তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। আরও শুনা যায় যে, সময়ে সময়ে চক্রদেবীর স্থান হইতে বৎস লইয়া একটী গাভী নির্গত হইত কিন্তু কি কারণে জানি না, এক সময়ে জনৈক কায়স্থ উক্ত চক্রের উপর মদিরা ঢালিয়া দিয়াছিল, সেই অবধি কেহ আর উক্ত গাভীকে নির্গত হইতে দেখে নাই।

রৌজ বা ইমারতশাহী মক্কা মদিনা—বাদশাহ ফরখসাহার রাজত্বকালে জনৈক মুসলমান তাঁহাদের মহাতীর্থ মক্কা মদিনার একটী নক্সা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরম পবিত্র সামগ্রী জ্ঞানে তিনি উহা সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া চূনার গড়ের পুরাতন নীমগারদ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন, ও সেইখানে ইমানের চবুতর বা বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া হয়; এতাবৎকাল ঐ নক্সা নীমগারদ ঘরেই ছিল। ইংরাজগণ যখন কেল্লার সহিত সাধারণের সম্পর্ক উঠাইয়া দিলেন, মির্জা সাউদ নামক এক ব্যক্তি সেই সময় উক্ত সিন্দুকটী আনাইয়া বর্ত্তমান মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দিয়াছেন। মুসলমানগণের এটী পবিত্র দৃশ্য।

ভর্ত্তরীনাথের স্থান।—হিন্দু শাস্ত্রের আদি হইতে যে দেব দানবে বিরোধ শুনিয়া আসিতেছি, কোনকালে কি তাহার বিরাম নাই! পূর্ণ শান্তি কি সৌরজগতে একদিনের জন্যও বিরাজমান থাকিতে নাই। এই ঘোর কলিতে দেবাদির মাহাত্ম্য যে পরিমাণে হীনবল দেখা যায়, দেবদ্বেষীগণের দৌরাত্ম্যও সেই পরিমাণে প্রবল বলিয়া বোধ হইতেছে। আর কিছু না হউক, পুরাণ বর্ণিত ভীষণকায় দানবগণের সহিত রক্ত মাংস দেহধারী দেবগণের বিরোধ এখন সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও সভ্যতম উনবিংশ শতাব্দীতেও যে অনেকানেক দেব মূর্ত্তিকে যথেষ্ট নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত আর কাহাকেও এখন দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। চূনার গড়ে যে সকল দেবমূর্ত্তি স্থাপিত ছিলেন, তাঁহারাও এ ভোগ হইতে অব্যাহতি পান নাই। ইংরাজগণ চূনার গড়ের স্বত্ব পাওয়ায় দেবদেবী মূর্ত্তিসমূহ স্বত্বচ্যুত হইলেন। মনসারাম নামক জনৈক যোগী সেই সময়ে ভর্ত্তরীনাথের মূর্ত্তি গড় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বেলবীর মহল্লায় স্থাপিত করেন। প্রবাদ আছে, প্রাতে শিশু, মধ্যাহ্নে যুবা ও সায়াহ্নে বৃদ্ধরূপে ভর্ত্তরীনাথ ভক্ত দর্শকবৃন্দকে দেখা দিতেন। এখন কেবল উহা শোনা কথা মাত্র। বাঙ্গালায় বোধ হয় ভর্ত্তরীনাথকে ভর্ত্তরীহরি বলে।

নৌলবীর।—সাহ কাসেমের বাটী নির্ম্মানকালে উক্ত কার্য্যের তত্ত্বাব-

ধারণে ইনিই নিযুক্ত হয়েন। শ্রম জীবিগণের হিসাব নিকাস করিয়া তাহাদের প্রাপ্য টাকা কড়িও ইনি চুকাইয়া দিতেন। ইনি একটী কৌশলময় সিন্দুক তৈয়ার করিয়াছিলেন। পারিশ্রমিক লইতে আসিলে নৌলবীর শ্রমজীবিগণকে ঐ সিন্দুকের ভিতর হইতে স্ব স্ব যথার্থ প্রাপ্য বাহির করিয়া লইতে বলিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—যাহার যাহা পাওনা, ঠিক তাহাই তাহার হাতে উঠিত, ইচ্ছা করিলে কেহ বেশী বাহির করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারিত না। এইরূপে তিনি পরিশ্রম ও প্রতারণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সিন্দুকটী যে কি কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল বহু অনুসন্ধানেও তাহা স্থির হয় নাই। এই জন্যই সাধারণে নৌলবীরকে ঈশ্বর জানিত লোক বলিয়া ভক্তিকরিত।

অপই দীক্ষিতকুল।—

এদেশে গোস্বামী যেমন সম্প্রদায় বিশেষের গুরুকুল, অপই দীক্ষিতকুলও সেইরূপ গুরুবংশ। গোস্বামীগণের সহিত অপই দীক্ষিতকুলের অবশ্য কোন সাদৃশ্যই নাই। অবতংসমণি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই কুলের আদিপুরুষ। তিনি দ্রাবিড় হইতে চুনারে আসেন ও এখানে কিছুদিন বাস করেন। একদিন সৈন্ধব লবণ বিছাইয়া একটী ঘরে জীবন্তে সমাধিস্থ হয়েন। সমাধির পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুত্র ও বিদ্যার্থী সুদর্শন পাঁড়েকে এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে সতর্ক থাকিয়া পাহারা দিতে বলেন। বর্ষান্তে সেই ঘরের ভিতর হইতে ডাক পড়ায় সুদর্শন উত্তর দিলেন। ঘরের ভিতর হইতে আশীর্ব্বাদ বচন নির্গত হইতে শুনা গেল। আজ পর্য্যন্ত সেই বাটীতে অপই দীক্ষিতকুলের গদি আছে। স্থানীয় অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ কুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

গুরু নানকের সংঘত।—

গুরু নানকের পরিচয় আর আজ নূতন করিয়া দিতে হইবে না। এখানেও উক্ত মহাত্মার একটী সংঘত বা মঠ আছে।

গোঁসাই সাহেবের মঠ।—

ঘিসাদাস নামক জনৈক কবিরপন্থী পূর্ব্বদেশ হইতে আসিয়া মনোরম ভগৎ নামক এক বণিকের নিকট থাকিতেন। অবর্ষণে এক বৎসর দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হওয়ায় কথায় কথায় উক্ত বণিক ঘিসাদাসের নিকট অনেক দুঃখ করিতে থাকেন। সাধারণের কষ্টের কথা শুনিয়া ঘিসাদাসের মনে দয়ারুদ্রেক হয় ও বর্ষণের জন্য ক্রিয়া করেন। যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপার এ সকলের কিছুই অনুষ্ঠান করিলেন না। কেবল স্নান করিয়া কমণ্ডলু পূর্ণ জল আনিলেন ও সেই জল আকাশে বরিষণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। সে বৎসরের বর্ষা দেখিয়া সাধারণে বুঝিল, ঈশ্বর গোঁসাইর প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া লোকে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে।

রাঘোজীর মহাবীর।—রাঘোজী নামক জনৈক সাধু থানার নিকটে এই মহাবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। রাঘোজীরও আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শুনা যায়।

এক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় উক্ত সাধু বালুঘাটে এক যজ্ঞ করেন, তাহাতে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি কাশী যাত্রা করেন। তথায় মনিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাপূজা সমাপনান্তে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বেলা এক প্রহরের সময় আকাশে দৃষ্টি করিয়া শিষ্যগণকে "শ্রীরাঘোজী জী কি জয়" শব্দ উচ্চারণ করিতে বলিলেন। শিষ্যগণ বারবার উহাই উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া রাঘোজীর প্রাণ-বায়ু নির্গত হইল। শিষ্যগণ প্রস্তর নির্ম্মিত সিন্দুকে তাঁহার মৃতদেহ রাখিয়া ভাগিরথীর জলে নিমজ্জন করিলেন।* ইঁহার স্মরণার্থ আজ পর্য্যন্ত এখানে রাম-লীলা হয়।

* অনেক সাধুর সমাধিক্রিয়া তখন এই রূপেইসমাধা হইত।

গৃহ ও গৃহিনীপনা।

দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, এবং এই ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইলে আমরা কোথায় যাইব আবার আসিব কি না এ সব বার্ত্তা আমরা বিশেষরূপ অবগত নই। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, কি অবস্থা হইতে কিরূপ কর্ম্মফলে এই মানব জীবন লাভ করিয়া এখানে আসিয়াছি ইহার অভ্রান্ত উত্তর কে দিবে? ভিন্ন ভিন্ন রূপ দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন রূপ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সকলেই মহাত্মা, সকলেই দর্শন শাস্ত্রবেত্তা, সকলেই মহাপণ্ডিত। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী, সকলেই আপন মত সমর্থন করিয়া ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই দেহ যে নশ্বর, এই দেহ যে এক দিন লয় পাইয়া যাইবে, বিবিধ সুগন্ধি বিলেপনে, কলপের আবরণে অথবা কৃত্রিম দন্ত ধারণে, বার্দ্ধক্য গোপন বা দেহের দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব হইবে না। এ কথা সর্ব্ববাদি সম্মত। এ মাটীর দেহ এক দিন না এক দিন মাটী হইবে। ধন সম্পত্তি বল, খ্যাতি প্রতিপত্তি বল, মান সম্ভ্রম বল, বিদ্যা বুদ্ধি বল, কিছুতেই দেহের দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থায়িত্ব হইবে না। পর্ণশালা নিবাসী ভিক্ষান্নবর্দ্ধিত দরিদ্রের দেহ যষ্টি যেরূপে লয় পাইয়া থাকে, রাজাট্টালিকাবাসী বিবিধ সুখাদ্য ভোজনে পরিপুষ্ট এক জন সম্রাটের দেহও সেই গতিলাভ করিবে। এ সম্বন্ধে সকল দার্শনিক এক বাক্যে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা দেহের পারিপাট্য জন্য নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদে তাহাকে আবৃত করি, সুবাসিত তৈল মর্দ্দন দ্বারা তাহার কান্তি বাড়াইয়া এবং সাবানাদির দ্বারা তাহার শোভাবর্দ্ধনে যত্নবান হই। কিন্তু কিরূপে যে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের স্থায়িত্ব করিতে হয়, কিরূপ উপায় দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন করিতে হয়। কিরূপে ইহার পরিবর্দ্ধন করিতে হয়, আমরা সে বিষয়ে বিশষেরূপ অনুধাবন করিয়া

দেখি না। দেহকে ভাল রাখিবার জন্য আমরা সময় সময় এরূপ উপায় অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা দেহের বাস্তবিক উপকার না হইয়া বিষম অপকার হইয়া থাকে। এমন কি তদ্দ্বারা স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া দেহ অকালে নষ্ট হইয়া যায়।

দেহ ধারণ করিয়া আমরা এ জগতে সুখ ভোগ করিতে আসি, কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসি, অথবা আপনাপন অভিনেতব্য বিষয়ের অভিনয় করিতে আসি, যে কারণে হউক, আমাদের এখানে আসিতে হয়, অথবা আসিয়া থাকি। যে জন্যই হউক, কিছু দিন থাকিতে হইবে। যখন এখানে কিছু দিন থাকা স্থির, তখন দেহ যাহাতে ভাল থাকে, যাহাতে নীরোগ থাকে, যাহাতে পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। ক্ষুধায় যথেচ্ছ আহার, পিপাসায় জলপান, রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া, বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে শয়ন করিলেই যথেষ্ট হইল না। বাল্যকালে পাঠ, যৌবনে বিষয়কর্ম্ম ও সংসার ধর্ম্ম, এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র পৌত্রোপার্জ্জিত ধনধান্য ভোগ অথবা ধর্ম্ম পথানুশরণ করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথানুরূপ করা হইল না বয়ঃপ্রাপ্তে বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসার ধর্ম্ম করিলে সংসার প্রতিপালন যথা রীতি করা হইল, এরূপ বিবেচনা করা ঠিক নহে। শরীরের সহিত মনের নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, একের উৎকর্ষে বা অপকর্ষে অন্যটীর সুস্থতা বা অসুস্থতা বৃদ্ধি হইবার কথা। আবার এদিকে মনে বিকার উপস্থিত হইলে অমনি দেহের মালিন্য প্রতীয়মান হয়, এমন কি মানসিক চিন্তার আধিক্য হইলে দেহ একবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যখন মনের সহিত দেহের এরূপ সম্বন্ধ, তখন কি উপায়ে দেহ মন ভাল রাখিতে পারা যায় সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত।

ধর্ম্ম জীবনের মূল, কীর্ত্তি শৈলে উঠিবার সোপান, উন্নতির আলম্বন—সংসার পারাবার পারের পাথেয়। যে ধর্ম্ম আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও সুখের হেতু সেই ধর্ম্ম সুস্থ ও সবল শরীর না হইলে অর্জ্জন করা কষ্টসাধ্য। জগতে কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হইতে হইলে, সুখ ও শান্তি উপভোগের বাসনা থাকিলে, শরীর নীরোগ করা আবশ্যক। নিদাঘের প্রখর সূর্য্য কিরণ, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা, শীতের দারুণ কঠোরতা, সুস্থ শরীর না হইলে সহ্য করা যায় না। পরোপকার ও সর্ব্বদা পরহিতানুষ্ঠানে তৎপর বা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্য করিতে হইলে কখন বা আতপতাপ তপ্ত, কখন বা বারিধারা সিক্ত সময়ান্তরে বা পৌষ মাঘ মাসের দারুণ শীতে অনাবৃতাবস্থায় যে বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য জনহীন স্থানে রজনী যাপন করিতে হইবে না এ কথা কে বলিতে পারে। কখন কাহার ভাগ্যে কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, পরোপকার হেতুই হউক বা আপনার দশা বিপর্য্যয় বশতঃই হউক, অনেক সময় অনেককে গ্রীষ্ম বর্ষাদি জনিত অশেষ রূপ যাতনা সহ্য করিতে হয়। যদি সুস্থ ও সবল শরীর হয় তবে তৎসমুদায় এক রকমে সহ্য করিতে পারা যায়, নতুবা পীড়িত ও অসুস্থ দেহ হইলে, তৎসমুদায় যাতনা শত গুণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে,

এমন কি কখন কখন কাহাকেও পঞ্চত্ব পাইতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গের ফলের মধ্যে যে ফল লাভের বাসনা থাকে, সুস্থ শরীরে হইলে তাহা আয়াস সাধ্য ও কষ্ট লভ্য হইলেও লাভ করিবার আশা, কিন্তু রুগ্ন শরীরে সে সুফল লাভের আশা একবারেই থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"সস্ত্রীকঃ ধর্ম্মমাচরেৎ"। স্ত্রীসমভি-ব্যাহারে আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম সুসম্পন্ন করি; স্ত্রী আমাদের ধর্ম্মপথের সহচরী। এই স্ত্রী সহায় করিয়া আমরা যাগযজ্ঞ সমাপন করি। স্ত্রী হীন হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার থাকে না বলিয়া রামচন্দ্র জানকী নির্ব্বাসন দিবার পর সুবর্ণ সীতা সঙ্গে করিয়া আরব্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। সেই কারণ বোধ হয়, পুরুষেয় স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিলে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। স্ত্রী-কেবল বিলাসের উপকরণ নয়। স্রবক চন্দনের ন্যায় শরীরের শোভার্থ নয়, অথবা কেবল প্রবাসের সঙ্গিনী নয়। স্ত্রী আমাদের "কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষুপত্নী ক্ষময়াধরিত্রী। স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গে সখী"। মন্ত্রী, দাসী, পত্নী প্রভৃতি অনেক গুলি বিষয়ের অভিনয় স্ত্রীকে সংসার রঙ্গ মঞ্চে দেখা-ইতে হয়। তিনি কখন স্বামীর সুখের সময় প্রফুল্লবদনে ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বামি সোহাগিনী হইয়া থাকেন, আবার বিধি কৃত বিপদে তাঁহাকে ভাসমান দেখিলে বিমুক্ত কুন্তলা হইয়া শোকাকুল চিত্তে বিলাপ করিয়া থাকেন। কখন বা তাঁহার পীড়া হইলে রোগীর শয্যায় বসিয়া অনশনে বা অর্দ্ধাশনে অহর্নিশ মলিন বদনে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করেন কখন বা তাঁহাকে উন্নতি সোপানে আরূঢ় দেখিয়া পূর্ব্বকৃত সুকৃতি বা শিব-পূজার ফলে এরূপ স্বামিলাভ হইয়াছে বলিয়া কায়মনে দেবতা সন্নিধানে জন্ম জন্মান্তরে এইরূপ পতি পাইবার কামনা করেন। কখন বা তাহার সৌভাগ্য বলে নানালঙ্কার ভূষিতা হইয়া একত্র বাসে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, আবার তাঁহার লোকান্তর হইলে, সেই স্ত্রীই সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈধব্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। স্ত্রী-স্বামীকে-ধর্ম্ম পথে প্রবর্ত্তিত করে, পাপ পথে গমনোন্মুখ দেখিলে সেই ঘৃণ্য পথ হইতে নিবৃত্ত করে, কার্য্যে শিথিল যত্ন দেখিলে উৎ-সাহ দ্বারা কার্য্য প্রণোদিত করে। পুরুষে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে২ ক্লান্ত হইলে স্ত্রীর নিকট শ্রান্তি দূর করে, হতাশ হইলে পুনরুৎসাহিত হয়, অভি-লষিত ফললাভ করিলে স্ত্রীর নিকট আসিয়া সিদ্ধ কাম জনিত আমোদ পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিয়া থাকে। স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ বড়ই জটিল, বড়ই পবিত্র। এ সম্বন্ধ মনোমালিন্যে নষ্ট হয় না, ইচ্ছা মাত্রে অবলীলা ক্রমে এ সম্বন্ধ সূত্র ছিন্ন করা যায় না, আইন বলে এগ্রন্থি ভেদ করা যায় না, এমন কি কালের কৃপাণেও কাটা যায় না।

রাজ্য যেমন মন্ত্রীর দ্বারা, তরণী যেমন কর্ণধার দ্বারা, গৃহও তেমনি গৃহিণীর দ্বারা পরিচালিতা। মন্ত্রীর মন্ত্রণা-গুণে ও বহু দর্শন জ্ঞান প্রভাবে রাজ্য যেমন সুশৃঙ্খলায় ও নিরাপদে চলে, কর্ণ-ধারের কর্ণধারণ গুণে ও জলপথের

অভিজ্ঞতায়, তরণী যেমন নিরাপদেচলে, রমণীর গৃহিনীপনায় ও কার্য্য কুশলতায় সংসারও সেইরূপ সুখে সচ্ছন্দে চলে। রাজা যেমন মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে প্রজার সুখ শান্তি বিধান করিতে পারেন, শত্রু দমন দ্বারা তাহাদের দুঃখ প্রশমন করিতে পারেন, বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, তাঁহার বহুদর্শন জ্ঞান প্রভাবে সমস্ত বিপদ বিনাশ করিতে পারেন, গৃহের কর্ত্তাও সেইরূপ গৃহিণীর পরামর্শে ও সাহায্যে প্রজাপালন করিতে পারেন, তাহাদের কোন বিপদ বা পীড়া হইলে তাহার সাহায্যে প্রশমিত করিতে পারেন। সংসারের সমস্ত ভার গৃহিনীর উপর ন্যস্ত করিয়া কর্ত্তা নিশ্চিন্ত।

স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া গৃহ। যে গৃহে স্ত্রী নাই সে গৃহ অরণ্য সদৃশ, যে গৃহে পুরুষ নাই সে গৃহ অরক্ষিত। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে, আর সেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য প্রত্যেকে এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পুরুষ অর্থোপার্জ্জন করিবে, সংসারের ব্যয় সংকুলান করিবে, এবং শত্রু হস্ত হইতে গৃহ রক্ষা করিবে। রমণী সন্তান পালন করিবে, গৃহকার্য্য করিবে, পরিমিত ব্যয়ে সংসার চালাইবে। পুরুষে বল ও বুদ্ধির কার্য্যে রত থাকিবে, রমণী স্নেহ, মায়া, দয়া দেখাইবে। বল বুদ্ধি না থাকিলে পুরুষে উপায়ক্ষম হইতে পারে না, উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। রমণী হৃদয়ে স্নেহ দয়া প্রভৃতি না থাকিলে সন্তান পালন হয় না। রোগীর সেবা শুশ্রূষা হয় না, দুঃখের সময় সান্ত্বনা মিলে না। রমণী পরদুঃখ বিগলিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকরণের নিমিত্ত স্বামীকে প্রোৎসাহিত করিবে। পুরুষেরও যে দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ দরকার নাই বা রমণীর বল বুদ্ধি আবশ্যক নাই এ কথা বলিতেছি না। তবে রমণীর স্নেহ, দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি থাকা চাই এবং বল ও বুদ্ধি উক্ত প্রকার গুণের যথাযথ প্রয়োগ করিবার জন্য আবশ্যক। পুরুষের বলবুদ্ধি. বিশেষ আবশ্যক এবং অন্য গুণ অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিবে।

রমণীর মন কাচের মত স্বচ্ছ, কঠিন অথচ ভঙ্গপ্রবণ। কাচের ন্যায় আর একটী মহৎ গুণ এই যে সহসা ইহাতে অন্য কিছু অঙ্কিত হয় না। স্বামী রমণীর পক্ষে বহুমূল্য হীরক, সেই কারণ স্বামীর দ্বারা তাহার মন অঙ্কিত হইতে পারে। কাচ ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া যেমন সাবধানে ও নিরাপদে রক্ষা করিতে হয়, অভিমানিনী রমণীর সম্বন্ধেও সেই বিধি। একজাতীয় কাচের এরূপ গুণ আছে, তদ্দারা লণ্ঠনের মধ্যস্থিত আলোক অধিকতর উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। পুরুষের গুণ গ্রামও সেইরূপ রমণীর চিত্তে কাচের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত প্রখর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রমণীর মনে এমনই চিত্তচমৎকারিণী মহীয়সী শক্তি আছে, যদ্দারা তাহারা প্রবল পুরুষকে সৎপথে লইয়া যাইতে পারে। লণ্ঠনে রিফ্লেক্টার (reflector) বা আলোবিবর্দ্ধক কাচ থাকিলে যেমন বহুদূর স্পষ্ট দৃষ্টি হয়, ও সেই কাচ বিহীন হইলে আলো যেমন ক্ষীণজ্যোতি হয়, রমণী না থাকিলে পুরুষও সেইরূপ

ক্ষীণবুদ্ধি হইয়া পড়ে। রিফ্লেক্টার কাচের তারতম্যানুসারে আলোর হ্রাস বৃদ্ধি হয়, রমণীর মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষভেদেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে।

যে রমণীর সহিত আমাদের এরূপ সম্বন্ধ, যে রমণী জীবনের সহচরী, গৃহরাজ্যে মহারাণী, ধর্ম্মপথে সঙ্গিনী, যে গর্ভে পুত্র জন্মিয়া কুলপ্রদীপ হইবে, যাহার যুক্তি পরামর্শানুসারে পুরুষ সংসারে চালিত হইবে, চিন্তাজর্জ্জরিত হইয়া যাহার নিকট শান্তি পাইবে, সে রমণী নির্ব্বাচন বড়ই কঠিন। যাহার সহিত জীবন সম্বন্ধ, যে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিবে, লতার ন্যায় দেহতরু বেষ্টন করিবে, সে রমণী নির্ব্বাচনে দূরদর্শিতা চাই। যৌবনদশায় উন্মার্গগামি মন, ভাল মন্দ বিচার করিবার অবসর পায় না, রূপের মোহে সহসা আকৃষ্ট হয়, রূপের দাহিকাশক্তি আছে একথা ভুলিয়া পতঙ্গপ্রায় রূপের অনলে ঝাঁপ দেয়। তৎকালে উন্মত্তমন মাধবীলতা ভ্রমে বিষবল্লী আশ্রয় করিয়া থাকে। দূর হইতে শিমুলের রূপে আকৃষ্ট হইয়া মুগ্ধ মনভৃঙ্গ সুগন্ধ ও মধু উভয়েই বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই জন্য পিতা অথবা পিতৃব্য প্রভৃতি হিতাকাঙ্ক্ষী দূরদর্শী গুরুজনের দ্বারা কন্যানির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। যে গৃহিণী লইয়া গৃহ এবং যাহার গৃহিণীপনার উপর গার্হস্থ সুখ-নির্ভর করে সেই রমণী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিলে চলে না।

সুধাধবলিতা, মনোহারিণী, হর্ম্ম্যশ্রেণী অথবা তৃণপর্ণ সমাচ্ছাদিত দরিদ্র কুটীর সকলই গৃহ বটে; কিন্তু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। যে গৃহে গৃহিণী নাই, সে গৃহ মহাশ্মশান, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা পরিরক্ষিত দ্বার হইলেও তাহা অরক্ষিত, সুদৃঢ় কবাট অর্গলবদ্ধ হইলেও তাহা সম্যক নিরাপদ নহে, পরধনাপহরণেচ্ছু তস্করগণের দুষ্প্রবেশ হইলেও, তাহা শূন্যকোষ। যে গৃহে গৃহিণী নাই, তাহা মহাশ্মশান বলিয়া কখনও বিষম ভীতির সঞ্চার করে, কখন বা বাসের অযোগ্য, কখন বা শান্তিনদী বর্জ্জিত ঘোর মরুপ্রান্তরবৎ দেখায়। বহুমূল্য আসবাব দ্বারা সুসজ্জিত হইলেও গৃহিণী বিনা কেমন শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়। রাজপ্রাসাদও গৃহলক্ষ্মীর অবর্ত্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়া মনে কেমন একরূপ বীভৎস রসের উদ্রেক করিয়া দেয়। গৃহিনীর সুব্যবস্থা থাকিলে সামান্য পর্ণশালা দর্শন করিলে শান্তি কুটীর বলিয়া মনে হয়, সেখানে দুই দণ্ড কাল অবস্থিতি করিতেও বাসনা হয়, সেখানে কোন জিনিষ অধিক না থাকিলেও, সুবন্দোবস্তের গুণে অল্প বস্তু যেমন অনেক বলিয়া প্রতীত হয় এবং সেই সুবন্দোবস্ত অভাবে ধনীর গৃহে বহু সামগ্রীসত্ত্বেও কার্য্যকালে অদৃশ্য হইয়া যায়; কোন বস্তুর আবশ্যক হইলে, কে তাহা রাখিয়াছে, কোথায় রাখিয়াছে কে লইয়া গিয়াছে, কিছুরই স্থিরতা থাকে না।

যে গৃহে গৃহকর্ম্ম তৎপরামাতা নাই, প্রিয়বাদিনী প্রণয়িনী নাই। সেবারতা দুহিতা নাই, সে ভবন বাস অপেক্ষা বনবাস সুখকর। যে ভবনে ভার্য্যা মুখরা, কন্যা ক্রীড়াশীলা ও আমোদ প্রিয়া এবং জননী অযথা ব্যয়ে মুক্ত হস্তা, বহু অর্থাগম হইলেও সে ভবনের উন্নতি

হয় না এবং পুরুষ উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেও সুখী নহেন। যে গৃহে রমণীগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন না, পোষ্যবর্গের আহারাদির বিষয় পরিদর্শন করেন না, শয়ন কক্ষে বসিয়া সকল সময় হাসিয়া বা গল্প করিয়া কাটাইতে ভাল বাসেন, লক্ষ্মী সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যে গৃহে স্বামীহীনা রমণী বৈধব্য দশায় বিধবা জনোচিত আচরণ বা বিধবা জন নির্দ্দিষ্ট মতের অধীন হইয়া না চলিতে পারেন, যেখানে রমণী অহর্নিশ বিষন্ন মনে বাস করেন, যেখানে রমণী স্বামি সোহাগিনী হইতে না পারেন, সে ভবনে বিষের বাতি দিবারাতি জ্বলিয়া থাকে, সর্ব্ব মঙ্গলময় হরি সেখানে বিরাজ করেন না। যে গৃহে কুলকামিনী আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছাড়িয়া পুরুষের কার্য্যে নিযুক্ত, ধর্ম্ম পথ ছাড়িয়া বিলাস সাগরে ভাসমান যেখানে রমণী জাতি দেবারাধনা ভুলিয়া আমোদ প্রমোদ রত, সে গৃহ দিন দিন বিষাদসাগরের অতলস্পর্শগর্ভে নিমগ্ন হইতে থাকে। যে ভবনের রমণী সন্তান পালন করিতে না জানেন, গৃহসংস্কার করিতে না পারেন, আহারোপযোগী দ্রব্যের উপর লক্ষ্য না রাখেন, সে ভবনে চিকিৎসককে নিত্য আসিতে হয়। যে ভবনে রমণীগণ আয়ের অতিরিক্ত ওজনে চলিতে চান, যেখানে তাঁহারা যথার্থ ব্যয় নিরত হইয়া অমিত ব্যয়ে মুক্ত হস্ত হন, সে ভবন দুঃখ তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া যায়। যে ভবনে আর্য্যনারী থিয়েটার তীর্থ স্থান জ্ঞানে গমন করেন, উপন্যাস পাঁচালী, ব্রত কথা বিনিময়ে শ্রবণ করিয়া থাকেন, কুসুম নিচয় দেবার্চ্চনার উপযোগী না ভাবিয়া বিলাসোপকরণ বিবেচনায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে ভবনে রমণীর দেবীত্ব লোপ পাইয়া যায়।

কেবল কতকগুলি চাবি অঞ্চলে বাঁধিলে পাকা গৃহিণী হয় না, কেবল ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে গৃহিণী হয় না, বিবিধ সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত হইয়া পালঙ্কে বসিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইচ্ছামাত্রে দাস দাসীর দ্বারা আনাইয়া ব্যবহার করিলে সুগৃহিণী হয় না, কেবল স্বামীকে মন্ত্র মুগ্ধ করিয়া সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিলে সুপটু গৃহিণী হয় না। যাঁহারা কেবল কর্ত্তার আয়ের সমস্ত হিসাব লইবার জন্য অধীর হন, বৈবাহিক সকল বার সন্তোষ জনক তত্ত্ব না করিলে যাহারা বধূমাতাকে গঞ্জনা দেন, সামান্য কারণে অথবা রুষ্ট হইবার কারণ না থাকিলেও সেবক সেবিকার উপর তিরস্কার করেন, তাঁহারা গৃহিনীপনায় আদর্শ স্থানীয়া নহেন। গৃহিণীপণা অন্যরূপ, ইহা বড়ই শক্ত, বড়ই জটিল। সহজে ইহাতে অধিকার জন্মে না, কেবল পুস্তক পাঠে ইহার তত্ত্ব নিরূপিত হয় না, কেবল বুদ্ধিবলে ইহাকে অধিগত করা যায় না। গৃহিণীপণা শিক্ষা করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে পটুতা লাভ করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতে চেষ্টা থাকা চাই, এবং মাতা, শাশুড়ী অথবা তাহাদের তুল্যগুণ সম্পন্না প্রবীণা মাসী, পিসী সহোদরা কিম্বা ননন্দার নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যকলাপ প্রণালী শিক্ষা করা চাই। একটা নূতন কর্ম্মের ভার পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা বিধেয়।

প্রথমে কোন একটা কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে বাটীর প্রবীণা ও গৃহিনীপণা নিপুণা রমণীর দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হয় তাহা দেখা উচিত; দুই চার বার দেখিবার পর মনে মনে সেই কার্য্যের একটা ধারণা হয়; সেই ধারণা বলেও জননী বা তৎস্থানীয়া প্রবীনার উপদেশ অনু-সারে কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। যদি একবারে সিদ্ধিলাভ না হয়, তবে সেইরূপ কর্ম্মে পুনর্ব্বার ব্রতী হইবার সময় আবার পরামর্শ লইতে হইবে। যাবৎ সেই কার্য্যে দক্ষতা না জন্মে তাবৎ এইরূপ পরামর্শ লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। দুই একবার ভগ্নো-দ্যম হইলে অথবা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ করিলে গৃহিনীপণায় দক্ষতা জন্মিবে না।

বঙ্গভাষায়—বঙ্গ-সাহিত্য।

বঙ্গ সাহিত্যে অরাজকতা অল্প বিস্তর সকল বিভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যে অর্থাৎ নাটকাদি দৃশ্য-কাব্যে এই অরাজকতা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। নাটক লিখিতেছেন আজকাল সকলেই; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বঙ্গ সাহিত্যের এমন দিনে প্রকৃত নাটক এক খানিও নাই এরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে আজকাল অনেককেই দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি—একবার দেখা যাউক।

বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত জীবন্ত নাটক না থাকিলেও কিন্তু নাটক সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভিতর অত্যন্ত বলবতী। সেই কারণে নাটক নামে পুস্তকাদিও এত ছড়া ছড়ি, গড়া গড়ি, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নাট্য সমাজ, রঙ্গালয়, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি এখন এদেশের নগর উপনগর ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম প্রভৃতির অলি গলিতে বিদ্যমান। আজ কাল ইতর, ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, নর নারী সকলেই এই নাট্য রসে (বিকারে) নিমজ্জিত। নাটক বা রঙ্গালয় নাম শুনিলে তাঁহারা আনন্দে গলিয়া ঢলিয়া পড়েন। তাই আজ কাল বঙ্গ সাহিত্য লেখক হইতে নট (actor) পর্য্যন্ত নাট্যকার হইতেছেন। তার উপর আবার নাটুকে রাম নারায়ণ, সুকবি ও নাট্যকার মাইকেল, প্রধান নাট্যকার দীনবন্ধু, নাটকে সিদ্ধহস্ত কবি রাজকৃষ্ণ, নাটক ভক্ত নাট্যকার উপেন্দ্র নাথ দাস প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্যের মহারথিগণ একে একে বঙ্গীয় সাহিত্য সমর প্রাঙ্গণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহাদের সম-সাময়িক প্রধান নাট্যকার বাবু মনো-মোহন বসু এখন প্রবীণ হইয়া পড়িয়া ছেন, কাজেই শেষ দশায় বিশ্রাম লাভার্থ বঙ্গ সাহিত্য আসর হইতে অবসর (re-tire) গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল মধ্যে মধ্যে সখের হিসাবে "কবি" ও "হাফ্ আখড়াই" আসরের অস্তিত্ব রাখিয়া গুরু ঈশ্বর গুপ্তের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাহাও কেবল কলিকাতাস্থ ধনী সম্প্র-দায়ের খাতিরে পড়িয়া, ইচ্ছা স্বত্বে নহে।

তার পর আধুনিক কালের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর এক প্রকার বঙ্গ সাহিত্য আসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিকগণের মধ্যে কেবল সুকবি রবীন্দ্র নাথ বঙ্গ সাহিত্যে নাটক সৃষ্টি করিয়া দীন বঙ্গ ভাষার মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছেন। বঙ্গভাষা রবি বাবুর নিকট অনেক আশা করে। আধুনিক রঙ্গালয়ে আর একটী মহারথি নটকুল চুড়ামণী সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু গিরীশ চন্দ্র ঘোষ রঙ্গবিভাগে বহুদিনের অভিজ্ঞতা হেতু অনেক নাটক লিখিয়া বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চের মান বজায় রাখিতেছেন। এখনকার দিনে বঙ্গীয় মহারথিশূন্য রঙ্গ প্রাঙ্গণের তিনিই একমাত্র রথিশ্রেষ্ঠ, কাজেই তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই বলিতে হইবে। তাঁহার দেখা দেখি বা তাঁহার অনুকরণে যে কয়েক জন অভিনেতা নাটক লিখিয়া তাঁহাদেরই তত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাস্য রসের অবতার "ষ্টারের" অমৃত লাল বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। এই ত গেল বর্ত্তমান নাটক লেখকগণের তালিকা। তাহার উপর আবার সাহিত্য বাজারের "পুঁটে তেলী" গণও নাটক লিখিতেছেন। আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়, বঙ্গ সাহিত্যে এত নাটক-লেখক ও নাটক থাকিতে একখানিও প্রকৃত নাটক জন্মাইতেছে না। থিয়েটার ওয়ালাগণও দেশের লোকের নিকট হইতে যে উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য পাইতেছেন তাহা আশাতীত, তত্রাচ প্রকৃত নাটক না হইবার কারণ কি ? পাশ্চাত্য সভ্য দেশের ন্যায় এদেশের লোক যখন অত্যন্ত থিয়েটারভক্ত হইতেছেন, যখন ধনী হইতে মুটে মজুর-পর্য্যন্ত সকলেই থিয়েটারের জন্য লালাইত, যখন ছাত্রেরা বাটীর অভিভাবকদিগকে লুকাইয়া তাহাদের জল খাবারের পয়সা জমাইয়া থিয়েটার দেখিতে যায়, যখন ধনীগণ থিয়েটারের আমোদের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তখন বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত নাটক জন্মাইতেছেনা কেন ?

থিয়েটার ওয়ালাদের নাটক'ত কেবল লাফালাফি হুড়াহুড়ি আর বিকৃত রসিকতায় পূর্ণ। রঙ্গালয়ের "পুঁটে তেলী" নামক রঙ্গ সাহিত্য লেখকগণ যেন তেন প্রকারে দর্শক মণ্ডলীর (পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত) বর্ত্তমান বংশীয় দিগের রুচি অনুযায়ী মনমুগ্ধ করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই নাটক লেখার সার্থক ও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। নাটক লিখনের উদ্দেশ্য ও তাহার দায়ীত্ব বোধ তাঁহাদের আদউ নাই, কাজেই ভাল নাটক জন্মাইতেছে না।

বঙ্গসাহিত্যে কেন যে প্রকৃত ভাল নাটক জন্মাইতেছেনা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ২ দেশের লোকের প্রকৃতি প্রবৃত্তিরও পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। আজ কাল উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা স্রোতের প্রাবল্য হেতু আমরা বৈদেশিক বৈভবে আপনাদিগেকে বিভূষিত ও গৌরবান্বিত মনে করি। অবিরত বৈদেশিক স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া হিতাহিত জ্ঞান আমুল ছেদন করিয়া পুরুষকারকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় মজিয়াছি

(মরিয়াছি ?) সুতরাং ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কাপুরুষের ন্যায় কেবল পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের দাস হইয়া ফ্যাসান ও হুজুকের একটানা স্রোতে পড়িয়া কেবল অনবরত চিৎকার করিতেছি। পূর্ব্বের সে হিতাহিত জ্ঞান, সে সাহস আর নাই, বহুদিনের পরাধীনতায় অল্প বুদ্ধি লইয়া ঘর করি ও পরের উপর নির্ভর করি বলিয়া আমাদিগের প্রকৃতি প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

যাহ'ক আধুনিক থিয়েটার যে বিলাতী উপকরনে গঠিত আর তাহার ধরণ ধারণ, চাল চলনও যে বৈদেশিক উপকরণে গঠিত তাহা আর বিশেষ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বঙ্গসমাজের উপর থিয়েটারের প্রভূত্ব দেখিয়া বর্ত্তমান যাত্রাওয়ালাগণ তাহার প্রভাবে তটস্থ সুতরাং তাহারা থিয়েটারের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনকার দিনে থিয়েটারের এতদূর প্রভূত্ব সত্বেও কেন ভাল নাটক জন্মে না সেই বিষয় অলোচনা করা যাউক।

বাঙ্গালী জাতী যে অপদার্থ অসার তাহার কারণ তাহারা সকল বিষয়ে অতিরিক্ত যায় বলিয়া। মনে করুন রঙ্গমঞ্চে বীর রসের অবতারণা করিতে হইবে অমনি দিন কতক খুব বীর রসের ছড়া ছড়ি গড়া গড়ি বাড়াবাড়ী চলিল। আবার স্বদেশের প্রতি ভক্তি দেখাইতে হইবে স্বদেশ হিতৈষীগণ "ভারত মাতা" ভারত মাতা বলিয়া যেই একটা ধুয়া তুলিল, অমনি সংবাদ পত্রে সভায় নাটকে উপন্যাসে অলিতে গলিতে ভারত উদ্ধারপার্টি প্রেট্রিয়টগণ ভারত মাতার শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। হরি ভক্তি দেখাইতে হইবে "প্রহ্লাদচরিত্র" ও "চৈতন্য লীলার" যেই অভিনয় হইতে আরম্ভ হইল অমনি দেখিতে দেখিতে চারি দিক হইতে সাহিত্য হইতে রঙ্গ মঞ্চ পর্য্যন্ত হরি নাম গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সুতরাং মধুর হরি নাম হরি বোল হরি বোল রব শেষে গোলে হরিবোলে পরিণত হইয়া একটা বেয়াড়া রকমের গণ্ড গোল বাধাইল। হরিবোল অবশ্য হিন্দুর পক্ষে পরমার্থ লাভের উৎকৃষ্ট পথ, হরি নামের মাহাত্ম্য অনন্ত হরি সঙ্কীর্ত্তনে আমাদের সহজেই মন মোহিত হয়। হরি সঙ্কীর্ত্তনে থিয়েটারও শিঘ্র জমে stage effect শিঘ্র হয়। সুতরাং তাহাতে নাটক লেখকের কৃতিত্ব কিছুই নাই; তাহা হরি নামেরই মোহিনী শক্তি। হরি নামে দেশ মাতাইতে হইলে নাটক বা রঙ্গালয়ে কেন, নেড়া নেড়ীর দ্বারাও ত সে অভাব পূরণ হয়। আর এক কথা এ স্থলে বলা উচিত বঙ্গ সাহিত্যে যে রঙ্গ সাহিত্য আদৌ জন্মে নাই একথা কেমন করিয়া বলি ? এখানে সেই দুই এক খানি নাটকের সমালোচনা করিলে এই প্রবন্ধটী ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বঙ্গদেশে অবৈতনিক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় যে ২।১ খানি "নাটক" দেখা দিয়াছিল এখন বৈতনিক (পেসাদারী) থিয়েটারের উন্নতির দিনে তেমনতর হইতেছে না কেন ? অবৈতনিক রঙ্গশালায় অভিনীত নাটক গুলির মধ্যে "নীলদর্পণ" উচ্চ অঙ্গের নাটকত্ব পূর্ণ নাটক। "কৃষ্ণকুমারী"কে (কাব্য হিসাবে নয় নাটকত্ব হিসাবে) কতক পরিমাণে উচ্চ অঙ্গের বলা যায়। "নীলদর্পণ" যে বঙ্গসাহিত্যে নাট্যাংশে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে তাহার কারণ "নীলদর্পণে" প্রকৃত বঙ্গবাসীর জাতীয়

আন্তরিকতা প্রতিফলিত ও মানবহৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত (action re-action) প্রতিবিম্বিত চিন্তাশীলতার পূর্ণ বিকাশ আছে বলিয়া। মাইকেলের নাটক ও দীনবন্ধুর সমসাময়িক নাট্যকার মনোমোহন বাবুর নাটকগুলি অবশ্য ভাব বৈভবে, রস ঐশ্বর্য্যে ও কাব্যাংশে হয়ত "নীলদর্পণ" অপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও ঘাত প্রতিঘাতের অভাব প্রযুক্ত নাট্যাংশে শ্রেষ্ঠ বা সমকক্ষ নয়। যাহ'ক মনোমোহন বাবুর "প্রণয় পরিক্ষা", জ্যোতিরীন্দ্র বাবুর সরোজিনী ও "অশ্রুমতী" উপেন বাবুর "শরৎসরোজিনী" প্রভৃতি কাব্যাংশে তত উৎকৃষ্ট না হইলেও নাট্যাংশে নীলদর্পণের পরই স্থান পাইবার যোগ্য। আর স্বভাব কবি বরীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নামক উৎকৃষ্ট নাটক কাব্যাংশে এ সকল অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট নাট্যাংশে তত নয়, গিরীশ বাবুর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। যাহ'ক অবৈতনিক রঙ্গালয়ের প্রাধান্য কালে এই কয় খানির জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর হয় না কেন? তাহার কারণ পূর্ব্বেই কতক বলিয়াছি। ঐ সকল মহারথিগণ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন আর তাঁহাদের স্থানে যাঁহারা (পুঁটে তেলীগণ) বসিয়াছেন; তাঁহারা নাটক লিখন বিষয়ে অপ্রচুর শক্তি সম্পন্ন—রঙ্গমঞ্চে অভিনয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাঁহারা মানব সমাজ ও প্রকৃতি লইয়া নাটকের প্রকৃত উপকরণ সংগ্রহ করিতে নিতান্ত অপারক। তাঁহারা প্রসিদ্ধ জহুরী নহেন কাজেই জহর বাহির বা বাছাই করিবার শক্তি তাঁহাদের আদৌ নাই। মনুষ্য চরিত্রই পূর্ণ নাটক ও প্রহসন স্বরূপ আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃত রঙ্গালয় এজ্ঞান তাঁহাদের বোধ হয় নাই। এই মনুষ্য সমাজ রূপ জীবন্ত নাটক হইতে নাটকত্ব সংগ্রহ করিতে প্রত্যুত. ক্ষমতা আবশ্যক করে, তাহা এখনকার নাটককারদিকের আদৌ নাই এ কথা নিশ্যংসয়রূপে বলা যায়। আদর্শ দেখিয়া চিত্র চিত্রিত করা সহজ তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক না হইলেও কাঠাম খানা বিশুদ্ধ রাখিয়া তাহাতে নিজের কৃতিত্ব রাখিতে পারিলে অনেকাংশে সিদ্ধ কাম হওয়া যায়; কিন্তু আদর্শ চরিত্র বা সমাজ সংগ্রহ করা কঠিন কার্য্য, কাজেই নাটক লেখাও বড় একটা যা তা নয়। ইহাতে কল্পনা চাই যেমন, কৌশল চাইও তেমন, চরিত্র ও সমাজ ভেদিনী সুক্ষ্ম দর্শন শক্তিও চাই অর্থাৎ এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট নাট্যকার হন আর তাঁহার প্রণীত নাটকই প্রকৃত নাটক বলিয়া অভিহিত হয়। এখনকার নাটক লেখকগণের মধ্যে সেরূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব বলিয়া তেমন ভাল নাটক জন্মাইতেছে না। কোন কোন সাহিত্য সেবক বলিতে পারেন যে ধনীদিগের সাহায্যে অর্থ ব্যয়ে উৎকৃষ্ট লেখক কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া অভিনয় করাণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু হায়! সে দিন আর নাই! বিক্রমাদিত্য বল্লাল সেন, বা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় সে রাজাও নাই। এখন ধনবানদিগের নিকট যদি সাহিত্যের আদর থাকিত, যদি তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী হইয়া লেখকদিগকে উৎসাহ দান

করিতেন তবে আর অভাগি বঙ্গভাষার এমন শোচনীয় অবস্থা হইবে কেন? তাঁহারা যে তাঁহাদের শনিবারের শান্তি নিকেতনে "গার্ডেনপার্টি"তেই মুক্ত হস্ত!!

এখনকার নাটকে জমি আছে গঠন নাই; গঠন আছে রং ফলান নাই, আবার যদি রং ফলান থাকে ত সামঞ্জস্য থাকে না। এই সকল নাটককারগণ মানুষ গড়িতে বাঁদর গড়িয়া থাকেন। কাজেই সেই সকল চরিত্রে নাট্যাংশ অপেক্ষা প্রহসনাংশ অধিক। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তনস্রোতের মধ্যে বঙ্গসমাজ বা বাঙ্গালী চিত্র চিত্রিত করিতে গেলে নাটক না হইয়া প্রহসন হইয়া পড়ে এই কারণে "সধবার একাদশী নাটক না হইয়া প্রহসন হইল। ভাল নাটক না হইবার আর এক কারণ যে এখন কেবল অভিনয় উদ্দেশ্যে নাটক লিখিত হয়, সাহিত্য হিসাবে নাটক লিখিবার প্রয়াস কেহ করেন না। আর যাহাঁরা নাটক লিখেন তাহাঁরা থিয়েটার ওয়ালাদের ঘরের লোক তাই তাহাঁদের বিশ্বাস যে আমরা মস্ত ওস্তাদ; কাজেই সাকরেদ না হইয়া একেবারেই ওস্তাদ হইতে যান বলিয়া ভাল নাটক জন্মাইতেছে না।

আর আধুনিক থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলি প্রধানতঃ ইউরোপীয় উপকরণে গঠিত। কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতিও আধুনিক নাটকের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের মন্ত্রশিষ্য। তার উপর আবার অপরিপক লেখকদিগের যথেচ্ছাচার রুচি অনুযায়ী বঙ্গসাহিত্যকে একটা অবয়বে খাড়া করা হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য সেবকদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, বাঙ্গালাভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু সেই সংস্কৃতের পদানুসরণ না করিয়া আমরা অগ্রেই ইংরাজির অনুকরণ করিতেছি। সভ্যতা বিষয়ে ইউরোপীয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া যে সাহিত্য, সমালোচনা কাব্য ও নাটকাদিতে ঐরূপ করিতে হইবে এ কেমন কথা!! আমরা ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে যাইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মহা গৌরবান্বিত প্রাচীন দেবভাষা সংস্কৃতের অবমাননা করিতেছি, একথা একবারও ভাবি না। সংস্কৃতে ত উত্তম উত্তম রঙ্গসাহিত্য—নাটক আছে তবে তাহার অনুকরণ করিয়া দেবভাষার কন্যা বঙ্গভাষা সুন্দরীকে ভূষিত ও পরিপুষ্ট করি না কেন? ইউরোপীয় অলঙ্কার শাস্ত্র অপেক্ষা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র কিছু কোন অংশেই হীন নহে, বরং কোন কোন বিষয়ে অধিকতর উন্নত ও মার্জ্জিত।

আজ কালকার "বাহবা" বা করতালিপ্রিয় সমাজে যেনতেন প্রকারে বাহবা ও করতালী লইতে পারিলেই আমরা কৃতিত্ব মনে করি, তাই যা তা একটা বিষয় লইয়া কথোপকথনচ্ছলে "বিলাতী ঘাত প্রতিঘাত (action reaction) লাগাইতে পারিলেই "নাটক" হইল বলিয়া আমরা মনে করি। এই "বাহবা" বা করতালী লাভের নেশা কেবল রঙ্গালয়ের নাটক লেখকদিগের কেন অনেক কৃতবিদ্য গ্রন্থকার সমালোচক ও সংবাদপত্র সম্পাদকদিগেরও আছে। কাজেই ভাল জিনিষ বঙ্গসাহিত্যে জন্মাইতেছে না।

পদার্থ শাস্ত্রের একটা মূল কথা।

ইংরাজীতে Subject ও Object এই দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে; বোধ হয় সেই অর্থে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ প্রয়োগ করিলে চলিতে পারে।

অন্তর্জগতে অনুভূতি আছে, স্মৃতি আছে, প্রবৃত্তি আছে, ইচ্ছা আছে, এবং ইহাদিগকে সাজাইয়া গোছাইয়া শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া দেখিবার ও চিনিয়া লইবার শক্তি আছে। ইহাদিগকে সাজাইয়া লইবার একটা বড় সুন্দর প্রণালী আছে, তাহার সাহায্যে আমরা প্রত্যেক অনুভূতিকে, ইচ্ছাকে, চিন্তাকে তাহার উপযুক্ত স্থানে আসন দিতে পারি। এবং এইরূপে তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া খুঁজিয়া লইতে ও চিনিয়া লইতে পারি। এই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সাজানর নাম কালব্যাপিয়া সাজান। আমার অন্তর্জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলি এইরূপে কালে সজ্জিত ও স্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে একটি একটি করিয়া দেখিয়া ও চিনিয়া লইতে পারি।

বাহ্যজগৎ, শব্দ স্পর্শ রূপাদি লইয়া যাহা নির্ম্মিত, তাহাও এইরূপে সাজাইয়া লই। যত কিছু শব্দ স্পর্শ, যত কিছু রূপ, আমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমার আত্মগত হইতে চায়, আমি তাহাদিগকে একেবারে এক সঙ্গে আসিতে দিই না। তাহাদিগকে কালে স্থাপিত করিয়া বিন্যস্ত করিয়া গোছাইয়া আসিতে দিই। একবার কতকগুলা আসে, আর একবারে কতকগুলা আসে, আর একবারে কতকগুলা আসে। এই-রূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে পর পর আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

বহির্জগতে যেন নানা রূপ নানা শব্দ নানা গন্ধ নানা রস বর্ত্তমান আছে। আমি যেন জীবন-স্রোতস্বিনীতে নৌকা-যাত্রী; এটার পর ওটা, ওটার পর ওটা, এইরূপ করিয়া কুলস্থ পদার্থনিচয় আমার প্রত্যক্ষ হইতেছে। অথবা আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; একবারে সবটা দেখিলে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইবে, বিবেচনায় খানিকটা খানিকটা করিয়া দেখিয়া লইতেছি, এবং তাহাতেই এক পরম তৃপ্তি অতুল আনন্দ ভোগ করিতেছি। অন্তর্জগতে যেমন, বহির্জগতেও সেইরূপ পদার্থের কালব্যাপ্তি।

রূপ রসের মধ্যে কতকগুলা পর পর আসে, কতকগুলা আবার এক সঙ্গে আসে, যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরাত্মাকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শক্তিমান, যাহারা সেইরূপে আসে তাহাদিগকেও অন্যরূপে সাজাইয়া লয়। এই সাজানর নাম দেশব্যাপ্তি।

দেশব্যাপ্তি অন্তর্জগতে নাই, সেথায় কেবল কালব্যাপ্তি আছে। বহির্জগতে উভয়বিধ ব্যাপ্তিই বর্ত্তমান। বলিতে পারি, দেশব্যাপ্তিই বহির্জগতের লক্ষণ।

অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম, দেশ ও কাল স্বীকার করিয়া লইলাম।

অন্তর্জগতের খণ্ড সকল কালব্যাপী। বহির্জগতের খণ্ড সকল কালব্যাপী ও

দেশব্যাপী। বহির্জগতের লক্ষণ ও পরিচয় দেশব্যাপকতা।

বহির্জগত বলিলে একটা না একটা কিছু বুঝি। কাল ও দেশ বলিলে একটা না একটা বুঝি। সেই একটা না একটা সম্প্রতি স্বীকার করিয়া লইলাম।

বহির্জগতের খণ্ড সকল রূপ রস গন্ধাদি পদার্থ। ইহারা এক হিসাবে অন্তর্জগতেরও অংশ; সেই জন্যই বহির্জগত ও অন্তর্জগতে সম্বন্ধ ও কারবার। সেই সম্বন্ধ কিরূপ পরে দেখিব। এক্ষণে বহির্জগত দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হয়, এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট।

বহির্জগতে চন্দ্র আছে, সূর্য্য আছে, নদী পর্ব্বত আছে, জল বায়ু আকাশ আছে, বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ আছে। ইহাদের এক একটি রূপ রসাদির সমবায়। কতকগুলি বিশেষসম্বন্ধবিশিষ্ট রূপরসাদির সমষ্টিকে চন্দ্র সূর্য্য জল বায়ু ইত্যাদি আখ্যা বা অভিধান দিয়াছি।

কতিপয় রূপরসাদির সমষ্টির নাম যেমন জল, অপর কতিপয়ের সমষ্টির নাম বায়ু, তেমনি কতিপয় রূপরসাদির সমষ্টির নাম আমার জড়দেহ। বহির্জগতের অপরভাগ অপেক্ষা এই ভাগটার সহিত আমার, অন্ততঃ আমার অন্তর্জগতের কিছু ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ অনুভব করি। সেই জন্য এই ভাগটাকে অর্থাৎ আমার জড়শরীরকে আমার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বোধ হয় এ একটা ভ্রান্তি। তবে এইরূপ নির্দ্দেশে কোনরকম সুবিধা থাকিতে পারে। মনে ভাব আছে, কিন্তু ভাষায় কথা নাই, তাই অনেক সময় ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করিতে ভুল হয়।

যে অর্থেই হউক, জড়শরীর বহির্জগতের অংশ, অথচ জড়শরীরের সহিত অন্তর্জগতের ঘনিষ্ঠতা কিছু অধিক। অন্ততঃ জড়শরীরের ভিতর দিয়া বহির্জগতের ব্যাপার আমার প্রত্যক্ষীভূত হয়। জড়শরীরের বিকারে বহির্জগতের বিকার হইয়া যায়, তাহার চেহারা বদলাইয়া যায়। আফিম্‌খোর তাহার সাক্ষি।

জড়শরীরের কয়েকটা খণ্ডের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া রূপ রস গন্ধ আমাদের অন্তরে প্রবেশলাভ করে অথবা আমাদের অন্তর্জগতের অংশীভূত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্।

ইন্দ্রিয়গণ এক অর্থে আমাদের জ্ঞানের বিষয় অথচ এক অর্থে তাহারা সমুদয় জ্ঞানেরদ্বার স্বরূপ। এ একটা প্রহেলিকা স্বরূপ। এ প্রহেলিকা বিশ্লেষণের এখানে আবশ্যকতা নাই। বোধ করি জগতে এই প্রধান প্রহেলিকা।

যাই হউক, স্বীকার করিলাম যে বহির্জগৎ আছে, এবং কাল ব্যাপিয়া ও বিশেষতঃ দেশ ব্যাপিয়া আছে। এবং বহির্জগতে যাহা দেশ ব্যাপিয়া আছে, যে পদার্থ লইয়া বহির্জগত, দেশব্যাপ্তি যাহার ধর্ম্ম, রূপ রসাদি যাহার লক্ষণ, তাহার নাম জড়পদার্থ।

স্বীকার্য্য যে জড়পদার্থ দেশ ব্যাপিয়া আছে, এবং রূপ রসাদি তাহার লক্ষণ এবং তাহাকে লইয়াই আমার বহির্জগত নির্ম্মিত। এই জড়পদার্থময় জগতের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

কিন্তু স্বীকার্য্য স্বতঃসিদ্ধ নহে।

যাহা স্বীকার করিয়া লইতেছি, তাহার অস্তিত্ব যে স্বতঃসিদ্ধ এমন কোন কথা নাই। জ্যামিতিবিৎ রেখা টানেন বৃত্ত টানেন আরও কত কি টানেন অথবা টানিবার শক্তি স্বীকার করিয়া লয়েন। বস্তুতঃ তাঁহার রেখা টানিবার শক্তি নাই, বৃত্ত টানিবারও শক্তি নাই। তিনি যাহা অঙ্কিত করেন তাহা সংজ্ঞানুযায়ী রেখাও নহে বৃত্তও নহে।

স্বীকার্য্য যে দেশ আছে ও কাল আছে ও উভয়েরই মাত্রা আছে। অল্প কাল ও অধিক কাল, সঙ্কীর্ণ দেশ ও বিস্তৃত দেশ আমরা অনুভব করি, সুতরাং সূক্ষ্ম আলোচনায় উভয়ের মাত্রা পরিমাণ করিতে পারিলে বড়ই সুবিধা হয়।

যে কোন পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, যাহার মাত্রার তারতম্য অনুভবে আমাদের শক্তি আছে ও প্রয়োজন আছে, তাহারই সূক্ষ্ম পরিমাণ আবশ্যক। সুতরাং দেশ ও কাল পরিমাণের উপায় অন্বেষণ করায় লাভ আছে।

কিন্তু মাত্রা পরিমাণের উপায় অন্বেষণের পূর্ব্বে উহাদের প্রকৃতির আর একটু আলোচনা আবশ্যক।

আমাদের দেশ ত্রিধা বিস্তৃত, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে বিস্তৃত, দক্ষিণ হইতে বামে বিস্তৃত ও উর্দ্ধ হইতে অধোমুখে বিস্তৃত। এই ত্রিধা বিস্তার আমাদের দেশের লক্ষণ, জড়পদার্থ মাত্রই ত্রিধা দেশব্যাপী।

দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ, বিস্তৃতির এই তিন ধারা। আমাদের দেশ, যে দেশ ব্যাপিয়া আমাদের জড়জগত বর্ত্তমান, যে দেশে আমাদের জড়দেহ অবস্থিত, তাহা এই দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধময়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে অন্যবিধ দেশ আছে কি না? একধা, দ্বিধা, বা চতুর্ধা বিস্তৃত দেশ আছে কি না?

জ্যামিতিবিৎ পণ্ডিতেরা রেখার কল্পনা করেন, উহা একধা বিস্তৃত দেশ, উহার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ বা বেধ নাই। তাঁহারাই আবার ভূমি বা তলের কল্পনা করেন; উহা দ্বিধা বিস্তৃত দেশ, উহার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, বেধ নাই। রেখা বা ভূমি এই উভয়ই জ্যামিতিকারের কল্পিত বা সৃষ্ট পদার্থ, তাঁহার সাধ্য নাই যে রেখা বা ভূমি আমাকে আনিয়া দেখান, বা অঙ্কিত করিয়া দেখান। আবার চতুর্ধা বা পঞ্চধা বিস্তৃত দেশ তাঁহার কল্পনাতে আসিতে পারে, কিন্তু তাহার আকার মনশ্চক্ষুর সামনে আসে না। সুতরাং সেই প্রকৃতিসম্পন্ন দেশ আছে কি না, বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা, যে দেশ আমাদের, যাহা ত্রিধা বিস্তৃত যাহার খণ্ডের বা অংশের নাম আয়তন, তাহা দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধময়। জড়দ্রব্য মাত্রই ছোটই হউক বড়ই হউক, এইরূপ আয়তনবিশিষ্ট।

রেখা ও ভূমি, যাহাদের অস্তিত্ব কল্পনাগর্ভে, কল্পনার বলেই তাহাদের পরিমাণ সাধ্য।

প্রত্যক্ষ অথবা কল্পিত যাহা কিছুর মাত্রা অনুভব করি, তাহার নাম রাশি। রেখা একটা রাশি, ভূমি একটা রাশি, আয়তন একটা রাশি, কাল একটা রাশি, ওজন একটা রাশি, উষ্ণতা, দীপ্তি, এ সকলেই রাশি। যে রাশির পরিমাণ করিতে হইবে, তাহারই একটি নির্দ্দিষ্ট টুক্‌রা লও। টুক্‌রাটি এরূপে বাছিয়া লইবে যে, যখন আবশ্যক তখন যেন সেই-

টিকেই অপরিবর্ত্তিত ভাবে পাওয়া যায়। রেখা মাপিবার জন্য এক টুক্‌রা নির্দ্দিষ্ট রেখা আবশ্যক, ভূমি মাপিতে এক টুক্‌রা নির্দ্দিষ্ট ভূমি আবশ্যক। ওজন মাপিতে এক টুক্‌রা নির্দ্দিষ্ট ওজন আবশ্যক।

পরে সেই নির্দ্দিষ্ট টুক্‌রাটির সহিত সমগ্র রাশিটি মিলাইয়া দেখ, তুলনা কর, যেমনে পার কর। দেখ দ্বিগুণ কি তিন গুণ কি শত গুণ কি সহস্র গুণ। যত গুণ হইবে, তাহাই সেই রাশির পরিমাণ বা মাপ।

এইখানে একটু গোল হয়। মনে কর একটা রেখার দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে। এক টুক্‌রা রেখাকে মাপ কাটি বলিয়া গ্রহণ করিলাম; উভয়ে মিলাইলাম; দশ গুণ হইয়া খানিকটা অবশিষ্ট থাকিল; সেই অবশিষ্ট অংশ আমার নির্দ্দিষ্ট মাপকাটির চেয়ে ছোট। সুতরাং দশ গুণ ত হয় না, পুরা এগার গুণও হয় না। এখানে সেই মাপ-কাটিটি ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, সেই রেখা টুক্‌রাটিকে ভাঙ্গিয়া আর একটি আরও ছোট টুক্‌রা গ্রহণ করিতে হয়। এই-টুকু ভগ্নাংশ, এবার মাপ পূর্ব্বের চেয়ে সূক্ষ্ম হইবে। এবারও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা পূর্ব্বের চেয়ে কম হইবে তবে ফলকথা খুব ছোট টুক্‌রা মাপ-কাটি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া যত সূক্ষ্ম-ভাবে পারা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। মাপকাটি যতই ছোট হউক, মাপিতে গিয়া একটু না একটু অংশ অবশিষ্ট থাকিবারই সম্ভব; তবে তাহা এত ক্ষুদ্র যে সাংসারিক কাজে ছাড়িয়া দিলে ক্ষতি নাই।

যেরূপে রেখার দৈর্ঘ্য মাপা যায়, ঠিক সেইরূপে এক টুক্‌রা ভূমির দ্বারা ভূমি ও একটুকরা আয়তনের দ্বারা আয়তন মাপিলে চলিতে পারে।

ভূমির ক্ষেত্রফল ও আয়তনের ঘন-ফল পরিমাপের একটি বড় সুবিধা আছে। দুইদিকে দুইটা দৈর্ঘ্যের মাপ লইলেই ভূমির পরিমাপ চলে, এবং তিনদিকে তিনটা দৈর্ঘ্যের মাপ লইলেই আয়তনের পরিমাপ চলে। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই রূপেই ভূমি ও আয়তন মাপিয়া থাকি। কিরূপে এই সুবিধাটুকুর উৎপত্তি হইল, তাহা গণিতশাস্ত্রের আলোচ্য।

দেখা গেল এক টুক্‌রা রেখাকে চিনিয়া ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে অন্য রেখা ভূমি ও আয়তন মাপিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন টুক্‌রা এই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কোথাও ক্রোশ, কোথাও মাইল, কোথাও হাত কোথাও বা গজ, ফুট বা ইঞ্চি এই জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। রেখা কল্পনার সামগ্রী, সেই জন্য একটি দীর্ঘ দণ্ড, যাহার বৃদ্ধি বা ক্ষয়ের তেমন অধিক সম্ভাবনা নাই অগত্যা তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে সর্ব্বকার্য্য উপলক্ষে একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট মাপকাটি প্রচলিত থাকিলে বড় সুবিধা হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের রক্ষণে একটি প্ল্যাটি-নমের দণ্ড আছে, তাহার দৈর্ঘ্যই সর্ব্বত্র মাপকাটি স্বরূপে ব্যবহারের জন্য পণ্ডি-তেরা চেষ্টিত আছেন।

কাল পরিমাণের জন্য এক টুক্‌রা কাল, (অহোরাত্র বা দণ্ড বা ঘণ্টা বা পল) নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সূর্য্যমণ্ডল আকাশমণ্ডলের মধ্যরেখা, অর্থাৎ যে রেখা ঠিক্ আমাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, সেই রেখা মধ্যাহ্ন ক্ষণে পার হয়, পরদিন আবার মধ্যাহ্ন ক্ষণে সেই রেখা পার হয়। এই দুই ক্ষণের মধ্যবর্ত্তী যে কালখণ্ড, তাহার নাম অহোরাত্র অথবা সংক্ষেপে দিনমান। পণ্ডিতগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দিনমান একটু ছোট বড় হয়। বৎসরের মধ্যে কখন একটু বড় কখন একটু ছোট হয়। তাই বৎসরের সমুদয় দিনমানের গড় করিয়া যে কাল পাওয়া যায়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই কালের মাপকাটি স্বরূপ গ্রহণ করেন। এই কালখণ্ডের নাম সাবন দিনমান। এই সাবন দিনমানের ২৪ ভাগে এক ঘণ্টা ও এক ঘণ্টার ৩৬০০ ভাগে এক সেকেণ্ড।

পদ্ধতি এক হইলেও কালের মাপে ও দেশের অথবা আয়তনের মাপে কার্য্যতঃ অনেক বিভেদ। আয়তন মাপিতে হইলে তিনটা রেখার দৈর্ঘ্য মাপিতে হয়। এবং রেখার দৈর্ঘ্যমাপ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। রেখার সহিত রেখার তুলনা দরকার হইলে দুইটাকে পাশাপাশি রাখিলেই চলে। কিন্তু কালখণ্ডের সহিত অন্য কালখণ্ডের তুলনা কঠিন। এক টুকরা কালকে অন্য কালের পাশে আনিতে পারা যায় না। এক অবলম্বন স্মৃতি, তাহার উপরও ভরসা হয় না।

কাল পরিমাণের জন্য অগত্যা কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা গণিতবেত্তারা জানেন। সে উপায় কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাও তাঁহারা বুঝেন। এস্থলে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বিবিধ বহিপড়া।

আমাকে কেহ একটা বই পড়ার উপায় বলিয়া দিতে পার? তোমরা এত বহি পড় কি করিয়া? তোমরা এত ব্র্যাকেট আলমারি ভরা ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ফ্রেঞ্চ বহি পড়; এত বিজাতীয় ভাষায় এত স্বদেশীয় ভাষায় বহি পড়, কিন্তু আমি ত তোমাদের সহিত এত বহি পড়িতে পারিলাম না। আমার এ বহি আমি কবে ধরিয়াছি ঠিক তাহা মনে হয় না কিন্তু এখনও আমার এই এক খানা বহিই শেষ হইল না। তোমরা প্রায় প্রত্যহ এক খানা বহি শেষ কর দেখিয়া, আমার মনে আমার এই বহি শেষ করিবার একটা যে আশা প্রতিদিন উষার সহিত বৃক্ষের ছায়ার মত জাগিয়া উঠে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তেমনি সে বৃক্ষের ছায়ার মত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, মনে হয় এ পড়া শেষ হইবে না—এখনও ঢের বাকি। তাই বলিতেছিলাম তোমাদের মত আমি হইতে পারিলাম না, তোমাদের মত আমি বহি পড়িতে পারিলাম না; আমার এক খানা বহিই শেষ হইল না।

তোমরা হয়ত ভাবিবে আমার পড়িয়া পড়িয়া অবসর নাই বলিয়াই তাহার শেষ নাই। আমি ক্রমাগতই বহি পড়িয়া

থাকি। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। আমার এ বহি পড়া অন্যরূপ। এ বহি যে অক্ষরে লিখা সে অক্ষরে লিখা তোমাদের কোন বহি কখনও দেখি নাই। ইহার অক্ষর আমাকে কখনও চিনিতে হয় নাই। প্রথমেই চিরপরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু, এত পরিচিত হইলে কি হয়? ইহার প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে যে নিগূঢ় রহস্য যে গভীর অর্থ আছে তাহা আমি কখনও ঠিক বুঝিতে ধরিতে পারিলাম না। এই পড়িয়া গেলাম,—বেশ অর্থবোধ হইল মনে করিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে যাইবামাত্র মনে হইল প্রথমটী ঠিক বুঝা হয় নাই ভুল বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা সমুদ্রের ফেনার মত, তাহার প্রবাল তাহার শুক্তির মত নহে। অমনি আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু কৈ? তাহার সমগ্র অর্থ বোধ ত' এপর্য্যন্ত হইয়া উঠিল না। আমার প্রথম পংক্তি পড়াই শেষ হইল না, বহি শেষ করিব কি করিয়া? আশা কোথায়?

মধ্যে মধ্যে মনে হয় আমি তোমাদের সহিত একই বহি পড়িতেছি; তোমরা যাহা পড়িয়াছ আমি ত তাহাই পড়িতেছি। তবে উহার এত বিশেষণ কেন? তাই ত মনে এত খানি ঈর্ষার উদয় হয়? তাই ত এবহি ত্যাগ করিবার জন্য মাঝে মাঝে একটা মর্ম্মান্তিক ইচ্ছা হয়।

কিন্তু এ বহি ছাড়িতে পারিব না। এই সমস্ত জীবন 'ধরিয়া ইহাকে ত্যাগ করিব মনে করিয়াছি কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। এই যে নব পরিচয়ের মধ্যে চিরপরিচিতের মত চেনা শোনা, এই যে গূঢ় ব্রীড়াক্রীড়িত প্রাণের গভীর অর্থোন্মেষের ঈষৎ অস্পষ্ট অনুভূতি, সহসা বিদ্যুতের মত অন্ধকারের মুখ নিমেষের জন্য আলোকিত করিয়া অন্ধকার আরও গাঢ়তর রাখিয়া চলিয়া যায়, এই যে দুইটী অপরিচিত প্রাণের অপরিচিত ভাষায় কথাবার্ত্তা আমার জীবন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে এমন একটা মোহ, এমন একটা স্নেহ-শৈত্য আছে যে, আজ পর্য্যন্ত ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ত্যাগ করিব ভাবি কিন্তু তখনই মনে হয় যাহাকে জীবনের সঙ্গী করিয়া লইয়াছি, তাহাকে ফেলিয়া আমার জীবনটা নিতান্ত স্বাদবিহীন হইয়া পড়িবে আর তাহার কোনও মূল্য থাকিবে না! তাই কত কি ভাবিয়া ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

তা, তোমরা চলিয়া যাও, আমি পিছনে পড়িয়া থাকি। তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ আমার অসিদ্ধ। তোমরা হয়ত হিসাবে আমাকে পাগল মনে করিবে তা কর আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এখানে সেই দিনের জন্য বসিয়া থাকি যে দিন আমি আমার ইতি শেষ করিব—যে দিন সান্ধ্য পথিকের মত ছায়া বিহীন হইয়া চুর্ণিত লোকে আমার সান্ধ্য তারার দিকে চাহিয়া আমি আমার সেই শেষের দিকে যাত্রা করিতে পারিব;— পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে অনন্তগম্ভীর অন্ধকার পদ শব্দধ্বনিত অসীম নির্জ্জন সেই ছায়া, ভয়, অবিশ্বাস ও বিস্মৃতির পথ, আর সম্মুখে রহিবে সেই সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে ছায়া পথালোকিত আমার সেই স্নিগ্ধ শেষ পথ? সেকি উজ্জ্বল উৎসাহ ও

বিরাট্ আনন্দের দিন ? সে দিন কি ভয়, কি বিস্ময়, কি আশা কি সংঙ্কোচের— কিন্তু, আমার তাহাতে কাজ নাই। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর সে আমার আশারই দিন চির কাল থাক্। হয়ত সে শেষ দিনে আমার সে শেষ দেখিবার সময় হইবে না। রজনী—সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দিবসের জন্য পূর্ব্বদিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু সেই দিবসের দ্বারেই তাহার মৃত্যু হয়।

মনের পৃথিবী। *

যজ্ঞ করিবেত সর্ব্বস্ব দক্ষিনা দিয়া যজ্ঞ করিও। তোমার যাহা আছে তাহা সমস্ত দিয়া পরের স্থানে যে ভিক্ষার কুটীর খানি বাঁধিবে তাহার ভিতরেই তোমার সমস্ত রাজত্ব থাকিবে তাহা কোন কালে ভাঙ্গিবার ছিঁড়িবার নহে।

তোমার ভাল বাসার জনকে তোমার যাহা আছে তাহাই দিও, তোমার মনের ভাঙ্গা কুটীর খানিও তাহাকে দিও কেবল তোমার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বাগান বাড়ী দিতে পারিলে না বলিয়া লজ্জা পাইবার কোনও আবশ্যক নাই। কারণ সেই কুটীর খানি তোমার বাগান বাড়ীর মালীর আরামস্থল ; যে মালী তোমার বাগান বাড়ীটীকে এত সুন্দর করিয়াছে সেই মালীর থাকিবার বাটী।

তোমার প্রিয়কে তোমার সমস্ত দেখাইও। তোমার প্রাণের অন্ধতম প্রদেশ ও বৃষ্টিহীন মরু হইতে আরম্ভ করিয়া উজ্জ্বল উর্ব্বর ক্ষেত্র অবধি দেখাইও ; যেন কোথাও কোন ছায়া, কোন সমস্যা আসিয়া তোমাদের মধ্যে না দাঁড়াইতে পারে—তোমাদের দৃষ্টি বিরোধী না হইতে পারে। কেবল ছায়াহীন আলোক দেখাইলে কি জানি যদি তোমার পার্শ্ববর্ত্তিনী কোনও ঘোরা বর্ষা রজনীর নিশীথ বর্ষণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া, তোমার দিকে চাহিয়া মনে করে সে তোমাকে যাহা ভাবিয়াছিল তুমি ঠিক তাহা নও।

অনাদি প্রকৃতি তাহার উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত বক্ষে লইয়া আকাশের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আছে, কিন্তু আকাশের, বায়ুর ভর তাহার সেই শুভ্র তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্র শ্যামল তৃণ গুল্মের উপরই বেশী ; কেবল যখন সেই বায়ুর একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তখনি তাহার বেগ সেই শৃঙ্গে প্রতিহত হয়, সে বেগে যদি সে শৃঙ্গ উপাড়িয়া পড়ে সে ত প্রকৃতির দুভার্গ্যের বিষয় সে তাহার লজ্জার বিষয় নহে। তাই বলিতেছিলাম তোমার প্রিয়তমের নিকট আত্মদোষগুণ কিছুই গোপন করিও না।

সমস্তদিন লোকে পৃথিবীর থাকে কেবল সন্ধ্যার ছায়া, আলোকের জোয়ার ভাঁটায় সে বিশ্বের হয়, তুমি যদি তোমার সন্ধ্যালোকে তোমার প্রিয়কে বসাইয়া তাহার বিশ্বের মধ্যে গণ্য হইতে না পারিলে ত তোমার সমস্তই বৃথা।

---

* এই প্রবন্ধটি মান্যনীয় শ্রীযুক্ত রবিন্দ্র নাথ ঠাকুরের বিবধ প্রবন্ধ' নামক পুস্তকের মনের বাগানবাড়ী নামক প্রবন্ধ দৃষ্টে লিখিত। সে প্রবন্ধটীতে মাননীয় লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই'—তোমার প্রিয়কে মনের বাগানবাড়ী দিও তোমার মনের আনাচ কানাচ দিও না।

তাই বলি তোমার প্রিয়কে কেবল তোমার মনের বাগান বাড়ী দিও না, তাহাকে তোমার মনের প্রকৃতি তোমার মনের পৃথিবী দাও। এক কথায় তাহাকে তোমার সমস্ত চরিত্র দাও।

নীরব সঙ্গীত।

১

শত লোক শত কথা বলে
শত লোকে গাহে শত গান
ধ্বনিয়া উঠিছে, চারিভিতে
অবিরাম অন্তহীন তান;

২

তারি মাঝে প্রতি দিন যাই
ক্ষুদ্র মোর প্রাণটীরে লয়ে
প্রতি সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি
তোমারে সে কথাটী না কয়ে

৩

বলিতে যাইয়া ফিরে আসি
সঙ্কোচে যে পারিনা বলিতে
সে সঙ্কোচ তুমিও বুঝ না!
আর কেহ বুঝে না মহীতে।

৪

যে গানে ধ্বনিয়া উঠে প্রাণ
গাহিতে পারিনে যেন তায়
প্রাণ পূর্ণ নীরব বাসনা
প্রাণেতেই নীরবে লুকায়!

৫

অশ্রুজল ধীরে পড়ে যায়
জগতের কেহ তা বুঝে না
আমার এ নীরব সঙ্গীত
এ জগতে কেহই শুনে না।

৬

তুমি যদি পারিতে শুনিতে
মোর এই নীরবিত গান
পশি সেই নিভৃত গুহায়
যেথা জাগি আছে মোর প্রাণ

৭

কোন শুভক্ষণে যদি কভু
বুঝিতে পারিতে এর কথা
নিমেষেতে গীতি পূর্ণ হ'ত
মোর গীতিহীন নীরবতা!

৮

এত গান আবরণ ভেদি
যেত গান তোমার শ্রবণে
ধ্বনিয়া উঠিত দিশিদিশি;—
মূর্চ্ছাতুর সন্ধ্যার পবনে

৯

আলোকের ওই গীতি সম
বিদায়ের রশ্মি বিচ্ছুরিত;
পড়িত সে অস্তাচল পরে
প্রাণ মোর হইয়া মূর্চ্ছিত!

১০

মরণে রহিত তার মনে
তুমি তার বুঝিয়াছ ব্যথা
সার্থক হইত তার গান
সার্থক হইত নীরবতা!

আমাদের কন্যা।

মানুষ মরিলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির কিরূপ দায়বিভাগ হইবে, ইহা লইয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্য অসভ্য সকল জাতির ভিতরেই চিরকাল বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে এবং যে জাতি সভ্যতার যত উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছে তাহারাই ইহা লইয়া যতদূর সাধ্য একরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থির করিয়াছে। মৃত্যু-কালে স্ত্রী পুত্র কন্যাদি রাখিয়া যাইবে সকলেই এইরূপ আশা করে সুতরাং ইহাদের ভিতর মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তির অংশ বা পারম্পর্য্য নিয়ম, সকল ব্যবহার শাস্ত্রের প্রথম উদ্দেশ্য। ইংরাজ জাতির ভিতর নিয়ম এই যে, মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পুত্র কন্যার সমান ভাবে প্রাপ্ত হয়, সাম্য যাহাঁদের সমাজ নীতির মূল ভিত্তি, তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম কিছুই আশ্চর্য্য নহে। স্ত্রী পুরুষের ভিতর কোন প্রকার অধিকার-ভেদ না থাকে ইহাই ইংরেজ সমাজের প্রধান নিয়ম ও ইংরেজ জাতির একান্ত চেষ্টা। সুতরাং ইংরাজ মরিলে তাঁহার বিষয়ের উপর তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সমান অধিকার বর্ত্তিবে ইহা তাঁহাদের একরূপ জাতীয় সংকল্প বলা যায়। ইউরোপীয় অন্যান্য অনেক জাতির ভিতর এইরূপ নিয়ম আছে, তবে সময়ে সময়ে অবস্থাভেদে প্রয়োজনানুসারে, সে নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ফরাসি জাতির স্যালিক আইন (Salic Law) এইরূপ জাতীয় অবস্থা ও প্রয়োজানুসারে গঠিত। মুসলমানদিগের ভিতর স্ত্রীপুরুষে সাম্য ভাব নাই বটে কিন্তু মহাম্মদীয় ব্যবহার নীতিতে ভ্রাতা বর্ত্তমানে ভগ্নি পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হন না, তাঁহাদের নিয়ম ভ্রাতার অর্দ্ধেক ভগ্নি পাইবেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে কঠোর নিয়ম করিয়াছেন যে, ভ্রাতা বর্ত্তমানে ভগ্নির পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি পাইবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। সাম্যবাদীদিগের চক্ষে এটা অতি ভয়ানক কঠোর নিয়ম নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে, কিন্তু বৈষম্যবাদী হিন্দু বহুকাল হইতে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে অনেকের সৃষ্টির বহু পূর্ব্বকাল হইতে, নির্ব্বিবাদে ইহা শান্তিময় নিয়ম বোধ করিয়া আসিতেছেন। এক পিতা মাতার সন্তান হইয়া একজন সমস্ত পাইবে, আর একজন কিছুই পাইবে না এটা হঠাৎ শুনিতে কেমন যেন একটা বড় কঠোর নিয়ম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক এ নিয়মের বিশেষ কারণ কি বিবেচনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়।

উপরি-উক্ত বিষয় বুঝিতে হইলে হিন্দুর বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটী কথা অগ্রে বোঝা চাই। হিন্দুবিবাহ চুক্তিমূলক নহে, পুত্র কন্যাদিগকে আইন সিদ্ধ করিবার জন্য নহে, (marriage is a contract to legalize generation.) স্ত্রীপুরুষে পরস্পর পরস্পরের বিষয় ভোগ করিবার জন্য সামাজিক নিয়ম বদ্ধ হইবার চেষ্টা নহে, অল্প কথায় হিন্দুর বিবাহ

মোটেই কোন প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার নহে। হিন্দু বিবাহের তাৎপর্য্য স্ত্রীপুরুষের একীকরণ, একীকরণ বিষয় সম্বন্ধে নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে। আমাদের স্ত্রী আমাদের বিষয়ভোগিনী নহেন, আমাদের সহধর্ম্মিণী। প্রকৃত পক্ষে আমাদের স্ত্রীলোকদিগের বিষয় সম্পত্তির সহিত কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই ; এবং রাখিতেও বাসনা রাখেন ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেতও নহে। স্বামী হিন্দু স্ত্রীদিগের একমাত্র আরাধ্য ও উপভোগ্য জিনিষ। দীন-দরিদ্র স্বামীতে রাজ দুহিতাও জগতের যাবতীয় উপভোগ্য পদার্থ দেখেন, এবং পরম দেবতা জ্ঞানে পবিত্রান্তঃকরণে আরাধনা করেন। যে জাতির স্ত্রীপুরুষের এই সম্বন্ধ সে জাতির স্ত্রীলোকদিগের পৃথক সম্পত্তি থাকা বা রাখা সামাজিক নীতি-বিগর্হিত। উপরে আমরা যে একীকরণের কথা বলিয়াছি তাহাতে স্ত্রী পুরুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহাকে আমরা গৃহস্থ বলি তাহাই হয়, অর্থাৎ পৃথক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, একথা নিতান্ত কল্পনা-প্রসূত বলিয়া জড়বিজ্ঞানবাদীদিগের মনে হইতে পারে, কিন্তু যিনি প্রকৃত হিন্দু তাঁহাকে ইহা বুঝাইতে হয় না। এইরূপ ধারণা ও নীতির বশবর্ত্তী বলিয়াই, হিন্দু কখন মনে করেন না,—আমি মরিলে আমার বনিতার বা কন্যার সম্পত্তি কি থাকিবে। তিনি মনে করেন,—আমার মৃত্যুতেই আমার স্ত্রীর মৃত্যু, স্ত্রীরও সেইরূপ একান্ত ধারণা, সুতরাং বিষয়ের ভাবনা কাহারও হইল না, কাযেই স্ত্রীর বিষয় পাইবার ব্যবস্থাও হইল না। কন্যা পক্ষেও তদ্রূপ। পিতা কখনও মনে করেন না আমার কন্যা আমার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া সুখ সম্ভোগ করিবে। তাঁহার বাসনা কন্যা সৎপাত্রে পরিণীতা হইয়া, সেই স্বামীর সুখে সুখিনী ও দুঃখে দুঃখিনী হইয়া জীবন যাপন করিবে। পিতার জীবদ্দশাতেই কি আর মৃত্যু পরেই কি পিতার সহিত,—পিতার সম্পত্তির সহিত—কন্যার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই এবং থাকে এরূপ বাসনাও নহে।

হিন্দু মরণান্তেও তাঁহার আত্মার কিসে উন্নতি হইবে সে ভাবনা সর্ব্বদাই ভাবেন এবং তজ্জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন, আমাদের পুত্র পৌত্রাদির কার্য্যাকার্য্যের উপর আমাদের আত্মার উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। সুতরাং যে পুত্রের সৎক্রিয়া জনিত পুণ্যে আমাদের আত্মার উন্নতি ও তৃপ্তিলাভ হইবে তাহাকেই আমরা সর্ব্বস্ব দিব, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নিয়ম নহে। সমাজের অবনতির সঙ্গে আমরা যেমন অনেক আধ্যাত্মিক কথা ভুলিয়াছি, এ কথাও তেমনি ভুলিতেছি। "বাপ পিতামহের নাম রাখিবে" এটা নিতান্ত সাংসারিক আত্মাভিমানের কথা। প্রকৃত কথা "নাম রাখিবে" নহে আত্মার তৃপ্তি সাধন করিবে। কন্যা দ্বারা সে কার্য্য হইবার নহে, কন্যা তাঁহার স্বামীতে লীনা সুতরাং তাহাঁর স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে, স্বামীর পিতা পিতামহের আত্মার উন্নতি ও তৃপ্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, আমার জন্য বা আমার পিতা পিতামহের জন্য করিবে কেন। তাহা হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ, তাহা আমরা মনে করি না। আমরা কন্যার শৈশব হইতেই তাহাকে শিক্ষা দিই যে, বিবাহ পর্য্যন্ত কন্যা

পিতামাতার আদরের জিনীষ, পালনের পদার্থ, শাসনের সামগ্রী ও ভাবনার বিষয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভাবনার বিষয় কন্যার বিবাহ, বিবাহান্তে কন্যার পিতা-মাতা অপেক্ষা শ্বশুরাদির নিজের জিনীষ। পিতামাতার বিষয় আর চিন্তা মাত্র না করে। যাহাতে স্বামীসুখে সুখী ও সন্তুষ্ট হন সর্ব্বদা তাহাই করিবে, যাহাতে স্বামীর পিতা মাতা সুখী হয়েন তাহাই করিবে, পিতামাতাকে ভুলিতে হয় তাহাও ভুলিবে তাহাতেই পিতামা-তার সুখ, হিন্দু পিতার কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ও কন্যা প্রতি এইরূপ উপদেশ।

প্রসঙ্গ-ক্রমে আমাদের কন্যা সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। একদিন স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, যে তিনি মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে এবং অনেকানেক শাস্ত্রালোচনা করিয়াও যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই তাহা একজন সামান্য ভৃত্যের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং ভৃত্যের গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ পারিতোষিকও দিয়াছি-লেন, সে শিক্ষাটী এই যে তিন মুষ্টি তণ্ডুলে তাঁহার জীবনধারণ হয়, ব্রাহ্মণের ছেলে তিনি দ্বারে দাঁড়াইলে তিন মুষ্টি তণ্ডুল পাওয়া যায়, তাহার জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করা কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমানে অবস্থিতিকালে তাঁহার প্রিয় ভৃত্যের নিকট হইতে এই শিক্ষা-লাভ করেন এবং কলিকাতায় প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়াই চাকরী পরিত্যাগ করেন। ভৃত্য যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক-দিন শিক্ষক হইয়াছিল, কন্যা সেইরূপ হিন্দুসমাজের প্রত্যেক লোকের শিক্ষ-য়িত্রী। কন্যার নিকট হইতে আমরা যে স্বার্থ-ত্যাগের মহতী শিক্ষা পাই, সে শিক্ষা সহস্র গ্রন্থ পাঠে বা গুরূপদেশে উপলব্ধি হইতে পারে না। যে কন্যাকে আমরা জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া লালন পালন করি, যে আদরের সামগ্রী কন্যা একদণ্ড চক্ষের বাহির হইলে আমরা চারিদিক অন্ধকার দেখি, যে কন্যাকে সাধ্যমত ভাল খাওয়াইয়া ভাল পরাইয়া আমরা সুখী হই, যে কন্যার সুখের জন্য আমরা জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকি, সেই কন্যাকে আমরা কেমন নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিয়া আমরা সুখী হই, আর সে দান এমনি স্বত্বলোপী দান যে বিবাহের পর কন্যার সহিত তাঁহার স্বামীর যে অপার্থিব পবিত্র একান্ত সম্বন্ধ তাহাই তিনি বুঝিতে পারেন ইহাই আমাদিগের বাসনা, আরও আমাদের বাসনা কন্যা "আমার" বলিতে আমার কিছু না বুঝেন তাঁহার স্বামীর বুঝেন। এরূপ স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা আমাদের জীবনের ভিতর আর হয় না ইহা ব্যতীত হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুয়ানী শিক্ষা হয় কি না সন্দেহ। দান হিন্দুধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ, কিন্তু সকল প্রকার দান অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু কন্যাদান কত বড় শিক্ষা তাহা বলা যায় না। ত্যাগ হিন্দুধর্ম্মের অপর প্রধান অঙ্গ কিন্তু এরূপ স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত জীবনে আর পাওয়া যায় না। আমরা জন্মিয়া অবধি শিক্ষা করি যে ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় আমাদিগকে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তজ্জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকা

কর্ত্তব্য। কিন্তু জড় দেহাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু কন্যাত্যাগ অধিকতর ত্যাগ শিক্ষার বিষয় নয় কি? এই জন্যই বলিতেছিলাম কন্যা হইতে আমরা যে শিক্ষা পাই সে অতি মহতী শিক্ষা, এবং তাহা হিন্দুর পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় শিক্ষা।

কন্যার সহিত পিতার সম্পর্ক ত্যাগ যখন হিন্দুদিগের অভিপ্রেত ও প্রয়োজনীয় তখন পিতা ও কন্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ রাখা উভয় পক্ষেরই শ্রেয়স্কর নহে, পিতার জীবদ্দশাতেই হউক আর মৃত্যুর পরই হউক, তাঁহার সহিত, বা তাঁহার সম্পত্তির সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা কন্যার পক্ষে বড়ই দূষণীয়।

পিতার সহিত সম্পর্ক রাখিতে নাই এ কথা আমি বলিতেছি না যে কন্যা বিবাহের পর হইতে পিতাকে "বাবা" বলিবেন না। আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে আমার ও তাঁহার স্বার্থ ও স্বত্ব বিভিন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেইরূপ ব্যবহার প্রার্থনীয়। যখন আমাদের সহিত আমাদের কন্যার এরূপ সম্পর্ক আর পুত্রের সহিত সম্পর্ক যেরূপ ঘনিষ্ঠ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাকারিত্ব নির্ণয় কালে কন্যা কিছুই পাইবেন না পুত্রই সমস্ত পাইবেন এরূপ বিধান কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আমরা এই প্রবন্ধে অনেক গুলি বিষয় ধরিয়া লইয়াছি কিন্তু এই সকল বিষয় আমাদিগের ভিতর প্রমাণ বা যুক্তি সাপেক্ষ নহে, চিরপ্রসিদ্ধ স্থির সত্য বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। সমাজ বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক ধর্ম্মও ব্যবহার নীতি ভুলিয়াছি ও ভুলিতেছি, সেই জন্যই আমাদের এই সকল সন্দেহ উপস্থিত হয়।

সাম্য নীতি হইতে সন্দেহ জন্মায় বলিয়াই স্বাধীনতা প্রয়োজন, এই জন্য আজ কাল যথেচ্ছাক্রমে জীবদ্দশায় বা জীবনান্তে সম্পত্তি দানের ব্যবস্থা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাতে ভগবানের এমনি ইচ্ছা যে বাঙ্গালাদেশে সে স্বাধীনতা অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে, ইহা ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে ইহা এক প্রকার কাকতালীবৎ ঘটিয়াছে। তাহার পর ইংরাজদের সংস্পর্শে উইলের ব্যবস্থা শিখিয়াছি সুতরাং জীবনে মরণে আমরা এক্ষণে স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছাক্রমে সম্পত্তি দান বা অপর যে কোন ব্যবস্থা করিতে পারি। এবং তাহাতে পুত্র কন্যার দায় সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির বিরোধী হইলেও সাম্যভাবে ও স্বাধীন চিত্তে স্বেচ্ছাধীনে ব্যবস্থা করিতে পারি।

রত্নহার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রতনের সংসার।

আরও দুই বৎসর অতীত। এই দুই বৎসরে রাণীর নিজের যাহা কিছু ছিল, তাহাও ফুরাইয়া গিয়াছে। রাজার বাজেয়াপ্ত সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে রাণীর নিজের কিছু স্ত্রীধন সম্পত্তিও ছিল। রাণী সেইটী উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সম্পত্তির উদ্ধার হইল না, পরন্তু মোকর্দ্দমার খরচ যোগাইতে তিনি দুই বৎসরে নিস্ব হইয়া পড়িলেন।

রতন এই দরিদ্র পরিবার লইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন। সংসারের মধ্যে রতন, রাণী, নারায়ণী ও একটী কোল বালিকা। দাস দাসী রাখিবার শক্তি রহিলনা বলিয়া, রতন তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন। আত্মীয় স্বজন যে কেহ ছিল, তাহারা সকলে ভাবগতিক দেখিয়া আপনা আপনি স্থানান্তরিত হইয়া গেল। নারায়ণী একা থাকিবে বলিয়া, একা থাকিলে কতকি ভাবিবে বলিয়া, অবিরত চিন্তান্দোলনে সোণার কমল শ্রীহীন হইবে বলিয়া, রতন কোল কুমারীকে নারায়ণীর সঙ্গিনী করিয়াছিলেন। বার বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রমুখ হইতে এই বালিকাটীকে রক্ষা করেন। তাহার পর পরিচিত একটী কোল গৃহস্থের হস্তে বালিকার রক্ষার ভার ন্যস্ত করেন। এখন প্রয়োজনে তাহাকে আবার আপনার কাছেই লইয়া আসিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বালিকা নারায়ণীর সঙ্গে প্রাণেপ্রাণে মিশাইয়া গেল। দুই দশ দিনে এমন হইল, যে কি রতন, কি রাণী, বালিকার জাতীয়ত্ব বিস্মৃত হইয়া সংসারে প্রত্যেক কার্য্যের ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইল, কোল কন্যা বলিয়া আর তাহার উপর ঘৃণা রহিল না। জাত্যভিমান কতক্ষণ ভালবাসার আকর্ষণ সহ্য করিতে পারে? বালিকার নাম আঙ্গী।

রাঁচি হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া ইটকাঠ লইয়া যাইতে খরচ পোষাইবে না বলিয়া, বীরচন্দ্রের প্রকাণ্ড প্রাসাদটী ইনজিনিয়র সাহেব পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুবর্ণরেখা সময় পাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে সেই অট্টালিকার কিয়দংশ উদরসাৎ করিয়াছে; তাহারই এক অংশে রাণী অবস্থান করিতেছেন।

আনন্দ দেব ইতি মধ্যে ভূম্যধিকারী হইয়াছেন। রাজদত্ত জায়গীর পাইয়াছেন। আর সরল ব্রাহ্মণের কুটীলতার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রাজা উপাধি লইয়াই বীরচন্দ্রের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়াছেন। রাণী রতনের কথা না শুনিয়া কি একটা স্ত্রীধন, পিতৃদত্ত যৌতুক—তাই লইয়া মোকদ্দমা করিয়া, হারিয়া নিজেরও যাহা ছিল সব নষ্ট করিয়াছেন। নারায়ণী পঞ্চদশে পা দিয়াছে।

রতন প্রাতে উঠিয়াই সন্ধ্যা আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন করেন। পরে সমস্ত পরিবারের আহার সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। যাহা কিছু পান, ফিরিয়া আসিয়া আঙ্গীর হস্তে সমর্পণ করেন। আঙ্গী সেইগুলি পরদিনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। নারায়ণী রতনের অনুপস্থিতির অবসরে পুষ্পাদি চয়ন করিয়া ব্রাহ্মণের দেবপূজার আয়োজন করিয়া রাখে। আঙ্গী ব্রাহ্মণের আহারের জন্য কাষ্ঠ তণ্ডুলাদি আহরণ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দেয়। রাণী বালিকাদিগের ও নিজের জন্য রন্ধনাদি করিয়া ব্রাহ্মণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ বাটীর বাহির হইয়া যেথায়ই যান না কেন দ্বিপ্রহরের পরে কোথায়ও থাকিতেন না। তিনি না আসিলেও আহার না করিলে কেহই আহার করিত না। কিছুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণ বালিকাগণের সহিত এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক করিয়াছিলেন। অনেক বকাবকি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সহিত বাকযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, বাটীর বাহির হইয়াই যত শীঘ্র পারিতেন ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও দ্বিপ্রহরের পুর্ব্বে প্রায়ই ফিরিতে পারিতেন না। অনন্তপুরের মধ্যে সাহায্যক্ষম লোক কেহই ছিল না। রাজার পলায়নের পর ক্ষণেই নিজ নিজ অশুভ সন্দেহে প্রায় সমস্ত রাজাশ্রিত প্রতিবেশি অনন্তপুর পরিত্যাগ করিয়াছিল। দুই চারি পরিবার জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কিছুকাল অনন্তপুরে বাস করে কিন্তু মহারাজের নিরুদ্দেশের পর হইতে তাহাদের উপার্জনের পথ বন্ধ হইয়াছিল। তাহার উপর জনশূন্য অনন্তপুর দুই বৎসরের মধ্যে অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী ব্যাঘ্রের উপদ্রব তাহাদের কর্ণ গোচর হইতে লাগিল। সকলের উপর, মাঝে মাঝে পুলীশের তাড়না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারাও একে একে সে স্থান ত্যাগ করিল। কাজেই গ্রামের মধ্যে রতনের সাহায্য প্রত্যাশা কিছুই ছিল না। গ্রামের প্রান্তভাগে কতকগুলি কোল বাস করিত—তাহারা সাহায্য করিবে কি, নিজেরাই সাহায্যের জন্য তাহার মুখ চাহিত। নূতন জমীদার আনন্দদেব তাহাদের বহুকালের স্বত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহারা চাষ বাস করিয়া যাহা উপার্জন করে—আনন্দদেবের মনস্তুষ্টি করিয়া, অবশিষ্টাংশ আপনাদের পরিবার খাওয়াইতেই কুলাইতে পারে না। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় সকলে একত্র হইয়া, নির্দ্দিষ্ট তৃণ প্রান্তরে বসিয়া, হাঁড়িয়া পানে উন্মত্ততায়, ও মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতে আপনাদিগের মনোদুঃখ প্রকাশ করে। তাহারা রতনের সাহায্য করিবে কি—তাহারা রতনকে দেখিলেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিত। রতন তাহা দেখিতে পারিতেন না—তাহাদের দেখিলে রতনের কঠিন হৃদয় দ্রব হইয়া যাইত। অবশ্য রতন কখন চক্ষুর জল ফেলিতেন না। হৃদয়ে আঘাত লাগিলে রতন আঘাতের কারণগুলাকে চোখের অন্তরাল করিবার চেষ্টা করিতেন। কোলগুলা সম্মুখে আসিলে তাহাদিগকে প্রহারের ভয় দেখাইতেন।

কাঁদিলে ইট তুলিতেন, লাঠী দেখাই তেন—ভয় প্রদর্শনে স্ত্রী পুরুষের ভেদ রাখিতেন না। যদি ভয় পাইয়া তাহারা পলাইত, রতন তাহা হইলে গন্তব্য পথে চলিতেন। ভয় না পাইলে আপনিই উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেন। কাজেই রতনকে তিনটী স্ত্রীলোক ও আপনার অন্ন সংস্থানের জন্য বহুদূর যাইতে হইত।

বহুদূর যাইয়া রতনকে প্রতিদিন সাতজন লোকের অন্নের সংস্থান করিতে হইত। রতন পেট ভরিয়া খাইলে সাত জনের অন্ন উদরস্থ করিতে পারিতেন। তবে ইদানীং কিছু সংযমী হইয়াছিলেন। চারিজনের অন্নেই তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু প্রতিদিন রতনের সে তৃপ্তিও ভাগ্যে ঘটিত না। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কখন দুই, কখন এক জনের অন্ন খাইয়া কখন অর্দ্ধাশনে কখন সিকি অশনে থাকিতে হইত।

প্রথম প্রথম দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রতন রাঁচি নগরে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভ্রমণ করিতেন। কেহ ভিক্ষা দিত; কেহ বা রতনের বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া তাঁহার দৈহিক বলের সমালোচনা করিয়া ভৃত্য হইতে বলিত,—ভিক্ষা দিত না। কেহবা ভিক্ষা দিয়াও অকর্ম্মণ্য রতনকে কর্ম্মণ্য করিবার জন্য দশন বিকাশে দুইচার কথা শুনাইয়া দিত। আর আসিলে ভিক্ষা না দিবার ভয় দেখাইত। কোন মহাপুরুষ বা অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া অপরকে ভিক্ষা দিতে দেখিলে নিষেধ করিত; কখন বা রতনকে পুলীশে দিবারও ভয় দেখাইত। রতন দেখিলেন ভিক্ষায় আর অধিক দিন চলে না। ভিক্ষায় আশা পূর্ণ হইলে রতন পাঁচ জনের টিট্‌কারী কাণে তুলিতেন না। কিন্তু ভিক্ষায় তাহার নিজেরই অন্ন উপার্জন ভার হইয়া উঠিল। রতন দুই এক দিন মোট মাথায় আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও বেশী উপকার হইল না। তখন কখন ভিক্ষায়, কখন বা পরিশ্রমে, যাহা কিছু পাইতেন, লইয়া দ্বিপ্রহরের সময় ঘরে ফিরিতেন। রাণী নারায়ণী ও আঙ্গীকে দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতে রতনের কখন বা অর্দ্ধাশন, কখন বা অনশন চলিতে লাগিল, পূর্ণ ভোজন প্রায়ই ভাগ্যে ঘটিত না। রতন দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। আঙ্গী তাহা দেখিল।

রাণী ও নারায়ণী যে ব্রাহ্মণের দেহের পরিবর্ত্তন দেখে নাই, তাহা নয়। তাহারা ভাবিয়াছিল মনস্তাপে ও পরিশ্রমে ব্রাহ্মণ দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে। কিন্তু তাহারা কি করিবে! ব্রাহ্মণকে কোনও কথা কহিতে তাহারা সাহস করিত না। কার্য্যের প্রতিবাদ রতনের সহ্য হইত না। কিছু বলিলে রতন ক্রোধ করিয়া সে দিনকার মত আহার বন্ধ দিতেন। কাজেই তাহারা কিছুই বলিতে সাহস করিত না। আর ব্রাহ্মণ একটু পরিশ্রম না করিলে তাহাদিগের উপায় কি হইবে?

রতন ফিরিয়া আসিলে নারায়ণী তাঁহার পদ সেবা করিত, আঙ্গী গাত্র মর্দ্দন করিয়া দিত, রাণী বাতাস করিতেন। রতন সহজে তাহাদের এই কার্য্য করিতে দেন নাই। প্রথম প্রথম প্রতিবাদ ও ক্রোধ প্রকাশকালীন রতন রাণীর চক্ষের জল দেখিয়াছিলেন। চক্ষু

জলে রতনের বড় ভয় ছিল। রতন সেবার কথায় আর বড় দ্বিরুক্তি করিতেন না।

কোল বালিকা কিন্তু বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণের এ কৃশতা মনস্তাপে নয়। ব্রাহ্মণ রাজার পরিণাম দেখিয়া হাসিয়াছিল, একথা সে নারায়ণীর মুখে শুনিয়াছে। শুনিয়াছে রাণীর কাতর রোদনে, নারায়ণীর সহস্র আবেদনেও ব্রাহ্মণ নিরুদ্দিষ্ট রাজার অন্বেষণে একপদও অগ্রসর হয় নাই। হতভাগ্য রাজার পলায়নের পর এক দিবসও তাহারা রাজার নাম ব্রাহ্মণের মুখে শুনে নাই। আসিয়া অবধি আঙ্গী এক দিনের জন্যও তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখে নাই। ব্রাহ্মণের সদা প্রফুল্ল বদন সেই বিষণ্ণ পরিবারের মধ্যে শান্তি আনিত। এমন ব্রাহ্মণ কি মনস্তাপে দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে? হইতে পারে—কিন্তু আঙ্গী বুঝিয়াছিল অপূর্ণ উদরই ব্রাহ্মণের দুর্ব্বলতার কারণ। আঙ্গা বিষয়টা বিশেষ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আঙ্গীর কার্য্য।

আঙ্গী সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বিধাতা একদিন সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন।

বাটীর বাহির হইয়া একদিবস রতনের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল। অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসিয়া রাণী যখন দেখিলেন, দিন যায় তবু ব্রাহ্মণের দেখা নাই, তখন নারায়ণী ও আঙ্গীকে আহার করিতে বলিলেন। নারায়ণীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নারায়ণী ব্রাহ্মণের বিলম্ব দেখিয়া প্রথমে উৎকণ্ঠিত হইল। বেলাও বাড়িতে লাগিল উৎকণ্ঠারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাড়িয়া বাড়িয়া যখন বেলা পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন নারায়ণী দাদার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। শেষে পিতামহীর আহারের অনুরোধ শুনিয়া চারিদিক হইতে কম্প আসিয়া তাহার হৃদয়কে ঘেরিয়া ফেলিল। রাণী ভাবিলেন, উদরান্নের সংগ্রহ মনোমত হয় নাই বলিয়াই বুঝি ব্রাহ্মণ বিলম্ব করিতেছেন।

মানব সহজে হতাশ হইতে চায় না। মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, আত্মীয় শেষ নিশ্বাসের পরও শ্বাসবায়ুস্পর্শের আশা করে। রাণী একটীর পর একটী, একটীর পর একটী করিয়া, জীবনের প্রায় সকল সুখে জলাঞ্জলী দিয়া, স্বামী পুত্র ঐশ্বর্য্য সুখে বঞ্চিত হইয়া, নারায়ণীকে লইয়া সুখী হইবার আশা রাখিয়াছিলেন। সে আশাটী হৃদয় পেটিকার নিগূঢ় প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই আশাটীর সহিত ব্রাহ্মণের জীবনের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। রাণী ব্রাহ্মণকে মনে মনে মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু দান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাজেই ব্রাহ্মণের আসিবার বিলম্বের কোন বিশেষ কারণ আছে স্থির করিয়া নারায়ণীকে আহার করিতে আদেশ করিলেন। আঙ্গী ব্রাহ্মণকে খুঁজিতে যাইবার কথা পাড়িল। কিন্তু এমন অসময়ে অন্বেষণে বাহির হইলে কিছু না খাইলে চলিবে না ভাবিয়া আহার করিতে চাহিল। কাজেই নারায়ণী আঙ্গীকে খাইতে হইবে বলিয়া, না খাইবার মত যৎসামান্য খাদ্য উদরস্থ

করিল। আঙ্গী আহার করিয়া ব্রাহ্মণের অন্বেষণে বহির্গত হইল।

বাহির হইয়া আঙ্গী ভাবিল,—"আমি ক্ষুদ্র নারী, আমি এই অসময়ে ব্রাহ্মণকে কোথায় খুঁজিব? এই বহুদূর গত রাঁচির পথে কত শাখাপথ আসিয়া মিলিয়াছে, তাহার কোনটীতে দিয়া ব্রাহ্মণ আসিবে, কেমন করিয়া বুঝিব? ব্রাহ্মণ নিজের মঙ্গল সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝে, এমন ব্রাহ্মণের একদিন আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, অন্বেষণ করিতে যাইয়া কি গালি খাইয়া মরিব! আর ব্রাহ্মণ যদি অন্য কোন দিক দিয়া বাটী ফিরে, চৌকাটে পা দিয়া ত আগে আমার তত্ত্ব লইবে। যখন শুনিবে আমি তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছি, আর না দাঁড়াইয়া অমনি ফিরিবে। কল্পনায় আমার মাথা গুঁড়াইতে গুঁড়াইতে, বাটীর বাহির হইয়াই গগণভেদী চীৎকারে রাজ্যের কোল কোলনী জড় করিবে। লজ্জায় যে মরিয়া যাইব। হয়ত আজিকার মত তাহার আহারই হইবে না।" আঙ্গী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বারকতক ইতস্ততঃ করিয়া কর্ত্তব্যটা স্থির করিয়া লইল। ভাবিল দাদাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না,—দাদা যখন হোক আসিবে। আমি ইতি মধ্যে আমার কর্ম্মটা করিয়া রাখি।

আঙ্গী ব্রাহ্মনের উপার্জ্জন হইতে প্রতিদিন দুই চারিটী পয়সা চুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ সেই পয়সাগুলি সঙ্গে লইয়া আঙ্গী পথে বাহির হইয়াছে। আঙ্গী বরাবর গ্রাম প্রান্তে চলিয়া গেল। যাইয়া লোকদিগের নিকট হইতে, কিছু জ্বালানি কাষ্ঠ খরিদ করিল।

আঙ্গী ব্রাহ্মনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিয়াছিল ব্রাহ্মণ অর্থোপার্জনের পন্থা জানে না। হস্তী আকর্ষণের বল লইয়া ব্রাহ্মণ মুষিক বহিয়াই সময় নষ্ট করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবে, কুলীর খাটুনি খাটিবে তবুও জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য উপায় অবলম্বন করিবে না। অন্য উপায় আছে জানিতেও চেষ্টা করিবে না। অন্য উপায় আছে, আর সেই উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ ফললাভ হইবে, একথা ব্রাহ্মণকে বলিতে তাহার সাহস হইত না। নিজের বিষয়ে ব্রাহ্মণ বড় তাহাদের অনুরোধ উপরোধ রাখিত না। সে নিজে যাহা ভাল বুঝিত তাহাই করিত কখন কথা থাকে নাই, পাছে একথাও না থাকে, এই ভয়ে আঙ্গী কৌশল অবলম্বন করিল। অবশ্য ঔপন্যাসিক কৌশল নয়। নিরক্ষরা ক্ষুদ্র কোল বালিকা সরল প্রাণে যে সরল কৌশল উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাই অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। আঙ্গী ভাবিয়া রাখিয়াছিল ব্রাহ্মণকে কাষ্ঠের ব্যবসায় শিখাইতে হইবে। রাঁচি নগর জনাকীর্ণ। সে স্থানে কাষ্ঠ লইয়া যাইতে পারিলে ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের পথটা খুলিয়া যাইবে। অন্ততঃ তাহাকে অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিতে হইবে না।

কাষ্ঠ খরিদ করিয়া আঙ্গী কাষ্ঠের বোঝা মাথায় লইয়া ফিরিল। পথে বাহির হইয়া একবার তৃণগুল্মবৃক্ষলতাচ্ছন্ন চারিদিকের প্রান্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সম্মুখে অস্তগিরিরাজ, কন্যা সন্ধ্যার প্রিয়তম, বিশ্বজ্যোতির আধার মহা প্রতাপবান জামাতাকে অভ্যাগত

দেখিয়া মেঘরূপে সাদর সম্ভাষণ করিতে আসিতেছিলেন। কিন্তু প্রখর কর সন্তপ্ত শ্বশুর মহাশয় গৃহজামাতার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া, দুঃখে গলিয়া গেলেন। কন্যা ধীর পাদবিক্ষেপে স্বামীসম্ভাষণে আসিয়া স্বামীর দুর্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া যেমন চক্ষু রাঙ্গাইলেন, অমনি প্রভাকরের হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিতে আরম্ভ করিল। প্রভু থতমত খাইয়া কি করিয়াছি কি করিয়াছি বলিবার জন্যই যেন হাঁ করা হাসি হাসিলেন। সন্ধ্যা-রাণী গুনধরের কাণ ধরিয়া টান দিলেন। কাণের সহিত আকৃষ্ট হইয়া মাথা গিরি-বরের চরণপ্রান্তে লুটাইল। প্রভুর দৈনন্দিন লীলার অবসান হইল। কিন্তু গৃহিনীর রাগ থামিল না। রাগটা এখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার একটু ভগ্নাংশ আসিয়া আঙ্গীর মুখে পড়িল। ঘোরকৃষ্ণ কোল বালিকার কৃষ্ণ নয়নকমল সন্ধ্যারাগ নিষিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। আঙ্গীর মুখ বুঝি বুঝিয়াছিল কৃষ্ণকম-লিনী সপত্নীভ্রমে সন্ধ্যারাণীর ক্রোধ তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই সন্ধ্যার ভ্রম বুঝাইবার জন্য মলিন না হইয়া হাসিল। নীরব না রহিয়া গাহিল। সেই সুমধুর উচ্চকণ্ঠরব সুতানে সুতানে বায়ুরাশী ভেদ করিয়া পশ্চিম গগণে যাইয়া সন্ধ্যার কাণে উঠিল। সন্ধ্যা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া ফেলিল।

দিবা শেষ হইল, আঙ্গীর গীত শেষ হইল না। উন্মুক্ত হৃদয় দ্বার দিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিল। মুদারা, উদারা, তারা, স্বরের পর স্বর করিয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঢালিয়া, চতুর্দ্দিকস্থ শৈলপ্রাচীর প্রতিহত প্রতিধ্বনি তরঙ্গের সহিত মিলিয়া সেই বিস্তৃত প্রান্তরকে ঐক্যতান বাদনের লীলাভুমি করিয়া তুলিল। অতি আনন্দে প্রান্তর যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

অতি দূর হইতে সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বর আঙ্গীর কর্ণকুহরে সহসা প্রবিষ্ট হইল। 'কেরে'! বালিকা নিস্তব্ধ। প্রান্তর কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সঙ্গীত তরঙ্গ শীকর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া স্থির। 'বলি গাণ গায় কেরে'! প্রান্তর আবার মাতিবার উপ-ক্রম করিয়া গাঝাড়া দিল। আধ অন্ধ-কার মাথা অর্দ্ধস্বচ্ছ বায়ু আবরণ ভেদ করিয়া আঙ্গী দেখিল দূর হইতে একটী জঙ্গল আসিতেছে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আঙ্গীর মুখ আবার ফুটিল! বালিকা যথাসাধ্য চীৎকারে বলিয়া উঠিল—'দাদা'!

অগ্রসর হইতে হইতে জঙ্গল মানুষ হইল। আঙ্গী দেখিল একটা দেশ মাথায় করিয়া দাদা ঘরে ফিরিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রতনের অদৃষ্ট পরীক্ষা।

প্রভাতে উঠিয়া সন্ধ্যাহ্নিকাদি কার্য্য সমাপনান্তে রতন প্রতিদিন যেমন বাহির হন, তেমনি বাহির হইলেন। কিন্তু এক পদ না বাড়াইতেই দেয়ালের গায় টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল। কোপ দৃষ্টিতে রতন একবার দেয়ালের দিকে চাহিলেন। টিকটিকি আকাশের দিকে পা করিয়া, মাথাটী দেওয়াল হইতে কিছু উপরে তুলিয়া, নাড়িয়া নাড়িয়া, এক

স্থানে স্থির থাকিয়া রতনকে আরও গোটা দুই টিটকারী দিল।

বলের উপযোগী উপার্জ্জনে অক্ষম বলিয়া, তিনটী স্ত্রীলোক ও আপনার অন্ন সংগ্রহ করিতে প্রতিদিন বড়ই কষ্ট পাইতে হয় বলিয়া, রতন কয় দিন হইতে বড়ই চিন্তিত ছিলেন। বাহির হইবার সময়ে রতন চিন্তার বোঝাটী মাথায় করিয়াছিলেন। অনিশ্চিত দিবসের ফল আগে হইতেই কল্পনায় আনিয়া রতন রাঁচি সহরটাকে চোখের উপরে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রতন দেখিলেন কোথাও বিশ্বসংসার মাথায় করিয়া কোনও বাবুর পাছু পাছু যাইতেছেন। রতন আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য বাবু এক একবার পাছু পাছু চাহিতেছেন। আর চোখোচোখি হইলেই বলিতেছেন, এই আমার বাড়ী দেখা যাইতেছে, সেথায় মোটটী রাখিলেই পয়সা দিব। রতনের চলা ফুরায় না আর বাবুরও এই আমার ফুরায় না। পার্শ্বে দিয়া যাইতে যাইতে রতনের বোঝা দেখিয়া কতকগুলা কোল, ব্রাহ্মণ তাহাদের অন্ন মারিল বলিয়া দুঃখ করিতে করিতে চলিতেছে। দূর হইতে কাহারগুলা গালি দিতেছে। বালক গুলা জড় হইয়া রতনকে হাতী অনুমান করিয়া এ উহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইতেছে। স্ত্রীলোকগুলা হাঁ করিয়া তার পানে চাহিয়া আছে। বাবু চারি আনার কার্য্য চারি পয়সায় সম্পন্ন হইল ভাবিয়া রতনকে বোকা জ্ঞানে মনে মনে হাসিয়া, বোকা দেখিবার কামনা করিতেছেন। তাহা হইলে সুচারুরূপে বাবুর সংসার চলে, দুচারি খানি অলঙ্কার শীঘ্রই গৃহীনীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করে।

কোথাও রতন কূপ হইতে জল উত্তোলন কার্য্য পাইয়াছেন। দেশীয় চড়ক কল সাহায্যে রতন সাগর ছেঁচিতেছেন। কোথাও পথে আসিতে আসিতে সাহেবের বেগার কাজ পাইয়াছেন। তথনও পর্য্যন্ত প্রয়োজন মত উপার্জ্জন হয় নাই বলিয়া, রতন যত শীঘ্র পারেন বেগার কার্য্য শেষ করিতেছেন। কিন্তু কার্য্য শেষ না হইতেই আবার নূতন কার্য্য আসিয়া তাহার গলায় বরমাল্য দিতেছে। এইরূপ কার্য্যের পর কার্য্য, কার্য্যের পর কার্য্য আসিয়া রতনকে ঘেরিল। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া রতন গাঝাড়া দিলেন। সাহেব দয়ালু হইলে রতন কিছু পাইতেন। নহিলে দুটা মিষ্ট সম্ভাষণ পাইয়াই তাঁহাকে ফিরিতে হইত। কোথায় তাহাও ভাগ্যে যুটিল না। রতন পূর্ব্বজন্মে সাহেবের ঋণ করিয়াছিলেন—ঋণ পরিশোধ হইল। রতন ঋণমুক্ত হইলেন, ধন্যবাদের পাত্র কে?

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ।

ভৈষজ্য।

বৎসনাভ।

(মিঠাবিষ)

Aconitum ferox.

তৎপর্য্যায়ঃ।

বিষঃ ক্ষ্বেড়ো রসস্তীক্ষ্ণ গরলোঽথ হলাহলঃ।
বৎসনাভঃ কালকূটোব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপনঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৌল্কিকেয়ঃকাকোলো দারদোঽপিচ।
অহিচ্ছত্রো মেষশৃঙ্গ কুষ্ঠা বালুকনন্দনাঃ॥
কৈরাটকো হৈমবতো মর্কটঃ ক্রূরবীরকঃ।
সর্ষপোমূলকো গৌরাদ্রকঃ সক্তুককর্দ্দমৌ॥
অঙ্কোল্লসারঃ কালিঙ্গঃ শৃঙ্গিকো মধুসিক্থকঃ।
ইন্দ্রো লাঙ্গলিকো বিস্ফুলিঙ্গ পিঙ্গল গোতমাঃ॥
মুস্তকো দালবশ্চেতি স্থাবরা বিষজাতয়ঃ॥

ব্যুৎপত্তি।—প্রায়ো বৎসান্ নভ্যতি হিনস্তি বৎসনাভঃ ণভ্য গ হিংসেঽচাৎ বল্লিতিমিন্। অথবা বৎসস্য নাভিরিব বৎসনাভঃ ফঃ অনিতশ্চেতি ন বৃদ্ধিঃ অয়ং সিন্ধুবার পত্র সদৃশ পত্রঃ।

স্বরূপ-নির্ণয়।

সিন্ধুবার সদৃক্ পত্রো বৎসনাভাকৃতিস্তথা।
যৎপার্শ্বে ন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভ স ভাষিতঃ॥

ইহার পত্র সিন্ধুবার অর্থাৎ নিসিন্দা পত্রের ন্যায় এবং ইহা দেখিতে বালকদিগের নাভির, (গাঁড়ের) সদৃশ। ইহার পার্শ্বে তরু বৃদ্ধি পায় না।

সামান্যগুণ।

বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাসিচ।
আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্ যোগবাহি মদাবহম্॥

এই বিষ সেবনে লোকের প্রাণ বিয়োগ হয়; ইহা ব্যবায়ি অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; বিকাসি অর্থাৎ শরীরের তেজ শোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ শিথিল করিয়া ফেলে, আগ্নেয় অর্থাৎ উত্তেজক, বাতকফহারী, যোগবাহি অর্থাৎ সংসর্গ গুণগ্রাহক এবং মদাবহ অর্থাৎ মাদক।

বৎসনাভ অশোধিত অবস্থায় এইরূপ কুফলোৎপাদক, কিন্তু ইহাকে শোধন করিয়া লইলে সেই সমস্ত দোষ শোধিত হওয়াতে ইহা দ্বারা বিস্তর সুফল পাওয়া যায়।

উৎপত্তিস্থান।—সিকিম্ ও ঘড়োয়ালের মধ্যে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা প্রভূত পরিমাণে উদ্ভূত হয়।

ক্রিয়া।—ইহা প্রধানতঃ স্নায়বিক অবসাদক; স্থানিক উগ্রতাসাধক, বেদনা নিবারক, স্পর্শজ্ঞান-হারক, কচিৎ স্বেদজনক ও মূত্রকারক। শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে ঐ স্থান প্রথমতঃ উত্তপ্ত বোধ হয় অল্পক্ষণ পরেই ঝিনঝিন্ করিয়া অবশ হইয়া পড়ে। ইহা চর্ব্বণ করিলে অধিক মাত্রায় লালা নিঃসৃত হয় এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠ অসাড় হইয়া যায়। ইহা দ্বারা উগ্রতা সাধিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে আক্ষেপ হইতে থাকে; কখন কখন পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলের পেশিসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে; তদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন বিকার লক্ষিত হয় না; ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরও কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না।

ইহা মস্তিষ্কের জড়তা ও অবসন্নতা উৎপাদন করে এবং শ্বাসগ্রহণে সহায়তাকারী পেশিসমুদায়ের পক্ষাঘাত সাধিত করাতে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অনেক রোগে উপযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহা মাদক, অবসাদক, আগ্নেয়ও উত্তেজক। জ্বর ও শিরঃশূলে, কণ্ঠরোগে, অজীর্ণ ও বাতপীড়ায় ইহা প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বৎসনাভের ব্যবহার দেখা যায়। তরুণ বাতরোগে ইহা একটী মহৌষধ; তাহাতে ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপরূপে প্রয়োগ করা হয়। এরূপ করিলে শীঘ্র বেদনা ও যাতনা দূর হয় এবং আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়। ইহার প্রয়োগে বৃহৎসন্ধির বেদনা যত শীঘ্র দূর হয়, ক্ষুদ্র সন্ধির ব্যথা তত শীঘ্র অন্তরিত হয় না। পুরাতন বাতরোগেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলেন যে, পুরাতন বাতরোগেও বৎসনাভ প্রয়োগে আশু সুফলও পাওয়া যায়।

প্রদাহ ও প্রাদাহিক জ্বর-দমনে বৎসনাভ যেন ব্রহ্মাস্ত্র। প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রদাহ প্রশমিত হয়। কিন্তু প্রদাহ পুরাতন হইয়া পড়িলে ইহা দ্বারা তত সুফল পাওয়া যায় না;—বিশেষতঃ সেরূপ অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অতি সাবধানে ইহা প্রয়োগ করা উচিত।

জ্বরবিকারে।—বিষম ও স্বল্প বিরাম জ্বরে বৎসনাভ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে উৎকট শারীর তাপ ও নাড়ীর দ্রুতগতি শীঘ্র কমাইয়া আনে। সূতিকাজ্বরে ইহা ব্যবহার করিয়া অনেকে সুফল লাভ করিয়াছেন। এলবিউমিনিউরিয়া রোগে শরীর-তাপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে একোনাইট প্রয়োগ করা উচিত। সন্ন্যাস রোগে নাড়ী পূর্ণ ও বলবতী থাকিলে যদি বৎসনাভের অরিষ্ট প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে আশু উপকার হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্য, তরুণ প্রবাহিকা ও শিশুদিগের বিসূচিকারোগে বিবেচনা পূর্ব্বক বৎসনাভ প্রযুক্ত হইলে অচিরে মহোপকার পাওয়া যায়।

কষ্টরজো রোগে, প্রমেহ পীড়ার প্রবলাবস্থায়, মূত্রাশয়ের তরুণ প্রদাহে এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস নিবারণার্থ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বিবিধ প্রকার স্নায়ুশূল, ধনুষ্টঙ্কার ও হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনের মহৌষধ, এতদ্ব্যতীত মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্যে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

দেশীয় হকিমেরা বলেন যে, সর্প ও বৃশ্চিক দংশনে বৎসনাভ প্রয়োগ করিলে সুফললাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ঠিক কি না, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। পক্ষাঘাত পীড়ায় ইহা স্নায়ুবল সাধক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। শরীরের কোন অঙ্গ ভগ্ন বা নিষ্পেষিত হইলে ইহা প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়।

বৎসনাভ উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত; ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে বিষক্রিয়া উদ্ভাবিত করিয়া জীবন নাশ করিয়া থাকে।

অর্ক।

(আকন্দ)

Calatropis Gigantea.

পর্য্যায়।

ক্ষীরদল, পুচ্ছী, প্রতাপ, ক্ষীর-কাণ্ডক, চিক্ষীর, ক্ষীরী, খর্জ্জুঘ্ন, শীত-পুষ্পক, জম্ভন, ক্ষীরপর্ণী, বিক্লীরণ, মদা-পুষ্প, সূর্য্যাহ্ব, তূলফল, শুকফল, বসুক, আস্ফোত, গণরূপ, মন্দার, অর্কপর্ণ।

প্রকার।

অর্ক সচরাচর দুই প্রকার যথা, শ্বেত ও রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ বলেন, শ্বেত ও আরক্ত পুষ্প ব্যতীত হরিদাভ পীতবর্ণের এক প্রকার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পাতা অতি ক্ষুদ্র।

গুণ।

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও অগ্নিকারী এবং বাত, কফ, শোথ, ব্রণ, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক। ইহার ক্ষীরেরও এই সকল গুণ বিদ্যমান দেখা যায়, অধিকন্তু ইহা ব্রণ ও উদর রোগে বিশেষ হিতকর।

ভৈষজ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, শ্বেত ও রক্ত অর্কের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে। তদ্‌যথা,—

শুক্লার্ককুসুমং বৃষ্যং লঘুদীপনপাচনম্।
অরোচক প্রসেকার্শঃ কাসশ্বাস নিবারণম্॥
রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং
কুষ্ঠকৃমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
অর্শোবিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং
সংগ্রাহি গুল্মেশ্বযথৌ হিতং তৎ।

অর্থাৎ শুক্লার্কের কুসুম বৃষ্য, ও লঘু, ইহা পরিপাকশক্তি ও পাচকাগ্নি বর্দ্ধিত করে, অরুচি, প্রসেক, অর্শ, কাস ও শ্বাসরোগ নাশ করিয়া থাকে।

রক্তার্কের পুষ্প অল্প তিক্তযুক্ত মধুর। ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শ, বিষদোষ, রক্তপিত্ত, গ্রহণী ও গুল্মনাশক।

ক্ষীরসর্কস্তু তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠ গুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ্বিরেচনম্॥

অর্কের ক্ষীর তিক্ত, উষ্ণ ও স্নিগ্ধ-কর এবং লবণ মিশ্রিত হইলে লঘু। ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদরীনাশক এবং উৎকৃষ্ট বিরেচক।

অর্ক অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ, ইহা ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই কোন না কোনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ইহার ভৈষজ্য গুণ বিদিত আছে। বোধ হয় এত উপকারী বলিয়া ইহা আয়ুর্ব্বেদের আদিকর্ত্তা ভগবান্ মহেশ্বরের অতি প্রিয় কুসুম বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্কের সকল অংশই ঔষধরূপে প্রযুক্ত হয়,—বিশেষতঃ ইহার মূল, পুষ্প, বল্কল ও নির্যাসের অধিক আদর দেখা যায়।

নির্য্যাস।

অর্কের শাখা ও স্কন্ধ হইতে নির্য্যাস সংগৃহীত হয়। ক্রমে তাহা মৃদু সন্তাপে শুষ্ক হইলে বটিকা বা চূর্ণের আকারে পরিণত হইয়া থাকে।

ইহা অধিক মাত্রায় (৪ গ্রেণের অধিক) ব্যবহৃত হইলে উত্তেজক বিষের কার্য্য করে, তাহাতে অধিক বমন বা বিরেচন, কিম্বা এককালে উভয়ই হইয়া থাকে। ভেষজমাত্রায় (১ হইতে ৩ গ্রেণ) প্রযুক্ত হইলে ইহা আক্ষেপ নিবা-রণ করে এবং হৃষ্টি, পুষ্টি ও বলকারক-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

৩য় খণ্ড। | সন ১৩০৩ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মতিলাল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসাক।

—o—

সূচী।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা।৹ চারি আনা।

নিবেদন—

আমার ভূতপূর্ব্ব আশ্রয়দাতা সম্মানীয় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সেন মহাশয় আমার প্রতি সমীরণের সমুদয় ভারার্পণ করিবার পর নানা কারণে আমাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। নূতন আফিশ, নূতন বন্দোবস্ত, নূতন লোক— গোলযোগ হইবারই কথা। এই সকল কারণে এবার 'সমীরণ' বাহির হইতে অযথা অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। তবে বিলম্ব হইবার আর ও একটি কারণ আছে। কারণটি কি ?

সমীরণ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয় না বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিতেন—অভিযোগও অমূলক নহে। বৎসরের আরম্ভ হইতেই সকল কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে, নতুবা গোলযোগ ঘটিতে পারে। তা যাহা হউক, এখন হইতে বৈশাখ হইতেই সমীরণের বৎসর আরম্ভ হইল। গত বর্ষের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের সংখ্যা বৈশাখ ও জৈষ্ঠের ধরিয়া এ সংখ্যা আষাঢ় মাসের ধরিলাম। সমীরণ বাহির হইল, এখন পাঠকগণ এ বিলম্বের জন্য ত্রুটি-মার্জ্জনা করিলেই বাধিত হইব।

সবিতার স্থানান্তর আশ্রয়ে, সমীরণের অবস্থানুযায়ী হইয়া বহিতে কালাতিপাত হয়, "সমীরণের" সবিতার উপায়ান্তর অবলম্বনে যে তাহার স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণে বিলম্ব হইবে, তাহার বিচিত্র কি।

আমাদের অনাথ-কুটীর কার্য্যালয়।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ"। সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, কিছুই বলিতে পারা যায় না। আজকাল অর্থের টানাটানি—মধ্যবিত্তের দুর্দ্দশার একশেষ। হয়ত বাড়ীর মধ্যে একজন বিশ পঁচিশ টাকার চাকরী করেন—সমস্ত সংসার অহোরাত্র তাঁহার মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে। এই সময়ে যদি তিনি হঠাৎ মারা যান, তাহা হইলে সকলের দুর্দ্দশার অবশেষ থাকে না। ভদ্রলোক প্রকাশ্য পথে ভিক্ষা করিতে পারেন না—ভিক্ষা না করিলেও চলে না—এই অবস্থায় পড়িয়া তাঁহারা বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়েন—তাই যথাসাধ্য তাঁহাদের দুঃখ বিমোচনার্থই আমাদের এই অনাথকুটীরের সৃষ্টি। ইহার জন্য যিনি যাহা কিছু অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদান করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। আমাদের গ্রাহক মহাশয়গণের মধ্যে যদি কাহারও পরিচিত প্রকৃত অনাথ বা অনাথা থাকেন—অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই কার্ডে আমাদের জানাইবেন—পত্রের উত্তর পাঠাইবার পর সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে গ্রহণ করা হইবে।

আমাদের মেম্বরগণের নাম।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ।
শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মতিলাল।
শ্রীযুক্ত হীরালাল রক্ষিত
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল্।
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ।
শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র শেঠ।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসাক প্রভৃতি—

৩য় খণ্ড। | সন ১৩০৩ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

আদি কবি নরহরি ঠাকুর
ও
পদকর্ত্তা লোচন দাস।

লোচনদাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা এবং গ্রন্থকার। লোচনের কবিতা অতি সুমধুর এবং গভীর ভাবব্যঞ্জক অথচ হাস্যরসাত্মক। ঈদৃশ পদরচনায়, প্রাচীন কবিগণের মধ্যে একমাত্র লোচনই সিদ্ধ-হস্ত। এইরূপ রচনার জন্যই সম্ভবতঃ বৈষ্ণববর্গ তাঁহাকে "বড়াই বুড়ির" অবতার বলিয়া থাকেন।

(১) বিদ্যাপতিঃ (২) চণ্ডীদাসো (৩) জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ। (৪) লীলাস্তকঃ প্রেমযুক্তো (৫) রামানন্দশ্চ নন্দদঃ॥ (৬) শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোহন্ত (৭) সিদ্ধ কৃষ্ণকবীণকঃ। পৃথিব্যাং ধনধন্যাস্তে বর্ত্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ॥ এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্। যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

বৈষ্ণব কবিবর্গের মধ্যে ইহাঁরাই প্রথম শ্রেণীর কবি, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে লোচনদাস একজন শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বীকৃত।

এই লোচনদাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব ; কিন্তু তাঁহার কথা বলিতে গেলে ঠাকুর নরহরির কথাও বলিতে হয়।

যে সমাজে যখন কোন লোকাতীত পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, সে সমাজই তখন জাগিয়া উঠে, সে সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত কি এক বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া বলেই যেন সজীবতা প্রাপ্ত হয়। সাহিত্যে—কাব্যে, সর্ব্বত্রেই সেই সজীবতা দৃষ্ট হয়।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যেরও একবার সে দিন উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু তখন বঙ্গভাষা দুগ্ধপোষ্য শিশু ; সুতরাং সে শক্তি, তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিতেই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই যে বঙ্গভাষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যাবলী, তাঁহার বিচিত্র ভাবাবলী, বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্রে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাই তাঁহাদের কল্পনাকে উন্মেষিত, উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। চৈতন্যলীলার পদাবলী ও গ্রন্থাবলীই তাহার প্রমাণ। এই যে চৈতন্যলীলা-চিত্র, ইহার প্রথম অঙ্কনকারী—আদি চিত্রকরই নরহরি সরকার। নরহরি সর্ব্বপ্রথম চৈতন্যলীলার প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে পদরচনা করেন, তাঁহার দেখাদেখিই শেষে অন্যান্য কবিগণ অগ্রসর হন। অতএব, ঠাকুর নরহরির নিকট বাঙ্গালাসাহিত্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-সমাজের যুগপৎ কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই তাঁহাকে জানেন।

"নারায়নাত্মজমতীব দয়ালু প্রেম-প্রবাহ-পরিপূরিত ভক্তিমার্গং। চৈতন্যচরণেভি-নিবেশমন্তং বন্দে প্রভুং নরহরিং পরমেষ্ট দেবং॥"

নরহরি ঠাকুরের পিতার নাম নারায়ণ ছিল, ইহা এই (প্রণাম) শ্লোকটীতে লিখিত আছে। নারায়ণ দেবের দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ রাজবৈদ্য ছিলেন, হুসেন-সার চাকরী করিতেন। নরহরি বাল্যকাল হইতে বৈরাগী—আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন।

প্রতপ্ত বর্ণাভং ভাববরণং ভূষিতং,
নীলাবাসধরং দিব্যং চন্দনার্চ্চিত ভালকং।
গামসূত্র প্রগাভারং কণ্ঠে বিপুল লম্বিতং,
দিব্যসিংহাসনাসীনং শ্রীমন্নরহরিং ভজে॥"

এই (প্রণাম) শ্লোকটীতে শুনা যায় যে, তিনি অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন। যে বর্ণকে কবিগণ "প্রতপ্তস্বর্ণবর্ণ" বলে, নরহরির তদ্রূপ উজ্জ্বল রূপাভা ছিল। তাঁহার কণ্ঠে লম্বিত তুলসী মালা, অতি সুন্দর দেখাইত, এবং কপালে তিনি চন্দন লেপন করিতেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভু হইতে তিনি ৭।৮ বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং ১৪০০ শকাব্দায় তাঁহার জন্ম হয়, এ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

নরহরি একটী পদে লিখিয়াছেন;—একদা তিনি সুরধুনীর তীরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, এমন সময় মহাপ্রভুকে তথায় দেখিতে পাইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন, এমন কি সেই হইতে মহাপ্রভু তাঁহার "প্রাণনাথ" হইয়া গেলেন, সেই হইতেই তিনি তাঁহার সঙ্গী, ছায়ার ন্যায় সঙ্গেই থাকিতেন।

নরহরির বাড়ী শ্রীখণ্ডে। বিদ্যার্জ্জনের জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেন। একটি পদেই তিনি বলিয়াছেন—

—"গৌরাঙ্গচান্দের, রূপের পাথারে,
সাঁতারে না পাই থা।"

গৌররূপে তিনি কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই কথাটীতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। নরহরি গৌরলীলার একজন প্রধান সহায়তাকারী।

কিছুদিন গৌরাঙ্গের সঙ্গে বাস করিতে করিতে তাঁহার মনে একটী অদ্ভুত ভাবের উদয়

হইল, তিনি ভাবিলেন যে, গৌরাঙ্গ বস্তুটী সামান্য নহেন, এই বস্তুটী নিখিল বিশ্বের সেই একমাত্র কারণ। এরূপ মনে হওয়ায় তিনি একটু বিপদে পড়িলেন। এরূপ কথা তখন কেহ অবগত ছিল না, যদি তিনি তাঁহার মনের কথা বাহ্যজগতে ব্যক্ত করেন, লোকে হাসিবে—টিটকারী দিবে। ভয়ে বলিতে সাহস করেন না, আবার যে কথা সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহা না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছেন না "এই ভাব" দুটী ছত্রে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—

" কারে কব মনের কথা।
কে বুঝিবে মনোব্যথা॥"

কিন্তু নরহরির এ ক্ষোভ অধিক দিন ছিল না, তাঁহার "প্রাণনাথ" শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

নরহরিই সর্ব্বপ্রথম গৌরতত্ত্ব প্রকাশ করেন, এজন্য তিনি সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের নমস্য। তিনিই সর্ব্ব প্রথম গৌরলীলাত্মক পদাবলী সৃষ্টি করেন ও পথ দেখাইয়া দেন, এজন্য তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের অভিবন্দ্য।

গৌরাঙ্গের যে অদ্ভুত লীলাবলী তিনি দর্শন করিতেছিলেন, যে অমৃত তিনি পান করিতেছিলেন, তাঁহার বড় ইচ্ছা, পরবর্ত্তী জনগণও তাহার আস্বাদ পায়; তাঁহার বড় অভিলাষ, গৌরলীলার একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ হয়, কিন্তু ইহা তাঁহার ক্ষমতাতীত; কেননা, তিনি যখন লিখিতে বসেন, যখন ভাবিতে যান, তখনই একবারে, 'বিভোর' হইয়া পড়েন, আর লেখা হয় না। তথাপি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, কয়েকটী পদ বর্ণন পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ গৌর লীলা লেখকগণের জন্য উপকরণ রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্ব প্রথম যে পদটী বাহির হয়, তাঁহাতেই তদীয় হৃদয়ের অভিলাষ পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

গৌর লীলা দরশনে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুই ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
সে গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় লিখিত হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাইবে প্রভু॥
গৌর-গদাধর লীলা, শুনিতে আর্দ্র রসিলা,
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে গৌর লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থ গানে দরবিবে শীলা॥"

নরহরির গৌরলীলাত্মক পদ "কিছু কিছু লিখার" উদ্দেশ্য এই যে, "যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে গৌরলীলা।" বলা বাহুল্য—তাঁহার এই অভিলাষ লোচনদাসই সম্যকরূপে পূর্ণ করেন।

প্রথমতঃ তাঁহার অনুসরণ করিলেন

বাসুদেব ঘোষ। বাসুঘোষ মহাপ্রভুর জন্ম হইতে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী ঘটনানিচয় পর্য্যন্ত, (গৌরলীলা) পদে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরই অনুকরণে মাধব, মনোহর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ অপূর্ব্ব কবিতাহার গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গৌরলীলা-গায়ক বাসু ঘোষ স্পষ্টাক্ষরে তাঁহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥

কবি লোচনদাস এই সরকার ঠাকুরের শিষ্য,—ইহাঁরই "হাতগড়া" পুতুল। লোচন ১৪৪৫ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমানের উত্তর দশক্রোশ, গুস্করা ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে, কুনুর নদীর ধারে মঙ্গল কোটের নিকট, কো বা কুয়া (কুঁভা) নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে বৈদ্য-বংশে লোচনের জন্ম হয়। লোচন তাঁহার পূর্ণ নাম নহে, ইহা তাঁহার নামের একাংশ এবং "ডাক নাম" বলিয়া, এই নামেই তিনি সাধারনতঃ পরিচিত। আমরা এই একই ব্যক্তির চারিটী নাম দেখিতে পাই।

১। সুলোচন। ২। ত্রিলোচন।
৩। লোচন। ৪। লোচনানন্দ।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তিনি সুলোচন নামে আখ্যাত হইয়াছেন। চরিতামৃতের ১০ম পরিচ্ছেদে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। যথা—

"খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব সুলোচন॥"

ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম-বিলাসাদিতে তাঁহার ঐ নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা;—খেতরীর মহোৎসবে শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দনাদি গেলেন—

"শ্রীরঘুনন্দন সুলোচন আদি সঙ্গে।"—
নরোত্তমবিলাস।

ত্রিলোচন নামটী তাঁহার প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়। লোচনের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিতে এই নামটী আছে।

গুস্করা ষ্টেশনের নিকট কাঁকড়া গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল গায়ক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর* নিকট লোচনের সহস্ত লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ আছে। এই মূল এবং অন্যান্য প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির সহিত বটতলা-মুদ্রিত পুস্তকের দিন রাত্রি প্রভেদ। ছাপার পুস্তকে অনেক কথাই পরিত্যক্ত এবং ত্রিলোচন নামস্থলে "লোচন" বা "লোচন" লিখা হইয়াছে; যেমন—

"গুণ গায় এ লোচন দাস।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই "এ" টী "ত্রি" এরূপ হইবে—"গুণ গায় ত্রিলোচন দাস" ইত্যাদি।

লোচনকৃত বহুতর পদ আছে, পদ-

* প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী আট নয় মাস হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন। স্বগ্রামে ইনি প্রাণবল্লভ নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাঁর একমাত্র কন্যা কাটোয়ায় বিবাহিতা হইয়াছেন।—সম্পাদক।

সকলের ভণিতা স্থলে প্রায়ই "লোচন" নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিতর সর্ব্বত্রই যে "ত্রিলোচন" নাম আছে,তাহা নহে। কোন কোন স্থানে লোচন নামও পাওয়া যায়।

যিনি লোচনের গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন, পদে এবং গ্রন্থে অথবা গ্রন্থের সর্ব্বত্র একমিল রাখিবার জন্য, তিনিই বোধ হয় "ত্রি" টীকে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকিবেন। লোচনানন্দ নাম ভক্তদত্ত, বৈষ্ণবগণ আদর-করিয়া তাঁহার ঐ নাম ব্যবহার করেন। এই চতুর্নামাভিহিত ব্যক্তি বিভিন্ন পুরুষ নহেন—একই ব্যক্তি, পূর্ব্বে ইহা বলা গিয়াছে। "সুলোচন" নামটী তিনি স্বয়ং ব্যবহার করেন নাই বটে, কিন্তু যখন সুলোচনের গুণ, নিবাস, এবং কার্য্যাবলী, লোচনের সহিত অভিন্ন দেখা যাইতেছে, তখন ভিন্নব্যক্তি অনুমান করা যাইতে পারে না।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেন, ঐ গ্রন্থে মহাপ্রভুর শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যলীলা যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, মাধুর্য্যলীলা তেমন হয় নাই; এই জন্য নরহরির বড় অভিলাষ জন্মিল যে, গৌরলীলার মাধুর্য্যময় একখানি গ্রন্থ হয়, লোচন নরহরির এ অভিলাষ পূর্ণ করেন। নরহরির আদেশক্রমে তিনি চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ-রচনা করেন। ১৪৫৯ শকে এই অপূর্ব্ব কাব্য বিরচিত হয়। চৈতন্যমঙ্গল চারিখণ্ডে বিভক্ত। ১। সূত্রখণ্ড, ২। আদিখণ্ড, ৩। মধ্যখণ্ড, ৪। শেষখণ্ড। সূত্রখণ্ডে ২০টী "নাচাড়ী" ও ২৩টী শ্লোক (সংস্কৃত) আছে। আদিখণ্ডের নাচাড়ী সংখ্যা—২৪, এবং দুইটী মাত্র শ্লোক দৃষ্ট হয়। মধ্যখণ্ডে চারিটী নাচাড়ী এবং ২৫টী শ্লোক পাওয়া যায়। শেষখণ্ডের নাচাড়ী সংখ্যা—১৬ এবং একটীমাত্র শ্লোক; এই মোট নাচাড়ী ১০১, মোট শ্লোক ৫১। হস্তলিখিত পুঁথিতে এইরূপ সংখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে অনেক গুলি নাচাড়ীই পাওয়া যায় না, সর্ব্বশেষ যে ছয়টী অপূর্ব্ব নাচাড়ী আছে, মুদ্রিত পুস্তকে তাহা নাই। বৃন্দাবন হইতে নীলাচল আগমন, মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা ও অন্তর্দ্ধান কাহিনী একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নরহরির আদেশক্রমে, তাঁহার সহায়তায় লোচন চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন, একথা চৈতন্যমঙ্গলেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাহার॥
অনুকূলে কৃষ্ণপ্রেমা কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝয়ে প্রেমাবিন্দু॥
* * *
তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর॥
* * *
শ্রীনরহরি দাস যে দয়াময় দেহ।
পাতকী দেখিয়া দয়া বাড়াল সিনেহ॥
দুরন্ত পাতকী অঙ্গ আমি দুরাচার।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল অপার॥
তাঁর দয়াবলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে।
এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবাধে॥

নরহরির "দয়াবলে" আর বৈষ্ণব প্রসাদে পুঁথি "অবাধেই" হইয়াছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, গুণাগুণ বিচার করিবার পক্ষে স্থান অল্প; তবে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া, লোচনের রচনার লালিত্য দেখাইতেছি। তিল, ফুল যিনি নাসা "গৃধিনীর" কর্ণ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি নূতন প্রণালীতে গৌররূপ বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলিয়া গো,
তাহাতে গড়িল গোরা দেহা।
জগৎ ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো,
এক কৈল শুধুই সুলেহা॥
অনুরাগের দধি, প্রেমের সাঁজনা দিয়া,
কেবা পাতিয়াছে আঁখি দুটী।
তাহাতে অধিক মধু, লহু লহু কথা গো,
হাসিয়া বলয়ে গুটী গুটী॥
অখণ্ড পীযুষ ধারা, কেনা আউটিল গো,
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মাড়িয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো
হেন বাসো গোরা অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা গা খানি মাজিল গো,
চাঁদে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত নিরমাণ কৈল,
অপরূপ প্রেমের বলনি॥
সকল পূর্ণিমার চাঁদে, বিকল হইয়া কাঁদে,
কর পদ কদমের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটা, জগৎ আলা কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে॥
এমন বিনোদিয়া গোরা কোথাও যে দেখি নাই,
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতিভাবে, কাঁদিয়া আকুল গো,
দেখিয়া কেমনে মন বান্ধে॥"
ইত্যাদি।

লোচনের বর্ণনা অতি স্পষ্টতর; স্থলান্তরে বলিয়াছেন—

—"বয়স্যের কান্ধে, কর অবলম্বি,
পুঁথি করি বাম হাতে।
দিবসের অন্তে, রম্য রাজ পথে,
সুরধুনী তট তাতে॥
* * *
চাঁচর কেশের, বেশের মাধুরী,
হেরিয়া কে ধরে চিত।
কোঁচার শোভায়, জগত লোভায়," ইত্যাদি,
চৈতন্যমঙ্গল।

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে চৈতন্য-মঙ্গল ছিল, লোচনের গ্রন্থও চৈতন্যমঙ্গল। লোচন গ্রন্থ-রচনা সমাপন করিয়া বৃন্দাবন-দাসকে গ্রন্থ দেখাইলেন। বৃন্দাবন গ্রন্থের ভিতর প্রথমেই এই পদটী দেখিতে পাইলেন।

যথা—"অভিন্ন চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ।"

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য। লোচ-নের গ্রন্থে এই পদটী দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন, লোচনের এই মাধুর্য্য রসা-ত্মক কাব্যখানি তাঁহার কাছে অতি মিষ্ট লাগিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সুলোচন! তোমার এখানিই যথার্থ চৈতন্যমঙ্গল। আমার গ্রন্থ আজ হইতে চৈতন্যভাগবত

নামে আখ্যাত হইবে।" বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম সেই হইতে "চৈতন্যভাগবত" নাম প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃতে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম "চৈতন্যমঙ্গলই" লিখা আছে।

চৈতন্যমঙ্গল সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইল, প্রতি গায়ক চৈতন্যমঙ্গল গান করিতে ভালবাসিত, প্রতি শ্রোতা আগ্রহসহকারে তাহা শুনিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে।

"বৈদ্য বংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচন দাস।
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
চৈতন্যমঙ্গল গান তাঁহার রচিতে।
* * * *
প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান হয়।
তার পরে কৃষ্ণমঙ্গল গান করয়॥"

লোচনদাস শ্রীখণ্ডের নরহরির শিষ্য, শ্রীখণ্ডেই বাস করিতেন; এই জন্য প্রেমবিলাসে তাঁহার "শ্রীখণ্ডেতে বাস" লিখিত হইয়াছে; এবং চরিতামৃতাদি গ্রন্থেও

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে বাস।
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম॥
যাঁহার উদরে জন্মি করি গৌরগুণ গান।
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে গাই গৌর গুণ গাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থ পূত সেই তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
যথা তথা যাই দুল্লিল করে মোরে।
দুল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে পড়াইল অক্ষর।
ধন সে পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত তাঁহার॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা।
নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা॥
তাঁহার প্রসাদে যেবা করিল প্রকাশ।
পুস্তক করিল সায় এ লোচন দাস॥"

লোচনের স্বহস্ত লিখিত পুঁথির কথা বলিয়াছি। লোচনের "আখর" খুব মোটা। লোচন তাঁহার বাটীতে, শূন্য-আকাশ তলে, একটী পাথরের উপর উপবেশন পূর্ব্বক চৈতন্য মঙ্গল লিখিতেন। সে প্রস্তর খানি অদ্যাপি আছে, বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।

"পিতৃকুলে মাতৃকুলে" লোচনই একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; অতএব সকলের স্নেহভাজন লোচনের বিবাহ অতি অল্প বয়সেই সম্পাদিত হয়। লোচন লিখিয়াছেন, তিনি "দুল্লিল" অর্থৎ দুরন্ত ছিলেন, তাঁহার মাতামহ "মারিয়া ধরিয়া" তাঁহাকে অক্ষর চিনাইয়াছিলেন, বিবাহের পর অধ্যয়নের জন্য তিনি শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের নিকট গমন করেন।

*"নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ভক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যকাল হইতে সঙ্গী; গৌর

---

* উদ্ধার চিহ্নের মধ্যে যে কথাগুলি দিলাম তাহার ভাব অন্যত্র হইতে গৃহীত হইল—উদ্ধৃত নহে —লেখক।

রসে দোলায়মান। তাঁহার কাছে গেলে যাহা হয়, লোচনের তাহাই হইল; তিনি "গৌরপ্রেমামৃত-সাগরে" ডুবিয়া গেলেন। ইহারই ফল চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এবং পদাবলী।

"লোচন শ্রীখণ্ডেই থাকেন, বাড়ীতে যান না। এদিকে তাঁহার স্ত্রী কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন। লোচনকে অনেকেই বাড়ী যাইতে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। তখন একদিন লোচন পদব্রজে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন।

'বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আর যাওয়া হয় নাই, স্ত্রীকেও দেখেন নাই। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই একটী "তেমাথা পথ" দেখিতে পাইলেন। কোন্ পথে যাইবেন? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? নিকটে একটী অর্দ্ধযুবতি দাঁড়াইয়াছিল, ইহাকেই লোচন জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন— "মা! অমুকের বাড়ী কোন্ পথে যাইব।"

এ যুবতীই লোচনের স্ত্রী!!

"এই কথা যখন বিদিত হইল, যখন পরিচয় পাওয়া গেল, তখন লোচন ও তাঁহার স্ত্রী অতি কাতর হইলেন। লোচন অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে তাঁহার স্ত্রীই বা কেন পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন? তিনি স্ত্রীকে এ কথা সুন্দররূপ বুঝাইলেন ও উভয়ে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বামী স্ত্রীতে একত্রে পরমসুখে থাকা যাইতে পারে, লোচন জগৎকে ইহা দেখাইলেন। জগৎ দেখিল যে, ভগবদ্ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই, তাঁহাদের কাছে ইন্দ্রিয়গণ দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায়। লোচন এবং তাঁহার স্ত্রী কিদৃশ ক্ষমতাশালিনী, এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে।"

"স্বামীস্ত্রীতে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল, ইন্দ্রিয়বিকার-বিরহিত সেই পবিত্র প্রীতির প্রমাণ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলেই আছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে তিনি আপন ভার্য্যার অনুমতি গ্রহণ করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমে এই পদটী আছে—

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা।
আশীর্ব্বাদ মাগি আগে,
যত যত মহাভাগে,
তবে গাবো গোরা গুণ গাথা॥"

কি অপূর্ব্ব ভাব!! ইহা লোচনের ন্যায় কবি হৃদয়েরই যোগ্য।

লোচনের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "দুর্ল্লভ সার।" দুর্ল্লভ সার অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব পূর্ণ ভক্তি গ্রন্থ, পদ্য ছন্দে রচিত এবং ইহাতে বিবিধ শাস্ত্র হইতে বহুল প্রমাণ সংযোজিত হইয়াছে। এ গ্রন্থেরও স্থানে স্থানে লোচন আত্মপরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গল রচনায় নরহরির আদেশ-দান-প্রসঙ্গ এ গ্রন্থেও লোচন প্রসঙ্গতঃ তুলিয়াছেন। এখানিও মুদ্রিত হইয়াছে।

লোচনের তৃতীয়গ্রন্থ—সংস্কৃত "জগন্নাথ বল্লভ" নাটকের পদ্যানুবাদ। এই অনুবাদ গুলি এত মনোহর যে, কেবল ইহার জন্যই তাঁহাকে প্রধান কবি গণ্য করা যাইতে

পারে। কেহ কেহ বলেন, লোচন সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু এই অনুবাদ দেখিলে সে ভ্রম আর থাকে না।

লোচনের চতুর্থ গ্রন্থ—রাগলহরী। রাগলহরী সংস্কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্থান বিশেষের পদ্যানুবাদ। এ গ্রন্থখানি বহু অনুসন্ধানে সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। রাগলহরী এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত এবং সর্ব্বসাধারণে অজানিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা এক খানি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। লোচন এক জন ক্ষমতাবান্ স্বভাব কবি, ইহা স্বীকৃত। লোচন ৬৬ বর্ষকাল জীবিত ছিলেন। নীলাচল এবং বৃন্দাবন বাসে শেষকালে, তাঁহার ১৫ বৎসর অতিবাহিত হয়। ১৫১১ শকাব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

প্রহেলিকা।

(শেষভাগ।)

কলিকাতায় আসিয়া কাজ কর্ম্মে মন ব্যস্ত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু সে দিন রাত্রে রামশরণের বাড়ীতে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কোন মতেই ভুলিতে পারিলাম না। রাত্রে বা দিবাভাগে যখনই একাকী থাকি—যখনই নির্জ্জনতা আসিয়া আমার চারিধার বেষ্টন করে—তখনই আবার সেই কথা মনে—জাগিয়া উঠে। কোন কবি বলিয়া গিয়াছেন—"স্ত্রী জাতির চিতাভস্মকেও বিশ্বাস করিতে নাই"—একথা যখন তখন সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একবার মনে করিলাম—হয়ত দৃষ্টি বিভ্রম। হয়ত আমিই ভুলক্রমে কি দেখিতে কি দেখিয়াছি। কিন্তু দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিবার কোন সম্ভাবনাইত নাই। আমি নিদ্রায় স্বপ্ন দেখি নাই—জাগ্রত অবস্থায় তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি। তখনকার প্রত্যেক কার্য্য—প্রত্যেক অবস্থা আমার মনে—দিবালোকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে। না—না—ভ্রম কখনই হইতে পারে না।

এই ঘটনার ৮ দিন পরে খুব ভোরে একজন লোক রামশরণের নিকট হইতে আসিল। আমার হাতে পত্র দিয়া বলিল—"বাবু! সংবাদ বড় খারাপ—কর্ত্তা আপনাকে সকালের ছটার গাড়ীতেই যাইতে বলিয়া দিয়াছেন।" আমি কাঁপিতে কাঁপিতে পত্র খুলিলাম। পড়িতে পড়িতে হৃদয়ের আমূল কাঁপিয়া উঠিল—শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুতাগ্নি ছুটাছুটি করিতে লাগিল—আমি পত্র খানি নিষ্পেসিত করিয়া জানালার মধ্যদিয়া ফেলিয়া দিলাম। পত্রে লেখাছিল—

"ভায়া! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মহাকলঙ্কিনী ইচ্ছাময়ী গৃহ ত্যাগ করিয়া

গিয়াছে। শীঘ্র আসিবে—বিশেষ মন্ত্রণার প্রয়োজন।

তোমার হতভাগ্য বন্ধু।"

সকালে ছয়টার সময় ট্রেন ছাড়ে। আমি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া গাড়িতে বসিলাম। বেলা দশটার সময় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হইল।

রামশরণের মুখ শবদেহের ন্যায় বিবর্ণ চক্ষু ঘোর লাল ও অনিদ্রায় কোটরগত। দৃষ্টি চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত। মাথার চুল উস্ক খুস্ক। আর অন্তরের মধ্যে মহাঝটিকা।

আমাকে দেখিয়াই রামশরণের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। দুই ফোঁটা জল দেখা দিল। আমার কাছে বসাইয়া বলিল ভাই। তুমি আসিয়াছ বড় ভালই হইয়াছে। আমার যেমন কাজ তেমনি প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। যেমন এই প্রৌঢ়াবস্থায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলাম—তাহার ফল পাইয়াছি। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে নিজে মজিলাম। তবে বড় কষ্টের বিষয়—ইচ্ছাময়ী, এই অনর্থের মূল—সে নিজেই জোর করিয়া আবার নূতন সংসার পাতিল—আবার নিজেই তাহা ভাঙ্গিয়াছে। যাক, সে কথা এখন নহে, মধ্যাহ্নে সব খুলিয়া বলিব।

আমি শেষোক্ত কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। একথা শুনিতে বিশেষ কৌতুহল জন্মিল। তাহা তখন চাপিয়া রাখিয়া—জিজ্ঞাসা করিলাম—"লোক জন খুঁজিতে পাঠাইয়াছ? তাহারা কি কোন সংবাদ আনিতে পারিল না?"

রামশরণ বলিল রাত্রি এক প্রহরের পর এই ঘটনা ঘটিয়াছে। তার পর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া খোঁজা হইয়াছে। দেশে আর সুখ নাই। তোমার আসিবার অগ্রে প্রতিবাসীরা সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। আমি লজ্জায় বাটীর বাহির হই নাই। যাক্—সব কথা আহারান্তে হইবে।

আমি স্নান করিলাম। রামশরণের এক প্রতিবেশীর বাটীতে আহার হইল। সে দিন বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িল না। রামশরণ শরীর অসুস্থ ও জ্বর বলিয়া কিছু খাইল না। ইচ্ছাময়ী কোথায়, তাহাকে দেখিতে পাই নাই। আহারান্তে আমি ও রামশরণ বাড়ীর ভিতর এক নিভৃত কক্ষে বসিলাম।

তখন রামশরণ বলিতে লাগিল—"ভাই, অনেক গুলি ঘটনার পর এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। যার স্ত্রী গৃহ ত্যাগ করিয়া যায়, কলঙ্ক কালি মুখে মাখিয়া তার সমাজে না থাকাই ভাল। আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে, মাথা বড় ছোট হইয়াছে। এত মান সম্ভ্রম, সব সেই কলঙ্কিনীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। রাস্তার বাহির হইলে, লোকে ইসারায় দেখাইয়া বিদ্রূপ করিবে। সমাজে—সকলের কাছে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে—বরাবর যেখানে মহাদর্পের সহিত চলিয়াছি—সেখানে

—চির অবনত হইতে হইবে, ইহা আমার সহ্য হইবে না। আমি মনে করিয়াছি—আজই সমস্ত সম্পত্তি উইল ও বিলি বন্দোবস্ত করিয়া ৺কাশীধামে নির্জ্জনে জীবন যাপন করিব।

"কেন এ ঘটনা ঘটিল—পূর্ব্বের, কথা কতক গুলি বলিয়া রাখি। নচেৎ সমস্ত বুঝিতে পারিবে না। নূতন বধূ গৃহে আসিবার দেড় মাসের পর এক ঘটনা ঘটিল। তাহা আমি, ইচ্ছাময়ী, ও সেই হতভাগিনী ভিন্ন আর কেহই জানে না। সন্ধ্যার পর এক জন লোক আসিয়া বলিল, আপনার সহিত বিশেষ কথা আছে। আপনার নাম কি রামশরণ ঘোষ? আপনি কি মামুদপুরের হেমকুমার রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন?

আমি বলিলাম—হাঁ—মহাশয়ের কি প্রয়োজন?

লোকটা বলিল,—বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাহাতে কেবল আমার স্বার্থ নাই, আপনারও স্বার্থ আছে। যে বিধবার কন্যার সহিত আপনার বিবাহ হইয়াছে—সে আমার প্রতিবাসিনী। বিধবার কিছু সম্পত্তি ছিল, আমি তাহা পাইবার প্রত্যাশা রাখি। তাহার স্বামীর সহিত মোকদ্দামা করিয়া আমার খিড়কীর কতক জমী হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। আদালত হইতে পাইবার তাহার সম্ভাবনা নাই—তাই মনে করিয়াছিলাম, আমার পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়া এই সমস্ত সম্পত্তি আদায় করিব। আমি দেশে ছিলাম না, তাহা না হইলে আপনি সহজে বিবাহ করিতে পারিতেন না।

এখন কথা হইতেছে—আপনি সেই সম্পত্তি গুলি আপনার স্ত্রীর দ্বারা দান পত্র লেখাইয়া আমায় প্রদান করুন। নচেৎ আমি তাহাদের গৃহকলঙ্ক প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

সে লোকটা বলিল—মহাশয়! হেমকুমার রায় লোকটা বড় ভাল ছিল না, মামলা মোকদ্দমায় তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়াছে। তার মৃত্যুর পূর্ব্বে এক কন্যা জন্মে, সে কন্যার নাম ইন্দুমতী—সেই আপনার স্ত্রী।

স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে—বিধবার চরিত্র কলুষিত হইল। হতভাগিনী অন্তঃস্বত্বা হইল। আমার স্ত্রীর সহিত তাহার খুব সখ্যতা ছিল—কাজেই আমি ঘটনা আগে জানিতে পারিলাম। বিধবাকে হাত করিবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল—কেন না—পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি গুলিতে আমার বড় প্রয়োজন। আমি কৌশল করিয়া তাহাকে লইয়া বারাণসী গেলাম। কেন গেলাম, আর কেহ বুঝিল না—বুঝিলাম, আমি, আমার স্ত্রী, আর সেই কলঙ্কিনী—ও তাহার জার।

ছয় মাস পরে বিধবা কাশী হইতে ফিরিল। আমি তাহার যে উপকার করিলাম—তাহাতে সে আমার বড় বাধ্য হইল। আমিও শত্রুতা ভুলিয়া তাহাদের

উপকার করিতে লাগিলাম। তার পর, একদিন কথায় কথায় আমার পুত্রের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহের কথা তুলিলাম। সে হাঁ—না—করিয়া রাজি হইল। আমি কার্য্য ব্যপদেশে বরিশালে গেলাম, তার পর আপনি সেই ইন্দুকে বিবাহ করিয়া আমার আশার অন্তরায় হইয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম, যদি না করেন—তবে—এখনই সমাজে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব। আপনার মুখ দেখান ভার হইবে—জাতি যাইবে।

আমি লোকটার কথা শুনিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলাম, নিজের বিপদ দেখিতে পাইলাম। বাড়ীর ভিতর গিয়া ইচ্ছাময়ীকে সমস্ত কথা বলিব মনে করিলাম—তাহা বলিতে হইল না। আমি বলিবার আগে সে—এবং পাপিষ্ঠা ইন্দু দ্বারের পশ্চাতে থাকিয়া সমস্ত কথা শুনিয়াছিল। ইচ্ছাময়ী কিছু কুপিতা বোধ হইল—আমাকে দেখিয়াই বলিল,—"দাদা! আমার বুদ্ধিতে তোমার সর্ব্বনাশ হইল। এমন হতভাগা ঘরের মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলাম।"

ইন্দু কাছে দাঁড়াইয়া ছিল—কথাটা তার প্রাণে লাগিল—সে কাঁদিতে লাগিল। আমি ইচ্ছাকে বলিলাম, তুমি ওঘরে যাও—আমি ইন্দুর সহিত দুই চারিটা কথা কই।

ইন্দুকে সান্ত্বনা করিলাম। ইন্দু বিবাহের কন্যা বটে—কিন্তু তের চৌদ্দ বৎসরের--বিলক্ষণ সেয়ানা হইয়াছে। সে সমস্ত কথা শুনিল, কোন কথা কহিল না। কেবল কাঁদিতে লাগিল। আমার ঘরে ষ্টাম্প কাগজ ছিল—তাহাতে তাহার নাম সহী করাইয়া বাহিরে আসিলাম।

লোকটাকে বলিলাম—ইন্দুর মাতার সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে ইন্দু অর্পণ করিল। তাহার মা আর ইহলোকে নাই--আর কেহ আপত্তি করিবারও নাই। আমি এই দান পত্রের সাক্ষী রহিলাম।

এই থানেই বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইল। আমার সোণার সংসারে আগুন লাগিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইচ্ছাময়ী সমস্ত কথা দ্বারান্তরাল হইতে শুনিয়াছিল। এই ঘটনার পর সে নূতন বধুর উপর বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মধ্যে মধ্যে কোন দোষ পাইলেই—এই কথার উল্লেখ করিয়া সে ইন্দুকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিত। হতভাগিনী ইন্দু কি করিবে—নীরবে সমস্ত শাসন সহ্য করিয়া—অশ্রুধারে বালিস ভিজাইত।

ক্রমে সংসারের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল—যেন আর কোন কিছুতে শান্তি নাই। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। ইচ্ছাময়ীকে কিছু বলিতে গেলে—সে ভাবিবে, দাদা বউএর পক্ষ হইয়া আমার অপমান করিল। আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। ইন্দু বুঝিল—স্বামী যখন কোন বিষয়ে-কথা কন না—তখন ঠাকুরঝির সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

ইন্দু এইরূপে বিশ্বাস হারাইল। তাহার প্রত্যেক কার্য্যে আমি স্ত্রীধর্ম্মের অভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ভাল উত্তর দিত না। আগে যেমন আমার সেবা যত্ন করিত-তাহা আর করিত না। কেবল- কীটগ্রস্থ কুসুমের ন্যায়—মলিন মুখে—দিন কাটাইত।

এই সময়ে আমার মনের সুখ গেল। তার পর তুমি আসিলে। আমার সে সময়ের অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তার পর তুমি চলিয়া গেলে। শেষ এই ঘটনা।

আমি সমস্ত কথা স্থির ভাবে শুনিয়া—ভাবিলাম কি রূপে রামশরণের সোণার সংসারে অশান্তি বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কি প্রকারে—সুখতরু বজ্রাহত হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা আমি যে ঘটনা সে দিন রাত্রে—দেখিয়াছিলাম, তাহাও বিবৃত করিলাম। রামশরণ—শুনিয়া আরও বিমর্ষ ও স্তম্ভিত হইল। তাহার মুখ আরও শুখাইয়া গেল। তার পর সে ধীরে ধীরে বলিল. "ভাই সেই সময় যদি তুমি একথা খুলিয়া বলিতে—তাহা হইলে বোধ হয় এতটা ঘটিত না।"

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। দেওয়াও উচিত বিবেচনা করিলাম না। যে নষ্ট হইবার জন্য ঝুঁকিয়াছে—তাহাকে আবার সৎপথে আনয়ন করা কত দূর অসাধ্য তাহা জানি। আমি ভবিতব্য বিশেষ বিশ্বাস করি। সুতরাং এ বিষয়ে অন্য আলোচনা অনাবশ্যক ভাবিলাম।

শেষ রামশরণ—কাগজ পত্র বাহির করিল! তাহার যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল—তাহার এক তালিকা করিল। তাহার এক ভ্রাতষ্পুত্র ছিল—তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিল। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন—আছে।

"আমার—নগদ সম্পত্তি—মোট ৭৪০০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত তেজারতিতে প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা খাটিতেছে। চক্‌মাথালিয়া, হরিপুর, কৃষ্ণরামপুর, নবাবপুর প্রভৃতি গ্রামে যে সকল, লাখরাজ ও মালের জমী আছে তাহার আয়—বার্ষিক দুই হাজার টাকা। আমার ভ্রাতষ্পুত্র—শ্রীমান্ নটবিহারী ঘোষ এই সমস্ত সম্পত্তিতে আমার মৃত্যুর পর দখলিকার হইবে।"

(২) আমার ভগিনী—শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দাসীর দেবর পুত্রকে—৫০০৲ শত টাকা এই সম্পত্তি হইতে দেওয়া হইবে। ও ইচ্ছাময়ী—দেশে এক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও কাশীধামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে তাহার খরচ দুইহাজার টাকা ইহার মধ্য হইতে সে পাইবে।

(৩) আমি ও ইচ্ছাময়ী যতদিন জীবিত থাকিব—ততদিন-মাসিক—৫০৲ হিঃ এই সম্পত্তি হইতে মাসহারা পাইব। আমার জীবদ্দশায়—উক্ত নটবিহারী কেবলমাত্র একজিকিউটার থাকিবেন। এবং তাহার

সঙ্গে আমার প্রিয়বন্ধু——(অর্থাৎ আমি) সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধায়ক হইবেন। নটবিহারি আমার বন্ধুর মত লইয়া সমস্ত কার্য্য করিবে।

(৪) যদি আমার স্ত্রী ইন্দুমতী দাসী কখনও ফিরিয়া আসে—বা দুর্দ্দশা পন্ন হইয়া অন্ন বস্ত্রের জন্য কষ্ট পায়—তবে সে এই সম্পত্তি হইতে মাসিক ত্রিশ টাকা মাসহারা পাইবে।

আমি উইলের চতুর্থ-ধারায় "আমার স্ত্রী ইন্দুমতী দাসী" এই কথায় বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম। ছি! ছি! রামশরণ কি নির্লজ্জ? যাহার জন্য তাহার এই দুর্দ্দশা তাহার জন্যই আবার সে এত ভাবিয়া মরিতেছে!

রামশরণ বলিল—ভাই! তুমি যাহা ভাবিতেছ—তাহা আমি বুঝিয়াছি। কি জানিবে তুমি—আমি ইন্দুকে কত ভাল বাসিতাম। কি জানিবে তুমি—আমি তার সৌন্দর্য্যে কত মোহিত হইয়াছিলাম! সে নীরবে ঘুমাইত—আমি জ্যোৎস্নাসিক্ত —সেই সুন্দর মুখখানি যতবার বসিয়া দেখিতাম, ততই দেখিবার ইচ্ছা হইত। তাহার—কপোলে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিত—অলকাগুলি বায়ুভরে সেই প্রভাত কমল বিনিন্দিত মুখের উপর আসিয়া পড়িত—আমি তাহা সরাইয়া দিয়া নিজের উত্তরীয় দ্বারা তাহার মুখ মুছাইয়া দিতাম। স্বপ্নের যোগে অব্যক্ত যাতনায়—হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে—তাহার যখন এক একটী গভীর নিশ্বাস—নীরবে উঠিয়া নীরবে মিলাইত—আমার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিত। আমি ভাবিতাম কেন ইহাকে বিবাহ করিয়া চির অসুখী করিলাম? কেন ধনীর উপভোগ্য সৌন্দর্য্য রাশি—দরিদ্রের গৃহে আনিলাম। সে আমায় সেবা যত্ন করিত না—দুটা ভালবাসার কথা—বলিত না —তাহাতেও আমার দুঃখ ছিল না। তাহার মলিন মুখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যাইত। তাহার সেই শুষ্কমুখে একটু হাসি দেখিবার জন্য কতই না ব্যাকুল হইতাম। বন্ধো! তুমি কি জানিবে—আজও আমার হৃদয়ে তাহার জন্য কত ভালবাসা আছে! তুমি যাহাই বল না কেন? আজ যদি সে গৃহে ফিরিয়া আসে—আজ যদি কোথাও তাহাকে দেখিতে পাই—তাহা হইলে সব কথা ভুলিয়া গিয়া আবার তাহাকে গৃহে স্থান দি। দেশ ছাড়িয়া—আর কোথাও গিয়া বাস করি।

আমি বুঝিলাম—এটা ঠিক প্রণয় নহে। এটা—রূপোন্মাদ। এ মোহ কালে ছুটিয়া যাইবে।

—০—

উইল করিয়া সেই দিন রাত্রেই তাহার ভ্রাতস্পুত্রের হাতে সমস্ত দিয়া সদয়রাম বিশ্বাস নামক পুরাতন চাকরকে সঙ্গে লইয়া রামশরণ ও আমি, আমার কলিকাতার বাটীতে পৌঁছিলাম। ইচ্ছাময়ীও আমাদের সঙ্গে আসিল।

রামশরণ মাস খানেক আমার আহিরি-

টোলার বাটীতে থাকিবে এই স্থির হইল। তার পর প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ হইলেই সে ইচ্ছাময়ীকে লইয়া কাশী যাইবে। আমার বাটীতে প্রকৃত ঘটনা অপ্রকাশিত রহিল। ইহাতে ইচ্ছাময়ীর কিছু অসুবিধা ঘটিল। সে মনের সাধে দুটা গালি দিয়া গৃহত্যাগিনী ইন্দুমতীর মুণ্ড ভক্ষণ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া মনে মনে তাহার পিতৃ মাতৃ কুলের অযথা যশকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

একদিন আমাদের কতক গুলি বাজারের বরাত ছিল। আমি ও রামশরণ উভয়ে বাজারে গেলাম। কারণ একমাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—রামশরণের যাত্রার উদ্যোগ করিতে হইবে। বড় বাজারের কাজ সারিয়া গরাণহাটার শেষে উপস্থিত হইলাম—সেখানে এমন একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল—যে তাহাতে সমস্ত ঘটনা স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল।

আমাদের গাড়ি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছে। একখানি গাড়ি চিৎপুরের দিক হইতে আসিয়া ঠিক তাহার একটু দূরে দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে দুইটী অপরিচিত লোক নামিয়া নিকটে এক শুঁড়ির দোকান ছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা বুঝিলাম—ইহা সহরের নিত্য ক্রিয়ার অন্যতম মাত্র।

গাড়ীর ভিতরে কে ছিল—আমি দেখি-নাই। আমি দোকানীর সহিত জিনিস পত্রের দর লইয়াই ব্যস্ত। রামশরণ—একটু বাহিরে ঠিক্ ঐ গাড়ির দিকে সুমুক করিয়া বসিয়া ছিল। আমি মধ্যে মধ্যে দুই একবার গাড়ির দিকে একটু আধটু দৃষ্টিপাত করিতে ছিলাম।

সহসা গাড়ীর কবাট খুলিল। একটী সুন্দরী মূর্ত্তি তাহার ভিতর হইতে অর্দ্ধাব-গুণ্ঠনময়ী মুখ বাহির করিল। সে মুখ রামশরণ দেখিল—আমি লক্ষ্য করিলাম না। সহসা রামশরণ ত্বরিত গতিতে গাড়ির দিকে চলিল।

মুহূর্ত্ত পরে রামশরণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল ভাই শীঘ্র চল। আর জিনিস কিনিয়া কাজ নাই। অই অই ইন্দু! আমার প্রাণের ইন্দু। অই গাড়িতে চলিয়া গেল।"

দোকানদার একজন বিশিষ্ট লোক, সে আমাকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া জানে। রামশরণের অবস্থা দেখিয়া আমায় বলিল—মহাশয়! ব্যাপার কি? আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে দোকানদারকে জিনিসপত্র মায় ফর্দ্দ বাড়ীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়া—আমি গাড়িতে উঠিলাম। রামশরণ বলিল ভাই! আমার মাথা ঘুরিতেছে—ঐ ইন্দু—ঐ গাড়িতে চলিয়াগেল।"

আমার তখন বড় রাগ হইল। আমি ঈষৎ কোপের সহিত বলিলাম—ছিঃ রাম-শরণ তুমি এত লঘুচিত্ত! আবার সেই কলঙ্কিনীর জন্য অত উন্মত্ত হইয়াছ!"

রামশরণ বলিল—ভাই! পরে তিরস্কার করিও। আগে এ গাড়ী ধর—তার

পর যা হয় করিও। সে কাঁপিতে লাগিল।

আগের গাড়ী তখন অনেক দূরে। আমি গাড়োয়ানকে জোরে হাঁকাইতে বলিলাম। কিন্তু গাড়ি ধরিতে পারিলাম না। অসংখ্য জনস্রোত ও শকট প্রবাহের মধ্যে সে গাড়িখানি কোথায় মোড় ফিরিল দেখা গেল না।

খানিক ক্ষণ এদিক উদিক, ঘুরিয়া যখন কোন সন্ধান হইল না—তখন—কাজেই আমাদের বাড়ী ফিরিতে হইল। কিন্তু আমার বন্ধুর অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। রামশরণ—ঘন ঘন ঘামিতেছে—তাহার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। কপালের শিরা উঠিয়াছে। বলিল—জল দাও—প্রাণ যায়।"

গাড়ি যখন আমার বাড়ীর দ্বারে পঁহুছিল। আমি গাড়ি হইতে রামশরণকে নামাইলাম। সে একবারে গিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

বিষম উত্তেজনায়—রামশরণের জ্বর আসিল। ক্রমশঃ শরীরের উত্তাপ বাড়িতে লাগিল। আমি ইচ্ছাময়ীকে ডাকিয়া দিলাম। অন্য কাজ ছিল সারিয়া আসিলাম যখন ফিরিলাম তখন রাত্রি নয়টা। তখন রামশরণের অবস্থা অতি ভয়ানক। সে প্রলাপ বকিতেছে—তাহাও কেবল "ইন্দুমতীর কথা। আর ইচ্ছাময়ী—তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধ চাকর সদয় ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতেছে।

আমি ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইলাম, ডাক্তার আসিলেন— নাড়ী ধরিলেন টেম্পারেচার লইলেন মুখ বাঁকাইলেন—ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইলেন ভিজিটের টাকা পকেটে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—" মহাশয় রোগ বড় শক্ত। আকস্মিক মনোবিকার হইতে উৎপন্ন সাবধানে ঔষধ খাওয়াইবেন।"

বস্তুতঃ ডাক্তার যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহাই হইল। রামশরণ জ্ঞান হারাইল। তৃতীয় দিবসে যথোচিত পরিচর্য্যার পর তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। আমি এই তিন দিন আদতে ঘরের বাহির হই নাই। চতুর্থ দিন প্রাতে ডাক্তার আসিলেন, রোগীর অবস্থা পরিক্ষা করিয়া বলিলেন— "মন্দের ভাল বটে।" কিন্তু এখনও বিপদের অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই।

এই কয়দিনের অবস্থা ডাক্তার বাবু আমার মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া ছিলেন। কিন্তু কি আকস্মিক উত্তেজনায় এই জ্বর আসে তাহা তাঁহাকে বলা হয় নাই। তিনি ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করাতেও তাহা বলিতে আমি ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ ডাক্তার বাবু বলিলেন—"মহাশয়! চিকিৎসকের নিকট কোন বিষয় গোপন করা কখনও যুক্তি সঙ্গত নহে। ফলতঃ সেই কারণটী পাইলে—রোগমুক্তির সত্বরতা ঘটিতে পারে অথবা বিলম্ব হইলে রোগীর অনিষ্ট হইতে পারে।

আমি অগত্যা তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম।

তিনি শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। শেষ বলিলেন—"সেই—স্ত্রীলোকটীর কোন সন্ধান করিতে পারেন?"

আমি বলিলাম—"তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে; কারণ, তাহাকে আমি ভালরূপ দেখিতে পাই নাই। তার পর সমুদ্রবৎ বিস্তীর্ণ এই সহরের মধ্য হইতে একজন—অজানিত নাম-ধাম স্ত্রীলোককে খুঁজিয়া বাহির করা কত দুর দুরূহ কার্য্য, তাহা আপনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।"

ডাক্তার। তাহা হইলেও একবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? যদি তাহাকে পাইলে রোগীর বর্ত্তমান উত্তেজনার হ্রাস হয়, তাহা হইলে অনেক কাজ পাওয়া যাইবে। আজ রোগীর অবস্থা ভাল। আপনি আজই এই কার্য্যে অগ্রসর হউন।"

আমি অগত্যা ইহাতে স্বীকৃত হইলাম।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাটীর বাহির হইলাম। রামশরণের অবস্থা আজ অনেক ভাল। সদয়কে সঙ্গে লইলাম; কারণ—শরণের স্ত্রীকে আমি অবগুণ্ঠন-মণ্ডিতাই দেখিয়াছি। সদয় তাহার গৃহিণীকে বিশেষরূপে জানে। এ স্থলে তাহার সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। যাইবার সময় পথের মধ্যে তাহাকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম।

প্রথমতঃ আমি সেই দোকানে গিয়া বসিলাম। অন্য কোন কাজ না থাকিলেও—যাহাতে একটু সন্ধ্যা হয়, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইলে—সদয়কে বলিলাম, তুমি এখানে বসিয়া থাক—আমি একটু কাজ সারিয়া আসিতেছি।

প্রথমতঃ—সেই শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু জীবনেও সেখানে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই—এবং যাইবারও প্রয়োজন ছিল না—সেই ঘৃণিত স্থানে ঢুকিতে—মনের মধ্যে বড় একটা গোলমাল উপস্থিত হইল; কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে—কাজেই অগ্রসর হইলাম।

ভদ্রবেশী নূতন লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া—নূতন খরিদদার ভাবিয়া দোকানদার আমায় মহা আদর করিল। তাহার মনস্তুষ্টির জন্য আমি এক বোতল ব্রাণ্ডি কিনিলাম। বৈশাখ মাসের দিন—এক মাতাল বন্ধুকে দিয়া পুণ্য কিনিব, এই ইচ্ছা। দোকানীকে—একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বাপু! তোমার সহিত আমার একটু প্রয়োজন আছে। এ দিকে আইস।

আমি বলিলাম—"দেখ বাপু! গত রবিবারে বেলা আন্দাজ ৪।৫ টার সময় দুইটী বাবু—তোমাদের এই দোকান হইতে মদ্য কিনিয়া লইয়াছিলেন। নিকটেই এক খানি গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মধ্যে একটী স্ত্রীলোকও ছিল। তোমার বেহারা তাহাদের সঙ্গে গাড়ির কাছ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। যদি তাহাদের

কোন সন্ধান বলিয়া দাও, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়।

দোকানী—তাহার এক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে দিন—সে সময় কে দোকানে বিক্রী করিয়াছে। উত্তর যাহা পাইল—তাহা আমার পক্ষে সন্তোষ-জনক নহে; কারণ—সে লোক তার পর দিন দেশে চলিয়া গিয়াছে। বেহারাকে ডাকা হইল—সে, বলিল, বাবু ছুটী আসিয়াছিলেন, সে কথা তাহার ঠিক মনে আছে। তাঁহাদের গাড়ীতে স্ত্রী-লোকও ছিল; কিন্তু সে তাহাদের নাম-ধাম জানে না। তবে বাবুরা এ দোকান হইতে প্রায়ই জিনিস্ পত্র লয়েন।"

দোকানীর হুকুমে—সেই দিনকার জমাখরচের খাতা খোলা হইল। শেষ অংশে ছুটী নাম দেখা গেল—তাহাদের একটী "রামেশ্বর পাইন।" দোকানী বলিল—"যদি রামেশ্বর বাবু হন, তবে সন্ধান করা কষ্টকর হইবে না। তিনি আমাদের পরিচিত।" বেহারা এই সময়ে বলিয়া উঠিল—"হাঁ—হাঁ রামেশ্বর বাবুই বটে—এখন আমার মনে পড়িয়াছে।"

আমি বলিলাম—এক জন লোক আমার সঙ্গে দিন। একখানি গাড়ি করিয়া এখনিই রামেশ্বর বাবুর নিকট চলুন। বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুঁড়ী কিছু ইতস্ততঃ করিল—পরে বেহারাকে বলিল—তুই দরমাহাটার ৩২ নম্বর বাড়ী জানিস্—সেই খানে ইঁহাদের লইয়া যা।"

বেহারা গাড়ি করিয়া আনিল, আমি সদয়কে ডাকিয়া বেহারাকে তুলিয়া লই-লাম। গাড়ী ক্ষণমধ্যে সেই বাড়ীতে পৌঁছিল। বাড়ীটী পুরাতন ও সংস্কারা-ভাবে জীর্ণ শীর্ণ। ডাকাডাকিতে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া দোর খুলিয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু বাড়ীতে আছেন?" বৃদ্ধা বলিল—না—তিনি দুপুর বেলা বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। তবে ফিরিবার আর দেরি নাই।"

আমি বেহারাকে বলিলাম, "তোকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। তোকে এক টাকা বখ্‌শিশ্ দিব।"

বেহারা দোকানে কাজের ওজর করিল—কিন্তু একটা চক্‌চকে টাকা তাহার মনের উপর একটু আধিপত্য বিস্তার করিল। সে থাকিতে স্বীকৃত হইল।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় রামেশ্বর বাবু বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার অভক্তি হইল। মদ্যপানে চক্ষু লাল, মুখ দিয়া বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতেছে—টলিতে টলিতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসা—"কে তোমরা—কি চা—ও—ও।"

বেহারা বলিল—"বাবু! আমি আসি-য়াছি।" "কি বেটা—টা—টাকার তাগা-দায় না—কি।" বেহারা বলিল—"না বাবু! এঁর আপনার কাছে কি দরকার আছে। তাই ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

রামেশ্বর তখন সেই তক্তাপোষের উপর বসিল। বলিল, "মহাশয় মাপ করিবেন। আমার দশাই এই। আপনার কি প্রয়োজন?"

আমি আমার প্রয়োজন খুলিয়া বলিলাম। খালি স্ত্রীলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করাই প্রয়োজন, ইহাই বলিলাম। কেন—কি নিমিত্ত তাহা বলিলাম না। রামেশ্বর বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"আমি তাহাকে চিনি না।"

আমি অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই সে রাজি হইল না। তখন আমি অগত্যা শঠতা আশ্রয় করিলাম। জীবনে যাহা করি নাই—বন্ধুর জন্য তাহাও করিতে হইল। আমি বলিলাম—"দেখ রামেশ্বর বাবু! তুমি আমায় এখন চিনিতে না পারিলেও শীঘ্র চিনিবে না। আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। সেই স্ত্রীলোককে আমায় বিশেষ প্রয়োজন। তুমি সহজে না দেখাইলে—আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব; কিন্তু সেটা তোমার পক্ষে হিতকর হইবে না।"

পুলিসের লোক শুনিয়া—মদিরাবিহ্বল রামেশ্বর প্রকৃতস্থ হইল। কতকটা জ্ঞান তাহার মাথায় ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেচনা-শক্তি ফিরিল না; কারণ তাহা হইলে—আমি অত শীঘ্র কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিতাম না। রামেশ্বর বলিল "মহাশয়, সে স্ত্রীলোকের সহিত অতি অল্প দিন আলাপ হইয়াছে। সে সবে মাত্র মাস দুই কলিকাতায় আসিয়াছে। চলুন আপনাকে তাহার বাটী দেখাইয়া দিই।"

দ্বারে আমাদের গাড়ী ছিল। আমরা আবার গাড়ীতে উঠিলাম। রামেশ্বর আমাদের সেই বাড়ীর কাছে লইয়া গেল। বেহারা বলিল—"মহাশয়! আর আমার যাওয়া ভাল দেখায় না। আমি এই খান হইতেই যাই।" সে যদি প্রতারণা করিয়া অন্য কোন স্থল দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়ে, এই ভয়ে—আমি তাহাকে ছাড়িতে চাহিলাম না। বেহারা আমার মনের ভাব বুঝিয়া—বলিল—"বাবু—এই বাড়ীই বটে। আমি অনেক বার এ বাটীতে আসিয়াছি।"

রামেশ্বর নামিয়া চলিয়া গেল। আমার কাছে যে ব্রাণ্ডি ছিল—তাহা তাহার কাজে লাগিবে বলিয়া—তাহাকে দিয়া দিলাম। রামেশ্বর—বড় সন্তুষ্ট হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। বেহারা আমাদের উপরে লইয়া চলিল। আমার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। জীবনের মধ্যে—এ প্রকার স্থলে আমার এই প্রথম আগমন। মনে মনে ভাবিলাম—শেষ এত দূর পর্য্যন্তও নামিতে হইল! হা! হতভাগ্য রামশরণ!

বেহারা গিয়া আগে খবর দিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—বস্তুতই যদি ইন্দুমতীকে দেখিতে পাই—তাহা হইলেই কি হইবে? সেই বা আমাকে ও সদয়কে সেখানে দেখিলে কি অবস্থায় পড়িবে? নানা চিন্তায় আমার মন আকুল হইল! এক ভরসা—সেই ইন্দু—সেই গৃহস্থের কুল-

বধূ,—লজ্জা, যাহার—প্রধান ভূষণ ছিল, সে কি এক মাসের মধ্যে অধঃপতনের এত দূরন্তরে—নির্লজ্জতার প্রান্ত সীমায় নামিতে পারে? হয়ত সে ইন্দু নয়—অপর কেহ হইবে? আকৃতিগত সাদৃশ্য কি থাকিতে নাই?

গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঈশ্বর! তুমি ধন্য! এমন অপবিত্র স্থানে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলাম। সদয় তাহাকে দেখিয়াই আমার কাণে কাণে বলিল "বাবু! আমাদের ভুল হইয়াছে—এত সে নয়।" আমি আরও আশ্বস্ত হইয়া গৃহ প্রবেশ করিলাম।

প্রথমে আমাকেই কথা কহিতে হইল। সদয় দূরে বারাণ্ডায় এমন স্থলে রহিল; যেন সে আমাদের বেশ দেখিতে পায়। এ কথা, সে কথা, পাঁচ কথার পর সেই পাপিয়সীর হস্তে চারিটী মুদ্রা দিলাম—বলিলাম—আজ খালি আলাপ করিয়া গেলাম, বড় বিশেষ কাজ আছে। প্রয়োজন হইলে আবার আসিব।

(ক্রমশঃ।)

যম, পিতৃযান ও পরলোক।

ভারতীয় সভ্যতার মধ্যযুগে—বেদবিদ্যার চরম স্ফূর্ত্তিকালে পাঞ্চালদেশীয় রাজা প্রবাহন জৈবলি একদা তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর যুবক মহর্ষি শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"বেথ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রযাত্যো-বিপ্রতিপদ্যন্তা ইতি?"

এই সকল প্রজা মৃত্যুর পর যেরূপে যে স্থানে গমন করে, তাহা কি তুমি জান?

"বেথ উ যথেমং পুনরাপদ্যন্তা ইতি?"

তাহারা যেরূপে এই লোকে ফিরিয়া আইসে, তাহা কি তুমি জান?

"বথা উ যথেমং পুনরাপদ্যন্তা ইতি?"

তাহারা যেরূপে এই লোকে ফিরিয়া আইসে তাহা কি তুমি জান?

"বেথ উ যথা লোকং এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্ণ সম্পূর্য্যত ইতি?"

জীব বারবার জন্মগ্রহণ করিতেছে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তথাপি এই লোক ও সেই লোক পরিপূর্ণ হইতেছে না কেন, তাহা কি জান?

এই তিনটী গভীর প্রশ্নের উপর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সম্মুখে প্রত্যহ কোটি কোটি জীব প্রাণত্যাগ করিতেছে, সুখের সদন, শক্তির নিকেতন, আনন্দের আশাভরসার চরম স্ফূর্ত্তিস্থল পড়িয়া রহিল; যাহার জন্য এই সমস্তই, যে সংসারের এই বর্ত্তমান সুখেই সন্তুপ্ত হইয়া স্বর্গাপবর্গের পরম অস্পাদীভূত অনন্ত সুখকে উপেক্ষা করিত,—সহসা ইহা হইতে

বিচ্যুত হইয়া সে চলিয়া গেল!—কোথায় গেল, কিরূপে গেল! এইত কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার পুত্রমিত্র ও কলত্রগণ ঐহিক সুখে মত্ত হইয়া তাহার ও আপনাদের অনন্ত জীবন কামনা করিতেছিল; তবে যে, তাহাদিগকে অতল শোকসাগরে ডুবাইয়া, সেই আনন্দের, সেই অতুলনীয় জলন্ত জ্যোতিকে বিষাদের অনন্ত অন্ধকারে পরিণত করিয়া, সে চলিয়া গেল, আরত তাহাকে ফিরিয়া পাইবে না? আরত সেই সংসার সেরূপ মধুর হাঁসি হাসিবে না! নিসর্গের সর্ব্বত্রই সেইরূপ সর্ব্বতোমুখী স্বর্গসুখের স্রোত প্রবাহিত হইবে না! কোন পথে, কোন্ দিক্ দিয়া, কিরূপে সে কোথায় চলিয়া গেল? চতুর্দ্দশ ভুবনের সকল পথ খুঁজিলাম, দশ দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, সকলের গতিবিধি, ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলাম; কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না! এই অপ্রতিবিধেয় নিদারুণ মর্ম্মপীড়া, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার এই বিষম অঙ্কুশতাড়ন, আশার সুপ্রসাদ লাভার্থ এই ভয়াবহ আত্মোৎসর্গ-বাসনা বা অকপট উপাসনা এবং নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে এই সর্ব্বসংহারক বিদ্রোহ-কল্পনা লইয়াই ইহলোক ও পরলোকের এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মের মূলভিত্তি গঠিত হইয়াছে। মানব সংসার-শ্মশানের মহাযোগী মহাদেবের ন্যায় আশার সেই শবময়ী মূর্ত্তিকে স্কন্ধে ধারণ করিয়া কতশত বর্ষ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিল, কিন্তু তাহা আর জাগিয়া উঠিল না। আত্মার প্রাকৃত রাজ্যে কত বিপ্লব সংঘটিত হইল, কত চন্দ্র সূর্য্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মার্কণ্ডেয়ের সহিত পরমাণুতে পরিণত করিয়া, আবার নব নব দেহে উদিত হইল;—কত কোটি কল্পকাল পরে অনন্ত মহাকালরূপী হিমগিরির গৃহে চিরদিনের সেই আশা পূর্ণকলেবরে প্রকাশ পাইল। বিয়োগ-বিধুর সেই সংসারযোগী আপনার ভাবিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিল; বিশাল শ্মশানের নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া আবার আনন্দ-জ্যোতি উদিত হইল; কিন্তু এই কি সেই? যে গিয়াছিল সেই কি আবার আসিল, যাহাকে পাইলে সেই আনন্দ হইত, যাহার চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইলে, শরীরের শিরায় শিরায় তড়িৎ তেজ ছুটিয়া বেড়াইত, সেই কি এই? এই দুরূহ সমস্যার কে মীমাংসা করিবে? এই কঠোর প্রহেলিকার মর্ম্ম কে উদ্ঘাটিত করিবে?—দেশে দেশে, কালে কালে অনুশীলন চলিতে লাগিল। সেই অনুশীলনের আজিও শেষ হয় নাই। ব্রহ্মা ও নারদ, ভৃগু ও বশিষ্ঠ, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও শ্বেতকেতু, কণাদ ও গৌতম, ব্যাস ও জৈমিনি; প্লেটো ও পিথাগোরাস, সক্রেটিস্ ও কন্‌ফিউসিয়স্, মুশা ও ঈশা এবং লুথর ও মহম্মদ, সকলেই সাধ্যানুসারে জীবজগতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিলেন, অধ্যাত্মতত্ত্বের তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিলেন, কিন্তু এ দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ হই-

লেন না। তাঁহাদের সেই সমারদ্ধ অনুশীলন আজিও চলিতেছে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার একটী মাত্র অধ্যায়ের আলোচনা হইবে।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যম ও পরলোকের চিন্তা নিত্যসঙ্গিনী। যে ব্যক্তি নিতান্ত কঠোর-হৃদয়, সেও প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। এই চিন্তা হিন্দুর অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত; ক্রমে ইহা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রাচীন মিসর ও ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমে এককালে এই পরলোকতত্ত্ব প্রধানতম ধ্যেয় হইয়াছিল। প্রাচীন পারস্যের মেজাইগণের মধ্যে এই বিষয়টী ধর্ম্মের একটী মূল মন্ত্র-রূপে বিবেচিত হইত। এই মহীয়সী ধর্ম্ম-চিন্তা অপ্রতিহত প্রভাবে এককালে সুদূর গল ও শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। মহাবীর সিজর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গলরাজ্যে পরলোক সম্বন্ধে অনেক আলো-চনা শুনিয়াছিলেন। ওয়েল্‌স্ প্রদেশের অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী ও ওক পাদপরাজির নিবিড় বনমধ্যে ড্রুইদগণ এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের মহতী চিন্তা তদা-নীন্তন কেল্‌ট, গল ও বৃটনদিগের মনো-মধ্যে এত দৃঢ়তর নিবিষ্ট হইয়াছিল যে, মৃত্যুকে তাহারা দুঃখের অন্ত ও সুখের সোপান বলিয়া জ্ঞান করিত। ইহজীবনের প্রতি তাহাদের এতদূর বিরাগ হইয়াছিল যে, নবপ্রসূত শিশুর সুকুমার সৌন্দর্য্য দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া তাহারা রোদন করিত এবং মৃত্যুর বিভীষিকা দর্শনে হাস্য করিতে থাকিত। ইহার কারণ এই তাহা-দের ধারণা ছিল যে, ইহসংসার সকল দুঃখের কারাগার; অতএব ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই সকল যাতনার অন্ত হয়।*

সুদূর ওয়েল্‌সের গিরিগহনে এই ধারণা তাহার অধিবাসিগণের অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত। এই উৎকৃষ্ট নীতি তাহারা এত হৃদয়ের সহিত ভালবাসে যে, ইহাকে পর-দেশ-প্রসূত বলিতেও তাহাদের কষ্টবোধ হয়। এমন কি কোন ওয়েল্‌স-পুরা-তত্ত্ববিৎ বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা পুরাকালে ওয়েল্‌স্‌বাসীগণের নিকট হইতে এই পর-লোক-নীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! আরবীয় প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে ইহা বহুদিন বদ্ধমূল ছিল;—এমন কি তাহার ছায়া বর্ত্তমান কোন কোন মুসলমান গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। পেরু ও মেক্‌সিকোয়

* "The circle of metpempsychosis was an essential principle of the Druid faith, and as such was impressed upon our fore-fathers the Celts, the Gauls, and the Britons. It is claimed, that the people held this doctrine so vitally that they wept around the new-born infant and smiled upon death, for the beginning and end of an earthly life were to them the imprisonment and release of a soul.—"
Walker's Reincarnation. *Int*: P. 5.

এই পরম পবিত্র পারলৌকিকী নীতি যে এককালে বিশেষ আদৃত হইত, তাহা উক্ত দুই দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে স্পষ্টই বর্ণিত আছে। ব্যাবিলনে উৎকট কারাবাসের পরে য়িহুদীগণ এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, এলেকজন্দ্রিয়ার কাইরো প্রভৃতির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। জন-দি-ব্যাপ্টিষ্টকে তাঁহারা দ্বিতীয় ইলাইজা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এমন কি ঈশাকে দেখিয়া অনেকে বলিয়াছিলেন যে, জনই সেইরূপে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়াছেন। ক্যাণ্ট ও শোপেনহর, হার্ডার ও গিটে, জুলিয়স মূলার ও রুকার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই অমিয়ময় পরলোকতত্ত্বে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিব না। এই মহীয়সী তত্ত্বচিন্তা—সংসাররূপ বিষবৃক্ষের এই অমৃতময় ফল, কিরূপে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অধিগত হইয়াছিল, ইহার অপূর্ব্ব লোক-বিমোহিনী শক্তিতে, ইহার মধুর আস্বাদে তাঁহারা কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ক্রমে তাহার আলোচনা হইবে। মৃত্যু বা যম এই চিন্তার প্রধান উৎস; বৈদিক মহর্ষিগণের প্রাথমিক চিন্তা রাজ্যে সেই নবীন উৎস কিরূপে উৎসারিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাই দেখিব।

"পরেয়িবাংশং প্রবতো মহীরনু
বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং
যমং রাজানং হবিষা দুবস্য॥
যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাং
যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোকমেতম্!
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং
যমং রাজানং হবিষা সপর্য্যত॥ *
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ
নৈষা গব্যূতিরপভর্ত্তবৈ উ।
যত্র নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ু-
রেণা জজ্ঞানাঃ পথ্যাঃ অনুস্বাঃ॥ ৩
মাতলি কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভি
র্বৃহস্পতিঃ ঋক্কভির্ববৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবাঃ ববৃধুর্যে চ দেবাঃ
স্বাহা অন্যে স্বধয়া অন্যে মদন্তি॥ ৪
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদ
অঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সম্বিদানঃ।
আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবি-শাস্তাঃ বহন্ত
এনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব॥ ৫
অঙ্গিরোভিরাগহি যজ্ঞিয়েভি-
র্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বৈবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা
তে অস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষি আনিষদ্য॥ ৬

১। হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের

---

* অথর্ব্ববেদে ঠিক এইরূপ শ্লোক দেখা যায়;—

যঃ প্রথমঃ প্রবতং আসসাদ
বহুভ্যঃ পন্থাং অনুপস্পশানঃ।
যোহস্য ঈশে দ্বিপদো যশ্চতু—
স্পাদস্তস্মৈ যমায় নমোহস্তু মৃত্যুবে॥

দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; তাঁহার নিকটই সকল লোকে গমন করে।

২। আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন।

৩। মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন; যম অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে (এবং বৃহস্পতি ঋক নামক ব্যক্তিদিগের সাহায্যে।) যাহারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধনা করে এবং যাহাদিগকে দেবতারা সংবর্দ্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, কেহ স্বাহাদ্বারা আনন্দিত হয়েন, কেহবা স্বধাদ্বারা।

৪। হে যম! এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর; তুমি এই যজ্ঞ জান; তোমার সঙ্গে অঙ্গিরা নামক পিতৃলোক দিগকে লইয়া আইস। তোমার উদ্দেশে ঋষিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাকুক। হে রাজা! এই হোমের দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক আমোদ কর।

৫। হে যম! নানা মূর্ত্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদিগের সহিত এস, এই স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিবস্বা, তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। এই যজ্ঞে কুশের উপর আসিয়া উপবেশন কর।

৬। অঙ্গিরা নামক, অথর্ব্বন্ নামক এবং ভৃগু নামক, আমাদিগের পিতৃলোকগণ এইমাত্র আসিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী; সেই যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদিগের শুভানুধ্যান করেন; যেন আমরা তাহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণভাগী হই।

৭। (যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি)— আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাঁহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর।

৮। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও।

৯। (শ্মশানে দাহকালের উক্তি) (হে ভূত প্রেতগণ!) দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোক দ্বারা শোভিত; যম এই স্থান মৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকেন।

১০। (যমদ্বারবর্ত্তী দুইঃ কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি) হে মৃত! এই যে দুই কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের

সহিত সর্ব্বদা আমোদাহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।

১১। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়, তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।

* * * *

১৩। যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম কর। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দূত হইতেছেন, যাহাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাইয়া থাকে।

১৪। যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্য তাঁহার জন্য হোম কর, দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদিগকে দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন।

১৫। যম রাজার উদ্দেশে অতিমিষ্ট হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল পূর্ব্বকালের ঋষি আমাদিগের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

১৬। যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন। তিনি ছয়স্থলে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয়।+

আমার কাশ্মীর যাত্রা।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনোবৃত্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। নূতন দেখিতে, নূতন শুনিতে, নূতন পড়িতে এবং নূতনের সহিত মিশাইয়া নূতন ভাব ধরিতে মনুষ্যের প্রাণ স্বভাবতই লালায়িত। যৌবনে এই বাসনা এতটা প্রবল হয় যে অনেকে তাহা আঁটিয়া রাখিতে পারে না। আমিও পারি নাই, সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কাজেই সুযোগও হইল, আমার এক আত্মীয় "কাশ্মীর" বা ভূ-স্বর্গ দেখিতে যাইবেন শুনিলাম, অমনি তাঁহার সহিত বাহির হইবার সাধ হইল, সাধও পুরিল। ২৪শে এপ্রেল তারিখে নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ সাতজনে কলিকাতার নিকট হইতে কিছুদিনের

+ সায়ণ কহেন, ছয়স্থান যথা দ্যুলোক, ভূলোক, জল, উদ্ভিজ্জ, ঊর্ক ও সুনৃতা।
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ।

জন্য বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক হাবড়া হইতে "লুপম্বেলে" মহোল্লাসে বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

বেলা ৩টার সময়ে ট্রেণ মহাশব্দে হাবড়া ষ্টেশণ পরিত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে নেলুয়া, বালী, ও কোন্নগর এই ষ্টেশনত্রয় ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিয়া, শ্রীরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীরামপুরকে বাঙ্গালার আধুনিক উন্নতির আদি স্থান বলিলে কোনই দোষ হয় না। এই স্থানেই কেরি, মার্সম্যান্ প্রভৃতি সহৃদয় ইংরাজ মহাপুরুষগণ অধঃপতিত বঙ্গসন্তানদিগের পুনরুদ্ধার কামনায় স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা কেরি এই শ্রীরামপুরেই বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত করেন, ও প্রজাকষ্ট সহজ উপায়ে রাজকর্ণ গোচর করিবার জন্য একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচার করিয়া জনসাধারণের নিকট বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন অভিপ্রায়ে মহামতি হালহেড্ সাহেবের সহযোগে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া বঙ্গ ভাষার ইতিহাসের ১ম কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করেন। শ্রীরামপুরের পরপারে গঙ্গাতীরে বারাকপুর। এখানে ভারতের ইংরাজরাজপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনারালের সুন্দর সৌধাবলী বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে, শ্রীরামপুর বঙ্গদেশের দিনেমারদিগের প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। এক্ষণে তৎকালীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীরামপুরের দক্ষিণে বল্লভপুর ও তাহার দক্ষিণে মাহেশ, এই উভয় স্থানেই প্রতিবৎসর আষাঢ়মাসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে। শ্রীরামপুরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে ট্রেণ পুনর্ব্বার সমভাবে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগর অতিক্রম করিয়া হুগলিতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সেওড়াফুলী হইতে একটী রেলশাখা বহির্গত হইয়া সম্প্রতি তারকেশ্বরে গিয়াছে। ৺তারকেশ্বরের কথা এখন থাক। চন্দননগর ও হুগলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই! ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসিজাতি চন্দননগরে প্রথমে তাহাদের বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে ইহা একটী সামান্য গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। ভারতে ইংরাজ প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ক্লাইবের ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চাভিলাসী "ডুপ্লে" সাহেব এই স্থানেরই শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই আধিপত্য কালে চন্দননগরের এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ফরাসী বীর্য্য সেই সময়ে নানা চক্রান্তে পরাস্ত ও দিগ্বিজয়ী নেপালিয়ানের পোতাধ্যক্ষ "এ্যাড্ মিরাল ক্রয়ের" রণপোত সমূহ বিনষ্ট না হইলে বোধহয় কলিকাতার পরিবর্ত্তে চন্দননগরকেই অদ্য আমরা সমগ্র ভারতের রাজধানীর বেশে দেখিতে পাইতাম। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ অত্রস্থ ফরাসী দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দেন।

অদ্যাপি সেই স্থানটী "গড়" নামে খ্যাত রহিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ফরাসীরাজ্যে চন্দননগর একটি অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। গঙ্গাতীর হইতে এস্থানের দৃশ্যটী অতি মনোহর। এখানে কলিকাতার ন্যায় লালদিঘী, গোলদিঘী, চাঁপাতলা, প্রভৃতি, নামে অনেক পুষ্করিণী ও স্থান দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইংরাজরাজ্যে হত্যা প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিয়া দণ্ডভয়ে অনেকে এখানে আসিয়া পরিত্রাণ পাইত, কিন্তু এক্ষণে সে পথ সম্পূর্ণ রূপেই রুদ্ধ হইয়াছে। এখন ফরাসী শাসন কর্ত্তা বিনা আপত্তিতেই ইংরাজরাজ্যের আসামীকে স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার ইংরাজহস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া থাকেন।

হুগলি। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে, হুগলিনগর পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা স্থাপিত হয়। এখানে অবস্থান করিয়া তাহারা এতাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও প্রতাপশালী হইয়াছিল যে দিল্লীর মোগল সম্রাটকুমার সাহাজাহান মহাবেত খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্রস্থ গবর্ণর মহেকেল রড্রিগ সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা প্রার্থিত সাহায্য দানে অসম্মত হইলে; সাহাজাহান ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠেন ও সাম্রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই একদল সৈন্য হুগলির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনমাস অবরোধের পর প্রায় সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজ হত ও পঞ্চসহস্র বন্দীকৃত হয়। পর্ত্তুগীজদিগের উচ্ছেদ সাধিত হইলে, বঙ্গের রাজধানী সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে আনীত হয়। তদবধি হুগলি বঙ্গের একটী অতি বর্দ্ধনশীল নগর হইয়া উঠে। হুগলির প্রধান দৃশ্য "ইমামবাড়ী"। ইহার প্রাচীরগাত্র বিবিধ কোরাণ শ্লোক চিত্রিত ও চত্বরের মধ্যস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত! ইমামবাড়ী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে এখানে এক ধনাঢ্য মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও কন্যা ছিল। পুত্রের নাম মহিসিন ও কন্যার নাম মুন্না। পিতার জীবদ্দশাতেই মুন্না সালাউদ্দিন নামে জনৈক বিলাসী মুসলমানকে বিবাহ করে। কিয়ৎকাল পরে মুন্নার পিতার মৃত্যু হওয়াতে বিলাসী যুবক মুন্নার পিতৃদত্ত সম্পত্তি ও যথাসর্ব্বস্ব উড়াইয়া দেন। পরে মুন্নাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্বিবাহ করেন। ক্ষোভে ও দুঃখে মুন্না বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। মুন্নার ভ্রাতা মহিসিন স্বীয় ভগিনীকে সংসারে ফিরাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন কিন্তু মুন্না স্বামীরত্নে বঞ্চিত হওয়াতে আর গৃহে ফিরিলেন না। তখন মহিসিন মুন্নাদত্ত গুপ্তধনে এই মসজীদ নির্ম্মাণ ও শিক্ষার্থী মুসলমান যুবক দিগের জন্য কতিপয় বৃত্তি স্থাপন করেন। যদিও এক্ষণে হুগলির পতনাবস্থা উপস্থিত, তথাপি ইহার এখনও বিলক্ষণ সমৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হুগলি হইতে একটী শাখা রেলপথ বহির্গত হইয়া নৈহাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ট্রেণ হুগলিষ্টেশণ

পরিত্যাগ করিল। আমাদের গাড়িতে এক্ষনে আর কেহ নাই। আমরা নানা রূপ গল্প আরম্ভ করিলাম। এদিকে আমাদের অজ্ঞাতসারে ট্রেণ পাণ্ডুয়ায় আসিয়া বংশী-ধ্বনি করিল। এখানে একটী বৃহৎ গুম্ভ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে এখানে গোহত্যা লইয়া একদা হিন্দু ও মুসলমানের সহিত এক ঘোরতর সংগ্রাম হয় তাহাতে মুসলমানগণ বিজয়ী হইয়া জয়ের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ এই মনুমেণ্টটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা যে কত কালের এবং ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা হিন্দু কি মুসলমান তাহা স্থির সিদ্ধান্ত বড়ই দুষ্কর। কারণ গঠন দৃষ্টে উহা হিন্দু নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত হয়। বঙ্গে মুসলমান রাজত্ব দৃঢ় করিবার মানসে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল আমরা পুনরায় নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনিত অনেক-বার বর্দ্ধমান দেখিয়াছেন, ভাল, বলুন দেখি বিদ্যাসুন্দরের কথা যাহা কিছু শুনি-য়াছি তৎসম্বন্ধীয় কোনও চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে কিনা?" তদুত্তরে "বন্ধু কহিলেন, বিশেষ চিহ্ন কিছুই এক্ষণে দৃষ্ট হয় না। তবে এখানে গ্রাণ্ডট্র্যাঙ্ক রোডের প্রায় দুই মাইলদূরে বিদ্যাপটী নামে একটী স্থান আছে। প্রবাদ সেই স্থানেই বিদ্যার বাসগৃহ ছিল ও তাহার সন্নিকটেই পূর্ব্বে সুন্দরকৃত সুড়ঙ্গের একাংশ দৃষ্ট হইত। এতদ্ব্যতীত এখানে এক কালীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। লোকে বলে সুন্দর রাজ আজ্ঞায় বধার্থে মশানে নীত হইলে, তদীয় স্তবে তুষ্ট হইয়া জগদম্বা এই বধ্য ভূমিতে কালী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। লোকে এত প্রমাণ করিলেও পাঠকের কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা ঐতি-হাসিক নহে, উহা কবিকল্পিত বিচিত্র উপন্যাস মাত্র তবে ভারতচন্দ্রের নহে, উহার মূল সংস্কৃত আছে। অধুনা এখান কার দৃশ্যাবলীর মধ্যে কৃষ্ণসায়র, গোলাপ-বাগ, রাজপ্রাসাদই সর্ব্ব প্রথম। কৃষ্ণ-সায়রের চারিপাড় এত উচ্চ যে জলাশয়-টীকে দুর্গ বদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। গোলাপ-বাগের এক প্রান্তে প্রাণিশালা ও মধ্যস্থলে পুষ্করিণী। বাপীতটে একটী ক্ষুদ্র সুন্দর রাজ ভবন ও তৎসন্নিকটে মহারাজের একটী প্রিয় কুকুরের সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ আবুরায় লাহোর হইতে কার্য্যোপলক্ষে বিধাতার কৃপায় এই স্থানে রাজা হন মুসলমান রাজত্ব কালে একসময়ে বর্দ্ধমান সমগ্র বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল। ভুবন খ্যাত অলৌ-কিক রূপলাবন্যময়ী নূরজাহানের ভূত-পূর্ব্ব স্বামী শের আফগান এখানকার সুবাদার ছিলেন। পাপিষ্ঠ জাহাঙ্গিরের কুচক্রে পতিত হইয়া অকালে তিনি নিধন

প্রাপ্ত হন। এখানেই তাঁহার বীরদেহ সমাধিস্থ থাকিয়া দর্শক মনে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিয়া থাকে। শাহ শ্রীতে আধুনিক বর্দ্ধমান সহর দ্বিতীয় কলিকাতা হইয়া উঠিয়াছে। এখান কার সিতাভোগ নামক মিষ্টান্ন অতি রসনাতৃপ্তিকর।

বর্দ্ধমানে ট্রেন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিল। বেলা অবসন্ন হইয়া আসায় আমরা রাত্রির জন্য আহারের বন্দোবস্ত এই স্থান হইতে সারিয়া লইলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ক্রমে আমরা কানুজংশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে কর্ড ও লুপ লাইন নামক রেল পথের দুইটি শাখা বহির্গত হইয়াছে, পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা লুপমেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। সুতরাং আমাদের ট্রেণ ক্ষণকাল পরেই কানুজংশন পরিত্যাগ করিয়া লুপলাইন দিয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমরা রাত্রির মত আহারাদি করিয়া গাড়ির এক একটী বেঞ্চে শয্যা বিস্তার পূর্ব্বক শয়ন করিলাম ও মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রার বশীভূত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলাম, রাত্রিতে যখন একবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন দেখি আমরা তিনপাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছি। চন্দ্রালোকে তিন পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই সুন্দর ও নয়ন তৃপ্তিকর। পাহাড় কাটিয়া রেল পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টেশণটী একটি উচ্চ স্থানে অবস্থিত তিন পাহাড় হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব রাজধানী রাজমহল পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলপথ গিয়াছে। রাজমহল মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া সুলতান সুজা কর্ত্তৃক বিবিধ হর্ম্ম্যে শোভিত হইয়াছিল। এক সময় রাজমহলের শোভা দিল্লীর সমান ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালের স্রোতে সে শোভা ধুইয়া গিয়াছে। রাজমহল সাঁওতাল পরগণার অন্তর্ভূক্ত এবং বাঙ্গালা ও বিহারের সন্ধীস্থলে অবস্থিত। কিয়ৎক্ষণ পরেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমিও পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি আমরা ভাগলপুরে আসিয়া পৌছিয়াছি। ভাগলপুর অতি প্রাচীন নগর। ইহা গঙ্গার দক্ষিণ কূলে কলিকাতা হইতে প্রায় ২৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে মহর্ষি ভার্গবের তপোবন ছিল, কেহ কেহ বলেন তাঁহারই নামানুসারে ভাগলপুর নাম হইয়াছে। ভাগলপুরের অনতিদূরে গঙ্গার উপনদী জামুই বা চম্পকবতী নদীতীরে পৌরাণিক রহস্যপূর্ণ বঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগর অবস্থিত। কথিত আছে চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি উশীনরের পৌত্র ও অঙ্গের পুত্র চম্প এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া নিজ নামানুসারে উক্ত নাম দিয়াছেন। অধুনা যে স্থানে ইংরাজ দুর্গ অবস্থিত আছে, সেই স্থানেই পূর্ব্বে অঙ্গরাজ কর্ণের পুরী ও দুর্গ ছিল তন্নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি দুর্গ নিম্নে এক স্থলে কতিপয় সোপান চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রস্থ লোকেরা বলে এই সোপান শ্রেণীর দ্বারাই কর্ণপুরস্থিতা অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলাগণ ভাগি-

রথী সলিলে অবতরণ পূর্ব্বক স্নানাদি করিতেন। কর্ণের বহুকাল পরে এই স্থলে চাঁদ সাগর নামক গন্ধবণিক জাতীয় এক ধনবান্ লোক বাস করিতেন তিনিই এদেশে সর্ব্ব প্রথম মনসা পুজানুষ্ঠান করেন এবং তদবধি এই স্থানে প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মহাসমারোহে একটী করিয়া মেলা হইয়া আসিতেছে। এখানে অধুনা অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই আইন জীবী। তাঁহারাই এস্থানের এক প্রকার হর্ত্তা, কর্ত্তা বিধাতা, এবং সভ্য, ধনবান্ ও উন্নতশীল। ভাগলপুরের তসর, খেস ও গাভী ভারতের সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। অত্রস্থ সেণ্ট্রাল জেল, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বিষয়। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল—আমি আর নিদ্রাসুখানুভব করিতে পারিলাম না। বন্ধুদিগের সহিত নানা রূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা জামালপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জামালপুর হইতে একটী শাখা রেলপথ মুঙ্গের পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা এই স্থানে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া মুঙ্গের যাইবার জন্য উক্ত শাখা রেল স্থিত ট্রেণে গিয়া উঠিলাম। জামালপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী বড় ষ্টেশন। এখানে উক্ত কোম্পানীর গাড়ি, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বৃহৎ কারখানা আছে। এই কারখানাটী প্রত্যহ শত সহস্র ব্যক্তির অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেছে। কয়েক মিনিট পরেই আমাদের ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আর বসিতে অক্ষম হইয়া গাড়ীর একটী বেঞ্চের উপরেই শয়ন করিলাম। নিদ্রা হইয়াছিল কিনা তাহা জানিনা বটে, কিন্তু যখন তন্দ্রা ভাঙ্গিল তখন আমরা মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা ট্রেণ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শকটারোহণে অত্রস্থ কোম্পানী বাজারে এক বন্ধু * * মাড়োয়ারির বাটীতে গিয়া অতিথি হইলাম। অদ্যই এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয় দেখিয়া মোকামা যাইব স্থির করিয়া প্রাতেই নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

মুঙ্গের।—বিহার প্রদেশের মধ্যে মুঙ্গের একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। ইহা কলিকাতা হইতে রেলপথে ৩০৩ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এখানে ঐতিহাসিক রহস্যপূর্ণ অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে; তন্মধ্যে এখানকার পুরাতন দুর্গটী সর্ব্ব প্রথমেই পর্য্যটকের নয়নপথে পতিত হয়। প্রবাদ আছে এই দুর্গটী ভারতোক্ত জরাসন্ধ রাজা নির্ম্মাণ করেন। হিন্দু গৌরব অস্তমিত হইলে, ইহা মুসলমানদিগের হস্তগত ও যাবনিক রুচি অনুসারে ইহার আকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহার পর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার মীরকাশেম পুনর্ব্বার ইহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়া পূর্ব্ব রাজধানী মুরশিবাদ পরিত্যাগান্তে সসৈন্যে এখানে আসিয়া রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই স্থানেই তাঁহার আদেশ ক্রমে ইংরাজানুগত

নিরপরাধ রাজা রাজবল্লব গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হন। দুর্গটীর তিন দিকেই পরিখা ও অপর দিকে স্বয়ং ভাগিরথী প্রবাহিতা। এই পরিখার পরপারে চারিটী সিংহদ্বার ও বিবিধ হিন্দুদেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সমন্বিত অত্যুচ্চ প্রাচীর শ্রেণী দুর্গটীকে বেষ্টন করিয়া অদ্যাপি উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান আছে। আমরা একটী দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এখানকার কারাগার, বিচারালয়, খৃষ্ট-মন্দির, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানগুলি একে একে দর্শন করিয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে "কষ্টহারিণীঘাট" দেখিতে গমন করিলাম। কিম্বদন্তি আছে এই ঘাটে মুদ্গলনামে একঋষি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ দিবস নিরম্বু উপবাসান্তে মহর্ষি প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে মুষ্টিমেয় তণ্ডুল কণা আহার করিয়া পুনর্ব্বার মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, একদা মহর্ষি তপস্যান্তে আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় তপে পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন। তখন মুদ্গল স্বীয় তণ্ডুলকণা দ্বারা অতিথি সৎকার করিয়া পুনর্ব্বার হৃষ্ট চিত্তে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীহরিও তখন সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিনবার ছলনা করিয়া অবশেষে নিজ মূর্ত্তিতে মুদ্গলকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে অভিমত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন; ঋষি কহিলেন "ভগবান"! যতক্ষণ জঠরানল প্রজ্বলিত থাকে, ততক্ষণ লোকে আহারের জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু সম্যক্‌রূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে ভোজনে আর কণামাত্র স্পৃহা থাকে না। পার্থিব যাবতীয় বিষয়ে বীতরাগ হইয়া আমি একমাত্র পরব্রহ্মের জন্যই এতদিন চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকারে এক্ষণে আমার সে বাসনাও পূর্ণ হইল। আর আমি আপনার নিকট কোনও বরেরই প্রার্থনা করি না, তবে আপনার যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে, আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আপনার দর্শনে আমার যেরূপ এক্ষণে সকল কষ্ট দূরীভূত হইল, তদ্রূপ অদ্য হইতে যে কেহ এই ঘাটে স্নান দান করিবে, সে অচিরে সকল কষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মরণান্তে অনায়াসে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে।" ভগবান "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, তদবধি এই ঘাট "কষ্টহারিণী ঘাট" ও এই স্থান মহর্ষির স্বনামানুসারে মুদ্গলপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান মুঙ্গের নাম এই মুদ্গলপুর নামেরই অপভ্রংশ মাত্র।

কষ্টহারিণী ঘাটে স্নানান্তে আমরা "করণচড়া" দেখিতে যাইলাম। করণ চড়া একটী ক্ষুদ্র গণ্ডশৈল মাত্র। শুনিলাম ইহাই দানবীর কর্ণের দানবেদী ছিল। ইহাতে বসিয়া তিনি প্রত্যহ সমবেত সহস্র

সহস্র দরিদ্রগণকে অকাতরে ধন রত্ন বিতরণ করিতেন। ইহার পর আমরা নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিক্রমচণ্ডীর মন্দির দেখিয়া শকটারোহণে সীতাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে গমন করিলাম।

সীতাকুণ্ড একটী প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ। ইহার উৎপত্তি রহস্য আমি যেরূপ এখানকার পাণ্ডাদিগের মুখে শ্রুত হইয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য এই স্থলে বিবৃত করিলাম। ত্রেতাযুগে অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার রাবণ বধান্তে সীতার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে, মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া কষ্টহারিণী ঘাটে স্নানকরতঃ সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান সমভিব্যাহারে অত্রস্থ ঋষিগণকে ফলপ্রদান করিতে গমন করিলে, ঋষিগণ সকলের হস্ত হইতে ফল গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দুশ্চরিত্র রাবণগৃহে এতাবৎ কাল অবস্থান নিবন্ধন সীতাদেবীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দীগ্ধ হইয়া তদীয় ফলগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা কহিলেন, "সীতা যদি সর্ব্বসমক্ষে এই স্থানে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া আপন চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্ত হইতে ফলগ্রহণ বিষয়ে আমাদের কোনও আপত্তি থাকে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া জানকী—হনুমান-কৃত এক প্রকাণ্ড জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া স্মিতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সমবেত ঋষিমণ্ডলীর অযথা সন্দেহ দূর হইল। তাঁহারা সকলেই সীতার হস্ত হইতে পরম সমাদরে ফলগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শত শত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই অলৌকিক অগ্নি পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে জানকী শ্রীরামচন্দ্রকে পাতালস্থিতা ভোগবতী গঙ্গার পবিত্র সলিলে এই চিতানল নির্ব্বাপিত করিতে বারম্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র তদ্রূপ করিলে জানকী আবার কহিতে লাগিলেন, "নাথ! আমার এই অগ্নি-পরীক্ষার নিদর্শন স্বরূপ এই ভোগাবতী সলিল যেন চিরকাল উত্তপ্ত থাকে।" বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামচন্দ্র তথাস্তু বলিয়া জানকীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তদবধি সীতাদেবীর নামানুসারে এই উষ্ণ প্রস্রবণ সীতাকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত উরিণগ্রামে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডশৈল দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই শৈলশিখরেই বুদ্ধদেবের আশ্রম ছিল। পুরাকালে এখানে নানাদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যাত্রীদিগের সমাগম হইত। এ স্থানে অদ্যাপি বুদ্ধদেবের অসংখ্য প্রস্তর খোদিত চিহ্নাবলী বর্ত্তমান আছে। মুঙ্গেরে এক সময় অত্যুৎকৃষ্ট বন্দুক প্রস্তুত হইত, কিন্তু এক্ষণে উৎসাহাভাবে সে শিল্পবিদ্যা একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখানকার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান, এখানকার উভয় জাতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। হিন্দুগণ মুসলমান পর্ব্বে

ও মুসলমানগণ হিন্দুপর্ব্বে যোগ দিয়া পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। কোনও প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইতে প্রায় দেখা যায় না। অত্রস্থ সমস্ত দেখিয়া আমরা বন্ধু-মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পরে রাত্রি ২টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথাকালে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল ও মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা পুনরায় জামালপুরে আসিয়া লুপমেলে উঠিলাম, মোকামা যাইব।

লুপ্ত "কবির গান।"

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য যতদূর পুষ্টি-লাভ করিয়াছে, "কবিওয়ালা" হরুঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি দ্বারা তাহা অপেক্ষা কম পুষ্টিলাভ করে নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও বঙ্গ-ভাষার অন্যান্য ইতিহাস লেখক দ্বারা কতক গুলি বিশিষ্ট কবিওয়ালাদিগের জীবনী ও তাঁহা-দের রচিত গীতাবলী (সখি সম্বাদ, বিরহ ও খেঁউড়) প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ বিশিষ্ট "কবিওয়ালা" গণের সম সাময়িক আরও অন্যান্য অজ্ঞাত-নামা "কবি" ছিলেন। তাঁহাদের বিরচিত ঐ "কবির গান" আজও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পক্ক-কেশ সম্পন্ন বৃদ্ধের নিকট মহা আদর পাইতেছে। আধুনিক যাত্রা ও থিয়েটারের গান, কবির গানের ন্যায় তাঁহাদের নিকট তত তৃপ্তি ও আনন্দদায়ক নহে।

আমি অনেক যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কতকগুলি কবিওয়ালা ওস্তাদদিগের গীত ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি; তন্মধ্যে অদ্য কবিওয়ালা "মহেশকাণার" বিষয় বিবৃত হইল।

কবিওয়ালা "মহেশ-কাণা"

জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত সব-ডিভিসনের নিকটবর্ত্তী মহেশ্বরপুর নামক গ্রামে কায়স্থকুলে ৺মহেশ চন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মান্ধ বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে "মহেশকাণা" বলিত। জন্মান্ধ ব্যক্তি কবি! এ কথায় অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন; কিন্তু জগৎপাতা বিধাতার কি অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য লীলা! কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল!! অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন মনুষ্যের কোন না কোন বিশেষ গুণ সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অপার মহিমা প্রকাশ করে!! একচক্ষুহীন (কাণা) অপর চক্ষে অধিক দেখে, অন্ধের শ্রবণ বা স্পর্শ শক্তি অধিক, হাবা কালা প্রভৃতি আকার ইঙ্গিতে সহজেই অপরের কথা বুঝিতে পারে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্ধ,

খঞ্জ প্রভৃতির জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরম করুণাময় বিধাতা তাহাদের এক একটী বিশেষ গুণ প্রদান করেন। অন্ধের বাদ্য ও গীত শক্তি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যজগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইতিহাস লেখক অন্ধ প্রেস্‌কট "স্পেন দেশীয় রাজা ফার্ডিনেণ্ড ও রাণী ইসাবেলার ইতিহাস", "মেক্সিকো বিজয়ের ইতিবৃত্ত" পেরু বিজয়ের ইতিহাস" এবং দ্বিতীয় ফিলিপ্সের রাজত্বের ইতিহাস" এই চার খানি পুস্তক রচনা করিয়া সভ্যজগতে যশস্বী হইয়াছেন। অন্ধ ফসেট 'পলিটীকাল ইকোনমী" নামক সুন্দর পুস্তক লিখিয়া জগতে প্রসিদ্ধতা লাভ করিয়াছেন। আর জগদ্বিখ্যাত কবি মিল্টন অন্ধ হইয়া " প্যারাডাইজ লষ্ট " নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে, অনেক বর্ণজ্ঞানহীন অথবা যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিও অতি সুন্দর সুন্দর গান রচনায় পারদর্শী, আসরে বসিয়াই মুখে মুখে নানাবিধ ছন্দে " কবি ও পাচালির" গান রচনা করিতে তাহারা অদ্বিতীয়।

এই প্রবন্ধে কথিত জন্মান্ধ কবি "মহেশকাণা" এই শ্রেণীর কবি। তিনি স্বীয় অসাধারণ মেধা ও স্মরণ শক্তি বলে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি বর্ণিত বিষয় সকলও কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কথিত আছে মহেশচন্দ্র প্রত্যহ গ্রামস্থ ভট্টাচার্য্য পাড়ায় যাইয়া তাঁহাদের নিকট কিম্বা উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী সংস্কৃত টোলে ছাত্রদিগের নিকট "অমর কোষ" ও ব্যাকরণাদি কণ্ঠস্থ ও তাঁহাদেরই মুখনিঃসৃত পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মারকতা শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জন্মান্ধ মহেশচন্দ্র এইরূপে মৌখিক শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনা শক্তি বলে নানাবিধ সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে "বাঁধনদার" মহেশ চন্দ্রের যশঃ-সৌরভ পাঁচালী ও কবিওয়ালা সমাজে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখনকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পাঁচালী ও কবিদলের লোকেরা আদর করিয়া মহেশচন্দ্রকে স্ব স্ব দলে গান বাঁধিবার জন্য লইয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কলিকাতার ধনী সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এখন "বাবু" শব্দ যেমন অকর্ম্মণ্য বিলাসী মুখসর্ব্বস্ব স্বধর্ম্মত্যাগী পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার অভ্যস্ত কেরাণী ব্যক্তিকে বুঝায়; তখন কিন্তু সেরূপ ছিল না। তখন এই কলিকাতায় যিনি দশ জনকে প্রতিপালন করিতেন, যিনি বৎসরে বার মাসে তের পার্ব্বণ প্রভৃতি হিন্দুর ক্রিয়া কাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তিনিই তৎকালীন সহরের বড়লোক ও বাবু নামে অভিহিত হইতেন। তখন "বাবু" নামলাভ গৌরবের জিনিষ ছিল। স্বর্গীয় লালাবাবু, ছাতু ও লাটুবাবু প্রভৃতি তখনকার সহরের মধ্যে "বাবু" ছিলেন। বিখ্যাত ছাতু ও লাটু বাবু প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামদুলাল সরকারের পুত্র—তাঁহাদের প্রকৃত নাম আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব। জ্যেষ্ঠ আশুতোষ (ছাতুবাবু) তখনকার সহরের বড়লোকদিগের মধ্যে এক জন প্রধান সমাজপুষ্টি ও

"সমজদার" ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে ১০৮ জন ওস্তাদ, পাঁচালী ও কবিওয়ালা তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত। ছাতুবাবুর স্বদেশীয় কবি "দুর্গামঙ্গল" রচয়িতা ৺বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাতুরায় ও মহেশচন্দ্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

ছাতুবাবু স্বয়ং গুণজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অনেক সঙ্গীত সাধারণের নিকট পরিচিত আছে। তাঁহার রচিত একটী গান এই স্থলে প্রকাশ করা গেল। এই মর্ম্মভেদী অসম্পূর্ণ গীতটী কোন্ সময়ে ও কি কারণে রচয়িতার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, সে বিষয় এখানে প্রকাশ করিবার আবশ্যক বোধ করি না।

তার কথা কার কাছে কই;
এমন দুঃখের দুঃখি মিলে কই?
প্রকাশিলে পরে, পাছে শুনে পরে
সদা ভাবি ঐ............।

যাহা হউক, গুণজ্ঞ ও সঙ্গীতরসজ্ঞ ছাতুবাবু "মহেশ কাণাকে" বড় ভালবাসিতেন। এমন কি যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাইয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের সহিত "সঙ্গীত-সংগ্রাম" বাধাইয়া আপনি বন্ধুবান্ধব সহ শ্রবণ করিতেন।

পূর্ব্বে গুণজ্ঞ বড়লোকদিগের নিকট "গুণী" বা ওস্তাদ দিগের কিরূপ আদর ছিল, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কোন সময় ছাতুবাবুর বাটীতে মহা সমারোহের সহিত সঙ্গীত-সংগ্রাম [কবি] হইয়াছিল। সেই আসরে এক পক্ষে মহেশচন্দ্র "বাঁধনদার" ছিলেন। সঙ্গীত-সংগ্রামের সুসময় সমুপস্থিত হইবে মহেশচন্দ্রের অনুপস্থিতি আসিতে পারিয়া ছাতুবাবু তাঁহাকে আনাইবার জন্য পুনঃপুনঃ লোক পাঠাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও কবি মহেশচন্দ্র আসিতেছেন না কেন, জানিবার জন্য ছাতু বাবু স্বয়ং সদলবলে মহেশচন্দ্রের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যাইব কি করিয়া বাবু! পেটের পীড়ার জন্য সদাই অস্থির। অন্যত্র শৌচ করিতে বড় অসুবিধা বোধ করি একারণ"—তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ছাতুবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তার জন্যে ভাবনা কি যোষজা? আসরে যদি পেটের পীড়া উপস্থিত হয় আমি তখন নয় স্বয়ং চাদর পাতিয়া ধরিব।" পূর্ব্বে গুণজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গুণী বা ওস্তাদদিগের এমনি আদর ছিল।

জন্মান্ধ "মহেশ কাণা" বিরচিত একটি "কবির গান" এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

পুত্র প্রসবিয়ে, যশোদা-চিত্ত অলস, অবশ
তায় কৃষ্ণের মায়া, নন্দজায়া, তথ্য না জানেন নির্য্যাস
কোন সখি প্রভাত সময়;
বলে ওঠ মা নন্দরাণী, পোহায়েছে রজনী—
কোলে তোমার কাল চাঁদের উদয়।
হরে পূজি' বিল্বদলে, পেয়েছ গোপালে,
সে ছেলে,
এখন উচ্চ স্বরে করিছে রোদন;
নন্দরাণী এ আনন্দে কেন হ'লে অচেতন।
একবার কর শুভ দরশন।

নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও উক্ত গানটীর শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।' তখন মুদ্রাযন্ত্রের এতদূর প্রচলন বা আদর না থাকায় সেই সকল গান

সাধারণে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত, আর সময় সময় সমবয়স্ক বন্ধুগণ একত্রে সম্মিলিত হইলে আনন্দে সেই সমস্ত গান গীত হইত। এখন এই সমস্ত গানের আর চর্চ্চা নাই; সুতরাং দুই একটি বৃদ্ধ ব্যতীত অপর কাহারও মুখে আর শোনা যায় না।

মহেশচন্দ্রের বিরচিত "খেঁউড়" সঙ্গীত গুলি অশ্লীলতা বোধে এস্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না; কিন্তু সহৃদয় সঙ্গীত রসজ্ঞ পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তন্মধ্যে একটি খেঁউড় লিখিত হইল। উহা নামে "খেঁউড়" কিন্তু শুনিতে নিধুবাবু প্রভৃতির "মধুর টপ্পা" অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

খেঁউড়।

বালিকা ছিলাম ভাল ছিলাম ত
ছিল না সুখ অভিলাষ,
পতি চিনিতাম না, সে রস জানিতাম না
হৃদপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সেই শতদল, মুদিত কমল
কাল পেয়ে ফুটিল তায়;
(প্রাণসই সই রে)
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।
এখন কি করি বল না, অবলা বইত না
হয়েছি নূতন ব্রতে ব্রতী
আমার কুলের নাশক হ'ল রতিপতি
প্রাণের নাশক হ'ল প্রাণপতি
(ওরে প্রাণ প্রাণ রে॥)

এই গীতটিও সমস্ত পাওয়া গেল না। যদি কেহ উপরি উক্ত গীত দুটি সম্পূর্ণ আকারে প্রদান করেন তবে লেখক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন।

আবার!

আবার সে ভালবাসা?
এখনো যাহার নামে আতঙ্কে শিহরি প্রাণে,
আবার আবার সেই রাক্ষসী পিপাসা?
যুঝি নিত্য যার সাথে হৃদয়ের পাতে পাতে,
এখনো রয়েছে ক্ষত সদ্য প্রাণ নাশা!
এখনো যাহার রাগ অধরে চুম্বনদাগ,
আলিঙ্গনে চূর্ণ হৃদি দারুণ দুর্দ্দশা!
এখনো জীবন পত্রে রহিয়াছে ছত্রে ছত্রে
যার অশ্রু দীর্ঘশ্বাস সুখীরব ভাষা!
ভূত বর্ত্তমান ছাপি' সুদূর ভবিষ্য ব্যাপী,
ছুটে যার মর্ম্ম দাহী আকুল পিপাসা!
আবার সে ভাল বাসা!

আবার সে ভালবাসা?
অর্দ্ধেক জীবন ধরি যাহার অর্চ্চনা করি,
ভরিলনা শূন্যবুকে একবিন্দু আশা!
বিশাল হৃদয় খানি যা'ছিল নিলগো টানি,
ধূ ধূ ধূ বিশালমরু—শুধু—মৃগতৃষা।
সেই ধূ ধূ বালুমত নিশিদিন অবিরত,
নীরবে পুড়িয়া মরি চির নির্ভরসা।
ভালবাসা বিনা মম, নাহি দোষ অন্য কোন,
সে ভালবাসার আজ এ হেন দুর্দ্দশা!
আবার সে ভালবাসা?

আবার সে ভালবাসা?
যেখানে ধারণা হেন শিশুর খেলনা যেন,—

হৃদয়ের বিনিময় প্রণয় সম্ভাষ!
যদি সেটী ভেঙ্গে যায়, আবার মিলিবে হায়,
সুদিনের খেলা ধুলা দু'দিনে ফরসা!
চাহিতে নয়ন ফুটে শোণিত প্রবাহ ছুটে,
জীবন মধ্যাহ্নে রবি আবৃত কোয়াসা!
বাণডেকে আসে নদী, দুর্ব্বল সে তট যদি,
অমনি ভাঙ্গিয়া পড়ে হয়ে ভিন্ন মাঝা!
আবার সে ভালবাসা?

গোপালনায়ক ও আমীর খস্রু।

৬

আমীর খস্রুর যশ ভারতে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তদানীন্তনকালে কে যে তিনি তাহা আর প্রায় কাহারও অবিদিত ছিল না, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কবি খস্রুর নামে আকৃষ্ট হইত। বিশেষতঃ তাঁহার ভাবগতিক ও তাঁহার কাব্যের কথা ভাবিলে মনে হয় যে তিনি সম্ভবতঃ রমণীকুলের বড়ই আদরের পদার্থ ছিলেন। আর ইহাও কিছু আশ্চর্য্য নয়, কারণ রসাত্মক বাক্য শুনিবার জন্য রমণীজনের প্রেমার্দ্র হৃদয় সতত ব্যাকুল, এতদ্ব্যতীত কবি খস্রু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন বংশীবাদনক্ষম পুরুষ ছিলেন—পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে বোধ হয় পাঠকের তাহা স্মরণ আছে যে তিনি বাঁশী বাজাইয়া সভাশুদ্ধ মোহিত করিয়াছিলেন। মুরারির মুরলীধ্বনির ন্যায় কবি খস্রুরও বেণুবাদন চিত্তাকর্ষক ছিল।* এবং ইহার উপরে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কবি খস্রু চাতুর্য্য-গুণসমন্বিতও ছিলেন। এইরূপ কবি ও সঙ্গীত-চতুর ব্যক্তি রমণীগণের বিশেষ প্রীতির

* এই বেণুবাদন ব্যাপারে কৃষ্ণের সহিত খস্রুর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কৃষ্ণও ভারতে বাঁশীর দ্বারা গীতাদি আলাপ করিয়া লোক মোহিত করিয়াছিলেন; পারস্তকবি খস্রুও তাঁহার মত গীতাদি বেণুর সাহায্যে আলাপ করিয়া জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য থাকাতে উভয়ের যশ যে তুল্য তাহা নহে। ভারতে বাঁশীর সাহায্যে গীতালাপনের যে প্রথম ও বিশেষ যশ হিন্দুস্থানী গায়ক, খস্রুকে যে দান করেন তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যেহেতু কৃষ্ণই উক্তবিষয়ে ভারতে—ভারতে কেন, প্রকৃতপক্ষে এ ধরায় সর্ব্বপ্রথম ও অগ্রগণ্য বলিয়া মনে হয়। যখনি ভাবি বেণুবাদনের উদ্ভাবক কে কে, বংশীধ্বনির দ্বারা বিশেষরূপে সঙ্গীত আলাপ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সংসারকে বিমোহিত করিল তখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রথমে না ভাবিয়া থাকা যায় না। মুরারিই আমার ধ্রুব বিশ্বাস মুরলিবাদনের উদ্ভাবক। ক্লারিওনেট প্রভৃতি যে সকল বাঁশীর আকারে ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়ের আদি আমার বেশ বোধ হয় শ্যামের মোহন মুরলি যন্ত্র। কারণ ইউরোপীয় সঙ্গীতগ্রন্থে দেখা যায় যে ইউরোপে যে প্রথম বেণুযন্ত্র ছিল তাহার নাম 'শাম' (Shawm Shalm :—"An early form of reed wind instrument, the precursor of the Clarionet &c.") দেখিতেছি।

পাত্র ছিলেন, তাহা কল্পনা করা কিছু অযুক্তিকর নহে। এই কল্পনার স্বপক্ষে অন্যান্য আরও অনেক কথা মনে আইসে; তিনি বোধ হয় একজন সুপুরুষ ছিলেন কারণ তাহার উপাধি খস্রু অর্থাৎ সুরূপবান্। তাঁহার খস্রু উপাধি যদিও তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিশেষ প্রমাণ স্বরূপে না ধরা যায় তত্রাচ আমরা তাঁহার চরিত্রচিত্র মানসপটে চিত্রিত করিলেই তিনি যে মনোরম ছিলেন, অসুন্দর ছিলেন না ইহাই দেখিতেপাই—না অনুভব করিয়া থাকিতে পারি না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যাহরণে যাঁহারা ব্যগ্র, যাঁহারা প্রকৃত কবি তাঁহাদের মুখে যে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইবে না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করি। সৌন্দর্য্যহারী কবিজনের তনু মন যে সুন্দর ভাব ধারণ করে এরূপ মনে হওয়াটা কিছু অসঙ্গত নয়।

যাহা হউক তাঁহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন শুধু এইটি বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার গীতিকাব্য কৌশলময় সৌন্দর্য্য তৎকালে রমণীগণের মন না হরণ করিয়া থাকিতে পারে নাই। আর অধিক কি বলিব ইদানীন্তন কালেও ভারতে কোন বিদেশীয় নিম্নজাতীয় রমণীর মুখে তাঁহার একটি গ্রন্থের গুণ প্রশংসার কথা শুনিয়াছি। না জানি তাঁহার সময়ে ভারতে রমণীরা তাঁহার গ্রন্থ কত পাঠ করিত এবং গ্রন্থকারের প্রতি কত আকৃষ্ট হইত। তাঁহার সময়ে তিনি একজন রূপে গুণে শোভমান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই বিশেষতঃ সুন্দরীগণের মনোমোহন—তৃপ্তিকর ছিলেন, কৃষ্ণের ন্যায় (কৃষ ধাতু আকর্ষণার্থ) তিনি রমণীগণের আকর্ষণের যত্ন ও আদর আধারের পাত্র ছিলেন ইহা পুনশ্চ নিম্নলিখিত একটী কাহিনীদ্বারাও অনেকটা বুঝা যায়।

চারিজন স্ত্রীলোক একটী কূপের ধারে জল তুলিতেছিল এমন সময়ে আমীর খস্রু বহুদূরব্যাপী পথভ্রমণজনিত তৃষ্ণা ও শ্রান্তি দূরকরণার্থে সেথায় মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন এবং তাহাদের নিকট জল পানার্থে চাহিলেন। একজন রমণী তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল এবং অপর সঙ্গিনীদিগকে বলিল, দেখ "ইনি খস্রু"; অপর সঙ্গিনীরা তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি যথার্থই সেই খস্রু যাঁহার স্তুতিগান সকলেই করিতেছে এবং যাঁহার হেঁয়ালি পহেলি প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শ্লোক সকল—'মুকারনিয়া অনামনিয়া' সমূহ সকলে আওড়াইতেছে। খস্রু উত্তরে কহিলেন "হাঁ"। তখন ললনাগণের মন তাঁহার নিকট কিছু জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সুবিধা পাইয়াছে ছাড়িবে কেন—ছড়াপ্রিয়া কামিনীগণ তাঁহার নিকটে ছড়া আদায় করিবার জন্য বিশেষরূপ প্রয়াস পাইল। কেহ বলিল "আমাকে ক্ষীরের বিষয় কিছু বল" কেহ বলিল "আমাকে চর্কার সম্বন্ধে কিছু বল" কেহ বলিল "আমাকে ঢোলের বিষয় কিছু বল" কেহ বলিল "আমাকে কুকুরের বিষয় কিছু বল"; তদুত্তরে প্রথমে তিনি কিছুই বলিলেন না, শুদ্ধ তাঁহার তৃষ্ণাতুরতা জানাইয়া কেবল জল ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ছড়াতৃষ্ণাকুলা কামিনীগণ ছড়াভাবে তাঁহার পিপাসা পরিহারে বিলম্ব ও অস্বীকারমধুরতা প্রদর্শন করত কহিল "তাহাদের বিষয় তিনি কিছু না বলিলে তাহারা তাঁহাকে এক বিন্দুও জলদান করিবে না।

তৃষ্ণাশুষ্ককণ্ঠ খস্রু কি করেন, রমণীগণের মন রাখিতেই—হইল কবি মানুষ রসজ্ঞ জন তাহাদের তীব্রমধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাহা আদেশের ন্যায় খস্রুর উপর কার্য্য করিল।

"ভুবন বিজয়ী জানি রমণীর নাম.
মধুর আবেশ বলে
তাহার আদেশ চলে
সে আদেশ শিরোধার্য্য মন অভিরাম"॥

তিনি তাহাদের মধুর আদেশ শিরোধার্য্য, করিয়া তাহাদের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য পৃথকভাবে চারিজনকে উত্তর না দিয়া একটী ছড়া দ্রুত রচনা করিয়া একবারে এক ঢিলে চারিপাখী মারিলেন, এককালে চারিজনের উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি অনমেল অর্থাৎ অমিতা-ক্ষরসম ছন্দে বলিলেন।

"খির পাকাই যতনসে
চর্কা দিয়া জালা
আয়া কুত্তা খা গিয়া
তু বইঠ ঢোল বাজা
আব পানি পিলা।

এ ছড়ায় তেমন রস কস নাই কিঞ্চিৎ প্রহেলিকাপূর্ণ ভাব থাকিলেও তেমন মাধুর্য্য নাই তথাচ তৃষ্ণায় নীরসকণ্ঠ খস্রু কি করেন, জলের জন্য উপস্থিতমত একটা চলনসই হেয়ালি-গোছের শ্লোক তাঁহাকে আপাতত রমণী-গণের তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত বাহির করিয়া দি-তেই হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও ইহাপেক্ষা ভাল ছড়া রচনা করিয়া দিতে পারিতেন কিন্তু অদম্যনীয়. পিপাসা তাহা খুব সম্ভব করিতে দিল না। তিনি পিপাসা ও রমণীগণের যাচ্ঞায় আর্ত্ত হইয়া একবারে চারিজনের জন্য ঐরূপ একটী শ্লেষ শ্লোক সত্বর তৈয়ারি করিয়া উত্তর দিলেন। পৃথগভাবে উত্তর দিতে আর সক্ষম হইলেন না। তিনি যে তখন কিরূপ পিপাসাতুর হইয়া ছিলেন তাহা ঐ শ্লোকই সপ্রমাণিত করি-তেছে। শ্লোকটী একরূপ যেন "যেন তেন প্রকারেণ" রচনা করিয়াই সর্ব্বশেষে "আব পানি পিলা" এই কথাটীর দ্বারা শ্লোকটীর সমাপ্তি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।—এমনি তাঁহার তৃষ্ণাতুরতা হইয়াছিল।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা তাঁহার প্রকৃতির সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া আসিয়াছি এ শ্লোকটীও যেন তাহার সপক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে—তাহার সমর্থন করিতেছে। তাঁহার একই প্রকারের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় দীপ্যমান হইয়াছে। যাহার যাহা প্রকৃত স্বভাব তাহা যাইবে কোথায় "স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে।" যে স্বভাবের বলে খস্রু দুর্জ্জন নায়ক গোপালকে দমন করিয়া কৌশলে দিল্লীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন সেই স্বভাবের বলেই তিনি তাঁহার দুর্জ্জয় তৃষ্ণা দমন করিয়া কৌশলে রমণীগণের তুষ্টিবিধান করিয়া ছিলেন।

খস্রুর স্বভাবে চাতুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই যেন কিছু সংযম ছিল কিন্তু গোপালের স্বভাবে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই যেন কিছু শিথিলতা ছিল। গোপাল নায়-কের অপেক্ষা আমীর খস্রু প্রাজ্ঞ ছিলেন। —খস্রু স্বকার্য্য উদ্ধারে বিশেষরূপ সক্ষম ছিলেন—"স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ"।

বাবু।

বড় রাস্তার ধারে একটা ডিস্পেন্সারি। ডিস্পেন্সারিটা ছোট খাট বটে, কিন্তু জাঁকাল। ফুটের পর হইতেই সিঁড়ির সারি—তাহার চওড়া চওড়া ধাপের পাশে কাচের টবে নানা রকমের বিলাতী গাছ—সে গুলা মৃদু সমীরণে মাথা নোয়াইয়া ঈষৎ হেলিতে ও দুলিতে ছিল—আর পরে রক—রকের মাঝখানে ভিতরে যাইবার পথ—দুই পাশের কাচ ঢাকা জানালার ভিতরে ফাহ্নুসের মত বড় বড় পেটওলা, লাল-নীল জল পোরা কাচের বোতলের পাশে আলো জ্বলিতেছিল—বাহিরে রকের উপর রাস্তার ধারে কড়ি হইতে বাহির করা ঝোলান, গোল গোল, ফুলা ফুলা, ফাঁপা ফাঁপা, দুই পাশে দুই খানা লাল সবুজ কাচ লাগান মস্ত একটা লণ্ঠনের ভিতর সেইরূপ আর একটা আলো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া পথের লোকদের আপনাদের সৌন্দর্য্য আর বাহার দেখাইতেছিল—তার পর ঘরের ভিতরে নারিকেল বৃক্ষের অংশ বিশেষের দ্বারা ম্যাটিং করা মেজের উপর একটা গোল মার্বেল টেবিল—তার আশেপাশে খানকত খালি চেয়ার, যেন কাহাদের আশার অপেক্ষায়, গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—আর টেবিলের উপরের একটা জ্বলন্ত ডুমওলা, চারিটা ডালবিশিষ্ট গ্যাসের আলোকে সম্মুখে সোণালী কাজ করা বড় একটা গোল ঘড়ি ঝকঝক, টকটক করিয়া চলিতেছিল।

এ ছাড়া, হলের দুই পাশে কাল, আয়নার মত জলজলে পালিশ করা আবলুস কাঠের চারিটা সো-কেস—তাহার ভিতরে নানারকম অস্ত্র—সকল গুলাই চকচকে—তাহার কোনটা শুঁড়ি মারিয়া, আড় হইয়া, ঠেঙ্গ ছড়াইয়া শুইয়াছিল—আর কোনটা ঘাড় বাঁকাইয়া, মুখ ফাঁক করিয়া হাঁ করিয়া, কাহাকে গিলিবার জন্য উপর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। ঊর্দ্ধে, কড়ির নীচে, দেওয়ালের গায়ে বড় বড় বিলাতী ঔষধের ছবি—সে গুলা যেন ক্রেতাদিগকে শীকার করিবার জন্যই, একেবারে ধারে ধারে দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া লাগিয়াছিল। আর চারিদিকে অনেকগুলা বড় বড় ঠেলা আলমায়রা নানামূর্ত্তির, নূতন, পুরাতন, ময়লা, ফরসা, ছাপমারা, কাগজ মোড়া ঔষধের শিশি বুকে করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে সেই রাশীকৃত শিশি গুলার মধ্যে কতগুলিতে যে ঔষধ ছিল, সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ আছে।

তাহা যাহাই হউক, আর একটি কথা বলিতে বাকী আছে। হলের পশ্চাতে, ছিটের পর্দ্দা ঢাকা, ঘসা কাচওয়ালা দরজার ভিতরে, দেওয়াল ধারের তাকের উপরের ঔষধের শিশির সারের নীচে, সামনের একটা বড় টেবিলের উপর কতকগুলি ঔষধের শিশি আর "মর্টার মেজার গ্লাস" লইয়া, চোখ ছোট, কান বড়, দাঁত উঁচু, নাক থাঁদা, ঠিক যেন হাঁদার ন্যায়, বিশ্রী, কিম্ভূতকিমাকার, কাল, কুৎসিত এক কম্পাউণ্ডার ঠুং ঠাং আর খটাং খটাং করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল, আর সামনের চিকের ভিতর হইতে কে একজন আঁচল দোলাইয়া, হাঁ করিয়া

ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একদৃষ্টে সেই পর্দ্দার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে রাস্তার এদিকে ওদিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে কোকিল-কণ্ঠে বলিতেছিল—"নী—নী—নীরু।"

কম্পাউণ্ডারের আস্ত গোটা নামটা নীরদ। "নীরু" তাহারি একটা অংশ। তবে তাহাকে সকলে 'ভজহরি' বলিয়া ডাকিত। আমরাও 'ভজহরি' বলিয়াই জানি।

ভজহরির পিতা গোবিন্দরামের নিবাস * * * পুরে। জাতিতে প্রামাণিক। জাতীয় ব্যবসা-তেই গোবিন্দরামের জীবনের প্রথম অংশটা কাটিয়া যায়। তার পর, কলিকাতায় কিছুদিন কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা করিয়া, দেশে গিয়া চিকিৎসা করেন। সুতরাং চিকিৎসা করাই এখন গোবিন্দ রামের পেশা।

সে কালে আজ কালের মত এতশত ঝঞ্ঝাট ছিল না। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে এত ভিড় ছিল না। বৎসর বৎসর রাশি রাশি ছেলে পাশ হইত না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে তখন মেডিকেল কলেজের ছেলে যোগাড় করিতে হইত। তখনকার লোকে মেডিকেল কলেজকে ভয় করিত। মড়া ছুঁইলে স্নান করিত। সহর-মফঃস্বলে এম্ বি, এল্ এম্ এস্ ডাক্তারের এত ছড়াছড়ি ছিল না। গলির মোড়ে মোড়ে ডাক্তারখানা ছিল না। সাইন্ বোর্ড-ওয়ালা কৃষ্ণদাস অধিকারীর এত পসার ছিল না। তখন ঔষধ কিনিতে একটু দূরে যাইতে হইত। দেশের ঔষধে দেশের ব্যারাম আরাম হইত।

গোবিন্দরাম সেই সাবেক হাতুড়ে নেটিব ডাক্তারের সময়ের লোক। বিশেষতঃ সেই সময়ে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড় বাড়িয়া উঠিয়া-ছিল। বর্ষায় ভালরূপে জলনিকাশ হয় নাই। নালা-নর্দ্দামা পরিস্কার ছিল না। ঘরে ঘরে ডাক্তার ও ঔষধের দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। আর গ্রামে অন্য ডাক্তার ছিল না। অনেক দূর হইতে ডাক্তার আনিতে হইত। দর্শনী অনেক লাগিত। তাহাও আবার সব সময়ে ভাল সুবিধা হইত না। ডাক্তার ঠিক সময়ে মিলিত না। পয়সা দিয়া অনেক খোসামুদি করিতে হইত। গোবিন্দরাম ঠিক সেই সময়েই বড় একখানা সাইন্‌বোর্ড টাঙ্গাইয়া দেশে গিয়া চেয়ার পাতিয়া বসেন। দেশের অধিকাংশ লোকই গরীব। তাহারা হাতের কাছে অল্প খরচে ডাক্তার পাইয়া, তাঁহাকে ফেলিয়া আর দূরে যাইত না। তার পর দুই এক জন আরাম হইলেই, গোবিন্দরামের পশার বাড়িতে লাগিল।

সে অনেক দিনের কথা। তখন ভজহরি স্কুলে পড়িত। তবে পড়া শুনা ভাল করিত না। প্রায়ই স্কুল পলাইয়া, মাঠে নরেনের সঙ্গে খেলা করিত; আর হরেণদের বাড়ী গিয়া, তাস ও দাবা খেলিত। গোবিন্দরাম সেটা ভাল বিবেচনা করিলেন না।

প্রথম প্রথম, পুত্র যাহাতে কিছু লেখাপড়া শিখিতে পারে, সে বিষয়ে যত্ন করিলেন। তার-পর, যখন দেখিলেন যে, সে চেষ্টা করা বৃথা, তখন কলিকাতায় কম্পাউণ্ডারী করিয়া, যাহাতে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু শিখিতেও পারে, সেই জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেই পর্য্যন্তই ভজহরির কলিকাতায় অবস্থিতি।

ভজহরি বাসায় থাকে, দিনে ডিস্পেন্‌সারিতে কম্পাউণ্ডারী করে। তবে ভজহরি কিছু বাবু। বার্ণিশ্‌ জুতা না হইলে, তাহার পায়ে দেওয়া হয় না; কোঁচান কালাপেড়ে না হইলে, তাহার পরা হয় না; আদ্দির সার্টে রূপার বোতাম না হইলে, তাহার চলে না; আর কলে-ছাঁটা চুলে টেরি না হইলে, লোকের সম্মুখে বাহির হইতে তাহার কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। এইটাই ভজহরির দোষ। তা আজকাল ভজহরির বাবুয়ানাটা এইরূপ হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। এক দিন হয় ত কেহ মদের ঝোঁকে আসিয়া বলিল—"কম্পাউণ্ডারবাবু, আজ * * ঘোষেদের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ—Evening Party তে join করিবার জন্য card আসিয়াছে, আমার সঙ্গে যাইবে না?"

কম্পাউণ্ডার। কেন যাইব না? নিশ্চয়ই। Certainly. এক আধ দিন, একটু আধটু আমোদ না করিলে, কি মানুষ বাঁচিতে পারে?

বাবু। তা চাই বই কি কম্পাউণ্ডারবাবু। বেশ! বেশ! খুসী হ'লাম। Thank you.

আর এক দিন হয়ত, থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে। 'অশ্রুমতী'র অভিনয়,—ভজহরির বড় ভাল লাগিয়াছিল। অভিনয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন অশ্রুমতী গাহিতে ছিল—

"প্রেমের কথা আর বোলোনা।
আর বোলো না,
আর তুলো না,
ক্ষমগো সখা—
ছেড়েছি সব বাসনা।
ভাল থাক, সুখে থাক হে—আমারে—
দেখা দিও না, দেখা দিওনা—"

তখন এসেন্স-মাখা জামা জোড়ার মাঝে বসিয়া ভজহরির মনে হইতে ছিল—বাঃ কি রূপ! কি সুমিষ্ট গলা! এমন সহরে থাকিয়াও, এমন কতকগুলা লোক আছে, যাহারা একবারও আসিয়া এ রূপ চোখে দেখিয়া যায় না; এমন সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা বুঝে না! তাহাদের কি চোখ! তাহারা কি বোকা! কি গাধা! আর পাড়াগাঁয়ের লোক গুলার ত কথাই নাই! তাহারা মূর্খ—পশু! থিয়েটার বাইনাচ তাহাদের স্বপ্নের জিনিষ—তাহারা বুঝিবে কি!!

মূহুর্ত্তের মধ্যে ভজহরির মনে অনেকগুলা কথা আসিয়া পড়িল। তার পর, সে দিন বাসায় ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল!

* * * *

আজকাল পড়া শুনার ভাবও ঐরূপ হইয়াছিল। এক দিন, ডাক্তারবাবু হয় ত, কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভজু, Exalgine টা কি জান?"

ভজ। নাম শুনিয়াছি বটে।

ডাক্তারবাবু। উহার dose কত?

ভজ। জানি না।

ডাক্তারবাবু। উহার Effect কি?

ভজ। জানি না।

ডাক্তারবাবু। তোমার Pharmacopœa তে আছে?

ভজ। জানি না।

ডাক্তারবাবু। কিছুই জান না, তবে prescription make up করিবে কেমন করিয়া?

ভজহরি নীরব।

... ...

এক দিন, একখানা প্রিস্ক্রিপ্‌সন্ আসিয়াছে।

"Re.

"Sodi Iodide.	gr. xxiv
——Bromide	gr. Lxiv
Mucilago Tragacan.	3iip.
Mag. Sulph.	3iip
Tinct. Hyoscyami	3iv
Inf. Buchu	Ad ozvii

"mft. mist.

"Put 8 marks

"one mark 3cc. daily.

"29—9—9— S. D. ——"

ঔষধ তৈয়ারি হইতেছে। ডাক্তার বাবু বলিলেন "ভজু, ওটা কি?"

ভজ। Mucilago.

ডাক্তার বাবু। কি Mucilago আছে?

ভজ। T-T-Tragacanthæ.

ডাক্তার বাবু। Mucilago Tragacanthæ কি করিয়া করিতে হয় জান? Preparation টা কি বলদেখি?

ভজ। কেন? Acacia আর জল!

ডাক্তার বাবু। (আশ্চর্য্য হইয়া) ওঃ! সবই যে ভুলিয়া গিয়াছ! বই লইয়া আইস।

ভজ। (বই লইয়া) হ্যাঁ—হ্যাঁ, ট্র্যাগাকান্থ চূর্ণ ৬০ গ্রেণ, স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ১০ আউন্স, আর শোধিত সুরা ২ ড্রাম।

ডাক্তার বাবু। এইবার ঠিক হইয়াছে। আচ্ছা বল দেখি—এটা কিসের ওষুধ।

ভজহরি। (হাঁ করিয়া) জ্বরের—

ডাক্তার বাবু। কোন্‌টা জ্বরের ওষুধ দেখ্‌লে? Gonorrhœa, Stricture এর ওষুধ এখনও বুঝ্‌লে না!——ছিঃ!!

ভজহরি চুপ্।

* * * *

গোবিন্দরাম প্রথমে ভজহরির যখন যা কিছু খরচের দুরকার হইত, টাকা পাঠাইতেন। এখন সেটা বড় একটা আর পাঠান না। যা, না হইলে নয়, তাই শুধু পাঠান। কেননা, দুই এক বার নাকি তাঁহার কাণে গিয়াছিল যে, ভজহরি বই কেনা ইত্যাদির নাম করিয়া মধ্যে, মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে যে টাকা লইত, তাহাতে নিজের বাজে খরচ করিত। আর কলিকাতা সহর। বাবুর দেশ! এখানে থাকিয়া ভজহরি বুঝিয়া, সুঝিয়া, গুছাইয়া অল্পের ভিতর চলে—ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা।

স্বজ্ঞানে বোধ হয়, কেহ কোন পাপকার্য্য করে না—অথবা যখন করে, তখন তাহার জ্ঞান থাকে না—নিজেকে নিজে সামলাইতে পারে না। ভজহরিরও এই রূপ হইয়াছিল। যখন প্রথমে কলিকাতায় আসে, তখন ভজহরি মন দিয়া পড়া শুনা করিত, এক পয়সাও বাজে খরচ করিত না, —বাপের পয়সাকে পয়সা বলিয়া মনে করিত। কিন্তু কলিকাতা সহর! বড় বড় বাড়ী। রাত্রে গ্যাসের আলো। পথের দু ধারেই বেশ্যা—বার দিয়া, কাতারে দাঁড়াইয়া। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে উৎসাহই দিয়া থাকেন - ব্যবসায়ী—বণিক—পয়সার দাস। পয়সা পাইলে তাঁহারা না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই। ভজহরি সামলাইতে পারিল না। ক্রমে দেশের মাঠের ধারের আটচালার কথা ভুলিয়া যাইতে লাগিল। কাদা-মাখা মেজের উপর দিয়া শুধু পায়ে চলা ফেরা করা, ঘরের কোণে মাটির পিলসুজের উপর সেই মিট্‌মিটে

করিয়া আলো জ্বলা, আর বর্ষাকালের অন্ধকার রাত্রে, আটচালা ফুড়ে ঘরের ভিতর টস্ টস্ করিয়া বৃষ্টির জল পড়ার কথা, আজ কাল ভজহরির বড় একটা আর মনে হইত না।

তবে দেশের সেই ঘরের কথা ভুলিবার আরও বিশেষ কারণ ছিল। এখন ভজহরির বয়স হইয়াছিল। নবীন যৌবনের সঙ্গে নবীন গোঁফের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর সম্মুখের চিকের ভিতরের নাকে-নোলক-পরা টুক্‌টুকে সেই ফরসা-পানা মুখখানা দেখিলে ভজহরির মন কাঁপিয়া উঠিত। মনে হইত—সে যদি ঐ মুখখানা আর ঐ হাসিটুকু পায়, তাহা হইলে, সে এ জগতে আর কিছু চায় না—তাহার যা কিছু আছে—এমন কি, তাহার নিজের জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে, সে কোনও মতে কুণ্ঠিত নহে।

সে দিন সন্ধ্যার পর, ভজহরির কিছু কাজ পড়িয়াছিল। কার্য্যগতিকে চিকের দিকে এক বারও নজর ফেলিতে পারে নাই। তার পর আবার যখন সেই কোকিল-কণ্ঠের কুহুস্বর জোর করিয়া আসিয়া, তাহার কাণের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ধাক্কা মারিল, তখন তাহার মনটা কেমন করিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া আসিল, মনে করিল. ঔষধ তৈয়ারি করা আর সেই মুখখানা, এই দুই-টার মধ্যে কোন্‌টা আগে?

সে দিন কলেরার প্রিস্ক্রিপসনে আরসেনিক, (Liq. Arsenicales) ষ্ট্রোফেন্থাস্, (Tinct. Strophanthi.) বা হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের (Acid Hydrocianic Dil.) মাত্রার কিছু তারতম্য হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না, অথবা সেইজন্য ডিস্পেন্সারির কোন দুর্নাম বা ভজহরিকে লইয়া কোন টানা-হেঁচড়া হইয়াছিল কি না, তাহারও কোন সন্ধান পাই নাই, কিন্তু ভজহরি যে ভাবে সেই প্রিস্ক্রিপসন্ খানি প্রস্তুত করিয়া, বাহিরে আসিয়া একেবারে চিকের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহা দেখিলে মনে বড় ভয় হয়।

ডিস্পেন্সারির সম্মুখে এক বেশ্যা ছিল। কেন ছিল বলিতে পারি না। কিরূপেই বা ছিল, তাহাই বা কে জানে? তখনকার কালে এত বেশ্যা ছিল না। ছেলে পুলে অল্প বয়সে খারাপ হইত না। তখন ভদ্র লোকগণ স্বচ্ছন্দে পথ চলিতে পারিতেন। সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন। মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। স্বামী স্ত্রীকে ভাল বাসিত। স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি করিত। তখন সংসারে এত কচ্‌কচি-ঝগড়া ছিল না, এত বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না, এত মনের অসন্তুষ্টি বা গরমিল ছিল না। আর এত পাপ কার্য্য ছিল না—এত ভ্রূণহত্যা ছিল না—এত জীবহত্যা ছিল না—এত আত্মহত্যা ছিল না। কিন্তু আজকাল আর সে দিন নাই। তিনকড়ি পালের ফাঁসির পর, একবার বেশ্যাদিগকে প্রকাশ্য স্থান হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর তুলিয়া দেওয়া হয় না। প্রকাশ্য স্থান গুলিতেই বেশ্যাদিগের অধিক আধিপত্য। যে দিকে চাও, সেই দিকেই বেশ্যা। বেশ্যাই বুঝি সহরের একটা শোভা।

তা যাই হক্, ডিস্পেন্সারির সম্মুখে এক বেশ্যা ছিল। সে ভজহরির সেই চেরা সিঁতি সেই কামিজ, সেই কালাপেড়ে কাপড়, আর বার্ণিশ জুতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিয়া

ফেলিত। ভজহরিও তাহার সেই ভাসা-ভাসা চোখ, সেই চাহনি, সেই নোলক-নাকে-মুখ, সেই হাসি, সেই হাবভাব না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। কোথায় দেশের কুঁড়ে, কোথায় কোঠা, কোথায় একটা পিলসুজের উপর মিট্‌মিটে আলো আর কোথায় গ্যাস, কোথায় দেশের কাল কাল বিশ্রী মেয়েগুলা আর কোথায় টক্‌টকে, ফরসা, পরীর মত চেহারা—ভজহরির মন গলিয়া গেল। মনে করিল, এ পরীকে কি একেবারে পাওয়া যায় না?

দুইদিন গেল। চারিদিন গেল। একমাস গেল। দুইমাস গেল। ভজহরির কিছুই ভাল লাগিল না। কার্য্যে মন লাগিল না। সেই ঘর, সেই চিক ঢাকা বারেন্দা, সেই ঘরের ভিতরের ছবি, সেই সাজ সরঞ্জাম, সেই বিছানা, সেই হাঁসি হাঁসি মুখখানি, সেই চাহনি সদা সর্ব্বদাই ভজহরির মনে বিঁধিতে লাগিল। এক দণ্ডও তাহাকে চোখের আড়াল করিতে কষ্টবোধ হইতে লাগিল।

তারপর যখন ভালবাসা বাড়িল, তখন ভজহরি আর একটা নূতন বিষয়ের অভাব বুঝিতে পারিল। সে টাকা চায়, নূতন নূতন জিনিষ চায়, কিন্তু ভজহরির বেশী টাকা নাই, রোজ রোজ নূতন নূতন জিনিষ দিবার ক্ষমতা নাই, ভজহরির উপায় অল্প। তখন ভজহরির মনে কতরকমই কল্পনা হইতে লাগিল। একবার মনে করিল—তাহাকে আর দেখিবে না, তাহার দিকে আর চাহিবে না, আপনার গন্তব্যপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে। কিন্তু পারিল না। দিনের পর দিন গেল। তাহাকে ভুলিতে পারিল না। কেমন করিয়া তাহাকে ভুলিবে?

সে দিন সন্ধ্যার সময়, কতরকম কথাই ভজহরির মনে হইতে লাগিল। ডিস্‌পেন্‌সারির কম্পাউণ্ডারি-করা, পরের চাকরী, অল্প মাহিনা, একদণ্ডও কোথাও যাবার যো নাই, ঘরের সাম্‌নের লোকের সঙ্গে একবার মন খুলিয়া হাসিয়া যে কথা কহিবে—তাহারও সাবকাশ নাই, দূর ছাই, এমন পরের চাকরী আর করিবে না, তাহাকে লইয়া দেশে গিয়া ডাক্তারি করিবে, ডিস্‌পেন্‌সারি করিবে, এখান হইতে ঔষধ কিনিয়া লইয়া যাইবে, আলমায়রা কিনিয়া সাজাইবে, টেবিল কিনিবে, চেয়ার পাতিয়া বসিবে, দেশের কাল কাল, বিশ্রী মেয়ে গুলাকে সহরের পরীর মত চেহারা খানা ভাল করিয়া দেখাইবে—কত কথাই মনে হইতে লাগিল! সে দিন ভজহরি একটা মতলব ঠাওরাইল।

* * * *

একদিন দুপুর বেলা, ডাক্তার বাহির হইতে আসিয়া, সোনার ঘড়ি ও চেন খুলিয়া, ভুলিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভজহরি বাহিরে বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে। সাম্‌নের ফুটপাতের উপর ছায়ায় ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া কাহারা তাস খেলিতেছে। কাগজ ধরিতেছে। ছক্কা, পাঞ্জা ধরিতেছে, আবার উঠিয়া যাইতেছে। বকাবকি হইতেছে। চটাচটি হইতেছে। ভজহরি তাই দেখিতেছে। রাস্তায় আর কেহ নাই। এক এক জন মাঝে মাঝে ছাতা মাথায় দিয়া আসিতেছে, যাইতেছে। গরুগুলা অতিকষ্টে বোঝাই করা গাড়ীগুলা টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ হইতেছে। হঠাৎ ভজহরির মনে হইল, এই সোনার ঘড়ি ও চেন

ছুড়া হইলে, কি তাহার ডিস্পেন্সারির খরচ কুলায় না? সোনার ঘড়ি ও চেন যদি দুইশত টাকাও হয়, শ দেড়েক টাকার ঔষধ, আর বাকী পঞ্চাশ টাকার ফার্ণিচার—দুইটা আলমায়রা, একখানা টেবিল, একটা চেয়ার, আর খান দুই বেঞ্চ বইত নয়, তা যথেষ্ট হইবে। দেশে, এত টাকার জিনিষই বা কার কাছে আছে! আর এত লোকে দেশে গিয়া ডাক্তার-খানা করিতেছে, তাহারা কি এতই বুদ্ধিমান্? সে দিন বুঝি শুনিতেছিলাম, * * স্থানে কতকগুলা জিনিষ বিক্রী আছে। তা—

দুইটা ছয় ফিটে আলমায়রা না হয়,	২০৲	টাকা।
একখানা টেবিল … … ,,	১০৲	,,
একখানা চেয়ার … … ,,	৩৲	,,
আর দুইখানা বেঞ্চিও না হয় জোর	৩৲	,,
এইত হইল মোট … … …	৩৬৲	টাকা

এর বেশী ত আর নয়! তাহা হইলেও ত ১৪৲ টাকা বাকী থাকে। বেশ! একসেট ক্যাথিটারও (Catheter) না হয় লইয়া যাওয়া যাইবে!

ভজহরি ঘড়ি ও চেন তুলিয়া রাখিল। তারপর, মেটিরিয়া মেডিকা (Materia Medica) বাহির করিয়া মস্ত এক খানা কাগজে ঔষধের লিষ্ট (List) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। তিনটার পর লিষ্ট্ শেষ হইলে বড়বাজারে * * এর দোকানে দিয়া আসিল।

সেইদিন বৈকাল বেলা, সেই চিক ঢাকা ঘরের ভিতরে একখানা চিঠি পড়িয়াছিল। লেখা ছিল।

"ভাই সুর—

"আজ বড় তাড়া তাড়ি। সব কথা বুঝিয়া সুঝিয়া বলিবার সময় নাই। মোট কথা জানিয়া রাখ। কাল হইতে এখানে আমি আর কাজ করিব না। দেশে গিয়া ডাক্তার-খানা করিব মনে করিয়াছি। তা সব প্রস্তুত। এখন কেবল তোমারই অপেক্ষা। তুমি প্রস্তুত হইলেই হয়।

"তোমার মাথার অসুখের জন্য, তিন সিসি 'কুন্তলবৃষ্য" তৈল কিনিয়াছি। এক সিসি পাঠাইয়া দিলাম। ব্যবহার করিও। আশা করি—এবার তোমার মাথার অসুখ সারিয়া যাইবে।

"কাল যাইব। ঠিক হইয়া থাকিও।

"পুঃ…যা বলিলাম, ভুলিও না। আর যা যা চাই, শীঘ্র লিখিয়া পাঠাইও।— "তোমারই—

"নীর"—

সুর ওরফে—সুরবালা "কুন্তলবৃষ্য" তৈলটি যত্ন করিয়া কুলুঙ্গির ভিতর তুলিয়া রাখিয়াছিল, কাপড় কাচিয়া আসিয়া একটু মাথায় দিল, তেলের গন্ধটা একবার কামিনী দিদিকে শুঁকাইল, তার পর ছাদের উপরের টবে রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছিল, তুলিয়া খোঁপায় দিল, শেষ ঠোঁট রাঙ্গা করিয়া, বাহিরে বারেন্দায় আসিয়া বসিল।

পাঁচটার সময়, ডাক্তার বাবু কাপড় ছাড়িবার সময়, ঘড়ি পাইলেন না। কোথায় রাখিয়াছিলেন মনে নাই। কি হইবে? অনেক খুজিলেন। ভজহরিকে বলিলেন। ভজহরি কিছুই বলিল না। কত করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, তবে এক টাকা উপায় করিতে হয়, আর একেবারে এত টাকা লোকসান! ডাক্তার বাবুর মন খারাপ হইয়া গেল। শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া আসিয়া, একটু জল খাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

রাত্রে ভজহরি স্বপ্ন দেখিল—যেন সে কোথায় কি একটা অজানা জায়গায় গিয়া পড়িয়াছে, কেহ কোথা নাই, কেবল হু হু করিয়া ঝড় আর চড়্ চড়্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আর কোথা যাইবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তার পর, অনেক দূরে, একটা কুঁড়ের ভিতর একটা মিট্‌মিটে আলো দেখিতে পাইল। প্রথমে সে মনে করিল, ঐ কুঁড়েতেই যায়। কিন্তু মন উঠিল না। অনেক দূরে জোরে একটা জুড়ী ছুটিয়া যাইতেছিল, সেই দিকে ছুটিয়া গিয়া জুড়ীকে ধরিতে গেল। কিন্তু পারিবে কেন? খানিক দূর গিয়াই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। পায়ে আঘাত লাগিল। গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর, যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিল, মাথার বালিশ, বিছানা সব ভিজিয়া গিয়াছে, আর বুকের ভিতরটা তখনও কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে।

ভজহরি তাহার জীবনে আর কখনও স্বপ্ন দেখে নাই—ভয়ে চোখ দিয়া তখনও জল গড়াইয়া পড়িল।

* * * *

পরদিন, দুপুর বেলা, একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ধর্ম্মতলা মেসার্শ মুর কোম্পানীর দোকান হইতে বড়বাজার অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়ীর ভিতর ডাক্তার—এখন আর কম্পাউণ্ডার নয়—ভজহরি আর সুরবালা বা সুরসুন্দরী বসিয়া—সমুখে একটা মুর কোম্পানীর ছাপমারা বাক্স, বোধ হয় পোষাকের। ভজহরির পায়ে এখন ডসনের বুট, পরিণে পেন্‌টুলুন, গায়ে মস্ত কোট, মাথায় টুপি, মুখে হেভেনা চুরুট, হাতে একগাছা ছড়ি। সুরসুন্দরীও এখন আর সে সুরসুন্দরী ছিল না, তাহর পায়ে লেডিজ-সু, গায়ে গাউন, মাথায় লেডিজ্ ক্যাপ্।

তা যাক্। গাড়ীখানা ক্রমে পুরাণ চীনাবাজার দিয়া * * বড়বাজারে গিয়া পৌঁছিল। "রাখ রাখ" করিয়া ভজহরিও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সেখানে প্যাক করা দেবদারুকাঠের বড় বড় দুইটা বাক্স ছিল। ভজহরি গাড়োয়ানকে বাক্স দুইটি গাড়ীর উপর তুলিয়া লইতে বলিয়া সমুখে বসিল।

তখনও গাড়ী চলে নাই। বাক্স গাড়ীর উপর উঠে নাই। আর একখানা গাড়ী গিয়া গাড়ীর পাশে দাঁড়াইল। একজন বাবু একটা সোনার ঘড়ি ও একছড়া সোনার চেন লইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। ভজহরি তাঁহাকে দেখিয়া ঘাড় হেঁট করিল। আর চাহিতে পারিল না। মুখ শুকাইতে লাগিল। তারপর কোট পেন্‌টুলুন টুপি পরা আর একজন বাবু Stethoscope হাতে করিয়া নামিলেন। ভজহরি আড় ভাবে দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তিনি ভজহরির মনিব—ডাক্তার। তাঁহাকে দেখিয়া ভজহরি আরও ঘাড় হেঁট করিল। নিশ্বাস ফেলিতেও তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু ভজহরির দিকে চাহিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন—"ভজহরি, এখানে এমন করিয়া বসিয়া কেন?" ভজহরি উত্তর করিল না। ডাক্তার বাবু আবার বলিলেন—ভজহরি তথাপি নীরব। তাহার চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বড়বাজারের রাস্তা। অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল। আশপাশের দোকান হইতে অনেকে তামাসা দেখিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল। গোল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

যিনি ডাক্তার বাবুর সহিত দোকানে আসিয়াছিলেন, তিনি ডাক্তার-বাবুর বন্ধু—শুধু বন্ধুই বা কেন, অনেকটা অনুগৃহীত—বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। অনেক দিন হইল, একবার ডাক্তার বাবুর অনুগ্রহে ও চিকিৎসার গুণে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়; তার পর আবার একদিন, সেও বড় বেশী দিনের কথা নয়, রাত্রে তাঁহার কচি ছেলেটির ভেদবমি হইয়া মারা যাইবার উপক্রম হইলে, ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। এ পর্য্যন্ত তিনি এই উপকারের কিছুমাত্রও প্রতিদান করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ ছিল না। তবে শরীর দ্বারা যতটুকু পারেন, ডাক্তার বাবুর উপকার করিতে সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। আজকাল তিনি ঘড়ির কাজ করিতেন। সুতরাং ডাক্তার বাবুর ওয়াচ্ ও ক্লক্ অয়েল করিবার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। তিনিও আনন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার এক ভাই বন্ধকীর কাজ করিতেন। আজ সকালে যখন ভজহরি ঘড়ি ও চেন বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া ফিরিতেছিল, তখন তিনি ভজহরিকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। পরে ঘড়ি ও চেন দেখিয়া চিনিতে পারেন এবং ইহার ভিতর মস্ত একটা রহস্য আছে মনে করিয়া, ঘড়ি ও চেন লইয়া ডাক্তার বাবুর নিকট গমন করেন। ডাক্তার বাবু দেখিলে সব সন্দেহ মিটিয়া যায়। তার পর, সন্ধান পাইয়া বরাবর বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত হন।

ভজহরি তখনও নীরবে সেই ভাবে বসিয়াছিল। ডাক্তার বাবু আর একবার ভজহরির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভজহরি, এ ঘড়ি ও চেন কার?" ভজহরি কথা কহিল না। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাবু ভজহরিকে বরাবরই ভাল বাসিতেন। তারপর ভজহরির সেই লজ্জা বিনম্র মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি আর কিছু বলিলেন না। মনে করিলেন, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। তিনি সকলকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শেষে আপনার ঘড়ি, চেন ও ভজহরিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

গোলযোগ দেখিয়া সুর আগে গাড়ী করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। গাড়ীতে তখন মাল তুলা হয় নাই। মজা জমিবার মুখেই ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সকলে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

ভজহরি তখনও মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই। ঘাড় হেঁট করিয়াই বসিয়া ছিল। অনেক বার চোখের জল অসামাল হইয়া পড়িতে ছিল। বড়বাজারের রাস্তা। দুধারে কত দোকান; কত লোক; কত গাড়ী; কিন্তু ভজহরির কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না।

ক্রমে গাড়ী গিয়া সেই চিক-ঢাকা বারেন্দার সম্মুখে থামিল। সুর ভজহরির দিকে চাহিয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল। ভজহরি! তুমি না দেশে গিয়া ডাক্তার-খানা করিবে! আর ঈশ্বরের

পরীর মত চেহারাখানা দেশের কাল কাল বিশ্রী মেয়ে গুলাকে দেখাইবে! কুহকিনী আশা! তোর অপরিসীম শক্তি! তোর সংঘর্ষণে কত লোক ইহসংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছে—তোর করাল নিষ্পেষণে কত লোকের হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! তোর মোহ-মন্ত্রে দীক্ষিত-ব্যক্তির আর ইহকাল পরকালের ভয় থাকে না! তোর মোহিনী মূর্ত্তিতে যিনি বিমোহিত না হন, তিনিই ধন্য!

ডাক্তারবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। ভজহরি আস্তে আস্তে সেই রূপ ঘাড় হেঁট করিয়াই নামিল—কোন দিকে দৃষ্টি নাই—কাহারও প্রতি লক্ষ্য নাই—তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল।

ডাক্তারবাবু ভজহরির বাকী মাহিনা চুকাইয়া দিয়া বলিলেন—"ভজহরি, আর কাঁদিও না, আমি তোমায় মাপ করিলাম, তবে দে[illegible]রের কাছে এরূপ কার্য্য আর [illegible] করিলে নিশ্চয়ই বিপ[illegible]

ভজহরি চ[illegible] অপরাধে এত বড় [illegible] করিল, ডাক্তার [illegible] ধরে—চোখের জলে পা [illegible] বার ক্ষমা প্রার্থনা করে—কিছু [illegible]তি করে। কিন্তু সাহসে কুলাইল [illegible] চোখ বুজিয়াই যেন বেঞ্চের উপর বসিয়াপড়িল।

* * * *

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভজহরি বাসায় বসিয়া আছে। কোনও কার্য্য জুটাইতে পারে নাই। হাতেও কিছু নাই। কষ্টে দিন যাইতেছে। খরচ আর কুলায় না। এক মাত্র ভরসা পিতা। তা, তিনি আর তেমন নাই। তিনি সকল কথা জানিয়াছেন,—তাই পুত্রের উদ্দেশ লন না। পুত্রও লজ্জায় পিতার নিকট আপনার অবস্থা জানাইতে পারে না। কষ্টের অবধি নাই। বাড়ীওয়ালা বাসাভাড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া শেষ জিনিসপত্র যা ছিল, বেচিয়া লইয়া, ঘরে চাবি দিয়া দিয়াছে; উপায় নাই। এখন ভজহরিকে নিরাশ্রয়ে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে! ভজহরির আর সে শরীর নাই। কার্য্যের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া ফিরিল, কিন্তু কেহ কার্য্য দিল না। সহরের লোকে এখন গরীবের দিকে তাকায় না। এখন জামা-জোড়া ধুতির সম্মান—যাহাদের উপর লক্ষ্মীর কৃপা আছে, তাহাদের জন্য লোকে বিনা আহ্বানেও খরচ করিতে রাজি, কিন্তু গরিবের সহস্র চীৎকারেও লোকের চৈতন্য হয় না! পথের পাশে বুভুক্ষিত জন যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, পার্শ্বেই, বড় বাড়ীতে—আনন্দ-কোলাহল, প্রেমারা মদ্য অবিরত চলিতেছে—আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে—অজ্ঞানে বিভোর বাবু ধনের অপব্যয় সাধনে তৎপর, ঢুলু ঢুলু আঁখিতে কেবল কেয়াবাৎ, বাহবার ছড়া আওড়াইতেছেন। হা—ধরা! এ বীভৎস দৃশ্য কি তুই চিরকাল দেখিবি? দিন যাইতেছে। যা ছিল শেষ হইয়া গিয়াছে। জামা কাপড়ও কিছু নাই যে, তাহা দ্বারা দুই এক দিনের খরচ চলিবে। জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবুও কার্য্য জুটে না। কোথায় যাইবে? কে দিবে? কিরূপে খরচ চলিবে?

ভজহরির হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। কিছু উপায় নাই। একবার মনে করিল, সুরর

কাছে যাইয়া আপনার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিবে। কিন্তু তাঁহাতে কেমন লজ্জা লজ্জা করে। তবে কি হইবে? অনেক ভাবনা চিন্তার পর, শেষ সুরর কাছে যাওয়াই সাব্যস্ত করিল। মনে করিল, সকলে ত্যাগ করিলেও, সুর কখনও তাহাকে ঠেলিতে পারিবে না। সুর তাহাকে ভাল বাসিত—সে অকৃত্রিম ভালবাসা কখনও হ্রাস হইবার নহে! হৃদয়ে আশা হইল। আশায় বুক বাঁধিয়া ভজহরি সুরর বাড়ীর দিকে চলিল।

শনিবার। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। পথে জন-মানুষের সাড়া শব্দ নাই। নিশাচর পেচক ও কুকুরের কঠোর স্বর কেবল সেই গম্ভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সমস্ত দিন আহার হয় নাই। পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। পা আর চলে না। কোন্ পথে যাইতে হইবে জানে না। কিছুই স্থির নাই। হাঁটিয়া হাঁটিয়া আর সোজা হইতে পারিতেছে না। ভজহরি একাকী কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল।

আবার সেই পথ! আবার সেই গ্যাসের আলো! আবার সেই থিয়েটার! আবার সেই গান! ভজহরি বসিয়া পড়িল। থিয়েটার! তুমি কত লোককেই না মজাইয়াছ! তোমার ষ্টেজের উপরের * * সেই বাঁকা নয়নে কত লোকেই না মজিয়াছে!—থিয়েটার দেখিতে যায় কয় জনে?

সেখান হইতে সুরর বাড়ী তবু অনেকটা তফাৎ। ভজহরি আবার উঠিল। কাঁপিয়া কাঁপিয়া হেলিতে হেলিতে আবার চলিল।

সেখানে রাস্তায় আর সে নিস্তব্ধতা নাই। ওসব রাস্তা কখনও নিঝুম হয় না। ভজহরি সুরর বাড়ীর দরজায় গিয়া অতি কষ্টে ডাকিল। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তাহার কাতর স্বর কাহারও কাণে পশিল না।

উপরে গট্টরা চলিয়াছে। মহা ধূম। বাঁয়া তবলার টিপ্‌টাপের সঙ্গে, ভাঙ্গা গলার আওয়াজ আসিতেছে। কেহ বমি করিয়া তাহার উপরেই শুইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা মদের ঝোঁকে আড় হইয়া, কেবল আবল তাবল বকিতেছে। সুর-সুন্দরী গাহিতে ছিল, কিন্তু তাহার সে সৌন্দর্য্য ছিল না। তাহার রূপে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে। ভজ-হরি আস্তে আস্তে উপরে উঠিল। সকলে চীৎ-কার করিল---"চোর" "চোর" বলিয়া সকলে ভজহরিকে মারিতে আসিল। ভয়ে ভজহরি কাঁদিয়া ফেলিল। সুরসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া কত কথাই যেন বলিতে যাইল, কিন্তু বলিতে পারিল না। সুরসুন্দরীও কিছু বলিল না। ক্লান্ত ভজহরি মার খাইয়া শুইয়া পড়িল।

তার পর আবার একটা হুলস্থূল বাধিল সকলে ধরিয়া ভজহরিকে কাঁধে করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়, অনেকবার ভজহরির মাথা ঠুকিয়া গেল। অবশেষে সকলে "হরিবোল" বলিয়া ভজহরিকে রাস্তায় ফেলিয়া গেল। ভজহরি যদি তখনও মরিত! কিন্তু কথায় বলে, কর্ম্মের ভোগ না ফুরাইলে মানুষ মরে না! ভজহরির কর্ম্মের ভোগ ফুরায় নাই, তবে ভজহরি মরিবে কেন?

পরদিন হাঁসপাতালে ভজহরি শুইয়া ছিল। তখন জ্ঞান হইয়াছিল, লোকের কথা বুঝিতে পারিতে ছিল, কিন্তু কথার উত্তর দিতে পারিতে ছিল না। হাঁসপাতালে কেন? হাঁসপাতালেরলোকে এত পয়সা চায় কেন? গরীব লোকেই ত হাঁস-পাতালে আসে। তবে, এখানকার কি এই রীতি?

৩য় বর্ষ } শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। { ৪র্থ সংখ্যা।

সূচী।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা।

সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

সমীরণ প্রতিমাসের শেষে প্রকাশিত হয়।

সমীরণের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য সহর ও মফঃসল—সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা—প্রত্যেক খণ্ড।০ চারি আনা মাত্র। নমুনার জন্য প্রতি সংখ্যায় ।১০ সাড়ে চারি আনা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

সাধারণ পক্ষে অর্দ্ধ মূল্য—অর্থাৎ বাৎসরিক অগ্রিম ১॥০ দেড় টাকা মূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বকার গ্রাহকগণের জন্য পূর্ব্ব মূল্যই নির্দ্ধারিত রহিল।

যিনি একত্রে পাঁচটী গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে প্রতি মাসে একখণ্ড পত্রিকা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

সমীরণে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, এক বৎসরের জন্য প্রতি পেজ, প্রতি মাসে ৪৲ চারি টাকা, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ তিন টাকা, ও সিকি পেজ ২৲ দুই টাকা করিয়া পড়ে; সিকি পেজের কম বিজ্ঞাপন কণ্ট্রাক্ট হিসাবে গৃহীত হয় না। লাইন হিসাবে প্রতি লাইন প্রতিবার।০ চারি আনা করিয়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিনিময়ার্থ সংবাদ পত্র, সমালোচনার্থ পুস্তক ও সম্পাদকের সমুদায় চিঠি পত্র ৩৪৫ নং আপার চিৎপুর রোড সমীরণ কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

গ্রাহকগণ টাকা পাঠাইবার সময়, মনিঅর্ডারের কুপনে আপনার নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণকে আপনার নম্বর লিখিতে হইবে। পত্রোত্তর আবশ্যক হইলে রিপ্লাই কার্ডে না লিখিলে উত্তর যাইবে না।

নূতন গ্রাহকগণ কুপনে "নূতন" শব্দটি লিখিয়া দিবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

টাকা কড়ি আমার স্বাক্ষরিত বিল ব্যতীত কেহ দিলে, আমি তাহার দায়ী হইব না।

সমীরণ কার্য্যালয়,
৩৪৫ নং, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। } শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বত্বাধিকারী, যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নানা প্রকার অনিবার্য্য কারণে সমীরণ প্রকাশের অনিয়মিত বিলম্ব হওয়ায় গ্রাহকগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এবং অনেকেই এজন্য আমাদিগকে পত্রাদিও লিখিয়াছেন তাহাদিগের আগ্রহাতিশয্যে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। এখন নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ ব্যতীত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার অন্য উপায়ান্তর নাই। অতএব এখন হইতে যাহাতে প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া সমীরণ প্রকাশ হয় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি। আশা করি গ্রাহকগণ নিয়মিত পত্রিকা পাইলে ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

সম্পাদক—

৩য় খণ্ড। সন ১৩০৭ সাল। ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীমদ্রূপ-সনাতন।

[সনাতনের বৈরাগ্য]

শ্রীমহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে কাশীতে আসিয়া পৌছিলেন। এদিকে শ্রীরূপের পত্র* পাইয়া সনাতন কারাগার হইতে পলায়নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইলেন। প্রকাশ্য রাজপথে যাইতে ভয় জন্মিল, কেহ দেখিতে পাইয়া পুনর্ব্বার বা ধরিয়া লয়। সুতরাং তিনি দুর্গম পার্ব্বত্য পথে একরূপ অনাহারেই যাইতে লাগিলেন। ভক্তমালে লিখে যে "তখন তিনি ফল মূল জল মাত্র আহার করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।" এইরূপে দিনরাত্র কেবল চলিয়া চলিয়া সনাতন পাতড়া পাহাড়ে এক ভৌমিকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সনাতন এইখানে "দুই উপবাসের পর কৈল রন্ধন—ভোজন।" আহারের পর সনাতন সে ভৌমিককে পাহাড় পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই ভুঞা একটি দস্যুপতি। আত্মীয় কুটুম্বের সহিত দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার অধীনে দস্যুদলে একটি গণক ছিল, সে গণিয়া ভুঞাকে জানাইল যে, সনাতনের ভৃত্যের কাছে আটটি মোহর আছে।

* তৃতীয় প্রস্তাবে এই পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 'উদ্ভটচন্দ্রিকা" গ্রন্থের টীকাকার বলেন, শ্রীরূপসনাতনের নিকট—"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।" এই শ্লোকটী পত্ররূপে পাঠাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, চরিতামৃত সে পত্রের মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। যথা—

"বৃন্দাবন চলিল শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।
আমি দুইভাই চলিলাম তাহাতে মিলিতে। তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহা হৈতে॥ দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে। তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥ যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন। এত লিখি দুই ভাই করিল গমন॥"

"অর্থ অনর্থের মূল," দস্যুপতি মোহরের লোভ কেন পরিত্যাগ করিবে? সে সনাতনকে সে রাত্রে তাহার আলয়ে নিশি যাপন করিতে বিধি-মতে যত্ন করিতে লাগিল। এই অপরিচিত কেন এত আদর করিতেছে? হেতু কি? এ প্রশ্ন তাঁহার মনে স্বতঃই উদিত হইল; তিনি ভৃত্য ঈশানকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার সঙ্গে অর্থবিত্ত কিছু আছে কি না।

ঈশান অতি গোপনে পথের সম্বল আটটি মোহর আনিয়াছিলেন। প্রভুর নিকট যদিও মোহরের কথা অস্বীকার করিলেন না, তথাপি সাতটি মোহর আনিয়াছেন বই বলিলেনও না। "এই কাল যম কেন আনিয়াছ?" সনাতন ঈশানকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ও মোহর সাতটি লইয়া ভূঞার হাতে দিলেন, বলিলেন—আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্য পথে যাইতে পারি না, আমার যথাসম্বল মোহর সাতটি দিলাম, ইহা লইয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে পর্ব্বতটা পার করিয়া দাও।" মোহর দেখিয়া ভূঞা হাসিল, বলিল—"তোমার ভৃত্যের কাছে আট মোহর ছিল। তুমি বুদ্ধিমান, তাই মোহর আনিয়া দিলে—ভালই করিলে; নতুবা হত্যা করিয়া রাত্রে মোহর লইতাম। তোমার ব্যবহারে, হে বিদেশি! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মোহর আর লইব না, অমনি পর্ব্বত পার করিয়া দিব—আমার পুণ্য হইবে।" সনাতন বলিলেন "এ কাল গ্রহণ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি যদি না লও, অন্য দস্যু আমাকে হত্যা করিয়া লইবে।" দস্যু সনাতনের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, মোহর লইল, এবং পর্ব্বত পার করিয়া দিতে সনাতনের সঙ্গে চারিটি পাইক দিল।

পর্ব্বত পার হইয়া সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সঙ্গে আর কিছু আছে কি?" "অবশিষ্ট একটি মাত্র মোহর," ঈশান উত্তর করিলেন। "তুমি এটি লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, ধনস্পৃহা তোমার যায় নাই।" ইহা বলিয়া সনাতন ঈশানকে বিদায় দিলেন। ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। এখানে বলিয়া রাখি যে, পথে আসিতে আসিতে ঈশানের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইল, নেত্রজল তদীয় অন্তর নিহিত আবর্জ্জনা রাশি ধুইয়া ফেলিল, দেশে আসিয়া তিনি পরম ভাগবত হইলেন। এই ঈশান দ্বারা কত লোক জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হইল। ইহাই সাধুসঙ্গের ফল।

এদিকে সনাতন হাজিপুর উপস্থিত হইলেন। হাজিপুরে সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত রাজ-কার্য্য ব্যপদেশে বাস করিতেন। হরিহর-ক্ষত্রের মেলা চিরপ্রসিদ্ধ, এখানে অনেক হাতি ঘোড়া বিক্রীত হয়। হরিহরক্ষত্র ছাপরা জিলার প্রান্তভাগে অবস্থিত, তার পরই মজঃফরপুর জিলা, হাজিপুর এই মজঃফরপুরের অন্তর্গত। শ্রীকান্ত গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া এখানে থাকিতেন ও ঘোড়া যোগাইতেন; গৌড়েশ্বর তিন লক্ষ টাকা দিয়া তাহাকে এই-খানে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীকান্ত বৈকাল বেলায় আপনার অত্যুচ্চ "হাওয়াখানা টঙ্গির উপর বসিয়াছেন।" এমন সময়, ছেঁড়া কাঁথা গায় দীনহীন বেশে সনাতনকে দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন। সনাতনকে এরূপ

অবস্থায় দেখিতে পাইয়া শ্রীকান্ত দারুণ দুঃখ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন ও একটি ভৃত্য সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাছে আসিলেন। উপস্থিত হইয়া (যথা ভক্তমালে)—

"দেখে গিয়া বসি রাজমন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥
হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি. চক্ষে বহে বারি॥
আহা একি দশা; হেন রাজ্যপদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেন. ভূমে গড়াগড়ি॥"

সনাতন ভগ্নীপতিকে ধীরভাবে আপন অভিপ্রায় বলিলেন, কিন্তু শ্রীকান্ত তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে নানা প্রকারে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন; ফল কিছুই হইল না, তখন অগত্যা বলিলেন "যদি নিতান্তই যাবে, দুই তিনটা দিন এখানে থাক। আর এই মলিন বেশ ত্যাগ করিয়া 'ভদ্র হও'।" সনাতন মুহূর্ত্তকে মাস জ্ঞান করিতেছেন, বলিলেন—"এখনি গঙ্গা পার করে দাও, তোমার কাছে এইটুকু মাত্র সাহায্য চাহিতেছি, বিলম্ব সহিতেছে না, এখনি চলিব।"

শীতকাল;—শ্রীকান্ত শীত নিবারণোপযোগী একখানি মূল্যবান শাল আনিয়া সনাতনকে দিলেন। সনাতন হাসিলেন—শাল গ্রহণ করিলেন না। তখন শ্রীকান্ত একখানি বনাত আনিয়া দিলেন, সনাতন তাহাও লইলেন না। তখন মাঝাও একখানি ভোটকম্বল সনাতনকে দেওয়া গেল। ভগ্নীপতিকে আর কত দুঃখ দিবেন? অগত্যা সনাতন সেখানি গ্রহণ করিলেন। শ্রীকান্তের লোক গঙ্গা পার করিয়া দিল, সনাতন পশ্চিমমুখে ধাবিত হইলেন।

সাগর-গামিনী গিরিনদী পথে যদি বাধা পায়, বেগ তাহা হইলে তাহার প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সনাতন শ্রীকান্ত কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ বাধা পাইলেন, অনুরাগ স্রোত প্রখরতর হইয়া উঠিল, অনুরাগ ভরে দিবানিশি তিনি চলিতে লাগিলেন।

"নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপন্থ নাহি মান॥"

বিদ্যাপতির এই কবিতা দ্বারা সনাতনের তখনকার অবস্থা বুঝান যাইতে পারে। সনাতন স্নানাহার ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন পদে দেখি—তিনি তখন "কভু ভিক্ষা, কভু অনাহার" করিয়াই চলিলেন।

সনাতন "কতদিনে" বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন; সেখানে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিতে পাইলেন, জানিতে পারিলেন, শ্রীমহাপ্রভু কাশীতে আসিয়াছেন।

দুর্ল্লভ বস্তু লাভার্থ আশার উদয়, সে বাঞ্ছিত বস্তু যদি আয়াসলভ্য হয়, তাহাতে অবধারিত যে শ্রম ও কালবিলম্ব ঘটে, তদ্দ্বারা আশার পরিপাক হয়, বলা যাইতে পারে। সনাতন শ্রীমহাপ্রভুকে কাশীতে পাইবেন, কল্পনাও করেন নাই, এইরূপ অভাবিতরূপে—হঠাৎ না পাইয়া যদি তাঁহাকে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইতে হইত, তবে বোধ হয় সনাতন কত বিস্মিত, চমকিত ও চঞ্চল হইতেন না। কিন্তু তাহাই হইল, সনাতন বারাণসী ধামে শ্রীমহাপ্রভুকে পাইলেন, তাহেই

তাঁহার আশাতীত ফললাভ ঘটিল। আশার পরিপাক হইল না, তীব্রতর আনন্দে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। 'তিনি কাশীতে,—যাঁহার জন্যে কত নদনদী, পর্ব্বত প্রান্তর অতিক্রম করিয়াছি—পাব পাব বলে দৌড়িয়াছি, আমার সেই আকাশের চাঁদ হাতে,—কোথায় তবে ?' সনাতনের বাক্য বাধিতে লাগিল, নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তিনি উন্মত্তবৎ মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভক্তমালে যথা—

"শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকুরে বারে বার।
গদ গদ, ভাবে বহে গলদশ্রুধার॥
যারে তারে জিজ্ঞাসে চাই গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর॥
উন্মত্তের প্রায় সাধু খুজিয়া বেড়ায়॥"

এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে জানিতে পারিলেন, চন্দ্রশেখর নামক জনৈক বৈদ্যগৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। অনুসন্ধানে শেখরের গৃহ পাইলেন, কিন্তু বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, বহির্দ্বারে বসিয়া থাকিলেন। ভাবিতেছেন—'আমি পতিত—অধম, এ পবিত্র ভবনে, যেখানে প্রভু বাস করিতেছেন, যাইবার অযোগ্য।' কিন্তু হৃদয়ের দেবতা সনাতনের হৃদয় জানিলেন, তখন চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলেন আবার ফিরিয়া গেলেন। সনাতনকে দেখিয়া গিয়া বলিলেন—"কে প্রভো! দ্বারে বৈষ্ণব কোথায় ?" [illegible]

"মহাপ্রভু [illegible] চন্দ্রশেখরকে [illegible] [illegible] তাহারে [illegible]

[illegible]

ফিরিয়া গেলেন। সনাতনকে দেখিয়া গিয়া বলিলেন—"কৈ প্রভো দ্বারে বৈষ্ণব কোথায় ?"

প্রভু—"তবে কি কেহই নাই ?"

চন্দ্রশেঃ—"আছেন। তিনি বৈষ্ণব নহেন, একজন দরবেশ।"

প্রভু—"তবে তাঁহাকেই লইয়া আইস।"

চন্দ্রশেখর আবার বাহিরে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন—"দরবেশ সাহেব! শ্রীমহাপ্রভু স্মরণ করিয়াছেন, আইস।"

প্রভুর আজ্ঞা কাযেই যাইতে হইল। সনাতন আনন্দে চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিরূপে ?

"ছিড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি।
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥"

(পদকল্পতরু)

সনাতনের নয়নে ধারার পর ধারা বহিতেছে, কিঞ্চিৎ পরে অতি কষ্টে বলিতেছেন—

"শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু,
করুণা কটাক্ষ মোরে কর।
গৌরাঙ্গ চরণে মতি, তুমি সে ত্রৈলোক্যগতি,
এ অধম জনারে বিচার॥"

তখন [illegible]

সনাতনের আর্ত্তনাদ, [illegible] দৈন্য [illegible],

[illegible] প্রভু [illegible]

আলিঙ্গন করিতে [illegible] সনাতন [illegible],

[illegible] গোসাঁই [illegible]॥ [illegible]

তোমা [illegible] যোগ্য [illegible] ছুঁইবার নহ [illegible],

[illegible] মোর [illegible]। [illegible]

পাপময় কুকদর্য্য; সাধু সভার ত্যজ্য.
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ॥”
(ভক্তমালা)

কিন্তু প্রভু কি আর শুনেন? তিনি ধাইয়া গিয়া সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনের প্রেম-পাথার উথলিয়া উঠিল, দুইজনেই কাঁদিতে লাগিলেন।

উভয়ের প্রেম প্রভাব দর্শনে চন্দ্রশেখর চমকিত হইলেন; এই দরবেশ যে সামান্য পুরুষ নহেন, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে আপনার কাছে বসাইলেন, পিতা পরম স্নেহে শিশুপুত্রের গায় যেমন হাত বুলায়, আর স্নেহে তাহার চিত্ত যেমন আর্দ্র হইতে থাকে, শ্রীমহাপ্রভু তদ্রূপই সনাতনের গায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পাঠক! এই চিত্রটি মনে ভাবুন। গৌর-ভক্তগণ, শ্রীমহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। মনে ভাবুন, সনাতন জগজ্জীবের প্রতিনিধিরূপে ভগবানের কাছে উপস্থিত, আর ভগবান স্নেহে তাঁহার গায় হাত বুলাইতেছেন। মলিন জীব! এই চিত্রটি কত মনোরম, একবার ভাব দেখি। তুমি কল্পনায় সনাতনের অবস্থা ও স্বভাব লাভ কর, সনাতন হও; দেখিবে—ভগবান আদর করিয়া তোমার গায় হাত বুলাইতেছেন।

প্রভু যত তাঁহাকে আদর করিতেছেন, সনাতনের তত আপনাকে হীন জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু সে স্পর্শের অপূর্ব্ব শক্তিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইতেছে, [illegible] চলিয়া যাইতেছে।

সনাতন বলিতেছেন—“প্রভু আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য, আমি পাতকী ও পতিত।”

প্রভু বলিতেছেন—“সনাতন! তুমি কি? ভক্তিবলে তুমি ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। ভবাদৃশ ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সতত বিরাজ করেন। তাহা তীর্থ হইতেও পবিত্র—তীর্থেরও পবিত্রতাকারক।”

যথা—“ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥”
(শ্রীমদ্ভাগবত)

প্রভু বলিলেন—

“সনাতন! ভগবদ্ভক্ত অতি দুর্লভ। ভবাদৃশ ভক্তকে দর্শন করাই চক্ষুর, আলিঙ্গনই গাত্রের এবং গুণকীর্ত্তনই জিহ্বার ফল। আমি কেন তোমাকে স্পর্শ না করিব।” যথা—

“অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥”
(হরিভক্তিসুধোদয়ে)

তারপর—

“প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ,
তোমার দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়
হইল যে তোমায় উন্মুখ॥”
(ভক্তমালা)

প্রভু বলিতে লাগিলেন—[illegible] কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত [illegible] মহারৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার [illegible] কৃপার সমুদ্র [illegible] গম্ভীর অপার [illegible]

"সনাতন কহে - কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥"

(চৈঃ চঃ)

প্রভু সনাতনকে আগমনসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আদ্যোপান্ত সকল কহিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমার দুইভাই প্রয়াগে আমার সঙ্গে মিলিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন।" প্রভুর আদেশে সনাতন তৎপরে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

এই তপন মিশ্রের কথা চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে।

নিমাই যখন এক জন পণ্ডিত মাত্র, ভক্তির নাম গন্ধ যখন লইতেন না, ভক্ত বৈষ্ণব পাইলে যখন পদে পদে বিদ্রূপ করিতেন, তখন মিশ্র একদা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। তপন আপনার সাধ্যসাধন তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিতে ছিলেন না. তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, কেহ তাঁহাকে বলিতেছেন—'তপন! ভগবান তোমার দেশে নিমাই পণ্ডিতরূপে বিরাজ করিতেছেন, শীঘ্র যাও তাঁহার কাছে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' নিমাই ঐ সময় পূর্ব্ব দেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পর দিন প্রভাতে তপন ঊর্দ্ধশ্বাসে পণ্ডিত পাশে আসিলেন, স্বপ্নবিবরণ জ্ঞাপন করিলেন, আর যথার্থই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আশ্চর্য্য এই যে, যে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবকে 'ভাবক' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, তপনকে তিনিই ভক্তিধর্ম্মের উপদেশ দিলেন, আবার দেশে গিয়া 'যেই সেই' হইলেন; অর্থাৎ ভক্ত পাইলে পূর্ব্ববৎ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। আরো আশ্চর্য্য এই যে, তিনি তপনকে কহিলেন, "তুমি দেশ ত্যাগ কর—কাশী যাও. সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" ততোধিক আশ্চর্য্য দেখ, বৃদ্ধ তপন একটি বালকের বাক্যে আত্মীয়বান্ধব ও জন্মদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক কাশী আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা এতদিনে ফলিল, গৌরাঙ্গের সঙ্গে কাশীতে তাঁহার মিলন হইল।

চন্দ্রশেখরের গৃহ গঙ্গার উপরে ছিল। মহাপ্রভু ইহাঁরই আলয়ে বাস করিতেন, এবং প্রত্যহ তপন মিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। তপন মিশ্রের একমাত্র পুত্রই বিখ্যাত রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী *।

তপন মিশ্র সনাতনকে সে দিনকার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু কহিলেন—"সনাতন! যাও, ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন কর।" সনাতনের জন্য নাপিত ডাকিতে, তিনি চন্দ্রশেখরকেও বলিলেন। অনতিবিলম্বে নাপিত আসিল, চন্দ্রশেখর সনাতনকে যত্ন করিয়া "ভদ্র" † করাইলেন।

---

* পিতা মাতার পরলোক গমনের পর তিনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। রঘুনাথ ভট্ট অতি সুমধুর রূপে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন।

† শ্রীকান্ত পূর্ব্বে একবার "ভদ্র" হইবার অর্থাৎ কেশ শ্মশ্রু পরিত্যাগের কথা উত্থাপন করিলে, কালবিলম্বের ভয়ে সনাতন তখন স্বীকৃত হন নাই। এখন "ভদ্র" হইলেন; অর্থাৎ কারাগারে যথারীতি ক্ষৌর-কর্ম্ম করিতে না পারায় "হাতে নখ, মাথে চুলি" ও মুখে গোঁপদাড়ী দীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল, তাহাই ত্যাগ করিলেন। কেহ২ বলেন, মন্ত্রী থাকা কালে সনাতন যবনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দাড়ী গোঁপ রাখা তাহারই চিহ্ন। কিন্তু ঐ অনুমান যথার্থ নহে; তাহা হইলে রামকেলিতে মিলনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবশ্যই সে ইঙ্গিত করিতেন; আর তাহা হইলে শ্রীকান্ত "ভদ্র হও" বলিতেন না।

সনাতন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে, তাঁহার পরিধানের জন্ত একখানি নূতন বসন আনিয়া দিলেন। সনাতন নূতন বসন পরিধান করিলেন না। সনাতনের দৈন্ত ও বৈরাগ্য ভাব দর্শনে মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন ও ভোজন করিতে গমন করিলেন। প্রভুর ভোজনান্তে তপন সনাতনকে প্রসাদ আনিয়া দিলেন; সনাতন প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হইয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন।

তপন মিশ্রও সনাতনকে নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। সনাতন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন —"আমাকে পুরাতন একখানি ধুতি দিলেই চলিবে।" অগত্যা মিশ্র তাহাই আনিয়া দিলেন। সনাতন সেখানি ছিঁড়িয়া দুই খানি বহির্ব্বাস ও কৌপীন করিলেন, আর তাহাই পরিধান করিলেন।

এই যে সনাতনের মস্তক মুণ্ডন ও কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণ; এ বেশটি এখনকার "বৈরাগী" বর্গের মধ্যেও আছে, কিন্তু সনাতনের ভগবতামুরাগই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না বর্ত্তমানে "বৈরাগী" বর্গের ভেকাশ্রয়ের এক এক জন গুরু থাকেন। হরিভক্তি বিলাসাদি ব্যবস্থা শাস্ত্রে এরূপ গুরু গ্রহণের আদেশ দেখা যায় না। সন্ন্যাস প্রথা "বৈরাগীর" ধর্ম্ম নহে। সন্ন্যাস বিধি বোধিত, বৈষ্ণবের বৈরাগ্য অনুরাগ-মোদিত; দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত—পৃথক। সনাতনের কৌপীন গ্রহণের উপদেশ কর্ত্তা স্বয়ং অনুরাগ, অনুরাগই তাঁহাকে বৈরাগী করিয়া ছিল; অতএব কেবল বেশ ধারণ বা বেশ পরিবর্ত্তনেই বৈরাগী হয় না,—অনুরাগ থাকা চাই। যখন "বৈরাগীর" বৈরাগ্য ধর্ম্ম বিধি-বোধিত কর্ম্ম নহে, তখন কৃষ্ণানুরাগ না থাকিলে তাঁহাদের বেশ ধারণ যাত্রা গানের ঋষি বেশের স্তায় মূল্য হীন—অকর্ম্মণ্য। এ বিষয়টি কি মহানুভব বৈষ্ণবগণ আলোচনা করিয়া দেখিবেন?

সনাতনে কৌপীন পরিগ্রহের অভিপ্রায় কি? বোধ হয়—

(১) প্রবল বৈরাগ্যের উদয়ে, লজ্জানিবারণের জন্ত যত টুকু আবশ্যক, তদতিরিক্ত বসন তিনি অনাবশ্যকীয় বোধ করিয়াছিলেন।

বোধ হয়—

(২) বাহ্য বেশটি যথাযোগ্য ভজনের উপযোগী বা অনুকূল করিয়া লইয়া ছিলেন।

বোধ হয়—

(৩) যেরূপ বেশ ধারণে মনে অনুমাত্র অভিমান উপস্থিত হইতে পারে, তাহা বর্জ্জন করিয়া ছিলেন।

বোধ হয়—

(৪) যে গৌরাঙ্গ প্রভু তাঁহার প্রাণের অধিক, সেই প্রভুর যে বেশ, তাহারই স্তায় বেশ ধারণ করিয়া ছিলেন। এমন হইয়াও থাকে, যিনি প্রাণের অধিক, তিনি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেছেন দেখিলে, কোন্ মনস্বী ভাল পরিচ্ছদে অঙ্গ বিভূষিত করিতে পারেন?

কাশীতে ভক্তির আদর ছিল না; যে দুই চারি জন ভক্ত সেখানে,—তাঁহাদের পরস্পরে পরিচয় ছিল। মহারাষ্ট্রদেশীয় এক জন ব্রাহ্মণও ভক্তি ধর্ম্ম যাজন করিতেন, সনাতন তৎসহও সম্মিলিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণ সনাতনকে "মহানিমন্ত্রণ" করিলেন, বলিলেন—

"সনাতন! যাবৎ তুমি কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥"

সনাতনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না।

"সনাতন কহে,—আমি মাধুকরী করিব।

ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্রে ভিক্ষা লব॥"—

(চৈঃ চঃ।)

সনাতনের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন ভক্ত মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, বিচিত্র নহে। ভিক্ষা-প্রথা এখনও আছে; কিন্তু কোন প্রকার প্রাণ ধারণের জন্য মাত্র নহে; কিন্তু ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যও বটে।

মহাপ্রভু সনাতনের বৈরাগ্যব্যঞ্জক বিচিত্র ব্যবহারে উত্তরোত্তর আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু—

"ভোট কম্বল দেখি গায়,

প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,

লজ্জিত হইলা সনাতন।" (প্রা, প.)

সনাতন ভাবিলেন,—'এ ভোট কম্বল প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, তাই বার বার দেখিতেছেন।' এ কথা মনে হইবা মাত্র সনাতন জাহ্নবীর ঘাটে গেলেন। তথায় দেখিলেন যে, এক গৌড়িয়া একখানি কাঁথা রৌদ্রে শুকাইতেছে; সনাতন তাঁহাকে কহিলেন—"ভাই! এক কার্য্য কর, আমার এই কম্বলখানা লইয়া তোমার এই কাঁথা খানি আমাকে দান কর।" গৌড়িয়া বিস্মিত হইয়া দেখিল সনাতন কাঙ্গাল নহেন, পরম ভাগ্যবান। সে বলিল "আপনি প্রামাণ্য লোক হইয়া কেন আমাকে হাস্য করিতেছেন? এই লাখ টাকা লইয়া ছেঁড়া কাঁথা কেন দিবেন?" সনাতন বলিলেন "ভাই! আমি যথার্থই বলিতেছি; তুমি ভাবিতেছি না।" কিন্তু তথাপি গৌড়িয়া বিশ্বাস করিতেছে না দেখিয়া, কম্বল রাখিয়া, কাঁথা লইয়া তিনি আসিলেন। গৌড়িয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সনাতন তৎপর—

"সেই কাঁথা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,

দণ্ডবৎ করিয়া পড়িল।

প্রভু বলে তাহা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,

আলিঙ্গন উচিত করিল॥"—(ভ, মা,)

সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া—

"প্রভু কহে—তোমার ভোট কম্বল কোথা গেল।

প্রভুপদে সব কথা গোস্বাঞি কহিল॥

প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।

বিষয় ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।

রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ॥

তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।

ধর্ম্ম হানি হয় লোকে করে উপহাস॥ (চৈঃ চঃ).

সনাতন মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া ইহার উত্তর দিলেন—

"যিনি খণ্ডিল মোর কুবিষয় ভোগ।

তাঁহার ইচ্ছায় গেল শেষ বিষয় রোগ॥"

(চৈঃ চঃ)

এইরূপে কাশীতে সনাতন শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় সনাতনের স্ফূর্তি [illegible] জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি জন্মিল, তিনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর প্রভু এক এক করিয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন; কিন্তু যে—সব শিক্ষা [illegible] প্রবিষ্ট [illegible] ক্রমশঃ বলা যাইবে।

প্রশ্নোত্তর রহস্য।

প্র। ১। অসুরে বঞ্চিয়া সুর কোন দ্রব্য খায় ?
২। যশস্বী মরিলে বল কোন পদ পায় ?
উ। অমৃত।

প্র। ১। কিসে হয় বিকৃত ক্ষীরের আস্বাদন ?
২। কিসে হয় মৃতব্যক্তি মূর্ত্তির রক্ষণ ?
উ। আঁকিলে।

প্র। ১। কিসে নর খ্যাত হয় সর্ব্বসাধারণে ?
২। কি নামে তৃতীয় স্বর আখ্যাত ভুবনে ?
উ। ই নামে।

প্র। ১। কোন দেব করিলেন কামদর্প চূর ?
২। ভারতের কোন কোণে স্থিত মণিপুর ?
উ। ঈশান।

প্র। ১। শশজাতি পুরুষের চরিত্র কেমন ?
২। সুরুচির গর্ভেতে জন্মিল কোন জন ?
উ। উত্তম।

প্র। ১। বাষ্পরূপে কোন পথগামী গঙ্গোদক ?
২। কোন বিকারেতে দন্ত হারায় যুবক ?
উ। ঊর্দ্ধগ।

প্র। ১। বংশেতে হইলে শ্রেষ্ঠ কি বলিবে তায় ?
২। সংগীতে দ্বিতীয় গ্রাম বল কিবা হয় ?
উ। ঋষভ।

প্র। ১। মাতৃপদে কিসে বদ্ধ আমরা জগতে ?
২। কিসে নর সুখী নহে ধর্ম্মরাজ মতে ?
উ। ঋণে।

প্র। ১। কোন রূপ ধরি শ্যামা অসুর বিনাসে ?
২। কোন রূপ হেরি "গিরি" যায় কারাবাসে ?
উ। ঌলোকেশী রূপ।

প্র। ১। কি অভাবে ভারতের ভানু অস্ত গেল ?
২। কি অভাবে গীত বাদ্য নাহি লাগে ভাল ?
উ। ঐক্য।

প্র। ১। তৃতীয় ব্যঞ্জনে কেবা শৃঙ্গ দিতে পারে ?
২। গুণ টানি তরি নাহি যায় কোন্ পারে ?
উ। ও পারে।

প্র। ১। গরবে গৌরব বল কে করিতে পারে ?
২। চরে চৌর বল কেবা পারে করিবারে ?
উ। ঔ।

প্র। ১। কিসে নর শোভা পায় বিদ্বান সভায় ?
২। বল কিসে বানরের ক্ষুধা নাশ পায় ?
উ। কলায়।

প্র। ১। কিসে হয় দরিদ্রের গৃহ আচ্ছাদন ?
২। রন্ধনাদি কার্য্য কিসে হয় সমাপন ?
উ। খোলায়।

প্র। ১। কিসে হয় সমরেতে শত্রুর নিধন ?
২। কোথা হয় ধান্য আদি শস্যের রক্ষণ ?
উ। গোলায়।

প্র। ১। কিসে হয় মক্ষিকার সবিশেষ সঙ্গ ?
২। কেমনে কঠিন দ্রব্য করা যায় ভঙ্গ ?
উ। ঘায়ে।

প্র। ১। কোন জনে সংবাদাদি করয়ে বহন ?
২। নদী মাঝে স্থল কোথা করি দরশন ?
উ। চরে।

প্র। ১। বল দেখি কোন দ্রব্যে পিত্ত নাশ পায় ?
২। কিসে বল রসনার ক্লেদ দূরে যায় ?
উ। ছোলায়।

প্র। ১। কে করে মগধরাজে জীবন প্রদান?
২। কি লয়ে রাখিল পুরু পিতার সম্মান?
উ। জরা।

প্র। ১। এ রাজ্যেতে খুনী কিসে হারায় জীবন?
২। মাতালেরা কোন খানে করয়ে গমন?
উ। ঝোলায়।

প্র। ১। অবশ্য পড়িবে গৃহ কিরূপ হইলে?
২। মাতালের নাহি যশ কি দোষ করিলে?
উ। টলিলে।

প্র। ১। অবোধ কেমনে শিখে সুপথে চলিতে
২। কিসে থাকে তণ্ডুল বণিক বিপনীতে?
উ। ঠেকে।

প্র। ১। কোন দিক নারীর স্বামীর অধিকার?
২। মার চেয়ে ব্যথী যেই কি নাম তাহার?
উ। ডাইন।

প্র। ১। কিসে রক্ষা পায় বীর তরবারি হতে?
২। স্বভাবতঃ বারি বহি যায় কোন পথে?
উ। ঢালে।

প্র। ১। ভাদ্র মাসে কিসে হয় প্রচুর পিষ্টক?
২। কিসে লক্ষ্য রাখি গায় নিপুণ গায়ক?
উ। তালে।

প্র। ১। শীতকালে হয় কিবা বরষার গতি?
২। নাট্যশালে কোথা দোলে চিত্রিত মুরতি?
উ। থামে।

প্র। ১। কোন নদতীরে সর্ব্বমঙ্গলার ধাম?
২। রজ্জু হরি শ্রীহরি ধরিলা কিবা নাম?
উ। দামোদর।

প্র। ১। অস্ত্রের প্রশংসা কিসে করে সর্ব্বজন?
২। পতনের ভয়ে কোথা যাইতে বারণ?
উ। ধারে।

প্র। ১। কোন অঙ্গে পাই সর্ব্ব বস্তুর আঘ্রাণ?
২। দেবগণ কোথায় করেন অবস্থান?
উ। নাকে।

প্র। ১। কোথায় রাখিলে গাভী হয় সুরক্ষিত?
২। উৎসবে অঙ্গন কিসে হয় আচ্ছাদিত?
উ। পালে।

প্র। ১। ঔষধের ভাল মন্দ কিসে পরিচয়?
২। পবিত্র আহার বল কোন দ্রব্যে হয়?
উ। ফলে।

প্র। ১। স্বদেশে বিদেশে বল কিসের সম্মান?
২। কার হেতু সুন্দরের হইল শ্মশান?
উ। বিদ্যার।

প্র। ১। কেবা করে অজগরে অশন প্রদান?
২। কি লয়ে ভিক্ষুক করে ভিক্ষার আদান?
উ। ভেক।

আমার কাশ্মীর যাত্রা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

যথা সময়ে ট্রেণ জামালপুর পরিত্যাগ করিলে আমরা গাড়ীর এক একটী বেঞ্চের উপর শয্যা বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। অদ্য অতি ভ্রমণ নিবন্ধন শরীর নিতান্ত অবসন্নপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং শয়ন মাত্রেই আমি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এই-রূপে যে কতক্ষণ কাটিয়াছিল জানি না। প্রভাত হয় হয় এমন সময়ে হঠাৎ একটা উচ্চ কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন উঠিয়া দেখি, ট্রেণ 'লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনে' আসিয়াছে।

পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমরা ইতি পূর্ব্বেই 'কাণুজংশণে' কর্ড ও লুপ লাইন নামক দুইটী শাখা রেল পথের উৎপত্তির কথা বলিয়াছি। উহারা কাণু হইতে যথাক্রমে প্রায় ১৮৭ ও ২৫০ মাইল পথ আসিয়া এই লক্ষ্মীসরাইয়ে আবার পরস্পর মিলিত হইয়াছে। উচ্চ কোলাহলকারী রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও কুলীদিগকে অকালে আমার নিদ্রা-ভঙ্গের জন্য অতি বিরক্তি সহকারে মনে মনে গালি বর্ষণ করিয়া, আবার শয়ন করিলাম। প্রভাত স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলে ও নিদ্রাঘোরে পুনর্ব্বার শয়ন মাত্রেই যদিও আমি পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু অধিকক্ষণ সে নিদ্রা সুখটী অনুভব করিতে পারি নাই। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই আমার বন্ধুবর অতি ব্যস্ততা সহকারে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "উঠ, উঠ গাড়ী মোকামায় আসিয়াছে।" তখন বাধ্য হইয়া আমাকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইল ও শয্যাগুলি বন্ধন করিতে করিতেই ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

মোকামা।—প্রাতে ৫।।০ টার সময় আমরা মোকামায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মোকামা-ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথের একটী বড় ষ্টেশন ও 'লুপ মেলের' নির্দ্দিষ্ট সীমান্তস্থল। ইহা কলিকাতা হইতে ২৮২ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আমরা জামালপুর হইতে লুপ মেলেই যাত্রা করিয়াছিলাম। সুতরাং মোকা-মায় আসিয়া আমাদের ট্রেণ একেবারে গতায়ু-প্রায় চলৎশক্তি হীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। আমরা তখন সেই মৃতকল্প ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। আমরাও তখন বেড়াইতে বেড়াইতে ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ একটী ধর্ম্মশালা বা অবৈতনিক পান্থাবাসে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ধর্ম্মশালাটী ইষ্টক নির্ম্মিত ও একতল, আমা-দের দেশের সাধারণ গৃহস্থ লোকের বাটীর ন্যায় প্রায় দেখিতে। ধর্ম্মশালাটী সেরূপ অপরি-স্কৃত, তাহাতে এখানে থাকিতে আমাদের একে-বারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শুনিলাম, মোকা-মাতে অভ্যাগত বিদেশী ভদ্রলোকের বিশ্রাম-

যোগ্য কোনও বাটী বা দোকান নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই জঘন্য স্থানেই কয়েক ঘণ্টা থাকিতে হইল। এখানে আসিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহার করিয়া নিকটস্থ একটী শিবালয়ে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

একেত এ বৎসর সকল দেশেই গ্রীষ্মের প্রভাব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একটু অধিক, তাহাতে আবার পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকাল স্বভাবতই অত্যুষ্ণ। সুতরাং নিদাঘ-তপনের দুরন্ত উত্তাপের সহিত এই স্থানেই আমাদের প্রথম পরিচয় হইল, পরিচয়টা বিধিমতই হইল—গরমে দুঃসহ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। শেষে বিধাতা ও রেলওয়ে কোম্পানী আমাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বেলা প্রায় ১টার সময় ষ্টেশনে ট্রেণ আসিল। আমরাও সকলে একটী কামরায় গিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমরা গাড়ীর জানালা, সার্সি প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ করিয়া পরস্পর নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে কত শত স্থান অতিক্রমের পর ট্রেণ পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠককে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা এ যাত্রায় পাটনায় নামি নাই। আজ প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার পাটনায় আসিয়াছিলাম। সেই সময়ে এখানকার যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহাই সংক্ষেপে পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিতেছি।

পাটনা—ভারতের মধ্যে একটী অতি বিখ্যাত প্রাচীন নগর, কলিকাতা হইতে ৩৩২ ও মোকামা হইতে ৪৮ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ-কূলে অবস্থিত। ইহাই আমাদের প্রাচীন মগধ রাজধানী পাটলিপুত্র. গ্রীক্‌দিগের পালিবোত্র ও চীনবাসীদের পাটোলট্‌গি।

মগধরাজ জরাসন্ধ ভীমহস্তে নিহত হইলে, তদ্বংশীয় আরও ২২ জন নৃপতি (১) ক্রমান্বয়ে মগধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা অর্থাৎ জরাসন্ধের অধস্তন ২৩৩ম পুরুষ রিপুঞ্জয়ের শাসনকালে কপিলবস্তু নগরে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। অনুমান, ৫৩২ পূঃ খৃঃ সুনীক মহারাজ রিপুঞ্জয়কে হত্যা পূর্ব্বক জরাসন্ধ বংশের লোপ ও নিজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সুনীকের পর প্রদ্যোত, পালক, জনক বা বিশ্বকূপ, রাজক ও নন্দিবর্দ্ধন বা তক্ষক নামক কেবল ৫ জন ভূপতি যথাক্রমে মগধে স্বল্পকাল রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরেই শিশুনাগ মগধরাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই শিশুনাগের ৫ম পুরুষ (২) বিম্বিসার পুত্র অজাত শত্রুর সময় বৈশালীরা অতি দুর্দ্দমনীয়

(১) ১ম মগধরাজবংশ—"সহদেব (চন্দ্রবংশের ৪৫ পুরুষ পরবর্ত্তী, রাজা জরাসন্ধ ইঁহার পিতা)। মাজ্জারি, শ্রুতশ্রবা, আয়ুত্বা, নিরমিত্র, সুনক্ষত্র, বৃহৎসেন, কর্ম্মজীৎ, সুতঞ্জয়, বিপ্র, শুচি, ক্ষেম, সুব্রত, ধর্ম্মসূত্র, সুশ্রম, ধৃতসেন, সুমতি, সুবলী, সুনীত, সত্যজিৎ, বিশ্বজিৎ, রিপুঞ্জয় (বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন)"—রাজস্থান।

(২) ৩য় রাজবংশ ১। শিশুনাগ, ২। কাকবর্ণ, ৩। ক্ষেমধর্ম্মা, ৪। ক্ষেত্রঞ্জয়, ৫। বিম্বিসার, ৬। অজাতশত্রু, ৭। দর্ভক, ৮। উদয়াশ্ব বা অজয়, ৯। নন্দিবর্দ্ধন, ১০। মহানন্দ, ১১।"—রাজস্থান।

হইয়া উঠে এবং গঙ্গাপার হইয়া আসিয়া পুনঃ পুনঃ মগধরাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে। এই কারণে মগধরাজ অজাতশত্রু উহাদের রাজধানী "বিশালপুরী" (১) জয় করিবার জন্য সসৈন্যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহ নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থলের (২) সমীপবর্ত্তী পাটলী নামক ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। এই হইল পাটলী পুত্র নগরের সূত্রপাত। অজাতশত্রুর পরবর্ত্তী আরও ৪ জন রাজার পর ৩৭০ পূঃ খৃঃ মহারাজ নন্দের শাসনাভিনয় আরম্ভ হয়। ইনিই রাজগৃহ হইতে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন।

মহারাজ নন্দের মুরা নাম্নী এক নাপিত জাতীয়া দাসী ছিল। তাঁহারই গর্ভে ও নন্দ রাজের ঔরসে জগদ্বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। দাসীর গর্ভজাত বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত পিতার পরলোক গমনে পৈতৃক রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে সিন্ধুতীরে গিয়া দিগ্বিজয়ী সিকন্দরসার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। কিন্তু অচিরে তিনি সিকন্দরসার চক্ষুশূল হইয়া উঠেন ও তখন তাঁহার শিবির ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে তিনি সসৈন্যে মগধে ফিরিয়া আইসেন। ভারতের 'মেকিয়াভেলী' কূট বুদ্ধি বিশারদ চাণক্যের এই সময়ে এই স্থানে অভ্যুদয় হয়। ইনি ৩২০ পূঃ খৃঃ নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সিকন্দরসা পঞ্জাব (পঞ্চাপ) প্রদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া তথায় একজন গ্রীক্ শাসন কর্ত্তা রাখিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এক্ষণে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। ইহার পর তিনি বক্ট্রিয়ার গ্রীক্ অধিপতি সেলিউকসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বক্ট্রিয়ারাজ শীঘ্র তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যারত্ন সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে জামাতৃ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন। (১)

মহারাজ চক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের শাসন কালে পাটলিপুত্র সুখ সমৃদ্ধির চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। এবং বঙ্গ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সকল দেশের রাজাই ইহাঁর অধীনতা স্বীকার করেন।

এই সময়ে পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজসভায় গ্রীক্দূত মহামতি মেগাস্থিনিস (২) অনেক

(১) "Vaisali, a very famous city in the Buddhist Records, Cuningham identifies it with the present Besarh, 20 miles north of Hajipur"—Travels of Buddhist pilgrims—P. 96. n.

(২) "He places it in the territories of the Prasii (Vrijjis?), and just at the junction of the Errano-beas with the Ganges. Taking the former river to represent the Sone, and bearing in mind that the mouth of the Sone is now some 20 miles to the west of its former course (V. St. Martin, jul iii. n), the position of the modern Patna will correspond with the ancient town. There was a small fort erected on the site, to check the encroachments of the Litchhavas of Vaisala; and the interval between Buddha's death and the arrival of the Greek embassy to Chandra Gupta under Megasthenes, this fort had increased into a vast important city"—S. Beal. P. 103. n.

(১) Vide Ancient India as described by Megasthenes. P. 10.

(২) "Bohlen (Alte Indien I. p. 98) says that Megasthenes was a Persian. No one gives this account of him but Annius Viterbiensis, that forger, whom Bohlen appears to have followed. But it is evidently a Greek name. Strabo (V. p 243; comp. Velleius Paterculus, i. 4) mentions. Megasthenes of Chalkis, who is said to have founded Cumae in Italy along with Hippokles of Kume"—McCrindles Ancient India P. 14.

দিন অবস্থান করিয়া ছিলেন। এদেশে পূর্ব্ব-কালে ইতিহাস লেখার প্রথা আদৌ ছিল না সুতরাং মেগাস্থিনিস যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে রত্নতুল্য অতি দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তৎকালে পাটলিপুত্র নগর দৈর্ঘে প্রায় ১০ ও প্রস্থে ২ মাইল বিস্তৃত সমান্তর ক্ষেত্রাকার (parallelogram) (১) প্রাচ্য রাজ্য সকলের মধ্যে অতি সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রথমতঃ ৪০০ হস্ত প্রশস্ত ও ৩০ হস্ত গভীর পরিখা এবং তাহার পরেই ৬৪টী তোরণ ও ৫৭০টী শস্ত্রি ভবন (tower) সমন্বিত এক অত্যুচ্চ কাষ্ঠ প্রাচীর নগরকে বেষ্টন করিয়া শত্রু হস্ত হইতে নগরবাসীগণকে রক্ষা করিত। এই কাষ্ঠ প্রাচীরের গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র ছিল; তন্মধ্য দিয়া মগধ সেনাগণ অবরোধ কালে শত্রুদিগের উপর ঘন ঘন শর বর্ষন করিত। (২) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটী ক্ষুদ্রাকৃতি ইষ্টক প্রাচীর বহির্গত হয়। অনেকে অনুমান করেন, উক্ত প্রাচীরই কাষ্ঠ প্রাচীরের ভিত্তি। (৩)

(১) "It is of the shape of a parallelogram, and is girded with a wooden wall, pierced with loopholes for the discharge of arrows. It has a ditch in front for defence and for receiving the sewage of the city—McCrindle. P. 66.

(২) Ancient India as described by Megasthenes, translated by McCrindle, p. 68.

(৩) "Some excavations made at Patna during the cold season of 1876 revealed a low brick wall of remote antiquity, supporting a stout wooden palisading"—Wheeler's S. His. of India P. 50. n.

প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৯০ পূঃ খৃঃ চন্দ্রগুপ্ত পরলোকগত হইলে প্রথমে তদীয় পুত্র বিন্দুসার ও তৎপরে তদীয় পৌত্র মহারাজ অশোক মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১) রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনি সর্ব্ব প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাটলীপুত্রকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তিনি বিধিমতে যত্নবান হন। অশোক আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ও পীড়িত দরিদ্রগণের কষ্ট লাঘবের জন্য তাঁহার বিশাল রাজ্যের স্থানে স্থানে—বিশেষতঃ পাটলীপুত্রে অনেকগুলি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহাতে সকল শ্রেণীর পীড়িত লোকেরা রাজব্যয়ে ঔষধ পথ্যাদি পাইত এবং উপযুক্ত কবিরাজগণের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া অচিরে নিজ নিজ রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিত।

মহারাজ অশোকেরই প্রতিপোষকতায় বৌদ্ধ প্রচারক দল পাটলীপুত্র হইতে পবিত্র বুদ্ধ 'বটশাখা' হস্তে করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র এবং সুদূরবর্ত্তী বক্ত্রিয়া, কাবুল, কান্দাহার, সিরিয়া মিশর, মাসিডন, সাইরিন্, এপিরস্, সিংহল পূর্ব্বোপদ্বীপ ও চীন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই সময় বিবিধ কুসুমোদ্যান ও মনোহর নিকুঞ্জ কাননাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া পাটলিপুত্রের প্রাকৃতিক শোভা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, অতঃপর ইহা 'কুসুমপুর' 'পুষ্পপুর' ইত্যাদি

(১) 'The capital of Asoka was also at Patalipatra, or Patna'—Wheeler. P. 51.

শোভা সমৃদ্ধি ব্যঞ্জক নামেও কখন কখন অভিহিত হইত। (১)। ২২২ পূঃ খৃঃ মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে মৌর্য্যবংশের (২) গৌরব রবি ক্রমশঃ মলিনকান্তি হইতে লাগিল এবং পরিশেষে ১৮৩ পূঃ খৃঃ সঙ্গ বংশের (৩) অভ্যুদয়ে উহা একেবারেই অন্তর্দ্ধান করিল।

অশোকের বহুকাল পরে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে চিফাহিয়ান নামে একজন প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ভ্রমণ উপলক্ষে এখানে আসিয়া তৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তখনও এই নগরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড রাজ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ কেবল বর্ত্তমান ছিল। তাহাই দেখিয়া পরিব্রাজক এতদূর বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, ইহা মনুষ্য কৃত বলিয়া কোনও মতে তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিশ্চয় দৈত্য দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। (১) তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে প্রজাগণের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। লোকেরা প্রায় সকলেই ধনী, উন্নতিশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তখন এখনকার মত লোকেরা কথায় কথায় আইন আদালতের সাহায্য লইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত না। চন্দ্র সূর্য্যকেই সাক্ষী করিয়া তাহারা সাধারণ বিশ্বাসের কার্য্য সকল করিত। (২) মহারাজ অশোক যে স্থানে বাস করিতেন সেই স্থানে ঐ পরিব্রাজক একটী ৩৫ ফিট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ প্রোথিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। উক্ত স্থানটী 'নালা' (৩) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। স্তম্ভের মস্তক দেশে একটী সিংহ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল ও স্তম্ভ গাত্রে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী খোদিত থাকিতে পরিব্রাজক দেখিয়াছিলেন।

সঙ্গ বংশের (৪) পর কণ্বংশীয় রাজগণ (৫)

(১) "This city, which is otherwise called *Kusumapura* (the city of flowers), was not in existence in Buddha's time"—Travels of Buddhist Pilgrims. P. 103, n.—

(২) ৪র্থ রাজবংশ—মৌর্য্যবংশ (খৃষ্ট জন্মের ৩১৫ বর্ষ পূর্ব্বে)। চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খৃঃ পূঃ; ইনি নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া মগধের রাজা হন)। ২। বিন্দুসার, ৩। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহায়তা, ৪। সুযশা, ৫। দশরথ, ৬। সঙ্গত, ৭। কেশলিশোক, ৮। সোমশর্ম্মা, ৯। শতধনু, ১০। বৃহদ্রথ"—রাজস্থান।

(৩) ৫ম রাজবংশ—"১। পুষ্পমিত্র, ২। অগ্নিমিত্র, ৩। সুজ্যেষ্ঠা, ৪। বসুমিত্র, ৫। আর্দ্রক, ৬। পুলিন্দক, ৭। বজ্রমিত্র, ৯। দেবভূতি।"—রাজস্থান।

(১) "In the middle of the city is the royal palace, the different parts of which he commissioned the genii (demons) to construct. The massive stones of which the walls are made, the doorways and the sculptured towers, are no human work"—Travels of Buddhist Pilgrims. P. 103.

(২) See Travels of Buddhist Pilgrims.

(৩) "The town of Nala (mentioned in the Singhalese Annals) is situated to the S. E. of the gates of Pataliputra" (V. St. Martin, 383 n.)" —Beal. S.

(৪) ৬ষ্ঠ রাজবংশ—"বাসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ, সুশর্ম্মা, সিপ্রক, কৃষ্ট, শাতকর্ণি"—রাজস্থান।

(৫) ৭ম রাজবংশ—পূর্ণোৎসঙ্গ, সত্যকর্ণ, লম্বোদর, চপলাক্ষ, মেঘস্বতী, পটুমান, অরিষ্টকর্ম্মা, হল, পট্টলক তলক, প্রবিল্লসেন, সাতকর্ণি সুন্দর, চকোর শাতকর্ণি, শিবস্বতী, অরিন্দম, গোমতি, শ্রীচন্দ্র, শিবস্কন্দ, সাধ্যশ্রী, সোনতরি, বিজয়সেন, চন্দ্রবীজ, শালাপুরি, সুখযজ্ঞদেব"—রাজস্থান।

অল্পকাল মাত্র (৭১ হইতে ২৬ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত) পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে বিশাল মগধ রাজ্য দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত অন্ধ্রগণের (১) বশ্যতা স্বীকার করে ও ক্রমশঃ ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্টজন্মের প্রায় ৬৩০ বৎসর পরে হিউএন্থসাং নামে আর একজন চীন পরিব্রাজক অতুল অধ্যবসায় বলে ভারত সাম্রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাটলিপুত্রের অতি শোচনীয় অবস্থা। মৌর্য্যবংশের প্রসিদ্ধ রাজধানী তখন সম্পূর্ণ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আধিপত্য পুনঃ দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইতেছিল, তথাপি অসংখ্য বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধরাজগণের কীর্ত্তি চিহ্নাবলী চারিদিকে বিরাজমান থাকিয়া পাটলিপুত্রের পূর্ব্ব গৌরবের কথা পরিব্রাজকের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়াছিল।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্‌তিয়ার খিলিজির বিহার জয় কালে পাটলিপুত্রের আর কোনও কথাই শুনা যায় না। তখন বিহার নগরই সমগ্র বিহার প্রদেশের রাজধানী ছিল। কিন্তু কোন সময়ে যে বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটলিপুত্র বা পাটনা হইতে বিহারে স্থানান্তরিত হয়, তাহা স্থির করা সুকঠিন। বোধ হয় কাণ্যকুব্জে রাঠোরগণের অথবা গৌড়ে সেন রাজাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইলে উল্লিখিত রাজধানী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

মোগলদিগের রাজত্ব কালে পাটনা, বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের মধ্যে পুনরায় একটী প্রধান নগর হইয়া উঠে। সম্রাট আরঙ্গজীবের পৌত্র আজিম-উলগাল এ প্রদেশের সুবাদারি হইয়া নিজ নামানুসারে পাটনাকে "আজিমাবাদ" নামে অভিহিত করেন। তদবধি মুসলমানগণ পাটনাকে 'আজিমাবাদ' বলিয়া থাকেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ সর্ব্বপ্রথম এই পাটনা নগরে সম্রাট সাহাজাহানের অনুমতি ক্রমে একটী বাণিজ্যকুটী নির্ম্মাণ করিয়া অহিফেন, রেশম, পশম ও পট্টবস্ত্রাদির বাণিজ্য আরম্ভ করেন। কিন্তু ইংরাজের প্রতি বিধাতা চিরকালই অনুকূল। পলাসী যুদ্ধের পর ইংরাজ বাঙ্গালার নবাবকে কাষ্ঠ পুত্তলিকা প্রায় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজের উৎসাহে মীর কাশেম দিল্লীশ্বর সম্রাট সাহা আলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সম্রাটকে পরাজিত করেন। এই স্থানে ইংরাজের বাণিজ্যকুটীতে বসিয়া সম্রাট সাহা আলাম মীর কাসেমকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া উক্ত মর্ম্মে একটী সনন্দ ও ইংরাজদিগকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চিটাগং প্রদান করেন।

মীর কাশেম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রাপ্ত হইয়া অধিক দিন ইংরাজদিগের মন যোগাইতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিবাদ উপস্থিত হইল—১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানেই নষ্টবুদ্ধি মীরকাশেমের আজ্ঞায় তদীয় ফরাসী সেনাপতি নিষ্ঠুর সমরু খাঁর (১) হস্তে ১৫০ জন ইংরাজ অতি নৃশংস ভাবে নিধন প্রাপ্ত হন।

(১) Abhiras, 10. Gardabhas, 16. Sakas, 8. yavanas, 14. Tusharas, Mundas and Maunas.—Eleph.

(১) "A morose Franco-German, named Walter Reinhardt, had deserted more than once from the English to the French and back again. He

"মানিক চাঁদের দীর্ঘিকা' নামে এখানে এক অতি বিস্তৃত পুষ্করিণী আছে। ইহা যে কত কালের ও ইহার খনন কর্ত্তাই বা কে তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালার সুর রাজাদের আদিপুরুষ আদিসুর কোনও বিশেষ যজ্ঞোপলক্ষে ইহা খনন করাইয়াছিলেন। কেহ কেহ সিরাজউদ্দৌলার দেওয়ান মানিক চাঁদকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলেন।

ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাঁকিপুর পাটনার সিভিলষ্টেশন বা সরকারী কার্য্যস্থল। এখানকার সরকারী আপিস, আদালত প্রভৃতি সমস্তই বাঁকীপুরে। এখানে "গ্যাসটিংফলি" (Gasting's Folly) নামে ১১০ ফিট উচ্চ ও উপরে উঠিবার ১৪০টী সোপান বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড শূন্য শস্যাগার অবস্থিত থাকিয়া ইহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা গ্যাসটিং সাহেবের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছে। বিহার ভূমিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের করাল কবল হইতে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে গ্যাসটিং সাহেব গবর্ণমেণ্টের বিপুল অর্থব্যয়ে এই 'গোলাঘর' নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। সেই জন্য অত্রস্থ লোকে ইহাকে 'গ্যাসটিং ফলি' বা গ্যাসটিং সাহেবের নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া থাকে।

বাঁকিপুরের পরপারে গঙ্গাতীরে হাজিপুর গ্রাম। এই হাজিপুরে কার্ত্তিক মাসের পুর্ণিমা তিথিতে এক অতি প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় ভারতের নানাদেশ হইতে বিবিধ পণ্য দ্রব্যের আমদানী হয়। তন্মধ্যে হয়, হস্তী, উষ্ট্র, গো, মহিষ প্রভৃতি পশুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রবাদ আছে পক্ষিরাজ গরুড় যে যুযুধান গজকুর্ম্মকে নৈমিষারণ্যে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করেন, এই স্থানেই তাহাদের দীর্ঘকাল-ব্যাপী তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি এই স্থানে "হরিহরদেবের' এক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই হরিহর দেবের নামানুসারে উল্লিখিত মেলা 'হরিহর-ছত্রের' মেলা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান পাটনাকে মোটামুটি চারি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রকৃত পাটনা সহর, দ্বিতীয় বাঁকীপুর বা পাটনার সরকারী কার্য্যস্থল (civil station), তৃতীয় দানাপুর বা পাটনার সেনানিবেশ (military station), ও চতুর্থ মারুগঞ্জ বা পাটনার বাণিজ্য স্থান (trading mart)।—

পাটনায় তিনটী বিশেষ অদ্ভুত প্রথা অভ্যাগত দর্শকের কৌতুহল বর্দ্ধন করিয়া থাকে। প্রথমতঃ পাটনার 'গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রথা।' এখানকার গৃহাবলীর অধিকাংশই কাষ্ঠময়। পাটনায় হিমালয়ের 'তরাই' প্রদেশ জাত শাল-কাষ্ঠ বরাবরই অতি অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্যই বোধ হয় এদেশে কাষ্ঠ গৃহ অধিক। অত্রস্থ লোকেরা ইষ্টকাদির পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ দ্বারাই গৃহের প্রাচীরাদি করিয়া 'খোলায়'

had re-enlisted in an English regiment under the name of Somers; but his comrades nicknamed him Sombre on account of his evil expression. Finally he had deserted to the service of Mir Kasim, and obtained the command of a brigade under the Hinduised name of Sumru"—Wheeler.

(1) "The Shahazada, i.e., the eldest son of the Emperor of Delhi, being appointed by his father (Awoangzeb Subahdar of Bengal, Behar and Orissa, came to Behar to establish his claim." Mr. Dutt.

গৃহছাদ আবৃত করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ— পাটনার 'বিবাহ প্রথা।' অত্রস্থ প্রকৃত অধিবাসীগণের পুত্র ও কন্যার বিবাহ কার্য্য কেবল মাঘ ও ফাল্গুন মাসেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বোধ হয় নাতিশীতোষ্ণ বসন্তকাল সর্ব্বতোভাবে পরিণয় ক্রিয়ার অনুকূল বলিয়া এই বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৃতীয়তঃ— পাটনার 'শবদাহ' প্রথা। গঙ্গার পরপার ভিন্ন প্রকৃত পাটনার লোকেরা কখনও মৃতদেহ দগ্ধ করে না। বোধহয় প্রাচীন মগধদেশ আর্য্যগণের পুণ্যভূমির সীমা বহির্ভূত ছিল বলিয়া অত্রস্থ হিন্দু অধিবাসীগণেরও মধ্যে এই অভিনব সৎকার পদ্ধতি বদ্ধমূল হইয়াছে।

পাটনা ষ্টেশনের সন্নিকটেই একস্থানে "অশোক-স্তূপ" নামে একটী প্রকাণ্ড মৃত্তিকা রাশি দৃষ্ট হয়। অত্রস্থ লোকে বলে পূর্ব্বে এস্থলে মহারাজ অশোকের প্রাসাদাদি ছিল, উক্ত মৃত্তিকা-স্তূপ সেই রাজপ্রাসাদেরই ধ্বংশাবশেষ মাত্র। সম্প্রতি ঐ স্তূপের উপর একটী মুলসমান 'দরগা' বিরাজ করিতেছে। নদী তীরে চকের মধ্যে "রামনারায়ণ দুর্গের" ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শাহজাদার (১) বিরুদ্ধে রামনারায়ণ এই দুর্গটীকে বহু কষ্টে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পাটনা সহরে দুইশত বৎসরের কোনও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বতন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র স্বরূপ পাটলিপুত্র বা পাটনা হইতে অধুনা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সকল চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির প্রায় সমস্তই হিন্দু দেবালয়রূপে পরিণত হইয়াছে। এস্থানে যে সকল দেবালয় সম্প্রতি বিরাজিত আছে, তন্মধ্যে "হরমন্দির" ও পাটনদেবীর মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পাটনা নগর শিখগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত মন্দিরদ্বয়ের প্রথমটী পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত; ইহাতে অদ্যাপি গুরুগোবিন্দের গ্রন্থ ও পাদুকাদ্বয় অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয়টীতে নগরের অধিষ্ঠাত্রী 'পাটনদেবী' কালীমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। শিখগুরু গুরুগোবিন্দ এই পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া এই নগর শিখসম্প্রদায়ের মহাপুণ্য তীর্থভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ, এক্ষণে ইহা শিখ ও মুসলমানের প্রধান সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ বলেন পাটনদেবীর নাম হইতেই বর্ত্তমান পাটনা নগরের নামকরণ হইয়াছে।

এখানে ইংরাজদিগের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণ ও হরিদ্রাবর্ণের প্রস্তর খণ্ড নির্ম্মিত ৩০ ফিট উচ্চ একটী সুন্দর স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। শুনিলাম সমরুখাঁর হস্তে যে ১৫০ জন ইংরাজ নিহত হইয়াছিলেন, সেই সকল নিহত ব্যক্তিগণের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ ইংরাজরাজ এই স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন।

পাটনার তৃতীয় বিভাগ দানাপুর পাটনার সেনানিবেশ। এই স্থানে ইংরাজ রাজের এক বিখ্যাত ব্যারিক আছে। তাহাতে অসংখ্য দেশী ও বিলাতী সৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে। দানাপুরের ব্যারিকে অনেক দেশীয় চর্ম্মকার বাস করে। তাহাদের নির্ম্মিত চর্ম্মপাদুকা বহুদিন স্থায়ী ও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্রই

প্রসিদ্ধ। দানাপুরের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর।

পাটনার চতুর্থ বিভাগ 'মারুগঞ্জ এখানকার প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখানে ব্যবসার মধ্যে গম, তিসি, প্রভৃতি শস্যের ব্যবসাই অধিক লাভজনক। কথিত আছে এক সময় এই মারুগঞ্জের গঙ্গাতীরে ১৭০০ বাণিজ্য তরী বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এক্ষণে রেলওয়ের কৃপায় জলপথ বাণিজ্য অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। পাটনার অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্র নিচয় চীন ও ভারতের সর্ব্বনাশের জন্য ভূরি ভূরি অহিফেন বিষ উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া ইংরাজ রাজের আয়পথ দিন দিন বর্দ্ধিত করিতেছে। আমাদের দেশে আজকাল প্রজার সহিত রাজার বোধ হয় অর্থ লইয়াই সম্বন্ধ। তাহা না হইলে উত্তরোত্তর এদেশে কতশত নরনারী এই অহিফেন বিষ সেবনে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, আর আমাদের প্রজাবৎসল রাজা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও অর্থের মুখপানে চাহিয়া সেই বিষ নিজহস্তে প্রজার মুখে তুলিয়া দিতেছেন কিরূপে? আবার এই অহিফেন বিষ এদেশে কত পরিমাণে জন্মাইল, চীন প্রভৃতি দেশের উচ্ছেদ সাধনের জন্য কত পরিমাণে রপ্তানি হইল, এ দেশীয় লোকেরাই বা কত পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া মৃত বা জীবন্মৃত হইল তাহা নিরূপণের জন্য বাঁকিপুরে 'অপিয়ম্ এজেন্সি' নামে এক বৃহৎ সরকারী কার্য্যালয় আছে।

পাটনা সহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে। ষ্টেশনে ক্ষণকাল থাকিয়া ট্রেন আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ—

সাংখ্যস্বরলিপি।

স্বরসন্ধ্যা-স্বরসন্ধি।

দিবানিশির সন্ধিকালে যেমন সন্ধ্যার উৎপত্তি হয় সেইরূপ দুই বা ততোধিক স্বরের সন্ধিকালে স্বরসন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। এই স্বরসন্ধ্যা সঙ্গীত রাজ্যে বড় কার্য্যকারী।

স্বরগুণন অর্থাৎ স্বরসন্ধিকালেই স্বরসন্ধ্যা জন্ম লাভ করে। স্বরগুণনেই স্বরের প্রকৃত সন্ধিস্থল বিরাজিত হয়।

আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ীও আমরা অতিরিক্ত ভাবে স্বরগুণনকে স্বরসন্ধীকরণ—স্বরগুণকে স্বরসন্ধি কহিতে পারি।

গুণ্যস্বর।

যে স্বরটীকে গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত করা যায় তাহাকে গুণ্যস্বর কহে।

গুণকস্বর।

যে স্বরের দ্বারা অপর কোন স্বরকে গুণ করা যায় তাহাকে গুণকস্বর কহে।

ফলস্বর।

একটি স্বরকে অপর কোন স্বর দিয়া গুণ করিলে যে ফল হইবে তাহাকে স্বরগুণফল বা গুণফলস্বর কহা যায়। এমন কি শুধু ফলস্বর কহা যাইতেও পারে।

বর্গস্বর।

গুণ্য ও গুণকস্বর সর্ব্বতোভাবে সমান হইলে তাঁহাদের গুণফলকে বর্গস্বর কহে। যথা সা × সা = সা^{২}

যুক্তস্বর।

হসন্তমাত্রিক ও মুখ্যস্বর যুক্ত হইলে তাঁহাদের যোগফলকে যুক্তস্বর কহে। যথা স্মা বা স্মা। গ্মা বা গ্মা। ম্পা বা ম্পা।

স্বররাজ্যে যোগ।

স্বররাজ্যে যোগ সাধারণ সম্পত্তি। বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল স্বরসমূহ নানারূপে যুক্ত হইয়া সঙ্গীত রাজ্যে মহাকার্য্য করিতেছে। ছেদ-যোগ, টান-যোগ, খণ্ডযোগ, গুণযোগ প্রভৃতি নানা প্রকার যোগসাধনের দ্বারা স্বর সকল সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

ছেদযোগ।

ছেদযোগই স্বররাজ্যে সাধারণ ও স্বাভাবিক যোগ। ইহা সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত স্বরসমূহের ছিন্নপ্রাণকে সাধারণ যোগ-সূত্রে আবদ্ধ করে।

টানযোগ।

দুই বা ততোধিক একই স্বর পর-পর থাকিয়া যদি মিলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের সেই মিলনকে অথবা যখন একটি স্বর পর-পর স্বর সমূহকে পরে-পরে বা ক্রমে ক্রমে স্বীয় করিয়া লয় তখন সেই স্বরের স্বী-করণকে, অথবা যখন কোন একটি স্বর পরবর্ত্তী মাত্রা সমূহে স্বীয় স্বরপ্রবাহ বিশেষরূপে যোগ করিয়া দেয় তখন স্বরের সেই যোগকে স্বরের বিশেষ যোগফল বা টানফল অথবা বিশেষ যোগ বা টান কহা যায়।

খণ্ডযোগ।

যখন একটি স্বর হসন্তমাত্রিক ভাবে যাইয়া অপর একটি মুখ্য স্বরকে আলিঙ্গন বা স্পর্শ করে তখন সেই যে যোগ তাহাকে স্বরের খণ্ড মাত্রিক বা হসন্তমাত্রিক অথবা সংক্ষেপে খণ্ড বা হসন্তযোগ কহা যায়।

গুণযোগ।

যখন দুইটি স্বরগুণ বা স্বরধর্ম্ম যুগপৎ যুক্ত হইয়া যায় তখন তাহাদের সেই যে যুগপৎযোগ (বা যুগ্ম বা যুগলযোগ) তাহাকে স্বরগুণযোগ বা স্বরগুণন কহা যায়।

যোগচিহ্ন।

ছেদ্ যোগের চিহ্ন = (—) বা (') বা (পরিমিত বা নিয়মিত ব্যবধান)। পূর্ব্বে এই ছেদযোগের চিহ্ন ও টান যোগের চিহ্ন তেমন বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই এখন ভিন্ন ভিন্ন যোগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপ ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া দেওয়া হইল।

এই ছেদযোগ চিহ্নকে যোগাত্মক বিয়োগ চিহ্ন বা সাধারণতঃ সংক্ষেপে গৌণভাবে স্বর বিয়োগ চিহ্নও কহিতে পারা যায়।

টানযোগের চিহ্ন = (+) শুদ্ধ যোগচিহ্ন রহিল। কারণ টানযোগটী শুদ্ধ-যোগচিহ্ন। এই শুদ্ধ যোগচিহ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় ইহা কিরূপ অর্থব্যঞ্জক; ইহা যেন ছেদযোগের উপর বিরক্ত হইয়া ছেদযোগের ছেদটি কর্ত্তন করিতেছে—যোগের ছেদশনির উপর অশনি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদটুকুর হীনতা জাগাইয়া পর পর শুদ্ধযোগ রক্ষা করিতেছে। এই কারণে এই শুদ্ধ যোগচিহ্নকে সংস্কৃত ব্যাকরণের বজ্রচিহ্ন নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে।

খণ্ড যোগের চিহ্ন = লুপ্তস্বরের সহিত হসন্ত চিহ্ন।

গুণযোগ বা গুণনের চিহ্ন = (×) এই চিহ্নটি গুণনের প্রথম ও প্রধান চিহ্ন। এই চিহ্নের ভাব যেন যুগপৎ পরস্পরের আলিঙ্গন বা স্পর্শ ভাব।

ছেদযোগে স্বরের অবস্থা।

ছেদযোগে স্বর সকল কেমন পর পর মধুর ভাবে এবং যেন ঈষৎ কম্পিত আন্দোলিত বা তরঙ্গায়িত ভাবে চলিয়া যায়। একই স্বরের ছেদযোগে স্বর সকলের গতিভাব প্রায় টানা ভাবের কাছাকাছি যায় সেই কারণে একই স্বরের বেলায় ছেদযোগ যেন টানা ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া প্রায় অনেক সময় কেমন অনায়াসে তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে।

নদীর জল যখন মৃদু তরঙ্গায়িত বা মৃদু কম্পিত থাকে তখন আমরা যেমন সচরাচর তাহাকে প্রায় স্থিরই বলিয়া থাকি, তাহার সেই মৃদু সরল কম্পিত ভাব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না সেইরূপ একই স্বরের ছেদযোগে মৃদুকম্পন বা মৃদুতরঙ্গ তাহাদের টানাভাবের তেমন ক্ষতিকর নহে প্রত্যুত অনেক সময়ে টানা ভাবের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য-উদ্রেককারী হয়।

(আশ চিহ্ন।)

একাক্ষর বা একাঘাতের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া স্বর সমূহ প্রকাশ করিবার সময় আশ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই একাক্ষর বা একাঘাতের স্বর সমূহের বন্ধনেই যাহা আশের বিশেষত্ব, তাহা না হইলে আশের আর কি আবশ্যক? সাংখ্যস্বরলিপির ছেদযোগেই আশের যোগাত্মক বিয়োগ ভাবের কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়া যায়। একাক্ষর বা একঘাতের আকর্ষণে স্বর সমূহকে আকৃষ্ট রাখিবার জন্য আশের চিহ্নের যথার্থ আবশ্যক তাই আশের জন্য পুনরায় বিশেষ চিহ্ন করা গেল :— তাহা আশের পূর্ব্বের চিহ্ন কসি চিহ্নই কেবল প্রভেদ, এখন তাহা আকার ক সি (অর্থাৎ সমতল ভাবে স্থাপিত আকার); ইহাতে সুবিধাই হইল—ইহা আরও আশব্যঞ্জক হইল। কিন্তু গানের বেলায় গানের সঙ্গে সঙ্গে কথা থাকিলে কথার অক্ষর—স্বরবর্ণ ও তাহার মাত্রাবিন্দু সমূহের দ্বারাই বস্তুতঃ আশের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং সেস্থলে আশের চিহ্ন না দিলেও চলে।

আশের অতিরিক্ত চিহ্ন ⌣ বা ⌢ অর্থাৎ ন্যুব্জ বা কুব্জ বন্ধনী চিহ্ন রহিল।

ঘনস্বর।

যখন তিনটী সর্ব্বতোভাবে তুল্যস্বর, গুণিত হয়, তখন তাহাদের সেই গুণফলকে ঘনস্বর

করে। ঘনস্বরের চিহ্ন = স্বরের ঠিক পার্শ্বে ঈশানকোণে তিন সংখ্যা। কিম্বা স্বরের ঠিক পার্শ্বে তিন সংখ্যার উপরে বিন্দু বা ফুটকি। যথা সা৩= সা৩ = সা × সা × সা।

আবৃত্তির একটি চিহ্ন।

গানের কোন অংশ একবার আবৃত্তি করিতে অর্থাৎ গাহিতে ইচ্ছা করিলে সাংখ্যস্বরলিপিতে তাহাকে ইংরাজী "আই" চিহ্নের দ্বারা দুইপার্শ্বে বেষ্টন করিতে হইবে। দুইবার আবৃত্তি লিখিতে ইচ্ছা করিলে জোড়া আইয়ের দ্বারা আবৃত্তাংশটী বেষ্টিত করিতে হইবে।

স্বরবিন্দু।

হসন্তস্বরই প্রকৃতপক্ষে স্বরবিন্দুর ভাব ধারণ করে।

স্বররেখা।

খণ্ডমাত্রিক স্বর স্বররেখার ভাব ধারণ করে।

যতিযুক্ত স্বর।

যে স্বর যতিযুক্ত হইবে সেই স্বরকে ভিন্নরূপে লিখিতে গেলে তাহার মাথায় বা নিম্নে য না লিখিয়া স্বরের গায়ে যফলা (্য) চিহ্নিত করিয়াও দিতে পারা যায়। যথা স্যা বা স্য্য।

বলযুক্ত স্বর।

যে স্বর বলযুক্ত হইবে সেই স্বরকে ভিন্নরূপে লিখিতে গেলে তাহার মাথায় বা নিম্নে ব না লিখিয়া স্বরের গাত্র ব চিহ্নিত অর্থাৎ 'সয়ে বয়ে' করিয়াও দিতে পারা যায়। যথা স্বা।

মুখে উচ্চারণের সুবিধার্থে সপ্তক লিখনের নূতনরূপ অক্ষর সজ্জা।

সপ্তক লিখিবার কালে স্বরের মাথায় সপ্তকের চিহ্নসংখ্যা না লিখিয়া পার্শ্বে আরেক সজ্জায় লিখিতে পারা যায়। ঐ প্রকারে সপ্তক লিখিলে তাহা যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে সেইরূপ ভাবেই সংক্ষেপে মুখে উচ্চারণ করিয়া প্রকাশ করা যায়। ঐ প্রকার সজ্জা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি কথার বৈয়াকরণিক (মুখ্যতঃ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণানুযায়ী) সংক্ষেপ প্রী দ্বী ত্রী প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্ত হয়। সংক্ষেপ সকল, সাত স্বরের ন্যায় সপ্তম পর্য্যন্ত দেওয়া হইল। যথা প্রী, দ্বী, ত্রী, চী, পী, ষী প্তী।

সপ্তকের বেলায় ইহাদিগকে অনুস্বারযুক্ত বা অনুস্বারিত করিয়া লিখিতে হইবে। আর উচ্চ সপ্তকের বেলায় দীর্ঘ ঈ চিহ্ন (ী) এবং নিম্ন সপ্তকের বেলায় হ্রস্ব ই চিহ্ন (ি) থাকিবে যথ সাদ্বীং=ই সা২ সাদ্বিং=সা২।

এই সপ্তম পর্য্যন্তই যথেষ্ট, কারণ অধুনাকালে বাদ্যযন্ত্রে উচ্চে সপ্তক প্রায় পঞ্চম গ্রাম পর্যন্ত আর নিম্নে প্রায় চতুর্থ গ্রামপর্য্যন্ত থাকে। ইহার পরে আধুনিক যন্ত্রে আর আবশ্যক হয় না এবং হয়ও নাই। যদি ভবিষ্যতে আরও এরূপ উন্নত যন্ত্র বাহির হয় যে যদ্দ্বারা আরও উচ্চ বা নিম্ন সপ্তক প্রকাশ করিতে পারা যায় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ধাঁচে অক্ষরের পরিবর্ত্তে অঙ্ক সংখ্যা, নিম্ন সপ্তকের বেলায় (ি) এবং উচ্চ সপ্তকের বেলায় (ী) যুক্ত করিয়া এবং অনুস্বারিত ও সুবিধানুসারে বর্ণমাত্রাযুক্ত বা অযুক্ত করিয়া

৩ ৩
রাখিলেই চলিবে। যথা সাতীং = সা সাতিং = সা।

সপ্তকের এইরূপ সংক্ষেপ সমূহ কেন অনুস্বারিত করিলাম? কারণ সপ্তকের বেলায় স্বরই প্রকৃত মুখ্য বিষয়। তাই স্বরের অনুসারী চিহ্ন সাজ্যাতিক স্বরে ঠিক অনুভাব প্রমানকে চিহ্ন যে অনুস্বার তাহা সপ্তকের বেলায় যুক্ত করা গেল।

নূতনরূপ সজ্জায় মাত্রার লিখন।

পূর্ব্বোক্ত সপ্তকের নূতনরূপ সজ্জায় প্রায় সজ্জিত করিয়া মাত্রাও লিখিতে পারা যায় কেবল সপ্তকের সজ্জার সহিত মাত্রার সজ্জার প্রভেদ এই যে "অনুস্বারটী বাদ দিতে হয়।" যথা উচ্চ দ্বিতীয় সপ্তকের সা = সা২ = সাদ্বীং = সাহীং। দীর্ঘমাত্রিক সা = ২সা = সাদ্বী = সাহী।

নিম্ন দ্বিতীয় সপ্তকের সা = সা২ = সাদ্বিং = সাহিং। হ্রস্বমাত্রিক সা = সা ½ = সাহি।

দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রা।

দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রার ভাব নিম্নলিখিতরূপ ;—
দীর্ঘ মাত্রার ভাব এই তাহা মাত্রা সংখ্যা দ্বারা শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় গুণিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয় যথা সা২ = সা × ২।

হ্রস্ব মাত্রার ভাব এই তাহা মাত্রা সংখ্যার দ্বারা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যথা সা ½ = সা ÷ ২।

জয়দেবের গান।

গীতং। ১।

মালবগৌড়রাগেন রূপকতালেন চ গীয়তে।

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয়জগদীশ হরে।১। ধ্রুবং
ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণ চক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয়জগদীশ হরে। ২।
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে। ৩।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে। ৪।
ছলয়সিবিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীর জনিত জন পাবন
কেশব ধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে। ৫।
ক্ষত্রিয় রুধির ময়ে জগদপগত পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব তাপং।
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।৬
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কথনীয়ং
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃত রাম শরীর জয়জগদীশ হরে। ৭।
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভং।
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে। ৮।
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে। ৯।
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃতকল্কি শরীর জয় জগদীশ হরে।১০
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে। ১১।

তালি । ১ । ২ । ০ঃ (স্থা, ক্র, স্ত), ॥
মাত্রা । ২ । ২ । ৩
স্থাঃ সা সা২ । নি ধা । পা২ । ম্পা২ পা ।
২...............
স্থাঃ প্র ণ । য় — । প । য়ো ধি ।
গা২ । গা২ । পা পা২ । নি সা । রে
...
জ । লে । ধৃ ত । বা — । ন
রে । রে রে রে১/২ সা১/২ । সা২ । সা১ । রে৩
সি । বে — — — । দং । — । বি
। মা পা । ধা নিঁ ধা পা২ । রে২ ।
। হি — । ত — । ব — । হি
। রে২ । র্পা৩ । সা২ । সা২ । গা পা
। ত্র । চ । রি । ত্র । ম —
গা । রেঁ২ । সা২ । স্পা২ গা । স্রেঁ২ ।
— । খে । দং । চ — । রি ।
সা২ । গা পা গা । স্রেঁ২ । সা২ । (ক্র)ঃ-
ত্র । ম — — । খে । দং । (ক্র)ঃ-
২.........
। গা৩ । পা মাঁ । ধা পা । পসা৩ ।+
। কে । শ — । ব — । — ।
... ... ২... ..
সা২ । সা সা । স্রেঁ২ সা২ নি১/২ । সা২ ।
— । ধূ ত । মী — — । — ।
নি১/২ ধা১/২ নি । ধপা৩ । বা ধমা২ পা । পা২
ন — শ । রী । বা রী — । র
।+ পা পা । পধা৩ । মা২ । পা২ । গা২
। — জ । য় । জ । গ । দী
গা১/২ রেঁ১/২ । গা২ । রেঁ২ । সা৩ ।+ সা২ ।+
— — । শ । হ । রে । — ।
সা২ ।
— ।
(স্ত)ঃ- গা গা মা । পা২ । পা । পধা পা পা
ক্ষি তি — । র । তি । বি পু ল
২.........
। গা মা পা২ । পা ধা২ । ধসা সা ।
। ত — রে । তি — । ষ্ঠ তি ০ ০ ।

পেঁড়োর মন্দির।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জুমিলা সুফিউদ্দীনের আজ্ঞানুসারে তাঁহার দরবারে সমবেত সেনানী মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মুসলমানেরা এতদিন যে কুর্বন খাঁকে যমদূতের ন্যায় বোধ করিত, কিন্তু এখন মুসলমান নবাবের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া যিনি তাহাদিগের প্রীতিদৃষ্টির বিষয় হইয়াছেন, সেই কুর্বন খাঁও জুমিলার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। ক্রমে যথাসময়ে সেনাপতি দরবারে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং পাণ্ডুরাজার দুর্গাভ্যন্তরে জুমিলা কি কি করিয়াছিলেন এবং কি উপায়ে পাণ্ডুরাজার পরাজয় হইতে পারে এই সম্বন্ধে জুমিলাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। জুমিলা নিজে দুর্গমধ্যে কিরূপ উপায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেখানে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন "হুজুর, আমার নিজের কথা আমি সমস্তই বলিয়াছি, কিন্তু কি উপায়ে পাণ্ডুয়া দুর্গ আমাদিগের হস্তগত হইতে পারে, তাহা কুর্বনখাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন; যদিও তিনি এখনও আমাকে সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, এখন নিশ্চয়ই সমস্ত বলিবেন, কারণ তাহার পুরস্কার স্বরূপে অধিক কি বলিব, আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিবার অঙ্গীকার করিতেছি।" জুমিলা এইরূপে ইঙ্গিতে জানাইয়া রাখিলেন যে, কুর্বন খাঁ তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেই তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন।

সুফিউদ্দীন হাসিতে হাসিতে বলিলেন "জুমিলা, তুমি এত শীঘ্রই কি সেই সিংহপরাক্রম বাবরকে ভুলিয়া গেলে?"

এই কথা শুনিয়া জুমিলার কপোলদ্বয় লজ্জায় আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। জুমিলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিলেন "বাবরকে—না, তাঁহাকে আমি ভুলি নাই, এবং কখনও যে ভুলিতে পারিব, সে আশাও নাই। কিন্তু তাঁহার যে সকল সদ্‌গুণে আমার হৃদয় বশীভূত হইয়াছিল, কুর্বন খাঁর মধ্যেও তাহার সকলই রহিয়াছে দেখিতেছি। তবে দুইজনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আমি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও বাবরের পাষাণহৃদয় গলাইতে সমর্থ হই নাই, আর কুর্বন আমার প্রদত্ত শৃঙ্খল সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। আমি যেমন বাবরের জন্য আমার সকলই ত্যাগ করিয়াছি, কুর্বনও সেইরূপ আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তবে প্রভু, এখন বিবেচনা করুন, আমার হৃদয়ে কাহার ন্যায্য অধিকার:—

জুমিলার কথা শেষ হইতে না হইতে সুফিউদ্দীন তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "থাক্ থাক্, ও কথা থাক্; ইহাই যথেষ্ট যে, কুর্বন খাঁকে গ্রহণ করিবার জন্য তোমার ইচ্ছা হইয়াছে। আর আমিও মৃত ব্যক্তির জন্য বৃথা কতকগুলা হা হুতাশ করা সঙ্গত মনে করি না। কুর্বন যেরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন আর আমাদের সহিত ভদ্র মুসলমানের উপযুক্ত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তোমার অনুপযুক্ত পাত্র

হইবেন না। বিশেষ, তুমিও ইহাঁকে একপ্রকার কথা দিয়াছ; এখন একথা যেন কেহ বলিতে না পারে যে, এক মুসলমান রমণী আপনার কথা রাখিতে পারে নাই। তুমিই প্রথমে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছ যে, কুর্বনখাঁ আজন্মকাল আমাদিগেরই ধর্ম্মভ্রাতা; এখন যে আমাদের সেই ভ্রাতা একটী মুসলমান রমণীর প্রতিশ্রুত প্রেম-লাভে বঞ্চিত হইবেন ইহা দেখিতে না হয়। কুর্বন যখন স্বেচ্ছায় তোমার হাতে বন্দী হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে তোমার প্রেমদানে বঞ্চিত করিয়া হত্যা করিলে বাস্তবিকই অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা হইবে এবং লোকেও তোমার নিন্দাবাদ করিবে। পূর্ব্বে কুর্বন রামভদ্ররূপে কাফের থাকিয়া যেরূপ শত্রুনিপাত করিতেছিলেন, সেই রূপ যদি এখনও—অধিক কি বলিব, মুসলমান সৈন্যও নিহত করিতে করিতে কুর্বন যদি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন, তাহাও আমি তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিব। কিন্তু কুর্বনের ন্যায় বীরপুরুষ যে এক মুসলমান রমণীর প্রেম-লাভে নিরাশ হইয়া, নিজের গুণসকল হারাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘরের কোণে জীবনত্যাগ করিবেন, আমি—কেবল আমি কেন, কোন ভদ্রলোকেই তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না। আর আমি তোমাকে বেশী কিছু বলিয়া বিরক্ত করিতে চাহি না, কেবল এই টুকু বলি যে তুমি তোমার সাধু হৃদয়ের উপদেশমত চল। আর আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে, কুর্বন তোমার হৃদয়ের অনেকটা দূর পর্য্যন্ত বিদ্ধ করেছেন এবং কুর্বনও যেমন তোমার বন্দী হয়ে আছেন, তুমিও তেমনি তাঁর বন্দী হয়ে আছ।”

সেনাপতি এই সকল কথা বলিয়া চুপ করিতে না করিতেই সভার মধ্যে মহাগোলমালের সঙ্গে একটা বাহবাধ্বনি পড়িয়া গেল। তার পরে যখন সভ্যগণ একটু স্থির হইলেন, তখন তাঁহাদের আপনাদের মধ্যে বলাবলি হইতে লাগিল যে, এত-দিন যে জুমিলা আহার নিদ্রা ভুলিয়া বাবরের প্রতি অনুরক্ত ছিল, যে ঘর দুয়ার ছাড়িয়া স্ত্রীলোক হইয়াও পুরুষের বেশে কেবল এক বাবরের জন্য যুদ্ধশিবিরের আনুসঙ্গিক সমস্ত কষ্ট সহ্য করিল, আজ সেই জুমিলা বাবরের মৃত্যুর পর, দিন কয়েক যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আর এক জনের প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইতে পারে। সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল যে, কুর্বন খাঁকে মায়াজালে বাঁধিয়া জুমিলা নিজের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই এত প্রণয়ের ছলনা দেখা-ইতেছে মাত্র। কিন্তু আসলে তাঁহারা জুমিলার চরিত্র ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। জুমিলার চরিত্র অতি বিচিত্র। এরূপ চরিত্র আমরা কল্পনাচক্ষে অনেক দেখিলেও দেখিতে পারি, কিন্তু সংসারে ইহার জীবন্ত প্রতিকৃতি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষেরা যেরূপ স্ত্রীলোকের কোমলতা প্রভৃতি নারীসুলভ গুণ সকল দেখিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ সাহস, বল প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেই ভালবাসা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু জুমিলা এই বিষয়ে স্বাভাবিকতাকে ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতায় গিয়া পড়িয়াছিলেন। বাবর সুন্দর কি কুৎসিত, সে বিষয়ে লক্ষ্য করা জুমিলার তত প্রয়োজন ছিল না। জুমিলা বাবরকে কেবল মাত্র তাঁহার সাহসের জন্যই

ভাল বাসিতেন। বাবর সহস্র সুন্দর হইলেও তাঁহার সাহস যদি না থাকিত, তবে তাঁহার সৌন্দর্য্যের দিকে, বোধ হয়, জুমিলা একটী বারও ফিরিয়া চাহিতেন না। মুসলমান শিবিরে বাবরের অপেক্ষা সুন্দর অনেক ব্যক্তি ছিল, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সাহসিক কেহই ছিল না, এই কারণে বাবরই জুমিলার একমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর জুমিলা দেখিলেন যে, এখন একমাত্র কুর্বনই (ভূতপূর্ব্ব রামভদ্র) তাঁহার সহিত সাহসে ও সৌন্দর্য্যে সমকক্ষ; এমন কি, অনেকেই বলিত যে, কুর্বন বাবর অপেক্ষা উভয় বিষয়েই বরঞ্চ শ্রেষ্ঠতর। হিন্দু সেনাপতিদিগের মধ্যে কেবল যে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিক ছিলেন তাহা নহে, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পুরুষও ছিলেন। যাই হৌক্, কুর্বন অন্ততঃ বাবরের অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহেন, এই কারণেই তিনি জুমিলার অনুরাগপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। না হইবেই বা কেন, একেতো বাবর জীবিত নাই, তাহার উপর বাবর জুমিলার প্রীতির প্রতিদান দেন নাই, কিন্তু কুর্বন স্বেচ্ছাতেই তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছেন। বাবরের মৃত্যুর পর জুমিলার হৃদয়-প্রীতি রাখিবার একটী আধার অন্বেষণ করিতেছিল। ইত্যবসরে কুর্বন খাঁকে উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই সেই প্রীতি স্থাপিত হইল। এখন কুর্বনের মুখই জুমিলার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। এতদিন কুর্বন কাফেরসেনাপতি ছিলেন, অসংখ্য মুসলমান সৈন্য হত্যা করিতেছিলেন বলিয়াই জুমিলার বিবাহের আপত্তি ছিল, কিন্তু এখন তিনি মুসলমান হওয়াতে তাঁহার আর কোন আপত্তি রহিল না। ইহার উপরেও আবার জুমিলার পাণ্ডুরাজার দুর্গাভ্যন্তরে ছদ্মবেশে অবস্থান কালে তাঁহার অন্তঃপুরের বৃদ্ধা দাসীর নিকট যখন জানিতে পারিলেন যে, কুর্বন কেবল মুসলমানের সন্তান নহে, জুমিলার অতি নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতিও বটে,—এই অবস্থায় যে বাবরের মৃত্যুতে জুমিলার শূন্য হৃদয়, সহজেই কুর্বনের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কুর্বন যে, জুমিলার হৃদয় জয় করিবার উপযুক্ত পাত্র সে বিষয়ে কাহারই সন্দেহ ছিল না; কিন্তু জুমিলা যে সরল অন্তঃকরণে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মুসলমান সেনানীদিগের অনেকেই তাঁহাদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ শ্মশ্রু দোলায়মান করিতে করিতে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে বাবর এক সময়ে জুমিলার ইষ্ট দেবতা ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে যে জুমিলা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িবেন, তিনি সে ধাতুতে গঠিত হন নাই। তাঁহার হৃদয়ের সেই মুক্তভাব ও সাহস কিছুই কমে নাই; বরঞ্চ বাবরের মৃত্যুর পর হইতে তিনি কেমন যেন আর একটু নির্ভীক ও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। সমস্ত মুসলমান সৈন্যদলকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, জুমিলা না থাকিলে পাণ্ডুয়ার দুর্গ জয় করা অসম্ভব হইত। যাই হৌক্ সেনাপতি কুর্বন খাঁ ও জুমিলা উভয়েরই প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সকল কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা উভয়ে মস্ত এক সেলাম ঠুকিলেন এবং কুর্বন খাঁ তাঁহার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশে সুবিখ্যাত গজপতিবংশ রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের প্রতাপ সমস্ত বঙ্গদেশে, এমন কি দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই গজপতিবংশীয় লঙ্গুরদেব নামক রাজা যখন রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে এই পাণ্ডুয়া গ্রামে গণেশজী নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তখন এই গ্রামের এই দুর্গ, এই প্রাসাদ, এই সকলের কিছুই ছিল না—ইহা কেবল সামান্য একখানি গ্রাম মাত্র ছিল। এখানে ওখানে দুএকখানি কুটীর ছিল। এই পাণ্ডুয়াদুর্গ লইতে এখন সহজে কেহ অগ্রসর হয় না; এমন কি, দেখুন না কেন, আপনার এই বীর-সহচরগণও এ পর্য্যন্ত ইহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারিলেন না। কিন্তু তখন ইহার অস্তিত্বও পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিখানি গ্রামের লোক জানিত মাত্র।

সকলেই জানেন যে, জগন্নাথক্ষেত্র কেবল উড়িষ্যা প্রদেশের নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থক্ষেত্রে বাৎসরিক মহোৎসবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এখন, পাণ্ডুয়াবাসী ব্রাহ্মণ সেই গণেশজীও প্রতিবৎসর জগন্নাথের পূজা দিতে যাইত। জগন্নাথক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীরা পূজা দিবার পর ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইয়া গেলে তাহারই প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। গণেশজীকেও তাহার পুরোহিত সেই প্রসাদ আনিয়া দিত। এইরূপে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এক বৎসর, গণেশজী ঐরূপ পূজা দিয়া প্রসাদের জন্য বসিয়া আছে, এমন সময় তাহার পুরোহিত ঠাকুর প্রসাদ আনিয়া গণেশজীর হাতে দিয়া বলিল "পাঁড়েজী, জগন্নাথ তোমার পূজা গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি আমার মুখ দিয়া তোমাকে এই বর দিতেছেন যে, তোমা হইতে সর্ব্ব বিষয়ে প্রসিদ্ধ এক রাজবংশ অবতীর্ণ হইবে। তাহারা উত্তরোত্তর ধনে, মানে যুদ্ধকৌশলে সর্ব্ববিষয়ে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিবে। তাহাদের নাম পৃথিবীময় ধ্বনিত হইতে থাকিবে। তাহাদের দুর্গে শত্রুগণ একটী পদচিহ্নমাত্র অঙ্কিত করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই রাজবংশ একটী স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য ও চাতুরী দ্বারা একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব দেখ, যেন তোমার বংশে কেহ কখনও স্ত্রীলোকের রূপমোহে পতিত না হয়, এইরূপ বংশানুক্রমে উপদেশ করিয়া যাইবে, এখন গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার মঙ্গল হউক।"

গণেশজী তাহার পুরোহিতের কথায় তত বিশেষমনোযোগ দেয় নাই। এমন তো হইয়াই থাকে যে, পুরোহিতেরা কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় যজমানকে তাহার মনোরঞ্জক নানা কথা বলিয়া থাকে। গণেশও হয়ত এইরূপ কোন কিছু ভাবিয়া তত মনোযোগ দেয় নাই। মনোযোগ না দিলেও, পুরুত ঠাকুর কি এক রকম চোখ করিয়া এত বড় বড় সুরে কথাগুলি বলিয়াছিল যে, সেগুলি একেবারে গণেশের কাণ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই; কতকগুলি কথা কাণের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া বুকের ভিতরে রক্তের সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক তোলাপাড়া খাচ্ছিল। তার পর গণেশজী তাহার সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, পুরুত ঠাকুর যখন তাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিল সেই সময় তাহার মুখে

তাহারা কিছু অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়াছিল কি না। তাহারা বলিল যে, এমন বিশেষ কোন নূতন ভাব দেখে নাই; তবে, তাহারা তাহাকে চিরকাল যেরূপ দেখিয়াছে, আজও সেইরূপই দেখিয়াছিল। গণেশ যেন সকলই ইন্দ্রজালের মত দেখিতে লাগিল, কিছুই যেন বুঝিতে পারিল না, কেবল বুকের মধ্যে একটা গভীর চিন্তাভার লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন, গণেশজী তাহার গৃহের চৌকাঠে পদার্পণ করিতে না করিতে দেখে যে, তাহার স্ত্রী আপনার বুকে একটী শিশুকে কেলিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। এই ছেলেটী গণেশ বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল। গণেশজী তখন তাহার সমুদয় চিন্তা ভুলিয়া গিয়া ছেলেটীকে দুহাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার কপালে একটী দীর্ঘ চুম্বন দিতে যাইতেছিল—হঠাৎ কেন কে জানে, চমকিয়া উঠিল; গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেমন শরীর কাঁপিয়া উঠে, সেইরূপ তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম দরদর-ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গণেশ এতদিন পরে বাড়ী ফিরিল যদি তো এই এক মহাবিপদ আসিল। কাজেই পরিবারস্থ সমস্ত লোক এবং প্রতিবাসীরা আসিয়া যে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে তাহার স্ত্রী যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠিত-নয়নে স্বামীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এসকল কথা বলাই বাহুল্য। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে গণেশের স্ত্রী আর থাকিতে না পারিয়া কাতর-কণ্ঠে গণেশকে তাহার হৃদয়ের এরূপ ব্যাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সেকেলে ব্রাহ্মণের মত গণেশও এক আধটু সামুদ্রিক বিদ্যা জানিত। গণেশ তাহার স্ত্রীর কথার উত্তর দিবে কি, সেই সময় তাহার চোখ ছেলেটীর কপালের দিকে পড়াতে দেখিল যে, ভবিষ্যতে তাহার রাজা হইবার বিষয় কপালে স্পষ্ট লেখা আছে।

গণেশের পক্ষে এই সকল বিষয় এতই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে, তাহারই ভারে সে স্তব্ধ হইয়া গেল; সেই সকল বিষয় সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না এবং ইহাতে তাহার হৃদয়ে যে কি এক ভাবের আবেগ আসিয়াছিল তাহাও কাহাকে জানাইল না। কিন্তু এইরূপ ভবিষ্যৎ জানিতে পারাই তাহার পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল ব্যাপারে তাহার হৃদয় এতটা সংক্ষুভিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাহার কার্য্যে ও আচরণে উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই উন্মত্ত অবস্থায় মাটির ময়ূর গড়িয়া তাহাকে কথা বলিতে আদেশ করা, তাহাকে আদর করা প্রভৃতি তাহার একটী দৈনিক কার্য্য ছিল। প্রথম প্রথম পাড়াপ্রতিবাসী লোকেরা গণেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত; কিন্তু ক্রমে সচরাচর পাগলের ভাগ্যে যাহা ঘটে, গণেশের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল—গ্রামের সকল লোকে মিলিয়া তাহাকে

লইয়া উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, সহসা এক দিন গভীর রাত্রে সমস্ত গ্রাম চমকিতভাবে শুনিল যে, পাঁড়ের গৃহ হইতে এক ময়ূর অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। সকলেই কারণ জানিতে উৎসুক হইলেও অতরাত্রে কেহই আর সাহস করিয়া গণেশের গৃহে যাইতে পারিল না—সকলেই মনে মনে ভাবিয়া রহিল যে, কল্য প্রত্যুষেই ইহার কারণ জানিতে হইবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতেও সেই ময়ূরের ডাকার বিরাম ছিল না। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দলে দলে গণেশজীর গৃহে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া অবাক্—গতকল্য রাত্রে গণেশ যে মাটির ময়ূর গড়িয়া রাখিয়াছে, সেই ময়ূর তাহার বড় বড় ঠোঁট দুটো ফাঁক করিয়া মহাচীৎকার লাগাইয়াছে এবং তাহার নিকটেই গণেশের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সকলেই খানিকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে সকলে পরামর্শ করিয়া গ্রামের মণ্ডলদিগকে ডাকাইয়া আনিল। সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল; কেবল তাহাদের মধ্যে একজন কিছু দৈবশক্তি-সম্পন্ন ছিল। সে একবার ময়ূরের দিকে, একবার গণেশের মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'তোমরা কি এখনও ইহার রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলে না,—এই ময়ূরের ভিতর জগন্নাথদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন; তোমরা সকলে মিলিয়া একটা সোণার ঝাঁপা ময়ূর গড়াইয়া তাহারই ভিতর ইহাকে স্থাপিত কর। গণেশের পরিবার এবং প্রতিবাসী সকলে ইহার পূজা দিক্, তাহা হইলে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

এই কথাগুলি বলিয়া শেষ করিতে না করিতেই তাহার শরীর বিদ্যুৎ-তাড়িতের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার মৃতদেহ ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। ময়ূরের চীৎকার আরও বিষম বাড়িয়া উঠিল—চীৎকার আর কিছুতেই থামে না। অবশেষে যখন সকলে চাঁদা তুলিয়া এক স্বর্ণকারের নিকট হইতে একটা সোনার ফাঁপা ময়ূর গড়াইয়া তাহারই ভিতর সেই মাটির ময়ূরকে রাখিয়া দিল, সেই ময়ূর চীৎকার করিতে বিরত হইল। কুর্ব্বন সেনাপতিকে পাণ্ডুয়াদুর্গের উপরিস্থিত সুবর্ণ ময়ূর দেখাইয়া বলিয়া দিল যে, পাঁড়ের মৃত্যুর কারণ সেই ময়ূরই—দুর্গোপরিস্থিত ঐ ময়ূর।

এখন, গ্রামের ঐ ময়ূর যত্ন পূর্ব্বক রাখিবার পর কত কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সুফিউদ্দীন পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, অথবা তিনি তাহা অবিশ্বাস করিবেন তাই কুর্ব্বন সে সকলের বিষয় কিছুই বলিলেন না। যাই হউক্ একটা মাটির ময়ূর ডাকে, এই কথা

তাড়িত বেগে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং দলে দলে লোক তাহা দেখিতে আসিল; কিন্তু সকলকেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল, কারণ যেই একজন ভিন্নগ্রামবাসী তাহাকে দেখিবার জন্য পাণ্ডুয়াগ্রামে প্রথম পদার্পণ করিল, সেই দিন হইতে পনেরো বৎসর সে একেবারে নীরব হইয়া পড়িল।

চন্দ্রবর্ম্মার চক্রচিহ্ন।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। ইংরাজ রাজত্বারম্ভেও যে ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে তাহারও পূর্ব্বভাগ এখনও অনেক বিষয়ে ভ্রমসঙ্কুল রহিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির কৃতবিদ্য সদস্যগণের যত্নে ও পরিশ্রমে এবং আমাদের দয়ালু গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, ভূগর্ভ, পুরাতন স্তূপরাশির মধ্য হইতে দিন দিন খোদিত শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি প্রকাশিত হওয়ায় দেশীয় ইতিহাস সংগ্রহের যে কত সুবিধা হইতেছে তাহা আর বলা যায় না।

গুপ্ত রাজগণ সম্বন্ধে যত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকটারই একটা না একটা মীমাংসা (সত্যই হউক্ আর মিথ্যাই হউক্) হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রে খোদিত সমুদ্রগুপ্তের একখানি লিপিতে দেখা যায়, তিনি উত্তর ভারতের চন্দ্রবর্ম্মা নামক এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিকে পরাজিত করেন। এ চন্দ্রবর্ম্মা যে কে তাহা এতদিন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিদ্বগুলীর নিকট অজ্ঞাত ছিল। গত নবেম্বর মাসে (১৮৯৫) এসিয়াটিক সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে বিশ্বকোষসম্পাদক বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ চন্দ্রবর্ম্মার কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উক্ত প্রবন্ধের সার নিম্নে সংগৃহীত হইল।

বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া সহরের উত্তর পশ্চিমে ১২ মাইল দূরে ও রাণীগঞ্জ ষ্টেশনের ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সুসুনিয়া নামে এক পর্ব্বত আছে। রেলযাত্রীরা দুর্গাপুর, অন্তাল ও রাণীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এই পর্ব্বতকে ঠিক্ যেন পশ্চিম মুখে অবস্থিত এক মহাকায় হস্তীর মত দেখিতে পাইয়া থাকেন। এই পর্ব্বত বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী অংশ। প্যাটেট, বিহারীনাথ প্রভৃতি পর্ব্বতমালা ইহারই পশ্চিমে। এই পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বে বেলে পাথর আমদানী হইত। চাতনা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত অহল্যা বাইয়ের রাস্তা এই সুসুনিয়া পর্ব্বতের পশ্চিমাংশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তা হইতে কিছু পূর্ব্বে পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পর্ব্বতের গোড়ায় ধারা নামে একটি প্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণের নিকট কতকগুলি প্রাচীন খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিও আছে, তন্মধ্যে নৃসিংহমূর্ত্তিই প্রধান। এখানে চৈত্র-

কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ বারুণীর দিন একটি বার্ষিক মেলা হয়।

খৃষ্টীয় ১৮৯৫ অব্দের জানুয়ারী মাসে নগেন্দ্র বাবু, বাবু গোপীনাথ কর্ম্মকার নামক কোন বন্ধুর নিকট সংবাদ পান যে, সুসুনিয়া পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব গাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে লিপি খোদিত আছে। সেই স্থানের অধিবাসীরা এই লিপিকে দেবতার কর্ম্ম ও অক্ষরগুলিকে দেবাক্ষর বলিয়া বিশ্বাস করে। কেহই ইহা পড়িতে পারে না, হঠাৎ মেলায় কোন সাধু আসিয়া যদিই ইহা পাঠ করিতে পারেন তো তিনি ইহার মর্ম্মার্থ গ্রামের অধিবাসীদিগকে অনধিকারী বিবেচনায় বলেন না। নগেন্দ্র বাবু এই সংবাদ পাইয়া গোপীনাথ বাবুর নিকট ইহার একটি প্রতিলিপি ছাপ তুলিয়া পাঠাইতে বলেন, কিন্তু গোপী বাবু তাহা না পারায় হাতে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।

এই লিপি পর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তর গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই দিকেও যমধারা বা দমধারা নামে একটী প্রস্রবণ আছে। প্রস্রবণ পর্ব্বত-গাত্রের মাঝামাঝি স্থানে। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের নিম্নে বহুতর গ্রাম, পুষ্করিণী, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র ও জঙ্গল দেখা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে বিরূপাক্ষ ঋষির আশ্রমগহ্বর ছিল। এখনও নাকি কেহ কেহ শ্বেতশ্মশ্রু, পিঙ্গলজটাধারী দীর্ঘদেহ ঋষিকে কখন কখন পর্ব্বতের উপরে অতি প্রত্যূষে দেব-গান গাহিয়া বেড়াইতে দেখিতে পায়। তিনি নাকি মনুষ্য-সমাগমে অন্তর্হিত হন।

লিপিখানি বড় পরিষ্কৃত ও তিন ছত্রে লিখিত। লেখার উপরিভাগে বিষ্ণুচক্রের ন্যায় একটি চক্রও খোদিত আছে। অক্ষরগুলি গভীর করিয়া খোদিত। এক একটি অক্ষর প্রায় ৪ বি-ইঞ্চ দীর্ঘ হইবে। অক্ষরগুলি ডাঃ ফ্লিটের কথিত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর উত্তরভারতীয় অক্ষরমালার ন্যায়। মেহেরউলিতে লৌহস্তম্ভ-গাত্রে চন্দ্রের যে খোদিত লিপি দেখা যায়, এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যাহা এসিয়াটিক সোসাইটীর গোচরীভূত হয়, এবং ডাঃ ফ্লিট তাঁহার "কর্পাস ইনৃস্ক্রিপ্সানাম্ ইণ্ডিকেরাম্" নামক পুস্তকের তৃতীয়ভাগের ২১ সংখ্যক লিপিতে যাহা প্রকাশ করেন, ইহার অক্ষরগুলিও তাহারই তুল্য।

এই লিপিতে একটি শব্দের বানান একটু নূতন ধরণের। 'র'-ফলা (্র) পূর্ব্বে 'ক'-এর দ্বিত্ব হইয়াছে। ডাঃ ফ্লিট মেহেরউলি স্তম্ভের লিপিসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এতল্লিখিত "চন্দ্র" সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত ১ম (গুপ্তরাজ-গণের ১ম) হইবেন। তবে ইহাতে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত ১ম কর্ত্তৃক শকবিজয়ের কথা না পাইয়া তিনিও একটু সন্দেহান্বিত ছিলেন।

নগেন্দ্র বাবু সুসুনিয়া হইতে যে খোদিত লিপিটুকু পাইয়াছেন, নিম্নে তাহার মূল ও অনুবাদ দেওয়া হইল।—তথায় যে ছত্রে যতটুকু আছে এখানেও সেই ছত্রে ততটুকু রাখা গেল।

মূল—১। চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ

২। পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজশ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য

৩। মহারাজশ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ।

চক্রস্বামীর দাসগণের প্রধান পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মার পুত্র কৃতি মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মা।

নগেন্দ্র বাবু এই চন্দ্রবর্ম্মাকেই মেহেরউলি স্তম্ভের 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মেহেরউলি স্তম্ভের 'চন্দ্র' বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন ও বঙ্গরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আরও তিনি সিন্ধুনদের সপ্তমুখ উত্তীর্ণ হইয়া বক্ত্রিয়া বা বল্‌খের বাহ্লীকগণকে জয় করেন। এ সমস্তই ঐ স্তম্ভলিপি হইতেই জানা যায়। নগেন্দ্র বাবু বলেন যে ইনিই সম্ভবতঃ বঙ্গরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় এই শুশুনিয়া পর্ব্বতের ধার দিয়া গিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুধ্বজস্থাপনের ন্যায় শুশুনিয়ার গাত্রে বিষ্ণুচক্র উৎকীর্ণ করাইয়া ঐ লিপি রাখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এলাহাবাদ স্তম্ভের সমুদ্রগুপ্তের লিপি-খোদিত চন্দ্রবর্ম্মা সম্বন্ধেও নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, উক্ত উত্তরভারতের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা চন্দ্রবর্ম্মাই এই মহারাজ শ্রীসিদ্ধবর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মা। ইনি পুষ্করাম্বুধিপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা অনুমিত হয়, ইনি আজমীরাধিকারীও ছিলেন। নগেন্দ্র বাবুও বলেন যে, হইতে পারে আজমীরপতি প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রবর্ম্মাই এক সময়ে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে পূর্ব্বে বঙ্গ, পশ্চিমে বাহ্লীক পর্য্যন্ত সমস্ত রাজগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

যতদিন না অপর কাহারও দ্বারা এ অনুমান ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হয়, ততদিন আমরা সমুদ্রগুপ্তের সময়ে উত্তর-ভারতে এতবড় একজন পরাক্রমী রাজার স্বত্তা নগেন্দ্র বাবুর দ্বারা অবগত হইলাম।

জ্যোতিঃশাস্ত্র।

ময়নামক দানব, সূর্য্যের নিকটে এই প্রধান শাস্ত্র, শিক্ষা করেন।

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্টাত্রিপরাশরাঃ।
কশ্যপো নারদো গার্গ্যো মরীচিমনুরঙ্গিরাঃ॥
রোমশঃ পুলশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।

সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, নারদ, কশ্যপ, গার্গ্য, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, রোমশ, পুলশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু ও শৌনক এই অষ্টাদশ মহর্ষিই প্রথমে জ্যোতিঃশাস্ত্র পারদর্শী ছিলেন। আবার অপরাপর ঋষিরা, ইহাঁদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া, শেষে এই শাস্ত্রকে মুহূর্ত্ত, জাতক ও সিদ্ধান্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পরব্রহ্ম মায়াপরবশ। নক্ষত্রমণ্ডল ও সূর্য্যাদি নবগ্রহ ইহাঁর আদি স্বরূপ হইতেছে। এই কারণে, যাঁহার এই পরব্রহ্ম নিরূপক জ্যোতিঃশাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা হইবেক; তাঁহার নক্ষত্র, সূর্য্যাদি গ্রহ, দ্বাদশ রাশি ও ইহাদের স্বভাব, গতি, গুণ ধর্ম্ম ইত্যাদি উত্তম

রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত গ্রহরাশি ইত্যাদির গুণ ও ধর্ম্ম ভূগোলকে উত্তমরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই পৃথিবীতে যাহার যে কিছু সুখ দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ এই যে গ্রহগণের নিজ নিজ গতির বিভিন্নতা, এবং যে গ্রহদ্বারা এই দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার নিজের ভিন্নতা অনুসারে হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভের এবং পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, সাঙ্গোপাঙ্গ ও জ্যোতিঃশাস্ত্র পাঠ করা আবশ্যক। অতএব প্রাণী সকলের সুখ দুঃখ গ্রহ, এবং রাশি সকলের স্বভাব অনুসারে ঘটিয়া থাকে। জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—

(১) গণিত ও (২) ফলিত জ্যোতিষ।

(১) গণিত জ্যোতিষ দ্বারা আমরা গ্রহগণের আকার, গতি এবং পরস্পরের দূরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি।

(২) ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে কার্য্যের শুভাশুভ ফল ও মানবাদৃষ্টের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালের অবশ্যম্ভাবী বিষয় গুলি জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

উদয় ও অস্তলগ্ন—সূর্য্যের উদয়কালে যে লগ্নের উদয়, অর্থাৎ পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ হইয়া থাকে; তাহাকে উদয় লগ্ন; এবং সূর্য্যের অস্তগমন কালে যে লগ্নের উদয়, অর্থাৎ পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ হয় তাহাকে অস্ত লগ্ন কহে।

প্রথম অধ্যায়।

অথ সিদ্ধিযোগ।

শুক্রবারে নন্দা। বুধে ভদ্রা। মঙ্গলে জয়া। শনিবারে রিক্তা। এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা হইলে সিদ্ধি যোগ হয়।

এবং কেন্দ্র স্থলে পাপগ্রহ থাকিলে অপমৃত্যু হয়; লগ্নে শনি কিংবা চন্দ্র পাপ গ্রহযুক্ত হইয়া ৮মে এবং পাপগ্রহ ১০ম ও ১২শে থাকিলে জাতকের অপমৃত্যু হয়॥

অমৃতযোগ।

রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা। শুক্র ও সোমে ভদ্রা। বুধে জয়া। বৃহস্পতিবারে পূর্ণা ও শুক্রবারে রিক্তা হইলে অমৃতযোগ হয়॥

পাপযোগ।

রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা; শুক্র ও সোমে ভদ্রা; বুধে জয়া; বৃহস্পতিবারে রিক্তা ও শনিবারে পূর্ণা তিথি হইলে পাপযোগ হয়॥

অথ দিন দগ্ধা কথন।

রবিবারে দ্বাদশী; সোমবারে একাদশী; মঙ্গলবারে দশমী; বুধবারে তৃতীয়া; বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী; শুক্রে দ্বিতীয়া এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে দিন দগ্ধা হয়॥

মাসদগ্ধা।

বৈশাখ মাসের শুক্ল ষষ্ঠী; জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থী; আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী; শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী; ভাদ্রের শুক্লাদশমী; আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী; কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী; অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদ্বাদশী; পৌষের শুক্লদ্বিতীয়া; মাঘের কৃষ্ণদ্বাদশী; ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্থী ও চৈত্রের কৃষ্ণদ্বিতীয়া হইলে মাসদগ্ধা হয়।

কাল ঘণ্ঠযোগ।

সোমবারে ষষ্ঠী; কুজে দশমী ও সপ্তমী; বৃহস্পতিবারে অষ্টমী; বুধবারে নবমী; শনিবারে দশমী; মঙ্গলবারে একাদশী; ও রবিবারে দ্বাদশী হইলে কালঘণ্টযোগ হয়॥

অথ নক্ষত্র প্রকরণ।

১ অশ্বিনী। ২ ভরণী। ৩ কৃত্তিকা। ৪ রোহিণী। ৫ মৃগশিরা। ৬ আর্দ্রা। ৭ পুনর্ব্বসু। ৮ পুষ্যা। ৯ অশ্লেষা। ১০ মঘা। ১১ পূর্ব্বফল্গুনী। ১২ উত্তর ফল্গুনী। ১৩ হস্তা। ১৪ চিত্রা। ১৫ স্বাতি। ১৬ বিশাখা। ১৭ অনুরাধা। ১৮ জ্যেষ্ঠা। ১৯ মূলা। ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। ২২ শ্রবণা। ২৩ ধনিষ্ঠা। ২৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২৬ উত্তর ভাদ্রপদ। ২৭ রেবতী॥

নক্ষত্রাধিপ কথন।

অশ্বী। যম। অগ্নি। ব্রহ্মা। চন্দ্র। শিব। অদিতি। বৃহস্পতি। ফণি। পিতৃগণ। যোনি। আর্য্যমী। সূর্য্য। বিশ্বকর্ম্মা। পবন। শক্ররাগ্নি। সূর্য্য। ইন্দ্র। রাক্ষস। জল। বিশ্ব। বিরিঞ্চি। হরি। বসু। বরুণ। অজপাদ। আহব্রধ্ন। পুষা।

বিষযোগ।

যেমন ঘৃত ও মধু একত্রিত হইলে বিষ হয়, তদ্রূপ অমৃত ও সিদ্ধিযোগ এক দিবসে হইলে বিষ যোগ হয়॥

মৃত্যুযোগ।

রবিবারে অনুরাধা। সোমে উত্তরাষাঢ়া। মঙ্গলে শতভিষা। বুধে অশ্বিনী। বৃহস্পতিবারে মৃগশিরা। শুক্রে অশ্লেষা ও শনিবারে হস্তা নক্ষত্র হইলে মৃত্যু যোগ হয়॥

তিথি নক্ষত্র যোগে মৃত্যু যোগ।

প্রতিপদে উত্তরাষাঢ়া, নবমীতে কৃত্তিকা, অষ্টমীতে পূর্ব্বভাদ্রপদ, একাদশীতে রোহিণী, দ্বাদশীতে অশ্লেষা একাদশীতে মঘা নক্ষত্র হইলে মৃত্যুযোগ হয়।

বার তিথি নক্ষত্রযোগে মহাদগ্ধা।

দ্বাদশ্যঙ্ক মঘাদিত্যে কৃত্তিকৈকাদশী সিতে দশম্যাঙ্গারকে চান্দ্রা বুধে মূলে তৃতীয়িকা। গুরৌ ষষ্ঠী ভরণ্যঙ্ক শুক্রোচদ্বিতীয়াশ্বিনী। অশ্লেষা শনি সপ্তম্যাং মহাদগ্ধা প্রকীর্ত্তিতা।

তিথ্যধিপ কথন।

অগ্নি, প্রজাপতি, গৌরী, গণেশ, সর্প, কার্ত্তিক, রবি, শিব, দুর্গা, যম, বিশ্ব, হরি, কাম, হর। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার অধিপতি চন্দ্র।

নক্ষত্রদ্বারা রাশি বিভাগ।

১। ২। ৩ এর পোয়া	...	মেষ।
৩ এর ৷৹। ৪। ৫ এর ॥	...	বৃষ।
৫ এর ॥০। ৬। ৭ এর ৷৹	...	মিথুন।
৭ এর ।০। ৮। ৯	...	কর্কট।
১০। ১১। ১২ এর ।০	...	সিংহ।
১২ এর ৷৹। ১৩। ১৪ এর ॥০		কন্যা।
১৪ এর ॥০। ১৫। ১৬ এর ৷৹		তুলা।
১৬ এর ।০। ১৭। ১৮	...	বিছা।
১৯। ২০। ২১ এর ।০	...	ধনু।
২১ এর ৷৹। ২২। ২৩। এর ॥০		মকর।
২৩ এর ॥০। ২৪। ২৫ এর ৷৹		কুম্ভ।
২৫ এর ।০। ২৬। ২৭	...	মীন।

লগ্ন নিরূপণ।

নক্ষত্রাহোরাত্রের মধ্যে ১২ রাশির ক্রমে উদয় হয়। রাশির প্রথমাংশ উদয় স্থানে উপস্থিত হওনাবধি, তাহার শেষ অংশ উদয় হওন পর্য্যন্ত যতক্ষণ হয়, সেই কালকে ঐ রাশির লগ্ন কহা যায়। রাশিচক্রের বক্রতা জন্য প্রতি রাশির লগ্নমান ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই কারণে দেশ ভেদে দর্শনের বক্রতা ও অবক্রতা প্রযুক্ত লগ্নমানের

ভেদ হইতেছে। কিন্তু ১২ লগ্ন এক নাক্ষত্র দিনের মধ্যে হয়; অতএব কোন লগ্ন বৃদ্ধি হইলে অন্য লগ্নের হ্রাস হয়। যথা বৈশাখ মাসের প্রথমে মেষ, পরে বৃষ, তৎপরে মিথুন ইত্যাদি যথাক্রমে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বৃষ, পরে মিথুন, তৎপরে কর্কট ইত্যাদি হইবে। ঐরূপ আষাঢ়ের প্রথমে মিথুন, শ্রাবণের প্রথমে কর্কট, ভাদ্রের প্রথমে সিংহ, আশ্বিনের প্রথমে কন্যা, কার্ত্তিকের প্রথমে তুলা, অগ্রহায়ণের প্রথমে বিছা, পৌষের প্রথমে ধনু, মাঘের প্রথমে মকর, ফাল্গুনের প্রথমে কুম্ভ, ও চৈত্রের প্রথমে মীন, এই প্রকারে দ্বাদশ মাসে প্রতিদিন দ্বাদশ লগ্ন হয়।

রবি যে লগ্নে উদয় হয়, তাহার সপ্তম লগ্নে তিনি অস্ত হন। যে মাসে যতদিন হইবে সেই মাসের উদয় লগ্নকে তত ভাগ করিলে, তাহার এক ২ ভাগ প্রত্যহ রাত্রিঃপ্রবিষ্ট হইবে, ঐ ভাগকে রবিভুক্তি কহে। আর অস্ত লগ্নেও সেইরূপ ভাগ দিন প্রবিষ্ট হইবে। অতএব মাসের যত দণ্ড সময়ে লগ্ন নির্ণয় কর্ত্তব্য হইবে, সেই লগ্ন দিবাতে হইলে উদয় লগ্নের পর২ লগ্ন যোগ করিলে, অভীষ্ট সময়ের লগ্ন নিশ্চয় হইবে। রাত্রিতে লগ্ন নিশ্চয় করিতে হইলে, অস্ত লগ্ন হইতে রবি ভুক্তি ত্যাগ করতঃ লগ্ন স্থির করিবে। যেমন বৈশাখ মাসের ১৪ দিনে দিবা ১৫ দণ্ড ১০ পলের সময়ে কোন কর্ম্ম করিতে হইবে। ঐ বৈশাখ মাস ৩০ দিনে সমাপ্ত হইবে। উদয় লগ্ন মেষ তাহার মান ৪ দণ্ড ৭ পল। ঐ ৪।৭ চারি দণ্ড সাত পলকে ৩১ দিয়া ভাগ করিলে এক২ দিনের রবি ভুক্তি ৭ পল ৫৮ বিপল ও ৪ অনুপল হইবে। ঐ ৭।৫৮।৪ কে ১৪ দিয়া গুণ করিলে ১ দণ্ড ৫১ পল ও ৩৩ বিপল হয়। এক্ষণে মেষ লগ্নের পরিমাণ হইতে এক দণ্ড ৫১ পল ও ৩৩ বিপল বিয়োগ করিলে, অবশিষ্ট ২ দণ্ড ১৫ পল ও ২৭ বিপল রহিল, তাহার সহিত বৃষ লগ্ন ও তৎপরে মিথুন লগ্ন যোগ করিলে ১২ দণ্ড ২৩ পল ও ৩৭ বিপল হইবে। সুতরাং কর্ম্মকালে কর্কট লগ্ন হইবে। রাত্রিতে অস্ত লগ্ন হইতে এইরূপ গণনা করিলে লগ্ন নিশ্চয় হইবে। এই প্রকারে নানাদেশীয় লগ্নমান [লইয়া] নানাদেশে লগ্ন নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন লগ্নমান।

রামোগ বেদৈ—জলধিস্ত মৈত্রৈর্বানোরসিঃ প্রঞ্চসাগরশৈলৈ বাণঃ কুবেদৈ বিগ্রয়োহঙ্কযুগ্মৈঃ ক্রমোৎক্রমোস্রেয় তুলাদিমানং।

মেষ ৩ দণ্ড ৪৭ পল। বৃষ ৪।১৭। মিথুন ৫।৬। কর্কট ৫।৪০। সিংহ ৫।৪১। কন্যা ৫।২৯। তুলা ৫।২৯। বৃশ্চিক ৫।৪১। ধনু ৫।৪০। মকর ৫।৬। কুম্ভ ৪।১৭। মীন ৩।৪৭।

প্রাচীন লগ্ন মানের দিন ভুক্তি।

মেষ ৭ পল ৩৪ বিপল। বৃষ ৮।৩৪। মিথুন ১০।১২। কর্কট ১১।১২। সিংহ ১১।১২। কন্যা ১০।৫৮। তুলা ১০।৫৮। বিছা ১১।১২। ধনু ১১।২২। ধনু ১১।২০। মকর ১০।১২। কুম্ভ ৮।৩৪। মীন ৭।৩৪।

অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

পঞ্চাঙ্গুল প্রায় দশ ব্যঙ্গুল ছায়া প্রযুক্ত কলিকাতায় এবং মেদিনীপুরে ও তাহার সমান রেখায় পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে, অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ ৪।৭।০	তুলা ৫।৩৫।২৬
বৃষ ৪।৪৯।৪০	বিছা ৫।৪০।৫৭
মিথুন ৫।২৯।৪০	ধনু ৫।১৭।২০

কর্কট ৫।৪০।৯ মকর ৪।৩৩।০

সিংহ ৫।৩২।৫১ কুম্ভ ৩।৫৭।৬

কন্যা ৫।২৯।২০ মীন ৩।৪৬।৪০

পঞ্চাঙ্গুল প্রায় দ্বাদশ ব্যঙ্গুল ছায়াহেতু নবদ্বীপ বর্দ্ধমান ও ঢাকা এবং তৎসমসূত্র পূর্ব্ব-পশ্চিমস্থ দেশেথয়মাংশ শুদ্ধলগ্ন মান।

মেষ ৪।৬।৫০ তুলা ৪।৪৬।২৪

বৃষ ৪।৪৯।৪৭ বিছা ৪।৪১।৩৫

মিথুন ৫।২৮।৪৯ ধনু ৫।১৭।২

কর্কট ৫।৪০।৩৫ মকর ৪।৩২।৪১

সিংহ ৫।৩৩।২২ কুম্ভ ৩।৫৭।৬

কন্যা ৫।২৯।৪০ মীন ৩।৪৬।২০

মুরশিদাবাদে ও তৎসমান দেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ ৫।৬।৩১ তুলা ৫।৩৮।১৫

বৃষ ৪।৪৯।৩৩ বিছা ৫।৪০।৪৮

মিথুন ৫।২৮।৪৬ ধনু ৫।১৭।২০

কর্কট ৫।৪০।৪১ মকর ৫।৩৩।৪০

সিংহ ৫।৩৩।৩৩ কুম্ভ ৩।৫৫।৪৯

কন্যা ৫।৩০।০ মীন ৩।৪৬।৯

চট্টগ্রাম ও তৎসমানদেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ ৪।৮।৪ তুলা ৫।৩৪।২০

বৃষ ৪।৪৯।৩৩ বিছা ৫।৩৯।৩৫

মিথুন ৫।২০।২২ ধনু ৫।১৭।৩৩

কর্কট ৫।৪৯।৪০ মকর ৫।৩৬।২৬

সিংহ ৫।৩২।৫ কুম্ভ ৩।৫৮।১৮

কন্যা ৫।২৮।২০ মীন ৭।৪৭।৩০

ষড়ঙ্গুল প্রায় দ্বিব্যঙ্গুল ঐ ঐ কুচবিহারে ঐ ঐ ঐ

মেষ ৪।৫৫।৫৩ তুলা ৫।৩৯।১৬

বৃষ ৪।৪৫।৪১ বিছা ৫।৪৮।৩৮

মিথুন ৫।২০।২১ কুম্ভ ৩।৫৯।৪০

কর্কট ৫।৪৫।৩০ ধনু ৫।২৯।২৮

সিংহ ৫।৪১।৪৭ মকর ৪।৩৫।২৬

কন্যা ৫।৩৮।২৯ মীন ৩।৩৯।৪০

রংপুর।

মেষ ৪।১।৩৬ তুলা ৫।২৩।২৭

বৃষ ৪।৪৯।২৮ বিছা ৫।৪৭।৪৭

মিথুন ৫।২৩।২৭ কুম্ভ ৩।৫৮।১৮

কর্কট ৫।৪৪।৩২ ধনু ৫।২৬।০৬

সিংহ ৫।৩৬।৩১ মকর ৪।৩৫।২৬

কন্যা ৫।৩৩।২০ মীন ৩।৪৭।২৯

বেলা নির্ণয়।

পদচ্ছায়াং দ্বিগুণীকৃত্য চতুর্দ্দশ সমন্বিতং।
পক্ষগ্রহকরাৎ ভাগলব্ধ দণ্ডাদিকং ভবেৎ।

দুই প্রহরের পূর্ব্বে তত দণ্ড বেলা হইবে; এবং দুই প্রহরের পরে দিবামানের তত দণ্ড বেলা থাকিবে।

মকর সংক্রান্তির দিবস হইতে, ছয়মাস অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাড় মাসের শেষ পর্য্যন্ত লগ্ন স্থির করিতে হইলে পদছায়া মাপিয়া একপদ ন্যূন করতঃ, অর্থাৎ, দণ্ডায়মান হইয়া পদাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে মাপিলে, সুতরাং, এক পদ হীন হইল। ঐ পদছায়া মাপিয়া যত সংখ্যা হইবে, ঐ সংখ্যায় ৭ সাত যোগকর; পরে ধ্রুবাঙ্ক ১৪৪ কে ঐ ছায়া সংখ্যা দ্বারা ভাগকর, ভাগফল অঙ্ক দণ্ডাদি হইবে। ঐ ৬ মাসে ১ একদণ্ড হীন করিলে অভীষ্ট সময় মিলিবে। এবং শ্রাবণ হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত ধ্রুবাঙ্ক ১৩৫ হইবে। এবং একদণ্ড যোগ করিলে সময় নিরূপিত হইবে। দুই প্রহরের মধ্যে লগ্ন স্থির করিতে হইলে। তত দণ্ড বেলা হইয়াছে

জানিবে; এবং দুই প্রহরের পরে দিবামানের তত দণ্ড সময় অবশিষ্ট আছে জানিবে।

যে নক্ষাত্রে জন্মগ্রহণে যে গণ হয়।

দমারাম দমাদিন্দু রারাম মদরাদরা।

দূরে রামো মদারারি মামদা গণনির্ণয় ॥

দেবগণ—মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, বর্ণা, পুষ্যা, রেবতী, মৃগশিরা, অশ্বিনী ও পুনর্ব্বসু।

নরগণ—ত্রিউত্তরা, ত্রিপূর্ব্বা, রোহিণী, ও আদ্রা।

রাক্ষসগণ—জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখা।

যে যে রাশিতে যে বর্ণ হয়।

কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন—বিপ্রবর্ণ।

সিংহ, তুলা ও ধনু—ক্ষত্রিয়বর্ণ।

মেষ, কুম্ভ ও মিথুন—বৈশ্যবর্ণ।

বৃষ, " কন্যা ও মকর শূদ্রবর্ণ।

জন্মরাশি অনুসারে নামের আদ্যক্ষর।

অ, ল=মেষ। উ, র=বৃষ। ক, ছ=মিথুন। ড, হ=কর্কট। ম, ঠ=সিংহ। প, থ=কন্যা। র, ত=তুলা। ন, জ=বিছা,। ধ, ভ=ধনু। খ, ষ=মকর। গ, শ=কুম্ভ। দ, চ=মীন।

নষ্ট রাশি নির্ণয়।

ঝ, ঞ, ক্ষ=মীন। ফ, ঢ=ধনু। ট,ণ,ঙ=কন্যা। উ, দ, উ=বৃষ।

অথ শতপদ চক্র।

অ, ই, উ, এ, ৩ কৃত্তিকা। শু, ব, বী, বু, ৪ রোহিনী। বে, বো, বা কি, ৫। কু, ঘ, ঙ, ছ, ৬। কে, কো, হ, হি, ৭। হু, হে, হো, ড় ৮। ডি, ডু, ডে, ডো, ৮। ম, মি, মু, মে ১০। থো, ট, টি, টু, ১১। টে, টো, প, পি ১২। পু, ষ, ণ, ঠ. ১৩। পে, পো, র, রি, ১৪। ক, রে, রো, ত ১৫ স্বাতী। তি, তু, তে, তো, ১৬। ন, নি, নু, নে, ১৭। নো, য, যি, যু ১৮। যে, যো, ভ ভি ১৯। ভু, ধ, ফ, ড়, ২০। ভে, ভো, জ, জি ২১। জু, জে, জো, খ, অ, ভি, জিৎ, মি, খু, খে, খো ২২। গ, গি, শু, গে, ২৩। গো, শ, গি, শুক্ষ, শে, শো, দ, দি ২৫। দু, থ, ঝ, ঞ ২৬। দে, দো, চ, চি ২৭। চু, চে, চোল ১। লি, লু, লে, লো ২।

যম, পিতৃযান ও পরলোক।

(২)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে ঋগ্বেদ হইতে যম সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যমের স্বভাব চরিত্র বিষয়ে কতকটা ধারণা হইতে পারে। যে যম হিন্দু সমাজে একটা উৎকট বিভীষিকার বস্তু, যাহার নামশ্রবণ মাত্র পাপীর হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে, বেদে তিনি পরম রমণীয় আকারে ও প্রকারে অবতারিত হইয়াছেন। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের পথে লইয়া যান; তিনি রাজা; তিনি সকলের প্রিয়; "যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্য তাঁহার জন্য হোম

কর ; দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদিগকে দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন।” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যমের রমণীয়তা ও লোকাভিরামতাই প্রকাশ পায় ; তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত যেন সকলেই ব্যস্ত। এই যমকে অবলম্বন করিয়াই মহীয়সী তত্ত্বচিন্তা—পরলোকের পরা ভাবনা—প্রাচীন আর্য্যহৃদয়ে মুখরিত হইয়াছিল। এই যমের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদে অতি বিচিত্র উপাখ্যান বিবৃত আছে ; এস্থলে পাঠকদিগকে তাহার উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি ইতীদং
বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া
বিবস্বতো ননাশ।
অপাগুহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী
সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্ যত্তদাসীদজহদুদ্বা
মিথুনা সরণ্যূঃ।

ত্বষ্টা স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিতেছেন, এই কথা শুনিয়া সমস্ত পৃথিবী সমবেত হইল। (বিবস্বানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।) বিবস্বানের বিবাহিতা পত্নী এবং যমের জননী অদৃশ্য হইলেন। মর্ত্ত্যদিগের নিকট হইতে সেই অমর্ত্ত্য কন্যাকে তাঁহারা লুকাইয়া রাখিলেন এবং তাঁহারই সদৃশী আর একটী রমণী সৃষ্টি করিয়া বিবস্বান্‌কে প্রদান করিলেন। সরণ্যূ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করিলেন এবং তাহার পর তাহাদিগের দুইজনকেই পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

ঐ দুইটী শ্লোক নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে. “তত্রেতিহাসমাচক্ষতে” তথায় নিম্নলিখিত ইতিহাস বর্ণিত আছে।

“ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বতঃ আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার।
সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব।
স বিবস্বান্ আদিত্যঃ আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তাং অনুসৃত্য সম্বভূব।
ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনুঃ।”

ত্বষ্টার দুহিতা সরণ্যূ আদিতিতনয় বিবস্বানের যমজ পুত্র প্রসব করেন। অতঃপর তিনি আপনার আকৃতির সমানা একটী প্রতিনিধি করিয়া অশ্বিনীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। বিবস্বান সেইরূপ অশ্বের মূর্ত্তিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। উভয়ের সংযোগে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইলেন; এদিকে তাঁহার সেই সবর্ণা যেনার গর্ভে মনু জন্ম গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য ইনিই বৈবস্বত মনু। এই মনু ও যম উভয়েই যে, বিবস্বানের পুত্র বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার মূল জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহদ্দেবতায় এই বিষয় কিরূপে অধিকতর স্ফুটীকৃত হইয়াছে, তাহাও এস্থানে প্রদর্শিত হইতেছে।

অভবন্মিথুনং ত্বষ্টুঃ সরণ্যুস্ত্রিশিরাঃ সহ।
স বৈ সরণ্যূং প্রাযচ্চৎ স্বয়মেব বিবস্বতে॥
ততঃ সরণ্যাং জাতে তে যমযম্যৌ বিবস্বতঃ।
তাবপ্যুভৌ যমাবেব• হ্যাস্তাং যম্যাচ বৈ যমঃ॥
সৃষ্ট্বা ভর্ত্তুঃপরোক্ষন্তু সরণ্যূঃ সদৃশীং স্ত্রিয়ম্।

নিক্ষিপ্য মিথুনৌ তস্যাং অশ্বাভূত্বা প্রচক্রমে॥
অবিজ্ঞানাদ্বিবস্বাংস্তু তস্যামজনয়ন্ মনুম্।
রাজর্ষিরাসীৎ স মনুর্বিবস্বানিব তেজসা॥
স বিজ্ঞায়াপক্রান্তাং সরণ্যুং অশ্বরূপিণীম্।
ত্বাষ্ট্রীং প্রতি জগামাসৌ বাজী ভূত্বা সলক্ষণঃ॥
সরণ্যুস্তু বিবস্বন্তং বিজ্ঞায় হয়রূপিনম্।
মৈথুনায়োপচক্রাম তাংস তত্রারুরোহ সঃ।
ততস্তয়োস্তু বেগেন শুক্রং তদপতদ্ভুবি।
উপাজিঘ্রচ্চ সা ত্বশ্বা তৎশুক্রং গর্ভকাম্যয়া॥
আঘ্রাণমাত্রাৎ শুক্রন্তৎ কুমারৌ সম্বভূবতুঃ।
নাসত্য শ্চৈব দস্রশ্চ যৌ স্তুতাবশ্বিনাবপি॥

ত্বষ্টার যমজ পুত্রকন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন, পুত্র ত্রিশিরা এবং কন্যা সরণ্যূ। তিনি বিবস্বানের সহিত সরণ্যুর বিবাহ দিলেন। বিবস্বানের ঔরসে সরণ্যূর গর্ভে যমজ পুত্রকন্যা জন্মিলেন; পুত্র—যম এবং কন্যা যমী। ভর্ত্তার অজ্ঞাতসারে সরণ্যূ আপনার সদৃশী একটী রমণী সৃষ্টি করিয়া পুত্রকন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক অশ্বিনীর আকারে প্রস্থান করিলেন। বিবস্বান্ তাহা জানিতে না পারিয়া সেই প্রতিনিধিস্বরূপিণী মহিলার গর্ভে মনুকে উৎপাদিত করিলেন। এই মনু রাজর্ষি হইয়াছিলেন; ইনি পিতা বিবস্বানের ন্যায় তেজস্বী। অতঃপর বিবস্বান্ ত্বষ্টৃ-দুহিতা সরণ্যুর প্রকৃত রূপ জানিতে পারিয়া তাহারই সমলক্ষণাক্রান্ত অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইলেন। সরণ্যূও বিবস্বানকে অশ্বরূপে চিনিতে পারিয়া মৈথুনার্থ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাহাতে তাঁহাদের শুক্র বেগে ভূমিতলে পতিত হইল; অশ্বীরূপিণী সরণ্যূ গর্ভকামনায় সেই শুক্র আঘ্রাণ করিলেন। আঘ্রাণ মাত্রই যমজ কুমার উদ্ভূত হইলেন;—তাঁহাদের নাম নাসত্য ও দস্র। ইহাঁরাই, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

উপরে ঋগ্বেদ, নিরুক্ত ও বৃহদ্দেবতা হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবস্বানের ঔরসে সরণ্যূর গর্ভে প্রথমে যমের ও যমীর জন্ম হয়। তাহার পর উভয়ে অশ্বিনী ও অশ্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁদের আদি নাম নাসত্য ও দস্র। বৈবস্বত মনু, যমের সহোদর ভ্রাতা নহেন। পুরাণে ও মহাভারতে প্রায় এইরূপ বিবরণই দেখা যায়।*

সর্ব্বজনিপ্রিয় লোকাভিরাম বেদোক্ত যম পুরাণে কিরূপে লোকের বিভীষিকাময় যমের আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহা হইতে পরলোকের পরমা চিন্তা ভারতীয় হিন্দুর হৃদয়ে কিরূপে উত্থিত ও পরিস্ফুট হইল, পিতৃযান ও পরলোকে কি প্রভেদ, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

* মহাভারত, আদি পর্ব্বে যম, মনুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তদ্যথা,—
মার্ত্তণ্ডস্য মনুর্ধীমানজায়তঃ সুতঃ প্রভু।
যমশ্চাপি সুতো জজ্ঞে খ্যাতস্তস্যানুজঃ প্রভুঃ॥

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তার পর চন্দ্রধ্বজ তারার পরিচয় দিলেন, মুঞ্জরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই রাখ্‌বি?" মুঞ্জরা স্বীকৃতা হইল। তাহার পর তাহার দৃষ্টি তারার অঞ্চলের দিকে পড়িল। মুঞ্জরা দেখিল, তাহাতে কি একটা বাঁধা আছে, জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার আঁচলে বাঁধা ওখানি কি?—তারা মুকুলের একখানি ছবি অঞ্চল হইতে খুলিয়া চামেলীর হাতে দিল।

গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাস্য,—পরে প্রকাশ আছে ঘটে তারা ছবি আঁকিতে জানে—মুকুলের ছবি আঁকা হইল কেন? তারার সহিত মুঞ্জরার দেখা হইবে এবং তাহাকে মুকুলের ছবি দিতে হইবে, এ কথা কি তারা জানিত? নিশ্চয়ই নহে। তবে ছবি আঁকা হইল কেন? যোগী অচ্যুতানন্দ সূক্ষ্মদর্শী, তিনি হয় ত সূক্ষ্মদর্শন বলে বুঝিয়াছেন যে, এই কৌশলের পর এই কৌশল অবলম্বন করিলে মুকুল মুঞ্জরার দর্শন ঘটিতে পারে, তাই, তারাকে আদেশ দিয়া ছবিখানি আঁকাইয়াছেন, আঁচলে বাঁধাইয়াছেন এবং প্রান্তরে বসিয়া থাকিবার সময় ছবিখানি কি ভাবে রাখিতে হইবে, কাহাকে দিতে হইবে এ সমস্ত উপদেশ বিশেষ করিয়া দিয়াছিলেন, নতুবা তারা এতটা করে কিরূপে?—সে ত ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। বরং সে নিজ প্রতিজ্ঞার জন্য মুকুলের কথা যাহাতে প্রকাশ পায়, এমন কার্য্য কোনমতেই করিতে পারে না, তাহার পক্ষে এরূপ স্থলে (যোগী বলিয়াছেন, এখানকার রাজা মুকুলকে তাহার বিমাতার তৃপ্তিহেতু কাটিয়া ফেলিলেও ফেলিতে পারেন সুতরাং যেখানে মুকুলের কথা প্রকাশ হইলে প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে সেখানে) মুকুলের ছবি লইয়া পথে বাহির হওয়া বা কোন লোককে (বিশেষতঃ সেই শত্রুবৎ রাজার কন্যাকেই) দেওয়া যার পর নাই অসম্ভব আর মুঞ্জরাই বা তাহা দেখিতে পায় কেন? অথচ এতক্ষণ রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি কেহই দেখিতে পাইলেন না কেন? তবে কি তারা তখন লুকাইয়া রাখিয়া এখন দেখাইবার মত করিয়া রাখিয়াছিল? অথচ যখন এতটা ঘটিল তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অচ্যুতানন্দের উপদেশমত তারা এতটা করিতেছে। পুস্তকের একস্থলে তাহার একটু আভাসও পাইয়াছি। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মুকুলের আর একখানি ছবি তারা মুঞ্জরাকে দিতেছে। সেই ছবিখানি দেখিবার সময় তারা বলিতেছে,—"যোগীর বচনমত করি আচরণ—যা হবার হবে আগে বাঁধিব জীবন।"—সুতরাং আমরা সহজেই দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি যে তারার এই মূক সাজিয়া প্রান্তরে বসা, যুবরাজের ইঙ্গিতে তাঁহার সহিত গমন, ছলে রাজসমীপে আশ্রয় প্রার্থনা, মুকুলের ছবি কৌশলে মুঞ্জরার দৃষ্টিপথে ধারণ ও চাহিবামাত্র তাঁহাকে প্রদান—ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য—নাটকখানির বীজ ও অঙ্কুরের উদ্গম—সমস্তই যোগী অচ্যুতের কূট কৌশলের ফলমাত্র। গ্রন্থকার ইহাতে কি বলেন?

পাঠকগণ! এইস্থানে দেখিলে, গিরীশ বাবু

এই দৃশ্যে যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করিলেন, তাহার কারণ স্থির করিতে গেলে অচ্যুতানন্দ যোগীকেই পাওয়া যায়। অচ্যুত এই সকলের কারণ হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে গিরীশ বাবু তাহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হইতে এই অতি-প্রথমেই স্খলিত হইয়া পড়িলেন। প্রেমে জড়-মুকুল ফুটাইবার তিনি যে সকল আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মনে প্রেমসঞ্চার হওয়া দূরে থাক বরং তাহার উপর পরোক্ষে বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে! প্রেম হউক আর না হউক যোগী অচ্যুতের কৌশলে পড়িয়া মুকুল না ফুটিয়া আর এড়াইতে পারিতেছেন না! তারা যোগীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল বটে,—

"কি হবে উপায় ?
অবোধ অজ্ঞানে প্রভু রাখ রাঙ্গা পায়।"

তারার এই প্রার্থনা পূরণার্থ যদি "মাতব্বর" যোগীবরকে এত কূট-কৌশল ও জাল-জালিয়াতের আশ্রয় লইতে হয় তবে তাঁহাকে যোগী না বলিয়া "ধড়িবাজ" আখ্যা দিলে ভাল হয়। গিরীশ বাবু যদি বলেন, আচ্ছা না হয় কুটপন্থাদ্বারাই লক্ষ্য লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে আর ক্ষতি কি ?—আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ এ পথ অবলম্বন করায় তিনি প্রথমেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন, তৎপরে রামযাত্রার অধিকারীর মত কোন গতিকে মিলন গাহিয়া আসর বজায় করিয়া গিয়াছেন মাত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগী অচ্যুতকে মাটী করিয়াছেন।

তার পর চামেলী ছবিখানি লইয়া মুঞ্জরাকে দিল। মুঞ্জরা দেখিল, দেখিয়া ভুলিল, ভুলিয়া মজিল, মজিয়া গন্ধ ছাড়িয়া দিল, গন্ধ ছাড়িয়া পদ্যে ছড়া ধরিল, ছড়ায় ছবির রূপবর্ণনা করিল। রূপবর্ণনায় তাহার একটু দুঃখ, একটু আক্ষেপ শুনা গেল। মুঞ্জরা বলিল,—

"একি একি খঞ্জন গঞ্জন দুটি আঁখি—
আহা! কেন ভাবহীন—যেন বালকের
আঁখি দুটি! যৌবনে সাজে না এ নয়ন!
হৃদয় দর্পণে নাহি হৃদয় আভাস!
লক্ষ্য শূন্য চক্ষু হীন প্রভা! কোন প্রাণে
কেমনে না জানি চিত্রি চন্দ্রমুখ খানি!
অদ্ভুত তুলিরা স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
জ্ঞান রাগ বিবর্জ্জিত এঁকেছে আঁখি দুটী!
কার প্রাণে নাহি বাজে সৌরভ বিহীন
ফুল্ল ফুল হেরি! একি একি সুধা নাই
সুধাকরে ?"

কথা গুলি পড়িতে শুনিতে বেশ! কিন্তু ইহাতে কবি মাথামুণ্ড কি বলিতেছে ? একটি মাত্র কথার অযথা পুনরুক্তি সহস্রবার কেন ?—এক নিষ্প্রভ চক্ষুর বর্ণনা আট প্রকারে!—কি প্রয়োজন ? তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে অর্থবোধের জন্য যে সকল ছেদ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক স্থলে অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। এ দোষ গিরীশ বাবুর সকল পুস্তকেই ঝুড়ি ঝুড়ি আছে। ইহা ধরিয়া দিতে গেলে, গিরীশবাবুকে স্বতন্ত্র রূপে ব্যাকরণ বুঝাইতে হয়, এখানে তাহার স্থান নাই, সুতরাং তাহা ছাড়িয়া দিলাম, কেবল গিগীশবাবুকে জিজ্ঞাস্য,—

"লক্ষ্য শূন্য চক্ষু হীন প্রভা! কোন প্রাণে
কেমনে না জানি চিত্রি চন্দ্রমুখ খানি!"

এই দুই চরণের অর্থ কি ? "লক্ষ্য শূন্য চক্ষু হীন

প্রভা” অর্থে কি আমরা “লক্ষ্য শূন্য চক্ষুতে প্রভা নাই”—এইরূপ অর্থ বুঝিব?—গিরীশবাবুর উদ্দেশ্য ইহাই বটে কিন্তু সমাসের নিয়ম না জানা থাকায় অর্থানুসারে কোন শব্দের পূর্ব্বনিপাত বা পরনিপাত হইবে, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। ঐরূপ অর্থ করিতে হইলে, ঐ সমাসটি এই রূপ হইবে—“লক্ষ্য শূন্য চক্ষু প্রভাহীন” (বা একান্ত পক্ষে “হীন প্রভ” হইলেও কতকটা হইত।] দ্বিতীয় চরণটির কোন অর্থ হয় না। “চন্দ্রমুখ খানি” “চিত্রিবার” জন্য মুঞ্জরার সন্দেহ ও আকুলতা কেন? মুঞ্জরা কি নিজে ‘চন্দ্রমুখ খানি চিত্রিবারে’ চায়? তাই “কেমনে” পারিবে তাই ভাবিতেছে? কেন? ছবি হাতে লইয়াই, প্রেম জন্মিতে না জন্মিতে ছবি খানির নকল করিবার সাধ কেন? প্রেমিকা হইলেই সকলকে ‘রত্নাবলীর’ সাগরিকা হইতে হইবে কি তারপর যুবরাজের নিজের ভাব সাগর উথলিয়া উঠিল; তিনি ভগ্নীর আক্ষেপ শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

“নহে চিত্র স্বভাবে অভাব।
হের বামা নিরুপমা, মদন বিরহে
রতি যেন ধরাতলে। বিধাতার ছলে
বাক্‌শক্তি হীন! * * * * *
কলঙ্ক চন্দ্রের হৃদে যার কল্পনায়,
সে বিধি কঠিন প্রাণে গড়েছে বালায়।”

যুবরাজ তারার রূপে ডুবিয়া গিয়াছেন! দাদাকে তারপর তারার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া মুঞ্জরা জিজ্ঞাসা করিল,—

“দাদা, তুমি বল্‌তে পার এ চোক দুটিতে কি ভাব দিলে ভাল হয়?

চন্দ্র। ও চোখের ঐ ভাব ও কোন উন্মাদের ছবি, দেখ্‌ছ না, হাব ভাব সকলি বালকের মত—মন অপ্রস্ফুটিত।”

দাদা আমার নিজের ভাবেই ভোর, কাজেই তিনি ভগ্নীর কথার উত্তর দিবার জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না। যা মুখে আসিল তাই বলিয়া বুঝাইতে চাহিলেন। বলি দাদা! এই না তুমি বলিলে—‘নহে চিত্র স্বভাবে অভাব।”—সেটি বুঝি নিজের জিনিষের বেলা? সেটি বুঝি উন্মাদিনী হইতে পারে না!—তার পর উন্মাদের সঙ্গে বালকের তুলনা কোথাও দেখি নাই, শুনি নাই।

মুঞ্জরার দাদার উত্তরে তৃপ্তি হইল না, বলিল,—“আমার বোধ হয়, নির্ম্মল মন, বাল্য সরলতা এখনও হৃদয় পরিত্যাগ করেনি, কুটিল সংসার দেখ্‌বে না বলেই যেন চক্ষু লক্ষ্য শূন্য।

চন্দ্র। এই তো তুই ভাবে গদগদ হয়েছিস্।”

ভ্যালা মোর ভাইরে! দাদা, মুঞ্জরা তোমারী সম্পর্কে শ্যালী না শ্যালকজায়া? তুমি কি বাল্যকালে কোন উপদেশ পাও নাই? পিতা, ভগ্নী, ভগ্নীস্থানীয়ার সহিত কি ভাষায় কথা কহিতে হয় তাহা কি বিন্দুমাত্রও তুমি শিখ নাই? আমাদের অনুরোধে যদি গিরীশবাবু এই অসভ্য অভব্য রাজপুত্রটির কাণ মলিয়া গালে দুটা চপেটাঘাত করেন তো আমরা বড় সুখী হই। মুকুল সংসার জ্ঞানহীন বটে কিন্তু চন্দ্রধ্বজ ও কি তাই?

তার পর চন্দ্রধ্বজ চলিয়া গেলেন। মুঞ্জরা ছবি খানি লইয়া আবার ছড়া কাটাইতে লাগিল।—

“এ উন্মাদ জগৎ উন্মাদ করে” ইত্যাদি।

এই বর্ণনার মধ্যে একস্থলে আছে,—

"সুখী তথা
তরুলতা পাখী দেখি কল্পনাকৌশল ?"

পাখী দেখিয়া সুখী হয় হউক কারণ বিধাতা তাহাকে দেখিবার জন্য দুইটা চক্ষু দিয়াছেন, কে তাহাতে বাদী হইবে ? কিন্তু গিরীশবাবু দয়া পরবশ হইয়া তরুলতাকে যদি চক্ষু সহস্র দান করেন, তাহা হইলেও কি তাহারা দেখিতে পাইবে ? অথবা তরুলতাকে কল্পিত চক্ষু দিয়া কল্পনা কৌশল দেখাইয়াই বা কবির এমন বিশেষ লাভ কি হইল এমন কি মহান্ কবিত্বের প্রকাশ হইল তাহা আমরাত বুঝিতে পারিলাম না। কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন একবার গাছে গাছে 'পুলক" নাচাইয়াছিলেন, গিরীশবাবুর ও ইহা সেইরূপ। আর একটি উপমা আছে ;—

"বিধাতার ধ্যানের গঠন এবদন"

ইহা অতি সুন্দর! তবে জিনিষটি গিরীশ বাবুর নিজের নহে, ৺কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "মহিলা"কাব্যের মধ্য হইতে ভাবটি সংগ্রহ করা হইয়াছে মহিলার আছে ;—

"সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,"

চুরী করিয়া কিন্তু গিরীশ বাবু জিতিতে পারেন নাই ; কারণ তিলোত্তমা মূর্ত্তি সৃষ্টির সময় বাস্তবিক বিধাতাকে ধ্যান করিয়া গড়িতে হইয়াছিল, প্রমাণ তাহার নামে। তাহার পর ঐ সকল কথা হইতেছে এমন সময়ে মুকুল তথায় উপস্থিত।

মুকুল আসিল কিরূপে ? আসিলই বা কেন যোগী কি তাহাকে আটকাইয়া রাখেন না ? অথবা তিনি কি তাঁহার মুঞ্জরাকে ছবিদানরূপ কৌশলের ফল ফলিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া শীঘ্র ফললাভের জন্য মুকুলকে আবার মুঞ্জরার দৃষ্টিপথে আনিয়া ফেলিলেন ? মুকুল আসিয়া মুঞ্জরাকে বলিল—"তুমি ফুল চাচ্ছিলে? এই নাও।" মুঞ্জরাকে তবে মুকুল আগে একবার দেখিয়াছে, কিন্তু মুঞ্জরাতো দেখে নাই, তাহা তাহার ছবি দর্শনের সময়কার কথায় আছে ; কিন্তু মুকুল ফুল দিতে আসিল কেন ?

মুকুলই তাহার উত্তর দিতেছে—"তুমি নেবে না ? তুমি পরবে বলে এনেছি। * * * তুমি বল্‌ছিলে বেশ ফুল ফুটে রয়েছে, তাই তুলে এনেছি. আমি তখন লতার বনে বসেছিলেম।"

পাঠক ! কারণ পাইলেন কি ? মুঞ্জরা প্রস্ফুটিত ফুলের প্রশংসা করিয়া ছিল বলিয়া জড় মুকুল ভাবিল এ যখন ফুলের প্রশংসা করিল তখন ইহার প্রাণে ফুল লইবার ইচ্ছা ঈষৎ জাগরিত আছে অতএব আমি পাড়িয়া দি। তারপর মুকুল ফুল পাড়িয়াছে, লতাবন হইতে মুঞ্জরাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এই পথে আসিয়া ধরিয়াছে! এতটা কার্য্য এতটা চিন্তা কি জড়ের পক্ষে অসম্ভব। অতএব পাঠকগণ বিবেচনা করুন মুকুল কি ?

তারপর মুঞ্জরা ফুল লইল, মুকুল বলিল— "আচ্ছা পর" এখন ; (চামেলীর প্রতি) পর্‌লে তুমি দেখ, ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন, বেশ দেখাবে,—বেশ দেখাবে, হি হি হি হি।"

মুকুল কিরূপে জানিল, কিরূপে বুঝিল যে পুষ্পাভরণে স্ত্রী-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বা কমনীয় কান্তিতে পুষ্পাভরণ ধারণ করিলে সে পুষ্পেরও শোভা বৃদ্ধি হয় ?—আমরা প্রথম দৃশ্যে দেখাইয়াছি—মুকুল জড়তাপন্ন হইলেও পার্থিব জ্ঞানহীন নহে, পূর্ব্বস্মৃতি বিশিষ্ট, মাতৃপ্রিয়, নানাবিধ বাসনার খেলাও তাহার প্রাণে আছে, আর এখানে দেখিতেছি, মুকুল স্ত্রী-

সৌন্দর্য্য বুঝে, স্ত্রী সৌন্দর্য্যের উচ্চনীচতা বুঝে, চামেলী ও মুঞ্জরার পার্থক্যও বুঝে, (নতুবা চামেলী কেও ফুল দিল না কেন ?) সৌন্দর্য্য দেখিতেও সে লোলুপ, পরের অন্তরের ক্ষীণ ইচ্ছাও বুঝিতে পারে, পরের কার্য্য করিয়া নিজে তৃপ্ত হইতে চাহে, কবির চক্ষে স্ত্রী সৌন্দর্য্যের সহিত কুসুম শোভার মিলনে কুসুমের বা স্ত্রীর শোভা বৃদ্ধি বুঝিতে পারে এবং তাহা যে দেখিবার জিনিষ তাহা বুঝিতে পারিয়া অপরকে দেখিতে অনুরোধ করে। এততেও কি মুকুলকে জড় বলিতে হইবে ? যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের কথায়, মুঞ্জরার আগ্রহে আর কবি গিরীশের অনুরোধে পড়িয়া কি এখনও আমরা মুকুলকে "শূন্যহৃদি, মনোবিকাশ হীন" বলিব ? এবং "জন্মভূমির" সমালোচক শ্রীবিহারীলাল সরকারের মত অন্ধ দৃষ্টিতে বলিতে হইবে "মুকুল প্রেমেই ফুটিয়াছে।"—আমরা কবিকে ও বিহারীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, মুকুলের মুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব্বে কোন্ জ্ঞানটি প্রস্ফুটিত ছিল নাই ?

রূপজ মোহ ঘটাইয়া জড়মনকে ফুটাইতে হইলে তাহার মনে কিরূপ পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ ঘটে তাহার প্রত্যেক ক্রমগুলি দেখাইয়া দেওয়াই কবির কর্ত্তব্য তাহা না দেখাইয়া দিলে কবিকে ও পাঠককে যে বিপদে পড়িতে হয়, তাহাই এই স্থানে ঘটিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় জড় মুকুল যেই তিলোত্তমা তুল্যা সুন্দরী মুঞ্জরাকে দেখিত, অমনি তাহার রূপ দর্শন শক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্দ্দর্শনাশা ঈষৎ জাগিত। তৎপরে এই আশার ভরে মুকুলমুঞ্জরার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। তাহার পর মুঞ্জরার অদর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি ফুটিত এবং পূর্ব্বস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অভাব জ্ঞান জন্মিত, তখন সে এক দুটা অসংলগ্ন বাক্যে সেই অভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিত, যোগী বা তারা তাহা হইতে তাহার ভাব বুঝিয়া তাঁহার ব্যবস্থা করিত, তবে যেন ঠিক হইত নতুবা এরূপ একটা কার্য্য এরূপ হঠাৎ হয় না। এরূপ একটি চিত্রে ক্রমবিকাশ না দেখাইয়া প্রথম দর্শনেই একবারে আঙ্গুল ফুলাইয়া কলাগাছ করিয়া তুলিলে গ্রন্থকারের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় তাঁহার দৃষ্টি নাই বলিয়া স্থির করিতে হয়।

তারপর আমরা যে প্রমাণ করিতেছি সে মুকুল ঠিক কবির উদ্দেশ্যানুযায়ী জড় নহে, তাহার বিশেষ প্রমাণ এইবার দিতেছি। সে নিজ মুখে নিজের যে পরিচয় দিয়াছে তাহা হইতে দেখাইব যে সে তাহার নিজের অবস্থা পরিচয় ইত্যাদি সম্বন্ধে সে সমস্ত জানে, সমস্তই তাহার মনোমধ্যে দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিস্ফুট রহিয়াছে কেবল গিরীশ বাবু ও তারার খাতিরে পড়িয়া এবং যোগীবর অচ্যুতানন্দ কর্ত্তৃক বীরসেনের প্রতি অভিসম্পাত অব্যর্থ রাখিবার জন্যযেজড়ের ভাণ করিয়া আছে; যথা,—

"মুঞ্জরা। তুমি কে ?

মুকুল। আমি এইখানে থাকি।"

উত্তরটি জড়ের ন্যায় হইয়াছে, কিন্তু এইটুকু সব নহে, মুকুল আরও অনেক কথা বলিতেছে —

"মুঞ্জরা তোমার কে আছে ?

মুকুল। মা ছিল কোথায় গিয়াছে, দিদি ছিল কোথায় গিয়েছে, সবাই কোথায় গিয়েছে।

দিদি বলেছে এই বাবার কাছে থাক্‌তে, তাই এখানে থাকি।”

মুকুল সব হারাইয়া যে বিশেষ কষ্টে আছে, তাহা এই কথা গুলিতে বুঝা যায়। তাহার মুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব্বেই হৃদয় এতটা উন্মেষিত, হৃদয় দর্পণে হৃদয়ের অভ্যাস এতটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে তাহার কথায় পূর্ব্বস্মৃতি ও অভাব জনিত কষ্ট অনুভূত হইতেছে!

“মুঞ্জরা তুমি আগে কোথা ছিলে?

মুকুল। কোথায় ছিলেম কে জানে?”

যে মুকুল হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিতে জানে, সে মুকুল বাসস্থানের নামটা জানে না বা বলিতে পারে না? এখানে না পারুক, একটু পরেই যে প্রকারান্তরে তাহা বলিয়াছে, তাহা দেখাইতেছি

“মুঞ্জরা তোমার কিছু বাল্যকালের কথা মনে হয় না?

মুকুল না আমার সব ছায়া ছায়া মনে হয়। আমার যেন রাত হয়েছিল তোমায় দেখে যেন দিন হয়েছে আমি আর ফুল তুলে আন্‌ব?”

গিরীশ বাবু “জড় মুকুল” আঁকিতে গিয়াছেন কিন্তু ছবি দাঁড়াইয়াছে “ন্যাকা মুকুলের.” মুকুল একবার বলিল বাল্যকথা মনে হয় না, আবার পরক্ষণেই বলিল সব ছায়া ছায়া মনে হয়. তারপর (যদি ও তাহার “কত যত্নে না হইল মনের বিকাশ তবু) সে কবি গিরীশচন্দ্রের অপেক্ষাও কবিত্ব ফলাইয়া বলিল “আমার যেন রাত হয়েছিল তোমায় দেখে যেন দিন হয়েছে” আরও সে “আমি আর ফুল তুলে আন্‌ব” এই কথাটা পড়িয়া যেন মুঞ্জরাকে ঐরূপ প্রশ্ন সকল হইতে কৌশলে নিরস্ত করিতে চাহিতেছে নতুবা ফুল গ্রহণ সম্বন্ধে মুঞ্জরা তাহাকে কোন আগ্রহই দেখায় নাই, অতএব সে ঐ কথা বলে কেন?

“মুঞ্জরা। তুমি হাস্‌ কেন?

মুকুল। আমি জানিনে, আমার বুকের ভেতর কেমন কর্‌ছে, তাই হাস্‌ছি. কি কর্‌ছে বল্‌তে পার্‌ব না, তুমি এত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে আমি কিছু বল্‌তে পার্‌লেম না, আমার এক-একবার মনের ভিতর কেমন কর্‌ছে; কেন বল্‌তে পার্‌লেম না; আমার বড্ড ইচ্ছে হ্‌চ্ছে তোমাকে বল্‌তে পারি, তুমি আমায় বল্‌তে শেখাবে? ঐ দেখ আবার হাসি আস্‌ছে, কিন্তু হাস্‌ব না. আমি হাস্‌লে তুমি ভাল বাস না. আমার কেমন হয়ে যায়! * * * তোমার মনে কিছু দুঃখ হচ্ছে? হুঁ হচ্ছে। আমি বুঝ্‌তে পারি. আমি যখন কতকি বলি, আপনি আপনি হাসি; দিদি অমনি আমার মুখপানে চেয়ে থাকে, তার দুঃখ হয়.—তার দুঃখ হয়, আমি বুঝ্‌তে পারি, আমি বুঝ্‌তে পারি।”

চামেলী। তুমি সুখ দুঃখ বুঝ্‌তে পার?

মুকুল। না ওটা (সুখ) বুঝ্‌তে পারিনে, দুঃখ বুঝ্‌তে পারি, বল্‌তেও পারি কেমন; আমি এই চলে যাব, একে দেখ্‌তে পার না, আমার মনটা এক রকম হবে, তার নাম দুঃখ।

চামেলী। আর রাজকুমারী দেখ্‌লে যা হয় তার নাম সুখ।

মুকুল। না না খালি মনে হচ্ছে আমি চলে যাব, আর দেখ্‌তে পাব না এ দুঃখ একটু ভাল

দুঃখ। আমি কি কর্‌ব জান? আমি রাজকুমারীর পর দাগ গুলি দেখ্‌ব।”

মুকুল যত ন্যাকামীই করুক, যত পাগলামীই করুক, যত হাব্‌লাটেপনাই করুক, কিন্তু তাহার এই কথাগুলি হইতে কি বোধ হয়? মুকুল সব বুঝে সব জানে, নতুবা সে হাসে কেন? যে সুখ কিছুই বুঝে না, কেবল দুঃখই বুঝে তাহার প্রাণে হাসি আসে কোথা হইতে? “তুমি আমায় বল্‌তে শেখাবে?”—এ প্রার্থনা কেন? “আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে বল্‌তে পারি”—এ বলিবার সাধ কেন? প্রথম দর্শনেই মুকুল প্রেমের আদান প্রদান চায় নাকি? পরস্পর মনের কথা বলাবলি করিলে যে কি সুখ কি তৃপ্তি তাহা কি মুকুল ইতি মধ্যে বুঝিয়াছে? যাহার “কত যত্নে নাহি হল মনের বিকাশ”—তাহার এই মুহূর্ত্ত মাত্র দর্শনে বা আলাপনে কি এতটা হয়? তার পর না হয় ইচ্ছার বিকাশ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ কি তাহার বিচার ক্ষমতা আসিতে পারে?—সে কিসে বুঝিল মুঞ্জরা তাহার হাসি ভাল বাসে না? “এ দুঃখ একটু ভাল দুঃখ?”—সাধে বলিয়াছি জড় মুকুল গিরীশ বাবু অপেক্ষাও কবি! সে ইহার মধ্যে বিরহ না হইতে বিরহ বুঝিয়াছে, বিরহের জ্বালা বুঝিয়াছে, বিরহে প্রণয়ের তৃপ্তি দেখিয়াছে, বিরহে প্রণয়িনী চিন্তা কত সুখের তাহাও জানিয়াছে, তাই সে আবার বলিতেছে অন্যান্য দুঃখের মধ্যে বিরহ একটু ভাল দুঃখ আরও বলিতেছে, “আমি কি কর্‌ব জান? রাজকুমারীর পার দাগগুলি দেখ্‌ব।”—মুকুল—অবোধ, অজ্ঞান, জড় মুকুল প্রথম দর্শনেই তন্ময়ত্ব লাভ করিল নাকি? শত বর্ষের বিরহ সহ্য করিয়া রাধা যে উপায়ে চিরবাঞ্ছিতের আদর্শ দুঃখ প্রশমিত করিতে চেষ্টা পাইতেন, এক নিমেষের দর্শনেই মুকুল সেই অবস্থা পাইল নাকি?—সে কি ইহার মধ্যেই বুঝিল যে রাজকুমারীর অদর্শনে তাঁহার পায়ের দাগগুলি দেখিলেও তাহার তৃপ্তি হইবে?—তাহার বিরহ না ঘটিতে ঘটিতে তাহার প্রাণে বিরহ কি এতই চাপিয়া বসিয়াছে?

জড় মনের এতটা বিকাশ হইতে যে সময় আবশ্যক সে সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি করিলে যে দোষ হয়, এখানে তাহা পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছে। মনের এতটা পরিবর্ত্তন মনস্তত্ত্বানুসারে এত শীঘ্র ঘটিতে পারে না। রূপ দর্শন হইতে রূপের আকর্ষণের প্রভাব, তৎপ্রভাবে দর্শনলালসা, লালসার পর দর্শনে তৃপ্তিলাভ, তৎপরে আসক্তি, আসক্তির পর অদর্শনকালে অভাব বা দুঃখ বোধ, তৎপরে বিরহ ইত্যাদি মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি পরম্পরা দেখাইতে গেলে মুকুলকে একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া কতবার রঙ্গস্থলে আনা উচিত ছিল, তাহা গিরীশ বাবু বুঝেন নাই, অথবা বুঝিয়াই দৃশ্যাবলী কমাইবার জন্য এক কোপে মুকুলকে এরূপে বলি দিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় গিরীশ বাবু মনস্তত্ত্ববিদ্ বিচারক্ষম লেখক নহেন, তিনি এরূপ একটি চরিত্র ধারণা করিতে পারিলেও কলমে ফুটাইতে পারেন না। তাহা পারিলে তিনি তাঁহার সাধের মুকুলকে এত তাড়াতাড়ি ফুটাইয়া মাটী করিতেন না। তাঁহার এ ক্ষমতা নাই বলিলাম এই জন্য যে, ইহা অনা-

সমালোচনা কালেও দেখা গিয়াছে। তিনি যখন জৈমিনি বা কাশীদাসের ছবি গুলিই ঠিক রাখিতে পারেন নাই, নকল করিতেও ভুলিয়াছেন, তখন একটি নূতন ছবি উদ্ভাবিত করিয়া পূর্ণরূপে আঁকিতে তিনি কখনই পারেন না।

মুকুল তাহার পর বলিল—

ঐ একটা কথা বুঝ্‌তে পেরেছি—দিদি আমায় বলে ভালবাসি, সেকি বল্‌ব?—এই তোমায় ভালবাসি। মুকুল ভালবাসা বুঝিয়াছে এক দিনে না এক মুহূর্ত্তে? সে দিদির ভ্রাতৃস্নেহ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিত আজ দিদির ভ্রাতৃস্নেহ ও মুঞ্জরা-প্রেম এই উভয়বিধ ভালবাসার পার্থক্য সে কি বুঝিয়াছে?—বুঝিয়াছে বৈকি! নতুবা সে দিদির অদর্শনে দিদির পার দাগ দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাহে না কেন?—সে বুঝিয়াছে, তাহা হয় না; নতুবা সে বলিত 'দিদিকে যখন না দেখি, তখন তার পায়ের দাগগুলি দেখি,' চামেলী তাহার পর যেই শুনাইল—ছিঃ ওকথা কি বল্‌তে আছে?— * * *

মুকুল। বল্‌তে নেই, আমি কুটীরে থাকি বলে বল্‌তে নেই, যদি তোমাদের মত ঘরে থাক্‌তেম, তোমাদের মত কথা কইতে পার্‌তেম, তোমাদের কথা বুঝ্‌তে পার্‌তেম তা হলে তোমাদের কাছে থাক্‌তেম আবার তোমায় ভালবাসি বল্‌তেম। তুমি মানা করনা আমি চল্লেম।"

এইখানে গিরীশ বাবুর কৌশল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গিরীশ বাবু এতক্ষণ অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে মুকুলকে একপ্রকার অর্দ্ধজড় অর্দ্ধজ্ঞানী সাজাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু চামেলীর কঠোর কথায় মুকুল আর সাম্‌লাইতে পারিল না. সে তাহার প্রাণের চাপা ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে স্পষ্টই বলিল—আমি কুটীরে থাকি• আমার গৃহাদি নাই. তোমাদের মত আমার ভাব ও ভাষা নাই বলিয়াই তোমরা আমায় প্রত্যাখ্যান করলে. (নতুবা আমি আর কিসে তোমাদের অনুপযুক্ত?) ইহা হইতেই আরও বুঝিতেছি যে মুকুল যেন তাহার পূর্ব্বাবস্থা-নাশের জন্য ঈষৎ সন্তপ্ত, যেন সে ভাবে যে যদি আমার রাজ্যাদি আজ থাকিত তাহা হইলে আজ আমায় ইহারা এ কথা বলিতে পারিত না। আজ ইহাদিগকে আসল কথা শুনাইয়া দিতে পারিতাম।

পাঠক! মুকুল এইরূপে অতর্কিত ভাবে নিজের অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। যদিও মুকুল স্বীকার করিয়াছে সব ছায়া ছায়া দেখ্‌তেম্"—তথাপি আমরা "কত যত্নে না হইলে মনের বিকাশ," "প্রশস্ত ললাট ধীবিহীন" "জ্ঞান জ্যোতিহীন" "হৃদয় দর্পণে নাহি হৃদয় আভাস" "শূন্যহৃদি" ইত্যাদিতে বেশী বিশ্বাস করিয়াছি বলিয়া ঐ "ছায়া ছায়া"—জ্ঞানেরও অনিশ্চয়তা উপলব্ধি করিতেছি। যদি তর্ক স্থলে এমন কেহ বলেন যে, তারা যোগীকে মোটামুটি দুই চারিটা কথা বলিয়া মুকুলের অবস্থা কতকটা আনাইয়া দিয়াছি মাত্র, প্রকৃত অবস্থা যাহা, তাহা আমরা মুকুলের মুখেই মুকুলের কার্য্যেই বিশিষ্টরূপ জানিতে পারি। বেশ কথা, দেখা যাউক তাহাই বা কিরূপ;—

১। মুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব্বে মুকুলের সব ছায়া ছায়া জ্ঞান হইত,—তাহা যথার্থ; সে মাতৃস্নেহ

স্মরণ করে, মার কাছে যাইতে চায়, তাহার গৃহদ্বার মনে পড়ে। তাহার দিদি ও মা কোথায় গিয়াছে সে, সে জন্য যেন ঈষৎ দুঃখিত। তাহার আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা আছে।

২। মুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব্বে সে সুখ বুঝিত না দুঃখ বুঝিত;—তাহাও যথার্থ,—সে মিথ্যা দোষারোপে রাগ করে, মুঞ্জরা ফুল না লওয়ায় সে মনোকষ্ট পায়। সে যখন আপ্‌না আপ্‌নি বকিত, তখন তাহার দিদি তাহার মুখের দিকে যে ভাবে চাহিত, তাহা দেখিয়া সে বুঝিত যে তাহার দিদির দুঃখ হইত। মুঞ্জরাকে দেখিতে না পাইলে তাহার "একটু ভাল দুঃখ" হইবে। সে মুঞ্জরার পায়ের দাগ দেখিয়া সে কষ্ট নিবারণ করিবে।

৩। মুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব্বে সে ভালবাসা কথাটা বুঝিত তাহাও যথার্থ,—সে বলিয়াছে, দিদি আমায় বলে ভালবাসি," সে নিজে মুঞ্জরাকে বলিয়াছে "তোমায় ভালবাসি," সে ভালবাসা বুঝিত বলিয়াই সে মুঞ্জরার মুখে ফুলের প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে ফুল দিতে আসিয়াছিল, সে ভালবাসার পার্থক্যও বুঝিত বলিয়া মুঞ্জরাকেই পরিবার জন্য ফুল দিতে আসিয়াছিল। আর তাহার অদর্শনে তাহার পায়ের দাগ দেখিবে বলিয়াছিল।

এখন পাঠক! বিচার করুন যাহার মনে মুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব্বে একটা ধারণা এতটা ভাব এত বিভিন্নবৃত্তির স্ফুর্ত্তি ছিল, তাহাকে তারা ওরূপ ভাবে পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইল কেন? তারপর মুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব্বে মুকুল দুঃখই বুঝিত সুখ বুঝিত না; কে বলিল?—সে নিজে বলিতেছে,—

"মা কোথায়?—চলনা সেথায়"

"তুমি পরবে বলে এনেছি"—"পরলে তুমি দেখ ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন, বেশ দেখাবে এখন, বেশ দেখাবে বেশ দেখাবে--হি হি হি।" "তোমায় বল্‌তে শেখাবে," "আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে বল্‌তে পারি," "আমার বুকের ভিতর কেমন কর্‌ছে, তাই হাস্‌ছি," "আমি রাজকুমারী পার দাগগুলি দেখ্‌ব (অবশ্য শান্তি বা সুখের আশায়)"—ইত্যাদি কথা গুলি কি সুখবোধের পরিচায়ক নহে?

এতক্ষণে যাহা দেখিলাম তাহাতে দেখিতেছি যে মুকুলের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা ঠিক করা সুকঠিন। মোটের উপর বলিতে পারি মুকুল জড় নহে, তবে কতকটা সাজান গোছান ন্যাকা এবং কতকটা কুটীল সংসারের অত্যাচারে বিমাতার জ্বালায় পড়িয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক। তাহার প্রাণের ভাব সবই ঠিক আছে কেবল ভাষাই যেন মাথা পাগ্‌লার মত। হ্যামলেট যেমন প্রয়োজন বশতঃ পাগল সাজিয়াছিল বোধ হয় তারার ইচ্ছায় মুকুলও সেইরূপ হাবা সাজিয়াছে।

ইহার পর মুকুলকে যে অবস্থায় পাইব তাহা অনেকটা বিকশিত অবস্থা সুতরাং মুকুলের গঠন প্রণালী বিচার করিতে হইলে পাঠককে এই পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে হইবে।

এই দৃশ্যে চামেলী সুচিত্রিতা, মুঞ্জরা বেশ উজ্জ্বলা তবে তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। প্রেমমূলক কাব্যের নায়িকারা যেমন হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে।

তারপর মুকুল মধ্যে মধ্যে ফুল দিতে পাইবে শুনিয়া চলিয়া গেল। মুঞ্জরা মুকুলের রূপে ও ভাবে গলিয়া চলিয়া গেল।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব। *

আমরা দুই খানি "শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত" পাঠ করিয়াছি। এক খানির প্রণেতা বাবু অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, আর এক খানির প্রণেতা বাবু অচ্যুত চরণ চৌধুরী। দুইখানি পুস্তকই এক বৎসরের মধ্যে —১৩০০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এক বৎসরে একই নামে স্বতন্ত্র দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই; আমরা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে এই বলিতে পারি যে, অঘোর বাবুর পুস্তক যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন অচ্যুত বাবুর পুস্তক যন্ত্রস্থ। সুতরাং অচ্যুত বাবু প্রথম প্রকাশিত অঘোর বাবুর "রঘুনাথ দাস" হইতে কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু অচ্যুত বাবু নিজের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পরে, অঘোর বাবুর সহিত যেরূপ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া সেকালে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ হয়।

অচ্যুত বাবু 'দাসী'তে যবন কুলোদ্ভব হরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ বংশাবতংস বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী পরিচালন করেন। ভক্ত হরিদাস ব্রাহ্মণ কি যবন ছিলেন, সে মীমাংসা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু এ কথা বলা কর্ত্তব্য যে, অচ্যুত বাবুর হরিদাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তই মনে উদয় হয় যে, হরিদাস যবনই ছিলেন। অচ্যুত বাবু নিজ মুখে "কবুল জবাব" না দিলেও তিনি এমন সকল যুক্তি পরম্পরা উপস্থিত করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে হরিদাসকে যবন বলিয়াই প্রতীতি হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের যে সকল জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরলোকগত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত "চৈতন্য লীলামৃত" গ্রন্থ ঐতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। বাবু শিশির কুমার ঘোষ, "অমিয় নিমাই চরিত" লিখিয়াছেন, সেখানি কিন্তু অভিনেতা শিরীশ বাবুর "চৈতন্য লীলার" ন্যায় কাব্য গ্রন্থ। অচ্যুত বাবু হরিদাসের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সেই চৈতন্য-কাব্য-প্রণেতা শিশির বাবুকেই প্রধান "সাফাই" মানিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই, শিশির বাবু কাহাকে'সাফাই' মানিবেন? "শিশির বাবুর লেখা" ইহা ব্যতীত 'অমিয় নিমাই চরিতের' উক্ত কথার আর কি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে।

প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার নিয়ম এদেশে কখনও ছিল না। রূপক, অলঙ্কারে প্রকৃত

* এ সম্বন্ধে কেবল আমাদের সহৃদয় লেখক বর্গকে দোষারোপ করা হইয়াছে, বলিয়াই এ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইল, লেখক আপনার নাম দেন নাই, নাম ধাম না দিলে, ইহার পর তাঁহার আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। সম্পাদক—

ঘটনা সমূহ আচ্ছাদিত করিয়া জন সমাজ-সমক্ষে ধারণ করা এতদ্দেশীয় কবিগণের কার্য্য ছিল। এখন যাঁহারা ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে অনেক আবর্জ্জনা, পঙ্কিলতা দূর করিয়া সত্য ঘটনা উদ্ধার করিতে হয়। উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কারকগণ যেমন দুই হাতে বরফের চাপ কাটিয়া, গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লক্ষ্য স্থানে গিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ইতিহাস লেখকদিগকেও তেমনই ভাবে চারি পাশের কল্পনার চাপ কাটিয়া সত্যের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। সুতরাং আমাদের দেশের ইতিহাস লেখকগণের কার্য্য বড়ই গুরুতর।

অঘোর বাবু বহুদিন হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনি শিক্ষিত, জ্ঞানবান এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ে সক্ষম। তিনি কুসংস্কার ও কল্পনা কণ্টকময় প্রাচীন সাহিত্য কাননে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত চন্দন তরু আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার দ্বারা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিরচিত হইবে। অচ্যুত বাবু প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে সত্য অসত্য আলোক অন্ধকার, ইতিহাস ও উপন্যাস মিশ্রিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইতিহাসের হিসাবে ধরিতে গেলে, অঘোর বাবুর 'রঘুনাথ" প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ, দ্বিতীয় খানি কল্পনা জড়িত। এখানিকে সে কালের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

অচ্যুত বাবু 'দাসী' ও 'সমীরণে' যে সকল বাদ প্রতিবাদের প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে সুলেখক বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু 'রঘুনাথ দাস' পাঠ করিলে, অচ্যুত বাবুকে তাহার লেখক বলিয়া মনে হয় না। তিনি ইচ্ছা করিলেই পুস্তকখানি ভাল ভাষায় লিখিতে পারিতেন,—কেন বটতলার ভাষায় লিখিলেন? নমুনা স্বরূপ দু একটী স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি;—

"নিত্য সিদ্ধ ভক্তগণের জন্মাদি মুকুন্দবৎ অর্থাৎ তাঁহারা লীলার সাহায্যার্থ অবনীতে আইসেন।

"এই রঘুনাথ দাস অতি আশ্চর্য্য বস্তু" * * "কি অদ্ভুত উদ্বেগ" * * বৌদ্ধ—যবন।

"এখানে আপনি বলিতে পারেন যে, রঘুনাথের এ বড় অন্যায়, পিতা মাতা ও নব বধূটীকে ফেলিয়া যাওয়া বড় অন্যায়। কিন্তু রঘুনাথ কি যথার্থই বড় দোষী?" * * "আপসে রঘুনাথকে দেখিলেন সুখী। এই জন্য তাঁহাকে বলিতে চান এবং তাঁহার পায়ে সুদৃঢ় শৃঙ্খল পরাইয়া দেন। আর রঘুনাথ প্রাণের যন্ত্রণায় সে শৃঙ্খল মোচন করিলে তাঁহাকে দুষেন, একি উচিত?"

"রঘুনাথ জগন্নাথ দর্শনান্তর প্রভুর অবশিষ্ট ভোজন ও নাম গ্রহণ করেন।"

গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এই রূপ অপরূপ বর্ণনায় বিভূষিত। কিন্তু অচ্যুত বাবু মধ্যে মধ্যে "শব্দাস্বুধি"ও ব্যাবহার করিয়াছেন, রঘুনাথের স্ত্রীর কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"আর লোকললামভূতা সেই লাবণ্যময়ী বালিকাটী যিনি কেবল স্বামী দর্শন ভিন্ন অন্য কোনও সুখ বোঝেন না" ইত্যাদি, রঘুনাথের নব পরিণীতা ভার্য্যার মধ্যে এমন কি গুণ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল যে, তিনি বালিকা বয়সেই "লোকললামভূতা"

হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথই ঐতিহাসিক চিত্র, তাঁহার স্ত্রী কোন্ গুণে 'লোকললামভূতা' হইলেন, নিগূঢ় ঐতিহাসিক তত্বটা কুটললাটে লিখিয়া দিলে ভাল হইত।

হংস যেমন জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষীর গ্রহণ করে, অচ্যুত বাবুও তেমনি ভাবেই সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন!! উদাহরণ স্বরূপ দু একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

"রঘুনাথের এ আত্ম-সমর্পণ নূতন নহে। তিনি জন্মে জন্মে ঐ শচীনন্দনের চরণেই জীবন সমর্পণ করিয়া থাকেন।"

"তিনি (রঘুনাথ) মানসে সেই সব সুস্বাদ দ্রব্য প্রস্তুত (পাক) করিতে লাগিলেন। সব প্রস্তুত হইয়া গেলে মানসে তাহা প্রভুকে খাওয়াইলেন।"

"পূর্ব্বে ঐ প্রভুই (শ্রীচৈতন্য) নবদ্বীপে মুরারী গুপ্তের এইরূপ মানসিক সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন এইরূপ তাঁহার পেট ফুলিয়া গিয়াছিল।"

"দাস গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "এই—ই সত্য—আমি মানসে দুগ্ধান্ন প্রসাদ খাইয়াছি।"

"মহাদেব এই অবতারে শ্রীঅদ্বৈত রূপে শ্রীহট্টের নবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।"

পাঠক দেখিলেন, কেমন ঐতিহাসিক প্রমাণ!! অচ্যুত বাবু এইরূপ ঐতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করিয়া অপরূপ ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তৎপরেই বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত অঘোর বাবুর পুস্তকের দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিবাদ স্থলে যেরূপ দৃঢ়তর অধ্যবসায় এবং সুললিত ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অনেকের নিকটেই ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন। তিনি 'রঘুনাথ' প্রণয়ন কালে যদি এই দুইটী উপায় অবলম্বন করিতেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁহার গ্রন্থ সাহিত্য সমাজে মান প্রাপ্ত হইত। দুঃখের বিষয়, আমরা "নিজ চক্ষের কড়ি কাঠ দেখিতে পাই না, পরের চক্ষের অতি ক্ষুদ্র ধূলি কণাও দেখিয়া থাকি।"

অচ্যুত বাবু 'সমীরণ' পত্রে প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনেক বার বৈষ্ণব সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া যদি চৈতন্য ও রূপসনাতনের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতেন তবেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য উজ্জল হইত।*

যদি দেখিতাম, অঘোর বাবু কোনও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম রক্ষার্থ অচ্যুত বাবু বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তবে এত কথা লিখিয়া সময় ব্যয় করিতাম না। অচ্যুত বাবু যে সকল খুটিনাটি ধরিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা ধর্ত্তব্যের বিষয় নহে। কিন্তু অঘোর বাবু তাহারও সদুত্তর দিতে বিস্মৃত হন নাই। একটা কথার উপরে অচ্যুত বাবু খুব জোর দিয়াছেন। তাহা এই—অঘোর বাবু রঘুনাথের অন্তঃলীলা—শেষ জীবনের কোনও কাহিনী বিবৃত করেন নাই। অঘোর বাবু

---

* শ্রীচৈতন্য কেন স্বলিখিত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন এবং দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রূপ গোস্বামী কেন জীবন গোস্বামীর মুখ দর্শন বন্ধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনা বৈষ্ণবগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বলেন যে, তাঁহার পুস্তক বিস্তৃত জীবনী নহে, সংক্ষিপ্ত; সুতরাং সংক্ষিপ্ত ভাবেই সকল কথা বলা হইয়াছে। অচ্যুত বাবুর ও ভাবা উচিত ছিল; তাঁহার নিজের পুস্তকের মূল্য ।০ আনা, অঘোর বাবুর পুস্তকের মূল্য ৵০ আনা মাত্র। তথাচ আমরা বলিতে পারি, অচ্যুত বাবু অনেক বাহুল্য কথা লিখিয়া স্বীয় পুস্তকের আয়তন যেমন বৃদ্ধি করিয়াছেন, আঘোর বাবু তাহা না করায় ভালই হইয়াছে।

অচ্যুত বাবুর প্রতিবাদ 'সমীরণে' প্রকাশিত হইলে, অঘোর বাবু প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। অচ্যুত বাবু বৈষ্ণব ভাবেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, অতি বিনয়ের সহিত কথা বলিয়াছেন। অঘোর বাবু ব্রাহ্মণ, যে জাতিতে দুর্ব্বাসার জন্ম অঘোর বাবু সেই ব্রাহ্মণ কুলাবতংস সুতরাং তাঁহার উত্তরটা ব্রাহ্মণ আলোচিত কর্কশ স্বরেই হইয়াছে। কিন্তু অঘোর বাবুর পরে যিনি আসরে নামিয়াছেন, সৌভাগ্য বশত বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে অনেক চক্রবর্ত্তী, তিনি "সুদে আসলে আদায়" করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহার নাম শ্রীঅনিরুদ্ধ চরণ চৌধুরী। ইঁহারও বাহন 'সমীরণ," নতুবা এত দ্রুতগতি কি করিয়া আসিবেন? 'অনিরুদ্ধ' হইয়াছিলেন কিনা একথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলেও ইহা বলিতে পারি, তিনি 'অবরুদ্ধ' থাকিলেই ভাল হইত। অচ্যুত বাবুর প্রতিবাদের 'ব্যাখ্যা' না করিলেও হইত। কিন্তু বলিলেও কি হয়, প্রতিবাদ হউক আর নাই হউক—অনিরুদ্ধ বাবুর এসম্বন্ধে দু কলম লিখিবার অধিকার আছে, কেননা তিনি অচ্যুত বাবুর "রঘুনাথের" প্রকাশক! আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, পাছে এই দাবি করিয়া অতঃপর প্রিণ্টার মহাশয় আসিয়া দেখা দেন। যা হউক, আমি মাঝখানে পড়িয়া দুটি কথা বলিলাম, কেহ 'অভিসম্পাত করিবেন না।

কলিকাতা। জনৈক সমালোচক।

গ্রাম্য কথা।

১

পাড়ার সতীশ বড় দুষ্ট ছেলে। বয়স ৫।৬ বৎসরের বেশী নয় কিন্তু এই বয়সেই সে সমবয়স্ক সকলের সর্দ্দার। তাহার শারীরিক বল যে বড় বেশী ছিল এমন নহে, কিন্তু তাহার সহিত বুদ্ধিতে কেহ আঁটিয়া উঠিত না। সেই জন্য সকল ছেলে তাহাকে বড় ভয় করিত। তাহার দুষ্টামি অন্য রূপ ছিল—কলহ মারামারি সে বড় ঘৃণা করিত। বুড়াবুড়িদিগের সহিত তাঁহার কিছু মাখামাখি ছিল। বুড়ার তিন কাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে; লাঠিটি মাত্র সম্বল, লাঠির উপর ভর দিয়া তিনি একটুকু আধটুকু নড়িয়া চড়িয়া বেড়ান। লাঠি না হইলে তাঁহার দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই।

বুড়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আসিতেছেন, সতীশ তাঁহার সহিত নিতান্ত ভাল মানুষের মত গল্প করিতে করিতে চলিল। তাহার পর বৃদ্ধ যেখানে বসিলেন, সেই খানে বসিয়া একথা সে কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধের অজ্ঞাতসারে তাঁহার লাঠি খানি একটু তফাতে সরাইয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে বিনা বাক্যব্যয়ে অন্তরালে চলিয়া যাইত। তাহার পর উঠিবার সময় বৃদ্ধ লাঠি না পাইয়া যখন বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, তখন সতীশ দৌড়াইয়া আসিয়া লাঠি খানি বাহির করিয়া দিত, বলিত, "বুড়া হয়েছেন চোখে দেখ্‌তে পান না কেবল মিছে চেঁচাচেঁচি করিয়া পাড়াটা মাথায় কর্‌ছেন।" এই বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চলিয়া যাইত। তাহার দুষ্টামিটা এই রূপ ছিল। দুষ্ট হউক ছেলে কিন্তু অমন সুন্দর ছেলে পাড়ার আর কাহার ছিল? অমন সুন্দর গঠন, অমন স্নিগ্ধ টুক্‌টুকে চেহারা অমন মিষ্ট কথা পাড়ার আর কোন্ ছেলের ছিল? সতীশ যে দিন তাহার বিধবা মাতার সহিত মামার বাড়ি যাইত, সে দিন পাড়াটা যেন সকলের নিকট অন্ধকার ঠেকিত। তাহার চক্ষু দুটিতে এমন একটা চট্‌পটে ভাব ছিল, যাহা দেখিলে বোধ হইত যেন কত কি বিষয় কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, কিছুই করা হইতেছে না, অথচ মিছামিছি সময়টা কাটিয়া যাইতেছে। তাই যখন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড নির্ম্মিত চাবুক হস্তে দলবলসহ সে তাহার মাতার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া "মা খেতে দাও" বলিয়া ডাকিত তখন তাহার সেই ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখিয়া সকলে না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। একবার পাড়ায় এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, সে সতীশের হাত দেখিয়া গণিয়া বলিয়াছিল যে, সতীশ বাঁচিয়া থাকিলে রাজা হইবে। অনেক বৃদ্ধও তাহাই বলিতেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে তাঁহারা বুড়া হইয়া চুল্ পাকাইলেন, ঢের ঢের ছেলে দেখিয়াছেন কিন্তু এমন ছেলে কখন দেখেন নাই।

২

বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। প্রত্যেক ফল-বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে। দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ধূলি-বহুল গ্রাম্য পথটা একটা শ্রান্তজীবের মত উত্তপ্ত বায়ুনিঃশ্বাসে ধুঁকিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঘন পত্রান্তরাল হইতে একটা নিঃসঙ্গ কাঠঠোকরার ডাকে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছিল। ঠিক এম্নি সময়ে সতীশ আরও দুএকটি বালকের সহিত ঢিল ছুঁড়িয়া একটি পুষ্করিণী তীরস্থ বৃক্ষ হইতে আম্র পাড়িতেছিল। সতীশ লক্ষ্য করিয়া একটি সুপক্ক আম্রের দিকে ঢিল ছুঁড়িল; কিন্তু ঢিলটি লক্ষ্যে না লাগিয়া অদূরে এক বৃদ্ধার কলসীতে লাগিয়া তাহা চুরমার করিয়া দিল। এই ব্যাপারে সতীশ বিশেষ দুঃখিত হইল বটে কিন্তু পাছে মাতা তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়া গালি দেন এই জন্য সে আগে দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল. বলিয়া বলিল "মা আমার কি দোষ আছে?" মাতা অভয় দিলেন, সে সেই খানে স্থির হইয়া বসিল। কিছু পরেই ভগ্ন কলসী হস্তে সতীশকে গালি দিতে দিতে সেই বৃদ্ধা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সতীশকে গালি দিতে দিতে বারম্বার তাহার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। সতীশের মাতা এতক্ষণ কিছু বলেন নাই কিন্তু ক্রমশঃ বাড়াবাড়ি দেখিয়া তিনিও বুড়িকে বিল-

ক্ষণ দশকথা শুনাইয়া দিলেন এবং ক্রোধ ভরে "বাঁদর ছেলে তুমিই বা মরতে যাও কেন" বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রাণটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি ত সতীশকে কখন মারেন নাই তবে আজ কেন মারিলেন? তাঁহার হাত যে বড় জ্বলিতেছে, বোধ হয় তাহার বড় লাগিয়াছে। তিনি সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে। যেন তাহার চিরাভ্যস্ত আদরের মধ্যে কোথায় একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া একটা আবেগপূর্ণ অভিমান আসিয়া তাহার পূর্ণোচ্ছ্বসিত চক্ষের জলধারা রোধ করিয়াছে রাখিয়া গিয়াছে একটা স্বপ্নাবেশময় সজল করুণ দৃষ্টি। সতীশের পিঠের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছে। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গত রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, যেন সতীশকে তিনি ধরিতে যাইতেছেন, সে দৌড়িয়া পলাইতেছে। তিনি যতই ধাবিত হইতেছেন সে ততই অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে ক্রমে উভয়ে একটি বেগবতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশ সেই নদী তীরস্থ একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তুপের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া হাততালি দিয়া হাসিতেছে। হঠাৎ সেই স্তুপটি ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাহার সহিত সতীশও নদী মধ্যে নিপতিত হইল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং পার্শ্বে সতীশকে নিদ্রিত দেখিয়া আশ্বস্ত চিত্ত হইলেন। কিন্তু আজ একি করিলেন; তাহাকে মারিলেন কেন? আজ সমস্ত দিন তাঁহার মনটা ভার ভার রহিয়াছে। আজ সতীশ খেলিতে যায় নাই। সে অনেকক্ষণ বিছানায় যাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সতীশের মাতা তাহাকে তুলিতে গেলেন, সে উঠিয়া পূর্ব্বের মত খেলা করে, একটু দৌড়াদৌড়ি করে—এই তাঁহার ইচ্ছা। দেখিলেন, তখনও পৃষ্ঠে তাঁহার হস্তের চিহ্ন রহিয়াছে, কষ্টে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হস্তকে কঠোর বলিয়া অনেকবার গালি দিলেন। পরে পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রিত সন্তানের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার গাত্র এত গরম বোধ হইতেছে কেন? তিনি পাড়ার একজন বৃদ্ধকে ডাকিয়া আনিলেন। বৃদ্ধ হাত দেখিলেন বিলক্ষণ জ্বর বটে। একজন কবিরাজ আনা আবশ্যক। বৈকালে এক জন কবিরাজ আসিয়া ঔষধ দিলেন। পাড়ার সকল লোক অন্য কর্ম্ম ফেলিয়া সতীশদের বাড়িতে আসিয়াছে। তাহার জন্য সকলে বড় কাতর। আর সতীশের মা আজ পাগলিনী আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছেন পীড়িত নিদ্রিত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার কি আর অন্য কিছু জ্ঞান আছে? পর দিবস সতীশ প্রলাপ বকিতে লাগিল। কি বলিতেছিল, কেহ বুঝিতে পারিতেছিল না হটাৎ একবার চমকাইয়া বলিয়া উঠিল "মা আমার বড় লেগেছে।" মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। বৈকালে কবিরাজ আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বিমর্ষ ভাবে উঠিয়া গেলেন।

* * * *

তাহার পর? তাহার পর আজ পাড়ার লোকেরা এক স্থানে জড় হইয়াছে, কাহারও

মুখে কথা নাই সকলেরই মুখে বিষাদ কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহারা এই মাত্র শ্মশান হইতে আসিয়াছে। আর বালকগণ? আজ তাহারা খেলা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারা বড় গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। সতীশ তাহাদিগকে এক দিনে বুড়া করিয়া গিয়াছে।

৩

বিশাখা গ্রামে আজি হাটের দিনে হাট বসিয়াছে এমন সময়ে কোথা হইতে একটি পাগলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেরা তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ পাগলিনী বিকট হাসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "আমার সতীশ রাজা হইয়াছে, তাই বুঝি তোরা আমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইতে আসিয়াছিস? আচ্ছা চল্।" বলিয়া পাগলিনী চলিয়া গেল। ইহার পর আর কেহ তাহাকে কখন দেখে নাই।

দেওয়ালী।

বিমল গগনে, বিমল তারকা
বিমল উজল ভাতি রে!
বিমল লহরী, বিমল সরসী
বিবশ কমল পাঁতিরে!
দিগন্ত বলয়ে, হেমন্তের আভা
তমোরাশি আসি গ্রাসিছে,
ঘুমাইল পাখী, বিটবীর কোলে,
যামিনী ভামিনী হাসিছে।
ঘোর হুহুঙ্কারে, কাঁপায়ে মেদিনী,
ভৈরব বেতাল নাচিছে,
ভকত মণ্ডলী, করি যুগপাণি,
জননী, করুণা যাচিছে।
কে আইল ওই, অমানিশা কোলে,
অমিয় কিরণ ঢালিয়ে,
ত্রিনয়ন কোণে, হানিয়ে বিজলী
কালরূপে আলো জ্বালিয়ে?
আতসী কুসুম, সমা শ্যামাঙ্গিণী,
শিব হৃদি মাঝে রাজিছে,
অরুণ কিরণ, শত শত দল—
চরণে নূপুর বাজিছে।
সমর রঙ্গিণী, বিবসনা ভীমা
কটিতটে কর কিঙ্কিণী
সঙ্গে সহচরী, বিকট দশনা,
ডাকিনী যোগিনী শঙ্খিনী।
বাম করে অসি, দনুজ কপাল
দক্ষিণে অভয় দানিছে,
শিবা, শুভঙ্করী, ভকত বৎসলা,
অসুরে অশনি হানিছে।
গলে মুণ্ডমালা, দোলে দুলমল,
ভুবন মোহন কারিণী,

বলাকিনী নীল পয়োদ মালার
মনোলোভা শোভাধারিণী।
লাজ বিমণ্ডিত স্মের বরাননে
কোটী শশী পরকাশ রে!
চাঁচর চিকণ চামর গঞ্জিত
পৃষ্ঠে দোলে কেশ পাশরে!
কুন্দ দশনে বিলোল রসনা!
অধর রুধির-রঞ্জিত,
দীপ্ত দিবাকর, মাণিক্য-মুকুটে
গিরিবর চূড়া গঞ্জিত।
আন ভক্তগণে, জবা বিল্বদল,
বিবিধ কুসুম রাশিরে!
পূজ প্রেমভরে, ও রাঙ্গা চরণ,
মানস তিমির নাশিরে!
ভক্তি স্নেহে মাখি, এ দেহ দশায়
হৃদয় প্রদীপ জ্বালিয়ে,
প্রীতি পূতবারি নয়ন সলিল
দেহ রে ওপদে ঢালিয়ে।
ভাবের উচ্ছ্বাস আতস বাজিতে
তোষ রে বিপদবারিণী,
কাম, ক্রোধ আদি, দেহ বলি পদে,
তবে ত তারিবে তারিণী।

দুটা পুরান কথার আলোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁহাদিগের এদিকে অন্তর্দৃষ্টি থাকুক আর নাই থাকুক লোকে কিন্তু কি বুঝিল? বুঝিল যে —সাররিচার্ড কাউডকে বরোদা কমিসনের প্রেসিডেণ্ট করিয়া উচ্চ আসনে বসাইয়া বড়লাট যে জয়পুর সিন্ধিয়ারও মস্তক অবনত করিলেন ইহার ভিতরেও তাঁহার গুঢ় অভিসন্ধি আছে। এক জন প্রেসিডেণ্ট আবশ্যক—এ ছুতাও খাটে না। কমিসনারগণ প্রত্যেক বারের জন্য নূতন নূতন চেয়ারম্যান মনন করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহারা যাহাকে খুসী মনস্থ করিলে তাঁহাদের সম্মান হানি হইত না; হয় ত মহারাজাগণ পরস্পর ঈর্ষা-পরবশ হইয়া বড় লাটেরই মনের মানুষকে ঐ পদে বসাইতেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় বড় লাটের মতলব সাধন ত হইবে না। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে বরোদা কমিসন কেবল সাররিচার্ড কাউচেরই কমিসন; সাররিচার্ড এবং অন্যান্য বৃটীষ অফিসারগণই সর্ব্বেসর্ব্বা—এ দেশীয় রাজা মহারাজাগণ কেবল সাজান পুত্তলিকা। দেশীয় রাজা মহারাজা ও রাজনৈতিকগণের যে এপক্ষে কোন হাত বা বলিবার কথা নাই তাহা গেজেটে প্রকারান্তরে বলিয়া দেওয়াও হইয়াছিল। যদি পারেন তো তাঁহারা চীফ্ জষ্টীস্ বা বৃটীষ নেতাগণকে সহায়তা করিবেন মাত্র।

ইংরাজের একজন মিত্ররাজ (যাঁহার সম্মান-সূচক ২১টি তোপধ্বনী হয়) ভারতের একজন

দিকপাল স্বরূপ মহারাজের বিচারক নিযুক্ত হইলেন কে? বাঙ্গালার চীফ্ জষ্টীস্ সাররিচার্ড কাউচ, পঞ্জাবকোর্টের জজ মিঃ মেল্‌ভিল্, মহীশুরের চীফ্ কমিসনার সার রিচার্ড মিড্ আর গোয়ালিয়ররাজ জয়পুররাজ এবং সার দীনকর রাও। প্রথমোক্ত ৩জনই হর্ত্তাকর্ত্তা, শেষোক্ত তিন জন কেবল সাক্ষীগোপাল মাত্র। বড়লাট এই সুযোগে একসূত্রে কাচ মনি ও মুক্ত গাঁথাইয়ে লইলেন। রহস্যপ্রিয় কেহ হয়ত উত্তর করিবেন—স্বয়ং ব্যাকরণবিৎ পানিনী যখন একই সূত্রে 'শ্বণ, যুবান্, ময়বান' গাঁথিয়াছেন তখন বড়লাট যে কাচ মনি ও মুক্তা গাঁথিবেন—ইহাতে আর বিচিত্র কি? বিচিত্রতা ইহাতে নাই, আমরা ভাবি কেবল ভারত মাতার অদৃষ্ট বৈচিত্র।

কোন দিকেই বা দেখি? ভারতগবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে সকলই উচ্ছৃঙ্খল করিতে বসিয়াছেন। সার দিনকর রাও জনৈক জায়গীরদার মাত্র। গোয়ালিয়র তাঁহার জন্মস্থান। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি গোয়ালিয়র রাজের মন্ত্রীত্ব পদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন কিন্তু এখন আর তাঁহার সে দিন নাই; বিশ্বাস হন্তা জানিয়া গোয়ালিয়ররাজ তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের হুকুমে আজ সেই দিনকর রাওয়ের সহিত জয়পুর ও গোয়ালিয়ররাজ এক আসনে আসীন দৃশ্যটী মনে আনিতেও যে ইচ্ছা হয় না। হুকুমটী আবার যেরূপ ভাষায় রচিত তাহা পাঠে বোধ হয় সে জাতি মধ্যে ইতর ভদ্রে প্রভেদ নাই নতুবা যাহাঁদিগের দ্বারা রচিত তাঁহারা কখন ভদ্রতা কাহাকে বলে জানেন না। নতুবা যে জাতীয় ভাষায় Your majesty, your Highness, your Excellency, your worship, your Honor, My liege, My lord, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার, যে সভ্য জাতির মধ্যে সামান্য কথার একটু এদিক ওদিক হইলেই Etiquetie ভাঙ্গা হয়, নোটিফিকেশন কি সেই জাতীয় কাহারও কর্ত্তৃক রচিত? নোটিফিকেশনে মহামান্য গোয়ালিয়র জয়পুররাজকে সামান্য you (তুমি) শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এরূপ ভাষায় যাহাঁদিগকে অভিহিত করা হইয়াছে তাঁহাদের অবশ্য কোন ক্ষতিই হয় নাই পক্ষান্তরে ভারতগবর্ণমেণ্টেরই ইহাতে কলঙ্ক বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র।

কথা গুলি যে উত্থাপিত হইয়াছে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। যে দিনকর রাও আজ বরোদারাজের বিচারক, যাঁহার কথায় বরোদারাজের অদৃষ্টের ভাবী শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে এক দিন তিনিই বরোদারাজের নিকট দেওয়ান পদ প্রার্থী ছিলেন আর বরোদারাজ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এ কথা কি নর্থব্রুকের মনে উদয় হইয়াছিল? রাজায় প্রজায় প্রভেদ জ্ঞান সকল দেশেই আছে; সভ্যতম য়ুরোপেও ইহার ভেদাভেদ আছে। এদেশে যে আবার এই ভেদাভেদ কতদূর তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। এখানের সাধারণে জানে—রাজ দর্শনে পুণ্য আছে, রাজা দেবতা সমান; বাঙ্গালার নবাব নাজীম বড়লাটকে নজর দিতে কুণ্ঠিত হওয়াতে তাঁহাকে অনেক ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং যখন

প্রথমে ভারতে বড়লাটের সভা গঠিত করেন তখন পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিং প্রথমে ইহার সদস্য হইতে অস্বীকার করিয়া ছিলেন কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সমান আসনে বসিতে হয়। অবশেষে তাঁহাকে অন্যান্য সদস্যগণের অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করা হইলে ও তাঁহার মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের সভা মধ্যে তাঁহার পশ্চাতে আসন দেওয়া হইলে তবে তিনি সদস্য পদগ্রহণ করেন। মহারাণী ভারতেশ্বরীর পুত্র ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স অবওয়েলস্ বাঙ্গালায় আসিলে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাব বন্দী ওয়াজীদআলীকে আমন্ত্রণ করা হয় কিন্তু তিনি নাকি "আমি কাহার নিকট বসিব জিজ্ঞাসা করিয়া আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই দেশে আজ দিনকররাও বরোদারাজের বিচারক!! গুইকুমার বিচারে দোষী আর নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হউন, গুইকুমার বংশে আর কি কখন কেহ মাথা তুলিতে পারিবেন?

এই ঘটনা সংক্রান্ত বড়লাটের সকল কার্য্যই যেন রং তামাসা বলিয়া বোধ হয়। বরোদা ব্যাপারে ধরিতে গেলে প্রকৃত ফরিয়াদী নর্থব্রুক আবার প্রকৃত বিচারকও তিনি! বরোদা কমিশন গঠিত হইল বটে কমিসনরগণ তাঁহাদিগের মতামত পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পাইবেন না। তাঁহাদিগের মতামত বড়লাট নিজে শুনিয়া যাহা হয় বিচার করিবেন। ফরেন আপীষের দ্বারা না হইয়া প্রকাশ্যেই যদি বরোদারাজের বিচারের ইচ্ছা ছিল তাহা হইলে ওসকল কমিশনর নিযুক্ত না করিয়া বড়লাট যদি পারস্যের সা, কাবুলের আমীর নেপালের মহারাজা, ব্রহ্মরাজ, শ্যামরাজ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপর সকল ভার অর্পণ করিতেন তাহা হইলেই গুইকুমারেরও সম্মান বজায় রাখা হইত আর কাহারও কোন মন্তব্য প্রকাশের ক্ষমতা থাকিত না, বড়লাটেরও মনে জ্ঞানে নিষ্পাপী থাকিতে পারিতেন। এরূপে রাজধর্ম্মপালনে ইংরাজ ভারতবাসীর হৃদয়ে যে রাজভক্তির উদ্রেক করিতেন তাহাতে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপনের ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করা হইত।

আসামীর দোষ প্রমানিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বন্দী করা যুক্তি সঙ্গত বা আইন সঙ্গত কথা নয়। তবে এরূপ কতকগুলি অপরাধ আছে, যাহাতে আসামী ধৃত হইলে বিচারের পূর্ব্বে জামিনে তাহাকে খালাস দেওয়া যায় না, তাহার কারণ আর কিছুই নয় কেবল পাছে সে ব্যক্তি জামিনকে বিপদে ফেলিয়াও পলাইয়া আত্ম রক্ষায় চেষ্টিত হয়। সাধারণত লোকে আপনার জীবনকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করে বলিয়াই এই সতর্কতা। গুইকুমারের সম্বন্ধে এ সতর্কতা শুধু অনাবশ্যকীয় নয় অসঙ্গতও বটে। রাজ্য ধন প্রিয়জন ছাড়িয়া গুইকুমারকে যদি পলাতকই হইতে হয় তাহা হইলেও তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন, অপরাধ প্রমাণ হইলে ইংরাজ আর ইহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড কি ব্যবস্থা করিতেন। অন্য কোনও রাজাকে জামিন চাহিলেও অনেকটা গুইকুমারের মান বজায় থাকিত। অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত বরোদার সীমান্তে কোন ছলে সৈন্য নিযুক্ত করিয়া বরোদা রাজ্যকেই মল্লার রাওএর প্রশস্ত

কারাগৃহ করিলে আরও ভাল হইল—এদিকে তিনি ততদিন সিংহাসনে থাকুন না কেন। কমিসন যখন বরোদাতে বা প্রকাশ্যে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না তখন আর গুইকুমারের সম্বন্ধে কোন ভয়ই নাই। কমিসনের মতের উপর নির্ভর করিয়া বরোদারাজকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেও বড়লাট বিচারের পূর্ব্বে যেমন করিলেন—সেই রূপ ধীরে সুস্থেই মল্লার রাওকে আটক করিতে পারিতেন। যাহা হউক বিচারের পূর্ব্বে আসামীর প্রতি দণ্ড ব্যবস্থা প্রথা কোথাওই নাই, বড় জোর না হয় তাহাকে আটক করা হয় এই পর্য্যন্ত; গুইকুমারকে ধৃত করণও আপামর সাধারণ আসামী আটকে অনেক প্রভেদ। মল্লার রাওকে ধৃত করায় প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রতি দণ্ড ব্যবস্থা করাই হইয়াছে। যে দেশে আদালতে যাওয়াই দোষের কথা, আসামী হওয়া কলঙ্কের কথা, সেখানে একবার কারাবদ্ধ হইলে তাহার আর জনসমাজে বাস চলে না। একবার কারাবদ্ধ হইয়া যতই নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমানিত হও, বিচারক তোমার অনুকূলে যতই বলুন না কেন, সমাজে আর তোমার অপহৃত মান উদ্ধার হইবে না। একবার মুহূর্ত্তের জন্যও জেলে যাওয়া আর যাবজ্জীবন জেলে থাকা—একই কথা। মল্লার রাও বিচারে দোষী বা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হউন একটী বিষয় কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে আপনাকে বিচারে নীত হইতে দেওয়ায় তাঁহার ও তাঁহার সহিত অন্যান্য রাজাগণেরও রাজকীয় সম্মান নষ্ট হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তি যিনি আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখিতে অক্ষম তাঁহাকে সহস্র ধিক্। রাজরক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হইতে কেহ কখন যোড় করে নতশিরে বিচার প্রার্থী হয় না॥

মুক্তি-সেতু।

সন্ধ্যায়—
মহাধনী আমি রয়েছি সুখে
প্রাসাদের পরে;
নাহি হেথা যেন দুখের লেশ
বাহিরে অন্তরে।
উঠে শোন ঐ ক্রন্দন নিয়ত—
'চির হাহাকার
দূর দূরান্তরে পল্লীর মাঝে;—
কিছু নাহি আর;—
শুধু হাহাকার!
যাহাদের তরে রয়েছি বেঁচে
সুখের সন্তান,
যাহাদের শ্রমে রয়েছে জেগে
কবিতার প্রাণ,
কভু যদি আসে কাতর স্বর
তাহাদের হতে

শুনিব না তা'—যদিও আমার
শ্রবণের পথে—
হোক্ দূর হতে ?
তাদের কেন বাসিব না ভাল
ভাই নহে তারা ?
তাদের অশ্রু দেখিব না কেন
বন্ধু নহে তারা?
তাদের দুঃখ শুনিব না কেন
প্রাণ নহে তারা ?
চন্দ্রসূর্য্য উঠি দিতেছে প্রেম ;
অনন্ত তারকা দিতেছে প্রেম ;
ঋতু বর্ষ যায় প্রেম রাখিয়া
ফুল ফুটে উঠে পড়ে ঝরিয়া.
যৌবনের প্রেম দেয় রাখিয়া ;
নদী গেয়ে গেয়ে সাগরে ধায়,
প্রেমের সুবাশ রাখিয়া যায় ;—
এরা যদি প্রেম পারে গো দিতে,
পারিব না মোরা ?
এরা যদি বিশ্ব ডাকিতে পারে
ডাকিব না মোরা ?
তাদের আমি হৃদয়ে রাখিব,
প্রাণেতে রাখি নয়ন মুছাব,
মুছায়ে আঁখি কাহিনী শুনিব ;—
তাঁরি বলে যত দুঃখ ঘুচাব ;
আমি তা'রা হব
তা'রা আমি হবে
আমি বিশ্ব হব
বিশ্ব আমি হবে ;
মহাদেব হেন রহিব ভোর
প্রেম পান ক'রে
বিশ্বে আমাতে পড়িবে বন্ধন
অদ্বিতীয় ডোরে।

আবর্ত্ত

দেব ! নাথ ! প্রভো ! এই কি সেই তব
মধুর হিরণ্য সংসার ?
এ যে দেখি দয়াময় আবর্ত্ত মহা—
শুধু যে শুনি হাহাকার।
ধনীজনে কোথাও বিলাসের ভরে
ফেলিছে বিলাসের বাস ;
পর্ণকুটীরে কোথা দুখীজনে ফেলে
মর্ম্মভেদী আকুল শ্বাস।
বিলাসের হিল্লোল আসিছে ভাসিয়া
সন্ধ্যার বিলাসের সাথে ;
তারি মাঝে দেখি হলাহল বিষম—
বাধিছে অনন্তের পথে ;
দুঃখশ্বাস তায় আসি দূর হতে
হানিছে হৃদয় মাঝার,
সাগর তরঙ্গ পাষাণের যেমন
বেলায় পড়ে বারবার।
এই ঘোর আবর্ত্ত সংসার প্রান্তরে
তুমি হে দেব কর্ণধার ;
তুমি প্রভু অমৃতসার !

তপস্যা—

দেব ! তুমি রেখোনা বাধা
তপস্যার পথে
অমৃত-বারি বরষি হে
জুড়াও অনাথে।
কত পাপ করেছি আমি—
কত মহাপাপ ;

তাপ তার ঘুচেনা যেন—
তার মহাতাপ।
আকুল প্রাণে খুঁজি, কোথা
শান্তি শান্তি কোথা—
কেহই তো ডাকে না কাছে
ঘুচাইতে ব্যথা।
বসনের আঁচল দিয়ে
মুছি' অশ্রু ধারা,
কেহই তো আসেনা হেথা
আপনার পারা।
নিরাশায় আঁধার দেখি
চারিদিকে ঘিরে;
এজগতে মিলেনা শান্তি
অন্তরে বাহিরে;—
মায়ের স্নেহের কোলেও
শান্তি নাহি পাই,
জগতে আপনার বলে
নাহি কোন ঠাঁই।
দূর করি বিষয় মোহ
যদি প্রাণ ধায়
জগতের অতীত যিনি,
যদি তাঁরে চায়,
তপস্যার দারুণ তেজে
ঘুচিবে আঁধার;
মোহ গিয়ে তখন হবে
সাধ আপনার।
তখনি ফেলিবে মলয়
সুরভি নিশ্বাস;
নদীর গানেতে তখন
প্রেমের সুবাস।
তপস্যাই দেখিছি হেথা
মরম জুড়ান
পুষ্পশোভী শ্মশান মত
পূর্ণ শান্তি স্থান।

সমালোচনা।

The Land-marks of Ethics, According to the Gita. by Buloram Mullick, B. A.,

ইহা গীতার জটিল অভ্যুদয় তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সরল বিবৃতি। বিবৃতি বিশদ, ইহাতে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েরই সার মর্ম্ম প্রকাশিত করিবার প্রয়াস আছে। যাঁহারা দুই চারি কথায় বিবিধ দুরূহ তত্ত্বে অধিকার লাভ করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে। গীতা কি, গীতার মর্ম্ম এবং উপদেশই বা কি, গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে কি কি আছে, এই সমুদায় তত্ত্বেরই তাঁহারা যথাযোগ্য আভাস পাইতে পারেন। গীতার কবিত্ব, মাধুর্য্য ও আনুষঙ্গিক অধ্যাত্মতত্ত্ব আস্বাদন না করিয়াও যাঁহারা গীতা তত্ত্ব বুঝিতে চাহেন, এই পুস্তক খানি তাঁহাদের বিশেষ উপযোগী। তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অধিক সন্তুষ্ট হইবেন। বিষয় উচ্চ, জ্ঞানলাভ সহজ অধিক পড়িতে হইবে না, ৩৩ পৃষ্ঠা মাত্র। আবার মূল্যও সুলভ, চারি আনা মাত্র।

৬ নং চোরবাগান লেন, প্রকাশক বাবু নকুড় চন্দ্র দত্তের নিকট ৩৪৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা প্রেস ডিপজিটারি, মনোমোহন লাই-ব্রেরী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

৩য় বর্ষ | শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। | ৫ম সংখ্যা

নব-তত্ত্ব।

"শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু" প্রস্তাবের কিয়দংশ সাহিত্যে দেখিলাম ; নব্যভারতের "রূপসনাতন" প্রবন্ধের সেই স্বনামখ্যাত লেখক বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যালই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করেন, রচয়িতা এই প্রবন্ধটি তাঁহাদিগকে পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন—ভালই করিয়াছেন। কেননা, তাঁহারা ব্যাল মহাশয়ের দংশনবিষ ভিন্ন প্রবন্ধে আর কিছুই পাইবেন না। সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা মধুময়ই হইবে ?

প্রবন্ধটি যে এক অপরূপ বস্তু, তার আর সন্দেহ কি। স্বয়ং অনন্ত দেবও এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন না, যেমন ব্যাল মহোদয় করিয়াছেন। তাঁহার বিরচন ভঙ্গী কেনা প্রশংসা করিবে? তাঁহার যুক্তির উপযুক্ততা কেনা স্বীকার করিবে?

স্বর্গ—মর্ত্ত্য এবং পাতাল, নির্ব্বোধ প্রাচীনগণ ত্রিলোক বলেন। ব্যাল মহাশয়ের যুক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য পরাস্ত করিয়াছে ; তবে কি ইহা পাতালপুরোদ্ভব? মর্ত্ত্যে মনুষ্যেরবাস, স্বর্গে দেবতা থাকেন,—স্বর্গ মর্ত্ত্য অপেক্ষা বড়। পাতালপুরী স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী,—পাতালে স্বয়ং ভগবানের অবস্থান। বলিরাজার কথা কি মনে নাই? বলির বলে ভগবান পাতালে আবদ্ধ। অতএব পাতালের যুক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য পরাস্ত করিতে পারে—সম্ভব।

তর্কোঽপতিষ্ঠ—তর্ক প্রতিষ্ঠাহীন। বেদ পুরাণে তর্ক নাই—বেদ পুরাণ, প্রামাণ্য। উমেশ বাবুর প্রবন্ধেও তর্ক নাই—যুক্তি নাই, ইহা অপ্রামাণ্য হইবেই কেন? অতএব তাঁহার কথায় অবিশ্বাসেরও কারণ নাই।

"কেন বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইলেন?—তিনি

দেখিলেন, সংসারে সুখ নাই। জনক জননী অন্নকষ্টে প্রপীড়িত, * নিজে ভাল খাইতে পান না, ভাল পরিতে পারেন না। মান নাই সম্ভ্রম নাই; দরিদ্র বলিয়া লোকে অবহেলা করে। এমন জীবনে সুখ কি? * * সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল। 'উমেশবাবুর মীমাংসা প্রণালী এই রূপ।

মরি! মরি! কি সুন্দর মীমাংসা!! আহা, কি সুন্দর!!

যদি কোন অজ্ঞ ইহা পাঠ করিয়া বলেন—"উমেশবাবু, তোমার কথাই কি বেদ যে মানিয়া লইব? কোন্ ইতিহাসের দোহাই দিয়া তুমি এ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছ?" তবে সেই অজ্ঞতম পাঠককে আমরা সাবধান করিতেছি,—"পাঠক প্রবর! উমেশবাবুকে অমন কথা বলিও না, তাঁহার প্রবন্ধ 'সত্যের ছায়া স্বরূপ,"—মানিয়া লইও, এবং ধীরতার সহিত পাঠ করিয়া দেখিও, এরূপ নবীন তত্ত্ব "ক্রমশঃ" দেখিতে পাইবে।'

"জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্ট এবং তাঁহার পিতার নাম কুবের মিশ্র।" উমেশ বাবুর এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্বে কি তোমার আপত্তি আছে? তুমি বলিবে—কৃষ্ণদাসের চরিতামৃতে, কবি কর্ণপূরের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য শত শত গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, জগন্নাথের পিতার নাম "কুবের" নহে—উপেন্দ্র মিশ্র। কিন্তু এখন হইতে জানিয়া লও—সে সকল ভুল। সেই ভুল শোধনার্থই উমেশবাবু লেখনী ধরেন। আর একথা কি জাননা পাঠক! যে, "বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী যাহা শুনিতেন, তাহাই বিশ্বাস করিতেন" ও লিখিয়া ফেলিতেন। "সুতরাং তদীয় বিবরণে আস্থা করা যায় না।" তথাপি যদি বল—'কৃষ্ণদাস প্রাচীন কবি, কবি কর্ণপুর প্রভৃতিও সুপ্রাচীন; তাঁহাদের কথা ফেলিয়া দিয়া উমেশ বাবুর নবতত্ত্ব কেন মানিব?' তবে তোমার অজ্ঞতারই আরও পরিচয় পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বেইত বলিয়াছি—তাঁহার বাক্যগুলা অতি সুন্দর। "সুন্দর! সুন্দর! অসুন্দর কিছু নাই। বেদ গাথার ন্যায় তাহাতে যুক্তির জটিলতা নাই, চরিতামৃতের ন্যায় তাহাতে পদে পদে প্রমাণ প্রয়োগের প্রাচুর্য্য নাই। তুমি না মানিবে কেন? বিশেষতঃ তাহা "সত্যের ছায়া স্বরূপ।"

যে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে যাহা শুনিতেন, তাহাই লিখিতেন, সেই "কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত আমাদের প্রধান অবলম্বন হইবে।" এই যে কথা উমেশবাবু বলেন. 'তাহা কতদূর সংলগ্ন?" একথাও তোমরা উত্থাপিত করিও না। করিলে সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইবে। দেখ নাই কি,—হংস ক্ষীর হইতে নীর পরিত্যাগ করে? যাহা মনের মত হইবে, চরিতামৃতের তাহাই মাত্র উমেশ বাবুর "অবলম্বন," যে কথায় মতের অনৈক্য হইবে, নীরবৎ তাহাই পরিত্যজ্য হইবে; এ সহজ কথাটিও কি তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে? অতএব এ অপরূপ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্দ ভাব মনে আনিও না, মন্দভাব সর্ব্বত্র বিনিন্দিত।

উমেশবাবু "ক্রমশঃ" কত কথাই জানাইবেন। দেখাইবেন যে, সিপাহী হন নাই বলিয়া বিশ্বরূপ যেমন নিন্দিত, শ্রীবাস ভবনে যাঁহারা কীর্ত্তনানন্দ করিতেন, তাঁহারা ততোধিক বিনিন্দিত। আর নিন্দিত ব্যক্তিগণ যেমন, তাঁহাদের "দেবতাও তাদৃশ।" কিন্তু পাতাল পর্য্যায় সে

সকল প্রশংসনীয় প্রহেলিকা অদ্যাপি সাহিত্য বক্ষে প্রকটিত হয় নাই।

সেই ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবলীকে নমস্কার! নমস্কার! তাহা আর মৎকর্ত্তৃক পঠিত হইবে না, ইহাই দুঃখ।

উমেশবাবুর লেখনী সার্থক। চারিশত বৎসর ধরিয়া "পরান্নপুষ্ট অনাতুর," স্বাবলম্বনে পরাঙ্মুখ," "শিষ্ট (অবশ্য তাঁহারই ন্যায়) সমাজে কাপুরুষ," একটি সন্ন্যাসী বাহবা লইতেছে, লোকের গৌরব ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহা কি সহ্য হয়? উমেশবাবু ইহা হইতে দিবেন না।

উমেশবাবুর লেখনী সার্থক, পূর্ব্বে সাহিত্যে (কোন মাসের কত সংখ্যা মনে পড়িতেছে না) তিনি প্রমাণ দিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় মিথ্যা মকর্দ্দমাকারী ও দাঙ্গাবাজ। উমেশ বাবুর লেখনী সার্থক, নব্যভারতে (কোন মাসের কত সংখ্যা মনে পড়িতেছে না) তিনি দেখাইয়াছেন যে, রূপসনাতন চোর, দস্যু এবং নরহত্যাকারী প্রভৃতি। উমেশবাবুর লেখনী, ভরসা করি, বর্ত্তমানে সুসার্থক হইবে।

কোন মাননীয় বন্ধু, সাহিত্যের প্রস্তাবটি আমাকে পাঠ করিতে লিখেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষার্থ পাঠ করি; তাহাতে মনে যে মিষ্ট রসের উদয় হইয়াছিল, তাহার অল্প একটু ভাগ পাঠকগণের জন্য সমীরণে রাখিলাম। সমীরণ দিগন্তে প্রবাহিত হইয়া উমেশবাবুর জয় ঘোষণা করিবে,—অভিলাষ।

প্রায়শ্চিত্ত।

শত পদাঘাত বুকে, শত উপেক্ষায়;
চাহিনি নয়ন তু'লে কভু একবার!
ভাবিয়াছি—ও হৃদয়
রক্ত মাংসে গড়া নয়,
সুখ দুঃখ ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ নাহি তার।
ভেবেছি—জীবনে তব
চিরস্থায়ী সুখ মম,
অযাচিত দান—নাই মূল এ ধরায়!
ভালবাসা থা'ক দূরে,
কখনো স্বভাব-সুরে,

মুখের কথাটী ভাল বলিনি তোমায়!
বনের পশুর প্রতি
ছিল যে মমতা প্রীতি
সে টুকুও ছিলনা গো—এতই চণ্ডাল!
দোষী—অপরাধী মত
নিশি দিন—অবিরত
ভয়ে ভয়ে বসিয়াছ এই দীর্ঘকাল।
সরমের বাঁধ টুটি'
এক দিনো মুখ ফুটি'
কহনি একটী কথা এত যাতনায়।

জীবন বসন্ত তোর
দেখেছ আঁধার চোর,
দেখ নাই—জীবনের সে স্বর্গ শোভায়!
অভিমানে অনাদরে
কতদিন আঁখি লোরে
ঝরিয়া গিয়াছে কত সুখ আশা তৃষা!
দারুণ নৈরাশ্য ভরে
চাপি বুক মাটী' পরে
কাটিয়াছে জীবনের কত দীর্ঘ নিশা!
পাশাপাশি দুই জনে
তথাপি হইত মনে
শত জন্ম-অগোচর তোমায় আমায়!
ক্ষুদ্র ও কোমল প্রাণে
এত ঘৃণা অপমানে
নীরবে রয়েছ স'য়ে এত কাল হায়!
অনল কিরণে সদা
পু'ড়ে পু'ড়ে মর্ম্মহতা,
তথাপি সে সূর্য্যমুখী সূর্য্যপানে চায়।
বুঝিবা পুরুষ হলে'
অমনি পড়িত ঢলে';
পাষাণো গলিয়া যায় ও সহিষ্ণুতায়।

২

বুঝি নাই এতদিন, বুঝিলাম শেষে,
যখন কি হবে বুঝে,'
যখন কি হবে খুঁজে';
সব সাধ সব ক্ষোভ মনে র'লো মিশে!
বুঝি নাই—ভাবি নাই,
খুঁজিয়াও দেখি নাই,
ছিলে যে 'সৌভাগ্য' তুমি অভাগার ঘরে।
কি গাঢ় অপরিমেয়
অমর আকাঙ্ক্ষনীয়,
ছিল প্রীতি ভালবাসা তোমার অন্তরে।
হাতে লক্ষ্মী ঠে'লে পায়
মরীচিকা মাঝে হায়
ঘুরিলাম এ যাবত শুধু নিরাশায়!
পবিত্রতা লেশ হীন
সংক্রামক ব্যাধি ক্ষীন
ছুঁইতে কি এ হৃদয় আজি দেবতায়?

৩

এস দেবি, এস আজ—অন্তিম জীবনে!
আজি অনুতপ্ত বড়,
ভুলে' যাও—ক্ষমা কর,
নামাও হৃদয় ভার, মুছাও নয়নে।
একটী চুম্বন দিয়া
একটু পরশ দিয়া;
ফিরে দাও ক্ষণ তরে অতীত জীবনে।
আত্মকৃত পাপাচার
প্রায়শ্চিত্ত করি তার
কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি দগ্ধমান।
এই দীর্ঘকাল সদা
দিয়েছি প্রাণে যে ব্যথা
ক্ষণিক আদরে আজি হবে প্রশমন?
হবেনা—হবেনা কভু
এস দেবি—এস তবু
হবে মোর প্রায়শ্চিত্ত-শাপ বিমোচন
সতীর পবিত্র স্পর্শে অমর জীবন।

বিষ্ণুপুরাণ।

সৌভরি-উপাখ্যান।

পুরাকালে সৌভরি নামক এক মহর্ষি জল মধ্যে অবগাহন করিয়া সদা সর্ব্বদা কঠিন তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া কাল যাপন করিতেন। এক দিবস ঐ জল মধ্যে তিনি তপস্যায় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে সম্মদ নামক একটি মহাকার মৎস্যরাজ পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি প্রভৃতি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া উক্ত মহর্ষির চতুর্দ্দিকে নানারূপ আনন্দ উপভোগ করিয়া সুখে বিচরণ করিতেছে। জিতেন্দ্রিয়, সংসার ত্যাগী, বিবেকী মহর্ষি মৎস্যের অবস্থায় মুগ্ধ হইয়া তাহার ন্যায় বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে অভিলাষ করিলেন। বিবেকী মহর্ষি ঈশ্বর চিন্তা ত্যাগ করিয়া এক দিবস ঐ বিষয় লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন অহো! এই মৎস্যরাজ কি ভাগ্যবান্; বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া কেমন সুখে জল মধ্যে বিচরণ করিতেছে।" অনন্তর তিনিও বৃদ্ধ বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে অভিলাষী হইলেন, এবং ঈশ্বর চিন্তা ত্যাগ করিয়া সদ্বংশ-সম্ভূতা কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

জরাগ্রস্ত মহর্ষি সৌভরি সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার পঞ্চাশটী অবিবাহিতা কন্যা আছেন অবগত হইয়া তাঁহার রাজ সভায় উপনীত হইলেন। মহারাজ মান্ধাতাও তাঁহাকে সসম্মানে যথাবিধি পূজা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসন গ্রহণান্তর মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "মহারাজ! আপনকার পঞ্চাশটী অবিবাহিতা কন্যা আছেন জানিতে পারিয়া আপনকার নিকট আগমন করিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে একটী কন্যাকে আমাকে বিবাহার্থে প্রদান করুন।" জিতেন্দ্রিয়, সংসার ত্যাগী, তেজস্বী বৃদ্ধ মহর্ষির এবমপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আত্মসংযম করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে সর্ব্বসুলক্ষণা-সম্পন্না রাজকন্যাকে কিরূপে এরূপ জরাগ্রস্ত ও বৃদ্ধ পাত্রকে সমর্পণ করিব। মুনিবর রাজার এবম্প্রকার ভাব দর্শনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! আপনি কি জন্য চিন্তা করিতেছেন? আমি আপনাকে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতেছিনা, অবশ্যই আপনার কন্যাকে কোন না কোন পাত্রে দান করিতে হইবে, সেই কন্যা আমাকে দান করিলে যদি আমি কৃতার্থ হই, তাহাতে আপনার কি ক্ষতি হইবে বুঝিতে পারিতেছি না? রাজা গভীর চিন্তার পর অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন, ভগবন্! কন্যা যে কোন সৎকুলোদ্ভব পাত্রকে আপন ইচ্ছানুসারে মনোনীত করে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করা আমাদের কুলধর্ম্ম, এরূপ কুলধর্ম্ম অতিক্রম করিতে আমার ইচ্ছা হয় না, সেই জন্য কি করিব চিন্তা করিতেছিলাম।"

সৌভরি বলিলেন,—"মহারাজ! আমাকে রাজান্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করুন, যদ্যপি আপনার কোন কন্যা স্বইচ্ছায় আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন, নতুবা আমি এই বৃদ্ধাবস্থায় আর দার-পরিগ্রহের চেষ্টা করিব না।" রাজা 'তাহাই হউক' বলিয়া এক জন কঞ্চুকির সহিত মুনি-বরকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। ভগবান্ সৌভরি কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে করিতেই মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। কঞ্চুকি রাজান্তঃ-পুরে মুনিবরকে লইয়া যাইয়া রাজকন্যাগণকে বলিল,—এই মহর্ষি কন্যা প্রার্থনায় মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং মহারাজ বলিয়াছেন যে যদ্যপি আমার কোন কন্যা এই মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি তাহার ইচ্ছার প্রতিকুলতা সাধন করিব না। কঞ্চুকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কন্যাগণ মহর্ষির মনোমুগ্ধকর রূপে মোহিতা হইয়া "আমি অগ্রে, আমি অগ্রে" এই কথা বলিতে বলিতে সকলেই মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কঞ্চুকি রাজসভায় যাইয়া বলিল "মহারাজ! প্রত্যেক রাজকন্যাই পরম অনুরাগে সেই অকলঙ্ক কীর্ত্তি ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। অনন্তর মান্ধাতা বিষণ্ণ মনে প্রত্যেক কন্যাকে মহর্ষিকে সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর মহর্ষি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা পঞ্চাশটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া প্রত্যেক ভার্য্যার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। একদা মহারাজ মান্ধাতা কন্যাস্নেহে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়া এবং কন্যাগণের অবস্থা মনে মনে কল্পনা করিয়া মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন; এবং মহর্ষির আশ্রমে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত পরম রমনীয় জলাশয় ও উপবন মালায় শোভিত স্ফটিকময়ী অট্টালিকা শ্রেণী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর তিনি একটী অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহার এক কন্যাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহপূর্ণ নেত্রে কহিলেন, "বৎসে! আমার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া এখানে কেমন আছ? মহর্ষি তোমায় ভাল বাসেন ত?" সেই কন্যা উত্তর করিল,—"পিতঃ! পিতৃ মাতৃ বিরহ জনিত কষ্ট ভিন্ন আমরা এখানে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি, কিন্তু আমার এই দুঃখ যে আমাদের পতি অতিশয় প্রণয় বশতঃ কেবল আমারই নিকটে থাকেন, আমার আর আর ভগ্নির নিকট গমন করেন না।" এই রূপে মহা-রাজ মান্ধাতা প্রত্যেক কন্যার নিকট জিজ্ঞাসা করায় সকলেই প্রথমা কন্যার ন্যায় ঐ একই উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। পরে রাজা সানন্দ চিত্তে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিয়া প্রীত মনে নিজ রাজধানিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে মহর্ষির পঞ্চাশ ভার্য্যা একশত পঞ্চাশটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। মহর্ষি সৌভরি সন্তানগণের মুখ-চন্দ্রিমা দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। প্রতিদিন স্নেহ বদ্ধমূল হওয়ায় তিনি অপত্যগণের প্রতি নিরতিশয় মমতায় আকৃষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কবে আমার এই শিশু গুলি আধ আধ কথা কহিতে শিখিবে; কবে ইহারা হাঁটিতে শিখিবে?

কবে ইহারা যুবা পুরুষ হইবে। কবে ইহাদিগকে সস্ত্রীক দেখিব? কবে ইহাদিগের পুত্র হইবে? কবে ইহাদিগের পুত্রগণকে আবার পুত্র বিশিষ্ট দেখিব? এবং এই সকল পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মৎস্যরাজের ন্যায় সুখে কাল হরণ করিব।

সৌভরি এইরূপে আপন জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কিছু দিন সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, তখন তিনি আপন মনের সঙ্কির্ণতা অনুভব করিতে পারিয়া অতিশয় অনুতাপিত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! আমার মোহজালের কি অসীম বিস্তার,—

"মনোরথানাং ন সমাপ্তি রস্তি
বর্ষা যুতে নাপি তত্তাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ব্বেষু পুনর্নবানাং
উৎপত্তয়ঃসন্তি মনোরথানাং॥"

অযুত বর্ষে বা লক্ষ বর্ষেও মনোরথ সকলের শেষ হয় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনোরথ সকল পূর্ণ হইলেই আবার নব নব মনোরথের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমার পুত্রেরা হাঁটিতে শিখিল, যৌবনও প্রাপ্ত হইল, দারপরিগ্রহও করিল, ইহাদের পুত্র জন্মিল, তাহাদেরও আবার পুত্র জন্মিল; আমার অন্তরাত্মা আবার তৎপুত্রগণেরও সন্তান দেখিবার জন্য অভিলাষী হইতেছে। আমি যদি তাহাদেরও সন্তান দর্শন করি, তাহা হইলে আবার অন্য মনোরথের উদয় হইবে, সেই মনোরথ পূর্ণ হইলেও আবার যে অন্য মনোরথের উদয় হইবে তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? আমি এক্ষণে ইহা জানিলাম যে, যতদিন না মৃত্যু হয়, ততদিন মনোরথ সকলেরও নিবৃত্তি নাই। আর, যে ব্যক্তি মনোরথের একান্ত অধীন তাহার চিত্তও কদাচ পরমাত্মায় আসক্ত হয় না।

আশা মায়াবিনী আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না, একটী আশা পূর্ণ হইতে না হইতেই তৎস্থানে আর একটী নূতন আশা আসিয়া উপস্থিত হয়; এই আশাই মনুষ্যের সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি স্থল।

সৌভরি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি নির্ব্বোধ! সঙ্গ দোষের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যে হেতু আমার মীনের সহবাসেই এই সংসার সুখাভিলাষ অদম্য হইয়া উঠিয়া ছিল; আমার একটি মাত্র দেহ ধারণের যে দুঃখ তাহা পঞ্চাশটি রাজকন্যাকে বিবাহ করায় পঞ্চাশগুণ বৃদ্ধি পাইল এবং অনেকগুলি পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় তাহা আবার বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক যোগ সিদ্ধ ব্যক্তিরাও কুসঙ্গ দোষের হস্ত হইতে নিস্তার পান্ না। এখন আমার চৈতন্য হইল; সংসারে লিপ্ত না হওয়াই যতিগণের মুক্তির উপায়; সংসারে লিপ্ত হওয়াতেই অশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। যদিও সংসার সঙ্গ রূপ দুষ্ট জলজন্তু কর্ত্তৃক আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি আমি আত্মার নিমিত্ত এরূপ তপস্যা করিব যাহাতে আমি নির্ম্মুক্ত হইয়া পরিজন দুঃখে আর দুঃখিত না হই।

"সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্য রূপম্
অণোরণীয়াংসম অতি প্রমাণং।
সিতা সিতং চেশ্বরম্ ঈশ্বরানাং
আরাধয়িষ্যে তপসৈব বিষ্ণুং॥"

যিনি সকলের বিধাতা অচিন্ত্যরূপী, যিনি অণু হইতেও অণুতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর,

যিনি জীবরূপে বদ্ধ ও ঈশ্বররূপে মুক্ত, যিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; আমি তপস্যা দ্বারা সেই বিষ্ণুর আরাধনা করিব। এই বলিয়া সৌভরি সমস্ত ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাগণের সহিত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা পরম গতি লাভ করিলেন। পাঠক উপাখ্যানের মর্ম্ম বুঝিলেন কি?

লুপ্ত "কবির গান।" (২)

বঙ্গীয় "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার "কবি গান" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা দিগের অপ্রকাশিত "কবি গান" প্রকাশিত করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের ও বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। গত সংখ্যার সমীরণ পত্রিকায় কবিওয়ালা "মহেশ কাণা" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে আর তিন জন কবিওয়ালার "কবির গান" সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহাঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের একটী, অপর কয়টী ফরাসডাঙ্গা নিবাসী প্রসিদ্ধ বলাই বৈষ্ণবের ও দত্তপুকুর * নিবাসী অজ্ঞাত নামা কবিওয়ালা মধু সিংহের বিরচিত গান।

* ২৪ পরগণা—বারাসাত সবডিবিসনের অন্তর্গত বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের দত্তপুকুর নামক (ষ্টেসন) গ্রামে কায়স্থ কুলে কবিওয়ালা মধুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও কবিওয়ালা "মহেশকাণা" প্রসিদ্ধ ছাতুরায় প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। ইহাঁর "খেঁউড়" এতদাঞ্চলবাসী গণের বড়ই প্রিয় গীত; কিন্তু অধুনাতন পাঠকগণের রুচি বিরুদ্ধ বলিয়া (নিতান্ত অশ্লীল বোধে) এস্থলে বিরত হইলাম।

প্রবন্ধ লেখক।

১। কবি গান।

(হরু ঠাকুর রচিতা)

বন বংশীধারী কি ব্রজে যা'বেনা?
সে ব্রজ মণ্ডলে, নয়ন সলিলে
উজান বহে যমুনা।
শুনে উদ্ধবের ঠাঁই, তত্ত্ব ল'তে তাই
মথুরায় এসেছি সম্প্রতি;
... ...
তুমি কা'র জোরেতে কর বিনা করেতে বসতী।
আজ দেখবো স্বচক্ষে কুব্জা কেমন সুন্দরী॥

২। কবি গান।

(বলাই বৈষ্ণবের রচিতা)

এমন লোলিত রাগে বীণা বাজায়
কেগো লোলিতে?
মুখে জয়জয় রাধাধ্বনী বীণাধ্বনী করে ধরী
এসেছি কুব্জা'র বনে রাধার কুঞ্জেতে।
হরি চেন চেন কর্চ্ছি নারি চিনিতে;

৩। রচিতা।

মথুরাতে যায় প্রভাতে কৃষ্ণ দয়াময়
প্রেমের দায়, বিদেশিনী হ'য়ে নিকুঞ্জে উদয়।
.........................ইত্যাদি।

৪। কবি গান।

(মধু সিংহ বিরচিত।)

[সমুদ্রমন্থন কালে কৃষ্ণের মোহিনী বেশ ধারণ।]

কি আশ্চর্য্য বিবরণ, অচেতন হ'লেন ত্রিলোচন;
অপরূপ রূপ যেরূপে শ্যাম হরে হরের মন।
ত্যজি বংশী হ'লে মনমোহিনী;
ছেড়ে বাঁকা ধড়া, বাঁকা মোহন চুড়া
হ'লে অনুপমা রূপে রমণী,
কৃষ্ণ কামিনী কি রূপে, বংশী কোথা রেখে,
(যে বংশী ব্রজাঙ্গনায় মজালে)
বাঁকা আঁখি শ্যাম কোথা লুকালে;
(ওহে শ্যাম শ্যাম হে—)
কাল বরণ হয় কি সম্বরণ?
তোমায় চিন্‌তে নারি, ওহে বংশীধারী
আমরা বিনয় করি ধরি শ্রীচরণ॥

দুঃখের বিষয় অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও গান গুলির সমগ্র অংশ পাওয়া গেল না। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ঐ সকল গান অবগত থাকেন অথবা অন্য কোন কবিওয়ালার অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত গান অবগত থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া সমীরণ কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীমদ্রূপ সনাতন।

[সনাতন—সম্বন্ধ তত্ত্ব।]

শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সনাতনের সম্মিলন পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে। সনাতন মহাপ্রভুর সহিত একত্রে কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন সনাতন সদৈন্যে শ্রীচৈতন্যের চরণ ধারণ পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—"প্রভো! আমি নীচ সঙ্গী এবং নীচ জাতি—অতি অধম।* সারাজীবন বিষয় মদে মাতিয়া কাটাইয়াছি। কি করিলে যে নিজের মঙ্গল হয়, মত্ততাবশে সে জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়াছে। (যাহা এই সকল বুদ্ধি যোগে শুভ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব, হয়ত তাহা অশুভের আকর; অতএব হে কৃপাময়!) কৃপাপূর্ব্বক বিষয় বিষের বিবর হইতে যদি উত্থাপিত করিয়াছেন, তবে কিরূপে পরিত্রাণ পাই, উপায় নির্দ্দেশ করুন; আমার কর্ত্তব্য কি,—আদেশ করুন।"

"প্রভো! মায়ামুগ্ধ স্বভাবতঃ অজ্ঞ জীবের

* "নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঙাইলাম জনম॥"—চৈঃ চঃ।
যবন সংস্পর্শে ছিলেন বলিয়া দৈন্য জীবন মহাত্মার আপনাকে নীচ জাতি বলা কিছু অন্যায় নহে।

হিতাহিত জ্ঞান নাই, সুতরাং তত্ত্ব জিজ্ঞাসারও শক্তি নাই, অতএব কৃপাময়! স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, যাহা আমার মঙ্গলজনক, তাহাই আদেশ করুন।" †

"অনেক সময় এই প্রশ্ন আপনা আপনি মনে হয় যে, আমি কে? যদি আমি ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ হই, তবে কেন আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয় আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে?" *

শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন :—

"সনাতন! তোমার উপর কৃষ্ণের কৃপাবারি বর্ষিত হইয়াছে. তুমি সর্ব্বতত্ত্বই জান তোমার তাপত্রয় কোথায়?. তবে যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা কেবল বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ? তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান যেরূপ উজ্জ্বল, তাহাতে তোমারই দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিবার পক্ষে তুমিই যোগ্য পাত্র। সে যাহা হউক, তোমাকে আমি সমুদয় তত্ত্বই ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

"কে আমি?" এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তুমি জীব। এই পঞ্চভূতাত্মক যে স্থূল দেহ, তাহা তুমি নহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক যে লিঙ্গ দেহ, তাহাও তুমি নহ। জীব অণুচৈতন্য, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। †

"জীব, চিৎ ও মায়িকজগতের সীমার মধ্যগত বলিয়া কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি নামে কথিত হয়। নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তট বলে। তট সন্ধিস্থল। চিৎজগতকে জল এবং মায়িক জগতকে ভূমি রূপে কল্পনা করিলে, তন্মধ্যগত জীবশক্তিকে তটস্থ বলা যায়। 'তটস্থ' অর্থাৎ জীব সন্ধি স্থানে আছে, ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণোন্মুখ বা বহির্ম্মুখ হইতে পারে, কৃষ্ণোন্মুখ হইলে মায়ামুক্ত এবং বহির্ম্মুখ হইলে মায়া বদ্ধ হইয়া পড়ে।

অতএব—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"—চৈঃচঃ

এই তটস্থ জীবের ভগবানের সহিত নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। সূর্য্যের সহিত কিরণের যেমন, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের যদ্রূপ, জীবের সহিত ভগবানের তদ্রূপ সম্বন্ধ। প্রজ্বলিত পাবকের সাদৃশ্যে শ্রীভগবানের কিরণ কণ স্থানীয় চিৎপরমাণু স্বরূপ জীব। অতএব শ্রীভগবানের সহিত অভেদতা সত্ত্বেও জীবের নিত্য ভেদ তত্ত্বতঃ অসঙ্গত নহে। জীবের নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদাত্মক বহু শ্রুতি বাক্য প্রসিদ্ধ আছে। অতএব জীব নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ স্বরূপ। যথা বৃহদারণ্যকে :—

---

† "আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাহি সত্য মানি।"—চৈঃচঃ

* "কে আমি? কেনে আমা জারে তাপত্রয়?" চৈঃ চঃ
শারির ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ। বাত পিত্ত, শ্লেষ্মার বৈষম্য জনিত শারির তাপ এবং কাম, ক্রোধ লোভ মোহাদি নিবন্ধন মানস তাপের উদ্ভব হয়। পশু পক্ষ্যাদি ও স্থাবরাদি হইতে আদি ভৌতিক, এবং দৈবোৎপাত অর্থাৎ অনুজ্ঞাত কারণ পরম্পরা হইতে উৎপন্ন তাপকে আধিদৈবিক তাপ বলে।

† "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।"—চৈঃ চঃ।
"কৃষ্ণের নিত্য দাস" বলাতে নিত্য ভেদ ও নিত্য সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইল। প্রভু ও দাসে নিত্য ভেদ এবং এক জাতিত্ব বিধায় নিত্য সম্বন্ধ। কৃষ্ণ মহাচৈতন্য, জীব তাঁহার অণু, অতএব দাস প্রভু সম্বন্ধ।

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি
এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।
তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত
ইদঞ্চ পরলোক স্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বং স্থানং।
তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভস্থানে
পশ্যতীদঞ্চ পরলোক স্থানঞ্চ।"

বিদ্বলা ভাব বশতঃ জীব মায়ার অধীন ভগবান মায়াধীশ। মায়া জড়শক্তি নহে—স্বরূপ শক্তি। *

"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া।"

"যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিসৎ বাক্যে "মায়ী" শব্দে মায়াধীশ ভগবান।

অতএব চিদ্ধর্ম্মে জীব ও ভগবানে নিত্য অভেদ হইলেও স্বরূপে নিত্য ভেদ লক্ষিত হয়। এই নিত্য ভেদ—ক্ষুদ্রত্ব বশতঃই জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস; ভগবানের সেবকত্বই তাহার স্বভাব। অতএব কৃষ্ণমুখতা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—প্রকৃতিগত। বহির্ম্মুখতা অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতাই দুঃখের কারণ।

যথা—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে ডুবায়॥"—চৈঃ চঃ

যথা বা—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদী
শাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈ কয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥—শ্রীমদ্ভাগবত।

"জীবের এই স্বাভাবিকতা—কৃষ্ণমুখতা সহজে যায় না। তবে নানা কারণে তাহা আচ্ছাদিত হইতে পারে; যথা কুসঙ্গ, অসৎ শাস্ত্র চর্চ্চা ইত্যাদি দ্বারা। কিন্তু এরূপ হইলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই, কেননা জগতে সৎসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রও আছে। অতএব—

"শাস্ত্র সাধু কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়ায়॥"—
চৈঃ চঃ।

"শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, এই তিন তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ আছে,—ভগবানই সম্বন্ধ শব্দ বাচক। সেই ভগবানকে পাইবার উপায় ভক্তি,—ভক্তিই অভিদেয় শব্দে কথিত। আর ভগবানকে যাহা দ্বারা উপভোগ করা যায় তাহাই প্রয়োজন। ভক্তির আনন্দঘন চরম অবস্থাই কৃষ্ণ প্রেম; অতএব প্রেমই প্রয়োজন শব্দ বাচক। অতএব প্রেমই মহাধন, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ। * কিন্তু এই মহাসম্পদ সৎশাস্ত্র ও সাধুজনের কৃপায়ই, তন্নির্দ্দেশমতে লভ্য হয়, পূর্ব্বেই তাহা বলা গিয়াছে।

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ—কোন দৈবজ্ঞ যেমন অজ্ঞ

---

* "কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি আর জীব শক্তি॥"—চৈঃ চঃ।

* "বেদ শাস্ত্র কহে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্তের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তের কারণ।
কৃষ্ণ সেবা করে আর কৃষ্ণরস আস্বাদন॥"—চৈঃ চঃ।

ব্যক্তিকে তাহার গুপ্তধন প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দেয়, তদ্রূপ শাস্ত্রোপদেশে আমরা কর্ত্তব্যের সন্ধান পাইয়া থাকি। শাস্ত্রোপদেশে আমরা জানিতে পারি, কাহাকে বলতারূপ † কর্ম্মকাণ্ড এবং কাহাকেই বা যক্ষরূপী § 'যোগ' বলে। জানিতে পারি যে, অজগর রূপ ‡ জ্ঞানের ফল কি, এবং এ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি প্রকারেই বা পরম ধন †† ভক্তি লাভ করিতে হয়।

চরিতামৃতে যথা—

"সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ কহে কৃষ্ণে উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায়॥
এই স্থানে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভিমরুল বোলতা উঠিবে ধন না পাইবে॥ ‡‡
পশ্চিমে খুদিলে তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না চঢ়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন না পাইবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
তাতে পূর্ব্ব দিকে অল্প মাটি খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম যোগ জ্ঞান তেজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণবশ হয় ভক্তে তারে ভজি॥

"তথাহি—
ন সাধয়তি মাং যোগ ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"
(চরিতামৃত)

"ভক্তিই সারধন, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা রূপ দারিদ্রের ক্ষয় এবং মায়ার অনধীনতা ভক্তির মুখ্য ফল নহে, প্রেম লাভই ভক্তির শ্রেষ্ঠ ফল। *

"এই তিনটি—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন মধ্যে সম্বন্ধ তত্ত্বই মূল, তাহা হইতেই অভিধেয়ও প্রয়োজন।

"সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞান অনুসঙ্গে যায় মায়াগন্ধ॥"—চৈঃ চঃ

ইহাই সম্বন্ধ তত্ত্ব।

(কিন্তু ইহা জানিলেই হইল না, কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বে জ্ঞান থাকা সাধকের আবশ্যক, স্বরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, আগামীতে পৃথক প্রস্তাবে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।)

† ব্রত নিয়মাদি কর্ম্মে কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটে না, চিত্তশুদ্ধি মাত্র ঘটে। ব্রত নিয়মাদি দ্বারা শারীরিক ক্লেশ প্রাপ্তি হয়, এ জন্য বলতার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

§ যোগ সাধন দ্বারা সংযম শিক্ষা হয় এবং বিবিধ বিভূতি লভ্য হয়, এরূপ শক্তি লাভে সাধক ঈশ্বর হইতে বহু দূরে পড়েন, তাহাতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটে না, এই জন্য গ্রন্থকর্ত্তা কবিরাজ গোস্বামী যোগ সাধনকে যক্ষের সহিত তুলনা দিয়াছেন।

‡ জানা আর প্রাপ্তি এক নহে। জ্ঞানে ঈশ্বরের স্বরূপাদি জানা যায় বটে এবং পাইবার উপায়ও জানা যায় সত্য কিন্তু প্রাপ্তি ঘটে না। বিশেষতঃ জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নাস্তিকতা প্রভৃতির কারণ হইতে পারে, তাহাতে সাধককে একবারে বিনাশের পথে লইয়া যায়; এই জন্য, জ্ঞানকে অজগরের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

†† ভক্তি সাধনে পূর্ব্বোক্ত কোন রূপ ভয়ের কারণ, নাই এবং তাহাতে অক্লেশে ইষ্টসিদ্ধি ঘটে, এই জন্য ভক্তিকে পরমধন বলা হইয়াছে।

‡‡ এই সকল পদের অতি বিকৃত অর্থ সহজিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে।

* "দারিদ্রনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥"—চৈঃ চঃ।

বাবু।

বাবু এ কথা বাঙ্গালা ভাষার সার। এ কথার প্রয়োগ করে না, এমন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘরে বাহিরে সকল সময় সকলকার মুখে "বাবু" এ শব্দের ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কোথাও যাইতে হইলে, এবং গন্তব্য স্থানে যাইবার পথ সম্যক জানা না থাকিলে, সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে হয় "বাবু কোন পথে যাব?" সহরে যাইতে যাইতে দেখিবে রাস্তার নাম মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, দোকানে যাও সে খানে বলিতে হইবে, বাবু এ জিনিষের দর কত? কাপড়ের পাড় বাবুধাক্কা, পুস্তকের নাম "বাবু," এমন কি মানুষের নাম বাবুরাম বা "বাবুলাল।" ইংরাজী ভাল রূপ না হইলে তাহার নাম বাবু ইংলিশ, বিলাসী হইলে তাহার নাম হইল "বাবু লোক" এবং ভিক্ষার্থী আসিয়া দ্বার দেশে বলিল "রাজা বাবুর জয় হোক।" এতদ্ভিন্ন আপনাপন কর্ম্মানুসারে লোকে বাবু হইয়া থাকে, যথা উকীল বাবু, ডাক্তার বাবু, মাষ্টার বাবু। আফিসে বড় চাকরী যার তিনি বড় বাবু, তদ্ভিন্ন কেশীয়ার বাবু, ডাক্ বাবু, নাজীর বাবু, কলে চাক্‌রী করিলেও তাহারা বাবু পদ বাচ্য। এমন কি অল্প বেতন ভোগী বালক বৃন্দও ফেলো বাবু নামে অভিহিত।

বাবুর ভাব বাবু গিরি। গিরি বলিতে বাবু বুঝায়। অথবা বাবু গিরি ইব বাবুগিরি। গিরি বিশেষে যেমন এক একটা আগ্নেয় গিরি থাকে, সময় সময় তাহার ধুম অগ্নি উদ্গিরণে সন্নিহিত পল্লী সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া যায়, বাবুগিরির দ্বারাও তদ্রূপ নিকটস্থ গ্রাম সমূহ তাহার ক্রোধাগ্নি ধূম রাশির দ্বারা বিনষ্ট হয়। কোন কোন গিরি হইতে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া উভয়কূলস্থিত ভূমির উন্নতি সাধন করিয়া তৎদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই বাবু গিরির কোন কোনটীর দয়া নদীর দ্বারা দুকূলের শোভা বৃদ্ধি হয়, এবং স্বদেশের হীন ভাব দূর হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয়। অনেক বাবুগিরি আছেন, তাঁহারা বাস্তবিক পর্ব্বতের ন্যায় পাষাণময়। আর যে সমস্ত বাবু গিরি কৈলাসগিরি সদৃশ, হরপার্ব্বতীও সেখানে বাস করিয়া থাকেন। আবার অনেকে হিমালয় সদৃশ, কন্যাও রূপে গুণে সতী সদৃশী এবং জামাতাও গৃহ বিহীন, শ্মশানবাসী মহাদেব, অথবা "কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ" কিম্বা সিদ্ধিতে নিপুণ দড়"; কেহ বা সিদ্ধিরস্ত ছাড়াইয়া আবগারী সমস্ত শেষ করিয়াছে। সুতরাং সে সব ভবনে দক্ষযজ্ঞও নিত্য ঘটে। কোথাও কোথাও অভিমানে সতীর দেহ ত্যাগ হয় কিনা সেটা পাঠকগণ বলিতে পারেন। উচ্চ গিরির শিরোদেশ যেমন বরফ রাশির দ্বারা সমাবৃত, বাবু গিরিও তদ্রূপ বরফ জলে সিক্ত। দেশের সীমান্ত প্রদেশ যেমন গিরি সন্নিবেশে পরদেশস্থ শত্রুর সহজ লভ্য নহে, দুরধিক্রম্য বাবু গিরি যে দেশে বর্ত্তমান্ সে স্থান অন্য গ্রামবাসীর দ্বারা প্রপীড়িত হয় না।

বাবু ইহা পুংলিঙ্গ কি স্ত্রীলিঙ্গ তাহা সহজে

বোধগম্য হয় না। যদি স্বীকার করা যায় যে ইহা পুংলিঙ্গ দাড়ী সত্বেও ছাগীকে যেমন স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া বিশেষ সুত্রের দোহাই দিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, সেই রূপ "দিদিমণি বাবু "বউ দিদিমণি বাবু" সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অথবা বাবু শব্দকে উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ কমন জেণ্ডার (Common gender) বলা যাইতে পারে, যথা দাদা বাবু (পুলিঙ্গ) দিদি বাবু (স্ত্রীলিঙ্গ) কেহ কেহ বলেন স্ত্রী পুরুষ সব সমান, ভেদাভেদ নাই, সেই জন্য সকলেই বাবু নামে অভিহিত হইতে পারে। শেষোক্ত মতটী বেশী বিশ্বাস যোগ্য। কারণ এখন মামা বাবু, কাকা বাবু, কর্ত্তাবাবু, খোকাবাবু ইত্যাদি রূপ সম্বোধন করিবার রীতি প্রচলিত। কোথাও কোথাও বাবাকে সুধু বাবু বলিয়া ডাকা আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রী নিতান্ত সহধর্ম্মিনী বলিয়া শ্বশুরকে বাবা বলিয়া স্বামীর ধর্ম্ম বজায় করিয়া চলে।

বাবু গিরির টেক্স নাই, লাইসেন্স নাই, সার্টিফিকেট নাই অথবা মেডাল নাই। হোমিওপ্যাথী ঔষধের ন্যায় ইহা সুলভ অথচ একাকার বিশিষ্ট। লেবেল রূপ পিরাণ না থাকিলে হোমিওপ্যাথী ঔষধ বা বাবু চিনিয়া লওয়া শক্ত। এই ঔষধ যত উচ্চ ক্রম (হাইয়ার ডাইলিউশন) তত বেশী তেজ সম্পন্ন। বাবু সম্বন্ধেও সেই রূপ. কারণ উচ্চ বংশের তেজ স্বতন্ত্র। জল যেরূপ স্বাদ বিহীন অথচ অপরিহার্য্য, বাবুও তদ্রূপ সুলভ হইলেও ব্যক্তিগণের প্রতি প্রযুক্ত না হইলে তাহাদের অপমান। কত ডিগ্রীর বাবু তাহা জানিবার জন্য থার্মোমিটার নাই। সুতরাং রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, উত্তমর্ণ, অধমর্ণ সকলেই বাবু নামে অভিহিত। পথে বাহির হইলে কে পোষ্য কে পোষক, পোষাক দেখিয়া স্থির করা কষ্ট সাধ্য। থাটীর যুবা সম্প্রদায় হইতে চাকর পর্য্যন্ত ছোট বড় চুল কেটে, টাইট কোটে দেহ এঁটে, রাস্তায় বাহির হইলে লোক নিরাকরণ করা সুকঠিন।

পূর্ব্বে গ্রামের প্রবীণ প্রতিবেশী অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ব্যক্তি মামা, কাকা, জেঠা, দাদা অথবা ঠাকুরদাদা মহাশয় ইত্যাদি একটা না একটা সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিল। পিতা পিতামহ অথবা মামা মাতামহের বংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দূর জ্ঞাতি এমন কি গ্রামস্থ সমস্ত লোকের সহিত এক রকমে না এক রকমে সম্বন্ধ থাকিত। আগে "বসুধৈব কুটুম্বরাম" ছিল, সেই জন্য প্রবীণ অথবা সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী খুড়া জেঠার ন্যায় সম্মানিত হইতেন। এখন সে ভাব নাই, এখন সবাই সমান, সুতরাং সকলে এক বাবু পদ বাচ্য। যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই এরূপ ভিন্ন গ্রামবাসী লোকের "রায় মশাই" বা "মজুমদার মশাই" বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি ছিল। কায়স্থ দিগকেও "দত্তজা" বোসজা বা "ঘোষজা মশাই" বলিয়া ডাকা হইত। এখন বোধ হয় "ঘোষজা" বা "দে মশাই" বলিলে তিনি ততটা সন্তুষ্ট হন না। শালা ভগিনীপতির মধ্যে "চাটুজ্জে মশাই, বাঁড়ুজ্জে মশাই" ইত্যাদি রূপ সম্বোধন প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে "রামবাবু" শ্যামবাবু" বলিয়া পরস্পরকে ডাকিতে শ্রবণ করা যায়। এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে লোকে শ্বশুরকে তাঁহার উপাধি অনুসারে "চক্রবর্ত্তী মশাই" বা "গাঙ্গুলী

মশাই” বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। পাছে শ্বশুরকে বাবু বলিলে তাঁহার অসম্মান হয়, এবং সেই অসম্মানে শ্রীমতীর মনোমালিন্য ঘটিলে, তাঁহার বিরাগ ভাজন হইতে হয়, এই ভাবিয়া এখনও কেহ উনবিংস শতাব্দীর শেষ ভাগেও শ্বশুর বাবু বলিতে সাহসী হন না।

আজ কাল বাবু গিরি বড়ই সুলভ। গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অর্থের সংস্থান না থাকিলেও বাবু গিরি করিবার ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় না হউক অনেকটা বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন আসল বাবু গিরি, নকল বাবু গিরি, গিল্টির বাবু গিরি ও কেমিক্যাল বাবু গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আসল বাবু গিরি পাকা সোণার ন্যায় মহার্হ। চাল চলনে অথবা কথাবার্ত্তার ধরণে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যায় কে কোন শ্রেণীর বাবু। কিন্তু আপন্নিকষ পাষাণে কষিয়া দেখিলে ইহাদের সারবত্তা উপলব্ধি হইতে পারে। ইহারা যখন চুরুট বার্ডসাই মুখে দিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে সাদা লাল ইত্যাদি বিভিন্ন বেশে পথে গমন করিতে থাকেন, তখন বোধ হয়, যেন এক খানি কলের গাড়ির অনুকরণ করিয়া চলিতেছেন।

যখন দেবগণের মর্ত্তে আগমন হইয়া ছিল, এবং তাঁহারা একে একে সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কলির সহর কলিকাতার কেতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, তখন নারায়ণ সহরের মধ্যে অনুকরণ যোগ্য বাবু গিরি স্বর্গে প্রচলন করিবারজন্য ব্রহ্মার নিকট প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে ইন্দ্র আপত্তি করিলেন, যদি বাবু গিরি স্বর্গধামে যায় তবে ব্রহ্মা হতে বেঁটু মাথাল পর্য্যন্ত বাবু হইবে। মহাদেব হাসিয়া বলিলেন “ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, পবন বাবু হইলে তাহাদের সন্তানরাও যখন বাবু সাজিয়া বাহির হইবে ভাল দেখাইবে না। তাই বলি ও বাবু গিরি স্বর্গে আনিবার আবশ্যকতা নাই।

রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা। *

আজি আমাদের বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম দিন, এই জন্য সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে প্রণাম করিয়া শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। যদি ঈশ্বরের রাজ্যে এমন কোন বস্তু থাকে, যাহাতে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ হয়, তাহা কেবল একমাত্র জ্ঞান। জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সত্য সকল অবগত হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করি। সেই ঈশ্বরকে

* এই প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছিল, কোন বিশেষ কারণে ঐ পত্রিকায় এতদ্ প্রবন্ধ আর প্রকাশ হইবে না স্থির হওয়াতে সমীরণে ইহাকে গ্রহণ করা হইল প্রবন্ধটী এখন সমীরণেই শেষ হইবে। সং—

বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য এবং তাঁহার প্রতি স্বচ্ছ প্রেম প্রবাহিত করিবার জন্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। যাহা দ্বারা পদার্থের গঠনতত্ত্ব, কার্য্যতত্ত্ব, কার্য্যনিয়মতত্ত্ব, পারস্পরিক সম্বন্ধতত্ত্ব এবং কারণ অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম বিজ্ঞানশাস্ত্র। প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র এই জগৎ; তাহার অধ্যাপক ঈশ্বর; দেবমনুষ্য অধ্যেতা; সজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ অধ্যয়ন। বিশ্ববিজ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—জড় অথবা ভৌতিকতত্ত্ববিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান। মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তড়িত, তাপ, আলোক পশুপক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যের শরীর পর্য্যন্ত, যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সে সকল ভৌতিকতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত; আত্মা প্রভৃতি যে সকল বিষয় অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহা আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। আবার এই দুই বিজ্ঞানের বিশেষ কোন ভাগ আলোচনা করিবার নিমিত্ত ইহাদের উপবিভাগ করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিজ্ঞানের এক একটী তত্ত্ব এত অসীম ও দুরবগ্রাহ্য, যে কেহই তাহার তলস্পর্শ করিতে পারে নাই এবং পারিবে যে, তাহার আশা করা যায় না। যাহার মন বিক্ষেপশূন্য হয়, এবং যিনি মনকে বশীভূত করিয়া এক বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়া রাখিতে পারেন ও বৃত্তিসকল সংযত করিতে পারেন, তিনিই স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা দ্বারা তত্ত্বলাভ করিতে পারেন; ইহাতে কঠোরতা চাই। এই কঠোরতার লাঘবার্থে সাধারণের পররচিত গ্রন্থপাঠ দ্বারাই জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে ভাল বাসেন, কিন্তু তাহা বিজ্ঞানের প্রতিবিম্বমাত্র; আর ইহাতে আপনার পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না। নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে মনুষ্যরচিত গ্রন্থের ভ্রমপ্রমাদ দোষেরও নিরাকরণ হয় না—একই ভুল বরাবর চলিয়া আসিয়া সকলকে ভ্রান্ত করিয়া তুলে।

মনুষ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বিশ্ববিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া ভ্রমপ্রমাদদোষে দূষিত হয় বলিয়া বিশ্ববিজ্ঞান যে ভ্রান্ত, তাহা নহে। বিশ্ববিজ্ঞানের প্রতিবিম্বমাত্র যে মনুষ্যরচিত বিজ্ঞান, তাহাতে সত্যও থাকিতে পারে মিথ্যাও থাকিতে পারে; এই জন্য বিজ্ঞান-প্রতিবিম্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্ষোভ নিবারণ হয় না, এই জন্যই বিজ্ঞান প্রতিবিম্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজের নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে, পরমেশ্বরের রচিত বিশ্ব-পুস্তকে কিছুমাত্র ভ্রান্তি নাই; যাহা কিছু ভ্রান্তি, তাহা আমাদের পড়িবার ও বুঝিবার ভ্রান্তি।

পূর্ব্বে যে দুইটী বিজ্ঞানের কথা বলা হইল তন্মধ্যে রসায়নশাস্ত্র জড়তত্ত্ববিজ্ঞানের একটী উপশাখা মাত্র। প্রাকৃতিক জগতে যে সকল সংযোগ বিয়োগ হয়, তত্তাবতের নিগূঢ় তথ্যানুসন্ধান করা রসায়ন শাস্ত্রের বিষয়। যে সকল ভৌতিক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকলের মূলান্বেষণ করাই এই বিদ্যার বিষয়। সংযোগ ও বিয়োগের নিয়ম নির্দ্ধারণ, সংযোগ বিয়োগ হইয়া যে সকল ভূত উৎপন্ন হইল তাহাদের ও তাহাদের উপাদান সকলের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করাও রসায়নের প্রধান কার্য্য। রসা-

য়ন শাস্ত্রের সহকারী সেই সকল শাস্ত্র, যে সকল শাস্ত্রের তাপ, তড়িৎ, আলোক, সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণ, জল, বায়ু প্রভৃতির তত্ত্ব সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই সকল শাস্ত্র জানা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রকৃত বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞানের, পুস্তক বিজ্ঞান নহে। পরমেশ্বর জগতে যে সকল ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে যাহা বুঝিতে পারিয়াছে, সে তাহাই লিখিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস না করিয়া পর্য্যবেক্ষণ-পরায়ণ হইয়া সেই সকল দেখিতে হইবে, তবে তাহা ঠিক জানা হইবে; অন্যের কথা শুনিয়া জানিলেও তেমন আনন্দ হয় না। যেমন, যে লবণ আমরা আহার করি, তাহা যেন দেখিতে এক পদার্থ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহা দুই পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত হয়—এক, ক্লোরীন্ (হরিতন) নামক উগ্রগন্ধ-যুক্ত বায়বীয় পদার্থ, আর সোডিয়ম (সর্জ্জ) নামক ধাতবীয় কঠিন পদার্থ, এই উভয়ের সংযোগে উপাদেয় সামগ্রী লবণ প্রস্তুত হয়। যে আপন স্বাধীন চেষ্টায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা জানিতে পারে, তাহার যেমন আনন্দ হয়, অন্যের চর্চ্চিত বিষয় পড়িয়া আমাদের তেমন আনন্দ হয় না। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা এই দ্রব্য পরীক্ষা করিতে হইবে; আবার অন্য বস্তুর সংযোগে ঐ বস্তুর কিরূপ সংযোগ বিয়োগ ও কিরূপ গুণ হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

পরীক্ষার যত উপায় আছে, তদ্দ্বারা পরীক্ষা করিলে তবে তথ্য অবগত হওয়া যায় এবং তাহা আপনার বলিয়া বোধ হয়। নিজে যে সবই করিতে পারি তাহা নহে, তবে মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়া যতদূর সাধ্য তাহা করা উচিত। এবং সেই আপনার কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য, নিজের সহায়তার জন্য, অমুক অমুক জ্ঞানী ব্যক্তি অমুক অমুক বিষয়ে কি কি লিখিয়াছেন তাহা জানিলে আপনার কার্য্যের অনেক সহায়তা হয়। নিজের কার্য্য করিবই; তাহার জন্য অন্যান্য জ্ঞানীদের নিকট সহায়তা লইব—ইহাতে অন্যের ভ্রম দেখিয়াও আপনার কার্য্যের সুবিধা হয়। আমরা অন্যের নিকট হইতে দুই রকমে উপদেশ লইতে পারি—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আর অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে; এক, অন্যের সত্য সংস্করণ দেখিয়া শিক্ষা করা যায়; আর এক, অন্যের ভুল দেখিয়া জ্ঞানলাভ করা যায়—ঐ ব্যক্তির এই কার্য্যে এই ভুল হইয়াছে, অতএব আমি ঐ পথে গিয়া ঐ ভুল করিব না।

এই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। বিজ্ঞান-তত্ত্ব জানিবার লক্ষ্য, এই সকল তত্ত্বপরম্পরা দ্বারা মূলতত্ত্ব ঈশ্বরকে জানা। যে ঈশ্বরকে জানে, এই সকল তত্ত্ব তাহার পক্ষে নিম্নতলে পড়িয়া গেল—বিজ্ঞানতত্ত্ব মূলতত্ত্বের সোপান। যেমন—এই কাগজ রহিয়াছে. ইহাকে ছিঁড়িয়া দশখণ্ড করিলাম, তাহার একটীকে আবার বিশখণ্ড করিলাম, তাহার একটীকে আবার চল্লিশ খণ্ড করিলাম; এইরূপে এত সূক্ষ্ম ভাগ করিলাম যে চক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার উপর কি ভাগ হইবে না?—বরাবর ভাগ হইবে; অনন্ত কাল ভাগের দিকে চলিল। দেখ, একখণ্ড কাগজ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মন অনন্তের দিকে

ধাবিত হইল। ঈশ্বরের অনন্ত ইচ্ছা হইতে কাগজের উপকরণ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এক-খণ্ড কাগজও অনন্তের চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। আমরা অনন্ত ঈশ্বরকে কাগজের কণার মধ্যে যেমন দেখিতে পাইতেছি, অনেক বিদ্বান্ লোকেরা মহান্ সূর্য্য চন্দ্রের মধ্যেও হয় তো ঈশ্বরকে তেমন দেখিতে পান না।

যেমন এই বড় বাড়ী আছে, এই বাড়ীকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে ইহার প্রতি গৃহকে আগে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়, তেমনি বিশ্ববিজ্ঞানকে বিভক্ত না করিলে সম্যক্ জানা যায় না; একবারেই সমস্ত ধারণ করিব কি প্রকারে—চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে, মন অব-সন্ন হইয়া পড়িবে। এক একটী বিষয় এক এক সময়ে লইয়া আলোচনা করা উচিত। আমরা এখন লইলাম কি—পৃথিবীর ভিতরে যে সকল সংযোগ বিয়োগ হইতেছে তাহাই লইলাম। এই দেওয়াল রহিয়াছে, ইহাকে যদি বিয়োগ করা যায়—রাসায়নিক বিয়োগ নহে—যদি ইহাকে ভগ্ন করা যায়, চুন, সুরকী, ইট, বালি, এই সকল উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু চুনকে যদি রাসায়নিক বিয়োগ কর, তাহা হইতে দুইটী জিনিস বাহির হইবে—অক্‌সিজেন (অম্লজান) বায়ু ও ধাতবীয় ক্যালসিয়ম (চুর্ণসার); বলিতে অ-ধাতবীয় সিলিকন (শিলিক) পদার্থ ও অম্ল-জান বায়ু পাওয়া যাইবে; তেমনি ইটে ও সুর-কীতে অম্লজান বায়ু ও লৌহ প্রভৃতি কতকগুলি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইবে; তাই বলিয়া ক্রমশঃই যে ঐ সকল দ্রব্য অধিক পাইতে থাকিব তাহা নহে। তিন চার পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে ঐ সকল প্রস্তুত হইয়াছে; যেমন সপ্তাশ্ব সূর্য্যের সাত প্রকার রশ্মি, যাহা সূর্য্যের আগে আগে দৌড়ায়, সেই সাত বর্ণের বিভিন্ন মিশ্রণে এত প্রকার বর্ণ আমরা দেখিতে পাই—কখন গোলাপ ফুলের বর্ণ হইতেছে, কখন চাঁপাফুলের বর্ণ হইতেছে। কিন্তু সাতটা রঙের বেশী কোন কিছুতেই নাই। ঐ সাত বর্ণের মধ্যে কতকগুলি বর্ণ একভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একপ্রকার বর্ণ হইল; আর এক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আর এক প্রকার বর্ণ হইল; ইহাতেও সাতটা রঙের অতিরিক্ত কিছুই নাই, উহাতেও সেই সাতটা রঙের অতিরিক্ত কিছুই নাই, সেইরূপ কতকগুলি পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে ইট, সুরকী চুন, প্রভৃতি হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগকে বিয়োগ করিলে গোটাকএক মাত্র বস্তু পাওয়া যায়, যাহাদিগকে আর ভাগ করিতে পারি না, তাহা দিগের নাম মৌলিক পদার্থ বা রূঢ়িক পদার্থ। আবার ঐ বিয়োজিত বস্তু সকলকে সংযোগ করিয়া ইট প্রভৃতি যদি প্রস্তুত করিতে পারি, তবেই পরীক্ষা একবারে সম্পূর্ণ হইল—বিয়োগের বেলায় যে প্রকার হইল, সংযোগের বেলায়ও ঠিক তাহাই হইল; যেমন দশকে বিভক্ত করিলে দশটা এক হইয়া গেল, আবার ঐ দশটা এককে যোগ করিলে দশ হইল, তবেই আর তাহাতে ভুল রহিল না। এইরূপে একবার বিয়োগ করিতে করিতে যাইতে হয়, একবার যোগ করিতে করিতে যাইতে হয়—উল্টাপাল্টা করিয়া দেখিতে হয়।

এইরূপে মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে চৌষট্টি বস্তু পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের মধ্যে নানা-

প্রকার সংযোগে পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু হইয়াছে এবং যত কিছু কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে আনিয়া ফেলিল চৌষট্টি অক্ষরে!—যেমন, একটা পুস্তকে কতকগুলি লাইন থাকে, প্রতি লাইনে কতকগুলি কথা থাকে, সেই সব কথাতে কতকগুলি অক্ষর থাকে;—মনে কর, একটা বইয়েতে দশলক্ষ অক্ষর আছে, যদি তাহা ইংরাজী পুস্তক হয়, সেই অক্ষর সকল আসিয়া মিলিবে ছাব্বিশ অক্ষরে; যদি তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে পুস্তক হয়, অক্ষর সকল আসিয়া মিলিবে, পঞ্চাশে, যেমন এই কয়টী অক্ষরের মধ্যে বিভিন্নরূপ সংযোগ দ্বারা সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তেমনি সমস্ত পৃথিবীকে বিয়োজিত করিলে তড়িৎ, তাপ আলোক, আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি এবং চৌষট্টি ভৌতিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে এইরূপে আপনার অঙ্গুলির গণনার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে আনিয়া ফেলিল, সে মুঠার ভিতরে জগতকে আনিল এবং তাহার মধ্যে বিচিত্রশক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। পরমাণুর মধ্যে, ঈশ্বরের সত্তা ও সহায়তা ভিন্ন সংযোগ বিয়োগ সাধিতে পারে না। ঘড়ির কলে দম দিলে, দম দিবার সময় যত পরিমাণ শক্তি তাহাতে গচ্ছিত করা হইয়াছিল, যতক্ষণ সেই শক্তি থাকিল ততক্ষণ ঘড়ি বেশ চলিতে লাগিল যেই তাহা ফুরাইয়া গেল অমনি তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। ফলতঃ ঘড়ির আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা নহি; পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর গুণাগুণ অবগত হইয়া এরূপে তাহাদিগকে রচনা করিলাম যে তাহারা কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিতে লাগিল, কিন্তু পরমেশ্বর স্রষ্টা, সুতরাং তাঁহার অধিষ্ঠানেই প্রতি পরমাণু কার্য্য-তৎপর রহিয়াছে। একটা কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেই কাগজ পচিয়া অণুতে বিভক্ত হইয়া গেল; হয় তো তাহার পরে সারমাটির সঙ্গে গিয়া তাহা কোন গাছের শাখায় বা ফলে প্রবেশ করিল; তাহাকে আবার জন্তু খাইল; হয় তো তাহা আবার ঘর্ম্মাদির সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল, আবার অন্য স্থলে চলিল। কোন পরমাণু এক মুহূর্ত্তও স্থির নাই; ক্রমাগত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা কি নিজে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে?—ইহারা তো জড় পদার্থ মাত্র। ইহাদের তৎপরতা ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই। এক ক্ষুদ্র পরমাণুর চেষ্টা হইতে, সেই পরমাণুর মধ্যে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরের যে কি অসীম চেষ্টা, তাহা উপলব্ধি করি। সমস্ত জগৎ এইরূপ অনিমেষ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কি নিজের শক্তি আছে?—তাহা নহে; তাহাদের ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহাই তাহাদিগকে চালাইতেছে। ঈশ্বরের মহাশক্তি সেই সকলের মধ্যে বিরাজ করিয়া যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছে। পরমেশ্বর যদি সেই সকলে না থাকিতেন, তবে ঐ সকল বস্তু নিস্তব্ধ হইয়া যাইত; ঘড়ি বন্ধ হইলে যেমন হয়, তাহা অপেক্ষাও নিস্তব্ধ হইত—এমন কি, কিছুই থাকিত না। এইরূপে বিজ্ঞান অতি অল্প আলোচনা করিয়াই ঈশ্বরের শক্তি কেমন নিগূঢ়ভাবে বুঝিতে পারি; তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট অনুভব করি; ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত আছি, তাঁহা হইতে কণামাত্র বিচ্ছিন্ন নহি, ইহা হৃদয়ে কেমন বিনিবিদ্ধ হয়।

আর একটি কথা;—রসায়ন জানিতে হইলে কোন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ উপাদানের কি কি পরিমাণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও জানিতে হইবে। কেবল মাত্র উদজান অম্লজান যোগে জল হইল, ইহা স্থূল কথা; ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম কথা হইবে এই যে, দুই ভাগ উদজান সহিত একভাগ অম্লজান মিশ্রিত করিলে জল হয়। এই তিন ভাগ সংযুক্ত হইয়া যে জলের বাষ্পরূপে পরিণত হইবে, সেই বাষ্প কেবল দুইভাগ মাত্র স্থান গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহাদের ওজন করিয়া পরীক্ষা করা যায়, দেখিতে পাইব যে, যে দুইভাগ উদজান আছে তাহার প্রত্যেক ভাগ উদজানের ওজন যদি এক কুঁচ হয়, তাহা হইলে দুই ভাগে দুই কুঁচ ওজন হইবে ; আর একভাগ যে অম্লজান আছে তাহার ওজন ষোল কুঁচ হইবে এবং ঐ দুই ভাগ উদজান ও একভাগ অম্লজান মিলিত হইয়া যে বাষ্প হইবে তাহার ওজন আঠার কুঁচ হইবে। যদিও তিন ভাগ উদজান ও অম্লজানে দুইভাগ মাত্র বাষ্প হইল, কিন্তু তাহাদের এক পরমাণুও নষ্ট হইল না—কারণ উদজান অম্লজান অধিক পরিমাণে ঘনীভূত হইল বটে, কিন্তু ওজনে যে আঠার কুঁচ, সেই আঠার কুঁচই হইল। পরিমাণ ও ওজনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে জল প্রস্তুত করিতে পারিবে না। আবার ইহারা যে সংযুক্ত হয়—কি নিয়মে সংযুক্ত হয়? শুদ্ধ উদজান দুই ভাগ ও একভাগ অম্লজান বিশ দিন একটা পাত্রে রাখিয়া দাও, কিছুই হইবে না, কিন্তু এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎ লাগাইয়া দাও, জল হইবে। তবেই নিয়ম এই হইল যে, দুইভাগ উদজান ও এক ভাগ অম্লজানে বিশুদ্ধ অবস্থায় তড়িৎ প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই হইল হিসাবী কথা ; ভাসা কথাতে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। বিজ্ঞান আলোচনা করিবার কালে তাহাদের নিয়ম সহিত আলোচনা করিতে হইবে, তবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আমরা অনুভব করিতে পারিব।

ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করাই আমাদের বিজ্ঞানালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা অতদূর উন্নত হয় নাই, যাহাদিগের মন পারমার্থিক দিকে ধাবিত হয় নাই, তাহারা কি রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বারা কোন উপকারই প্রাপ্ত হইবে না? ঈশ্বরের এরূপ ভাব নহে। তিনি উদারভাবে যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন ; যে তাঁহাকে চায়, তাহাকে আপনাকে দান করেন; যে ঐহিক সুখ চায়, তাহাকে ঐহিক সুখ দেন—ক্রমে সে তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া আবার তাঁহারই দিকে ফিরিয়া আইসে। সেইরূপ রসায়ন দ্বারা যে ঐহিক সাহায্য হয় না, তাহা নহে। ইহার দ্বারা ঐহিক উপকার বিস্তর হয়। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যে কত শিল্প প্রস্তুত হইতেছে বলা যায় না ; রসায়নশাস্ত্রের বিলোপ হইলে তাহার কিছুই থাকে না। ইহার এক সহজ দৃষ্টান্ত দেখ—সূর্য্যালোক দ্বারা ছবি তোলা। প্রথম কাচকে কলোডিয়ম দ্বারা প্রলেপ দিতে হয়, তাহার পরে তাহাকে (কাষ্টকি) "নাইট্রেট অব সিলবর" এর জলে ভিজাইয়া লইলে মানুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে মানুষের ছায়া যেখানে পড়ে সেই স্থান ক্ষয় হয় না, যেখানে যেখানে আলো পড়ে, সেই সেই স্থান ক্ষয় হইয়া যায়—ইহাতেই মানুষের প্রতিবিম্ব কাচে বেশ দাঁড়াইয়া যায়।

কাপড় রঞ্জিত করিবার রং ধাতু হইতেও প্রস্তুত হয়, বৃক্ষ হইতেও হয়। নীল রঙ্গ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু নানা কৌশলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা বাহির করিতে হয়। আমাদের এখানে খনি আছে, তাহা হইতেই হীরক নীলকান্ত মণি প্রভৃতি পাই, বিলাতে তাহা পাওয়া যায় না অথচ এ সকল না হইলে শোভা হয় না, সুতরাং বিলাতবাসীরা কৃত্রিম উপায়ে তাহা প্রস্তুত করে। যদিচ তাহা স্বাভাবিক হীরকাদির ন্যায় হয় না—যাহা ঈশ্বরের নিয়মে হয়, আর তাহা মানুষের নিয়মেও হইতেছে—তবুও অনেকটা ঠিক করিয়া উঠিয়াছে; ক্রমে ইহা অপেক্ষাও ভাল প্রস্তুত করিতে পারিবে না তাহা কখনই সম্ভবপর নহে—এই ব্যবসায়ের দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে, আবার কত লোকের বেশভুষার সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। আর এক প্রকার ব্যবসা চলিতেছে—ছাঁচ তোলার ব্যবসা। মনে কর, ঐ কুঁজটীর ছাঁচ তুলিবে। যদি তাহার ছাঁচ তুলিতে হয়, উহার অর্দ্ধেকের উপর তামার জলের * প্রলেপ দিবে, পরে অপর অর্দ্ধেকের উপর প্রলেপ দিবে; সেই দুই অর্দ্ধেক ছাঁচ সংযুক্ত করিলেই কুঁজার সম্পূর্ণ ছাঁচ উঠিল। এই ব্যবসায় প্রকৃতরূপে রসায়ন বিদ্যার ফল। মনে কর, কাচের ব্যবসায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাচের বদলে স্ফটিক ব্যবহার হইত। খনির ভিতরে যেমন অন্যান্য সামগ্রী থাকে, তেমনি কাচের মতন স্বচ্ছ প্রস্তর অনেক পাওয়া যায়। আর এখনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে কাচও প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে হইত। এখন বিশ চল্লিশ প্রকারের কাচ প্রস্তুত হইতেছে; যন্ত্রের দ্বারা তাহাকে কাটিয়া বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। গিল্টি ব্যবসায় সম্পূর্ণ রূপে রাসায়নিক ব্যাপার। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যাহারা ভোগবিলাসী তাহাদের পক্ষে সুখকর দ্রব্য ব্যয়েতেও অল্প, আবার তাহাতেই অন্যেরও জীবিকা হয়। আমাদের দেশে স্বর্ণকারেরা রসায়নের নিয়ম মাত্র জানে। সোনা গালাইতে হইবে—তাপ দিতেছে, গলিতেছে না, একটু সোহাগা দিতেই গলিয়া গেল; "পান" ধরাইবার সময় সোরা ও নিশাদল উপযুক্ত ভাগে দিলে জোড়া লাগিয়া যায়—অন্য কোন আটা দিলে সেরূপ যোগ হইত না। এই সকল রসায়ন-কথা বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাই তাহারা অভ্যাসবশতঃ জানিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা নাই, সুতরাং ইহার আর উন্নতি হইতেছে না; পূর্ব্বে রসায়ন বিজ্ঞান যতটুকু বাহির হইয়াছিল তাহাই আছে, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে বলিতে পারি।

চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও রসায়ন দ্বারা কত উপকার হইয়াছে। অসভ্যাবস্থায় যেন ধাঙ্গড় প্রভৃতি বন হইতে একটা গাছের কতকগুলি পাতা খুঁজিয়া লইয়া আসিল, আর একটা গাছের শিকড় লইয়া আসিল, ঔষধ হইয়া গেল। কিন্তু যেখানে সেই সকল গাছ আছে, সেই স্থানের লোকদিগেরই রোগে তাহা খাটিতে পারে; দূরবর্ত্তী স্থান হইলে পাতা প্রভৃতি আনিতে আনিতে শুকাইয়া গেলে আর তাহাতে কাজ হয় না।

* অম্ল পদার্থের সংমিশ্রণে গলিত তাম্র। ইহা কোন বস্তুর উপর ঢালিলেই তাহা ঘনসংযুক্ত হইয়া যায়।

এই জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের সত্বটা বাহির করিয়া লওয়া গেল। অনেক পাতা শিকড় খাইলে যে উপকার হয়, তাহার দশ ফোটা খাইলেই সেই উপকার হয়। সত্ব দ্বারা, ঔষধের রাগ হয়, তেজ হয়; এইরূপ বলবান্ ঔষধ প্রস্তুত না হইলে নিমের পাতা, গুলঞ্চের পাতা প্রভৃতি ঔষধদ্রব্য অনেকটা খাইতে হইত। আরও এই সত্ব প্রস্তুত করিবার প্রণালী দ্বারা সার ভাগ লইয়া অসার ভাগ পরিত্যাগ করা গেল; তাহাতে দূর দূর স্থানে পাঠাইবার সুবিধা হইল; চিকিৎসকদের ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হইল; রোগীর ঔষধ খাইবার সুবিধা হইল; বিক্রয়ের সুবিধা হইল। লৌহঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে লৌহের সঙ্গে অম্লজান যোগ করিয়া লৌহভস্ম করা হইল; তখন তাহা উদরে গিয়া পরিপাক হইয়া ঔষধের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহা না করিয়া যদি লৌহ গিলিয়া খাওয়া হয়, তাহাতে রোগের আরো বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ আমাদের দেশে তামাঘটিত, লৌহঘটিত, রূপাঘটিত, সোনাঘটিত ঔষধ আছে—অমুক অমুক পদার্থের সঙ্গে অমুক অমুক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহার সঙ্গে অম্লজান মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখে। আমাদের দেশে এইরূপে যতদূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়াছিল; তাহার পরে নানা কারণে আর বেশী চর্চ্চা হয় নাই, উন্নতি হয় নাই। ইংরাজদিগের কতরকম লৌহঘটিত ঔষধ আছে, —(হীরাকস বা গন্ধকায়িত লৌহ) সল্‌ফেট অব্ আয়রণ আছে, (লৌহভস্ম বা জারিত লৌহ) অক্‌সাইড্ অব আয়রণ আছে, (লিম্বুকায়িত লৌহ) সাইট্রেট অব আয়রণ আছে, (দ্রাক্ষায়িত লৌহ) টারট্রেট অব আয়রণ আছে, আরো কত রকম আছে; এক লৌহকে নানাপ্রকার রূপান্তরিত করিয়াছে—এক এক রূপে এক এক রকম গুণ। দেখ, রসায়ন শাস্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের কত উপকার হইয়াছে।

এই রসায়ন শাস্ত্রকে জানিতে হইলে ইহার সঙ্গে যে যে শাস্ত্রের যোগাযোগ আছে, তাহা আগে জানিতে হইবে। তাহা না হইলে রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে তাহাদের কোন কথা পড়িলে তখন হাতড়াইতে হইবে। যেমন, তাপ আগুন হইতেও পাওয়া যায়, সূর্য্য হইতেও পাওয়া যায় —উহাদের সম্বন্ধে বিস্তর কথা আছে; কোন্ বস্তুতে কি পরিমাণ তাপ দিলে কঠিন বস্তু তরল হয়, তরল বস্তু বায়ু হয়, বায়ু আবার কত তাপে কত প্রসৃত হয়; আবার সেই তাপ কত হরণ করিলে বস্তুর কত সঙ্কোচ হয়, বায়বীয় পদার্থ তরল হয়, তরল পদার্থ কঠিন হয়; কি পরিমাণ তাপ দিলে জলে বিকর্ষণ হইয়া জল বায়ু হইয়া আকাশে প্রসৃত হয়, কি পরিমাণ তাপ প্রত্যাহার করিলে তাহারা আকৃষ্ট ও সংকুচিত হইয়া জল হয়, তাহা হইতে আবার কত তাপ হরণ করিলে সেই জল কঠিন হইয়া তুষার হয়, এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় পূর্ব্বে জানা উচিত। দেখ এক তড়িতের দ্বারা বিদ্যুৎ পাত হইতেছে, আবার তারে সংবাদ যাইতেছে, কত দূর হইতে কত দূরে কত শীঘ্র অম্লজান ও উদজান মিলিয়া জল হইতেছে। আমাদের শরীরে তড়িৎ আছে বলিয়া কথা কহিতে পারিতেছি; তড়িৎ আছে বলিয়া শুনিতে পাইতেছি। সেই তড়িৎ কখন গুপ্তভাবে শরীরে আছে, কখন প্রকাশ্যভাবে

বিদ্যুৎ হইতেছে। আবার আকর্ষণ বিকর্ষণের বিষয় জানিতে হইবে। একটা গোলা ছাড়িয়া দিলাম, টেবিলের উপর পড়িল, আবার উপর দিকে যাইবে; প্রথম হইল আকর্ষণ, দ্বিতীয় হইল বিকর্ষণ। এই দুই ক্রিয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। আকর্ষণ না বুঝিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বুঝা যায় না। আকর্ষণ বিবিধ প্রকার—যোগাকর্ষণ. মাধ্যাকর্ষণ. কৈশিকাকর্ষণ রাসায়নিক আকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তড়িদাকর্ষণ; ইহার বিপরীত বিকর্ষণ। আকর্ষণে সংঘটন হয়, বিকর্ষণে বিঘটন হয়।

জল এক শ্রেণীর পদার্থ। তরল পদার্থের নিদর্শন হইতেছে জল। কঠিন পদার্থ তাহা. যাহার পরমাণু সকলকে শীঘ্র সরান যায় না। তরল পদার্থ ঢালা যায়; আঙ্গুল তাহার ভিতরে বসিয়া যায় অর্থাৎ আঙ্গুল যত স্থান গ্রহণ করে, তথাকার পরমাণু সকল সরিয়া গিয়া অন্যত্র তত-স্থান গ্রহণ করে আবার আঙ্গুল টানিয়া লইলে গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া যায়। বায়বীয় পদার্থ সকল ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে। হাল্‌কা সূক্ষ্ম বায়ুবৎ পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণ বলবান্; তাহাদের পরমাণু সকল যতক্ষণ বায়বীয় ভাবে থাকে, ততক্ষণ পরস্পর হইতে দূরেই যাইতে চায়। রসায়ন-বিজ্ঞান; জানিবার পূর্ব্বে জলজাতীয় যত পদার্থ, বায়ুজাতীয় যত পদার্থ, সকলেরই বিষয় জানিতে হইবে—তৈল জল জাতীয় পদার্থ, পারদ জল-জাতীয় পদার্থ। বায়ুর বিষয় জানিতে হইলে কেবল সামান্য বায়ুর বিষয় জানিলে হইবে না; অম্লজান একরকম বায়ু, উদজানও একরকম বায়ু —আবার এই সকল বায়ু যে কেবল মুক্ত ভাবে আছে তাহা নহে। ইহারা বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায়ও আছে।

আমার কাশ্মীর যাত্রা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্রমে বাঁকীপুর, দানাপুর প্রভৃতি ষ্টেসনগুলি একে একে অতিক্রম করিয়া 'ঝণ্ ঝণ্ ঝণাৎ গুম্ গুম্ ঝণাৎ' ইত্যাকার বিকট শব্দ ও ঘন ঘন উচ্চ বংশীধ্বনীর সহিত ট্রেণ সুবর্ণরেখা (শোন) নদের প্রকাণ্ড সেতুর উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। দেখিলাম সেতুটী দ্বিতল, উপর দিয়া ট্রেণ ও নিম্ন দিয়া মনুষ্যগণ যাতায়াত করিতেছে। ধন্য মানবের অসীম বুদ্ধি!!

৪৭২৬ ফিট্ বিস্তৃত সেতুটী কেবল মাত্র ২৮টী জল প্রোথিত স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান! ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর তারিখে রেলওয়ে কোম্পানীর সর্ব্বসমেত ৪৪ ৩৩ ৩২৪০ টাকা ব্যয়ে এই বিশাল শোন সেতু নির্ম্মিত হইয়া ইঞ্জিনিয়ার বয়লী (Boyle) সাহেবেরই অসাধারণ স্থাপত্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। যাঁহারা ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার শিল্পবিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার ইংরাজ শিল্পী বয়লী সাহেবের এই কীর্ত্তি-সেতু দেখিলে তাঁহাকেও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না—সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে শুল্ক স্বরূপ বর্ষাকালে দুইটী ও গ্রীষ্ম কালে একটী করিয়া পয়সা দিতে হয়।

এই শোন বা সুবর্ণ রেখার আর একটী নাম হিরণ্যবহা। প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের নিকট ইহা ঐ নামেতেই ভারতমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর নদী বলিয়া পরিচিত ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভাসীন প্রসিদ্ধ গ্রীক্‌দূত মহামতি মেগেস্থিনিস্ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সময়ে হিরণ্যবহা মগধ রাজধানী পাটলীপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) নগরের পদধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল। কিন্তু এখন কালের তাড়নায় হিরণ্যবহা পাটনা সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল সরিয়া পড়িয়াছে। (১)

বহুকাল হইতেই এদেশে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, একদা শোন নদের সহিত নর্ম্মদা নদীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় এই শুভ পরিণয় কার্য্যে সম্পন্ন হয় নাই। কথিত আছে, এই বিবাহের দিন পর্য্যন্তও হইলে কন্যা নর্ম্মদা একদিন প্রিয় সহচরী ঝোলা নাম্নী স্রোতস্বিনীকে ভাবি পতি শোনের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। একে ঝোলা তখন পূর্ণ যৌবনা তাহাতে আবার অনূঢ়া। সুতরাং তিনি শোনকে দেখিবা মাত্র স্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তথা শোনও ঝোলার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া নর্ম্মদার পরিবর্ত্তে ঝোলাকেই বিবাহ করিয়া বসিলেন। অতঃপর এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ নর্ম্মদার কর্ণগোচর হইলে, তিনি দুর্দ্দমনীয় ক্রোধাবেশে শোন ও ঝোলা দুইজনকেই দুই পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ও তদবধি চিরকুমারী থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন।

সেতুর উপর দিয়া যাইতে যাইতে একবার গাড়ীর বাতায়ন দিয়া দেখিলাম এখন আর সুবর্ণরেখার তাদৃশ প্রখর স্রোত নাই। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড তপনতাপে এখন স্রোতস্বতী তোয়াভাবে উভয়তীরবর্ত্তী বিপুল বালুকাময় সৈকতভূমীর অন্তর্গত আপনার অতি সঙ্কীর্ণ স্রোতবর্ত্মের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও ধীবরগণ স্রোতের মুখে জাল পাতিয়া চুণামৎস্যের বংশলোপের চেষ্টায় দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও কৃষকেরা তৃষ্ণার্ত্ত গো মহিষাদি পশুদিগকে জলপান করাইতেছে, এবং কোথাও বা বকধর্ম্মরাজ কুঞ্চিত গ্রীবায় পুলিন প্রান্তে মৎস্যধ্যানে বসিয়া আছেন ও মধ্যে মধ্যে আচমনছলে নদীসলিলে চঞ্চু প্রবিষ্ট,

(১) Vide, Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. P. 10.

করাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যকুলকে উদরসাৎ করিতেছেন। কিন্তু এখন গ্রীষ্মের প্রভাবে সূক্ষ্ম সুবর্ণরেখা প্রায় যে সুবর্ণ রেখা নদ লোকে অনায়াসে পদব্রজেই পারাপার হইতেছে, সেই সুবর্ণরেখা, শুনিলাম বর্ষাকালে নৌকা করিয়াও পার হইতে সহজে কেহ অগ্রসর হয় না। তখন স্রোতস্বিনীর বিশাল স্ফীত ফেনিল বক্ষ স্থানে স্থানে কখন কখনও ২ ৩ মাইল পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে আমরা সুবর্ণ রেখার পরপারে কৈলোর ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কৈলোরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। সেই জন্য এখানে নানাদেশ বিশেষতঃ আমাদের "ম্যালেরিয়া" প্রপীড়িত বাঙ্গালা হইতে অনেক রোগশীর্ণ জরাজীর্ণ ব্যক্তি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য (change) আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন। এতদ্ভিন্ন এখানে দু একটী অর্থবান বাঙ্গালী বাবুকেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। তাঁহারা এখানে সখ করিয়া আসেন। জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাঁরা প্রায়ই "শরীর খারাপের" দোহাই দিয়া বসেন, কিন্তু দুবেলা বোতল বোতল "ওল্ডস্কচ্ হুইস্কি" ও রাশি রাশি "ফাউল, ক্যারি," "মটন চপ" প্রভৃতি ষোড়শোপচারে উদর দেবের সেবা করিতে কোনও ক্রমেই ত্রুটী করেন না। যাহা হউক এইরূপে দিনদিন একটানা নবস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও পাপ তরঙ্গমালা যে প্রকার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে কৈলোরের স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া এখনও যে সুনামটুকু আছে, তাহাও শীঘ্রই লোপ পাইবে সন্দেহ নাই।

ক্ষণকাল পরেই ষ্টেষণ হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এইবার আমরা বিহার প্রদেশের নিকট বিদায় লইয়া ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করিতে চলিলাম। অতঃপর আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই প্রকৃতি সতীর মুখকান্তিরও একটু একটু করিয়া বৈলক্ষণ্য দেখিতে লাগিলাম এখন আর রেলপথের দুই পার্শ্বে সেই তরঙ্গায়িত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, সেই অত্যুন্নত তাল বৃক্ষ শ্রেণী সেই সুবিস্তৃত আম্র কানন প্রভৃতি বিহার দেশীয় দৃশ্যাবলী প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না। এখন উহাদের পরিবর্ত্তে শৈল প্রধান উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অভিনব পার্ব্বত্য শোভাই কেবল উত্তরোত্তর আমাদের নয়ন পথের পথিক হইতে চলিল।

আরা—কৈলোরের পর আরা ষ্টেষণ—কলিকাতা হইতে ৩৬৮ মাইল দূরে অবস্থিত। আরা একটী অতি প্রাচীন হিন্দু নগর। পাণ্ডবদিগের সময় ইহা অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত 'একচক্রা' নগরী নামে খ্যাত ছিল। মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায় ঐ সময়ে এখানকার অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না। তখন একচক্রার ভীষণ রাক্ষসদিগের উৎপাতে লোকেরা বড়ই উত্যক্ত হইত।

কথিত আছে, জতুগৃহ দাহের পর, পাণ্ডবগণ জননী কুন্তীদেবীর সহিত ব্রাহ্মণের বেশে এই একচক্রা নগরীতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে হিড়িম্বাসুর নামে এক অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন সেই দুর্বৃত্ত রাক্ষসের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া বহুকষ্টে হিড়িম্বাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া তাহার হিড়িম্বী বা হিড়িম্বা নাম্নী ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ ভারত যুদ্ধের রাক্ষসবীর ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরীতে গিয়া তথাকার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নগরের প্রান্তদেশে বকাসুর নামে আর একটী নিষ্ঠুর, নরমাংসাশি রাক্ষস বাস করিত। তাহার উৎপীড়নে অবশেষে এক চক্রার অধিবাসীদিগকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত এক অতীব লোমহর্ষকর রাক্ষসিক সমরধর্ম্মে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। ঐ নিয়মানুসারে তাহারা তাহার আহারের নিমিত্ত আপনাদেরই মধ্য হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে পর্য্যায়ক্রমে এক এক জনকে তাহার নিকট প্রেরণ করিত এবং দুরাত্মাও তখন সেই অনায়াসলব্ধ প্রচুর নররক্ত মাংসে পরিতৃপ্ত হইয়া অনর্থক লোকক্ষয় চেষ্টা হইতে বিরত থাকিত। এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে অবশেষে পাণ্ডবদিগের আশ্রয়দাতা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণেরই সময় আসিল। ব্রাহ্মণের দুরদৃষ্ট নিবন্ধন তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রেরই নামে কঠিণী পতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণের রোদনে মধ্যম পাণ্ডব দয়ার্দ্র চিত্ত ভীম সেনের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তিনি জননী ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট বিদায় লইয়া বকাসুরের বিরুদ্ধে গমন করিলেন। কথিত আছে যাইতে যাইতে মহাবলী ভীমসেন এক প্রকাণ্ড বনস্পতিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া লইয়া ছিলেন এবং তাহারই আঘাতে রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ নগর পর্য্যন্ত টানিয়া নাগরিক দিগকে বকাসুরের ত্রাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। ১

(১) Vide Wheeler's History of India.

বর্ত্তমান আরানগরের মধ্যে 'আরা হাউস' বা আরাগৃহই একমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ দ্রষ্টব্য স্থান। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইঞ্জিনিয়ার বয়লী. ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েক প্রভৃতি অত্রস্থ প্রধান প্রধান ইংরাজগণ, ৫০ জন মাত্র শিখ সৈন্যকে সহায় করিয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সংবাদ তদানিন্তন রোটাস দুর্গের অধিপতি উমার সিংহের বিদ্রোহী ভ্রাতা কুমার সিংহের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অচিরে প্রায় ৩,০০০ লোক লইয়া আরা গৃহ আক্রমণ করেন। কিন্তু আক্রমণ কারীরা প্রায় সকলেই সমর বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ-মূর্খকৃষকবৃন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থ ও লুটের প্রলোভনে এবং কুমারসিংহের ন্যায় উচ্চাভিলাসী ব্যক্তিদিগের প্ররোচনায় পড়িয়া লাঙ্গল ছাড়িয়া জীবনের মধ্যে এই প্রথম বন্দুক ধরিতে বাধ্য হইয়া ছিল। সুতরাং মুষ্টিমেয় শিখ বীরদিগের আলৌকিক সাহস ও বিচিত্র রণ কৌশলে তাহারা কোন প্রকারেই আরাগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন বিদ্রোহীগণ প্রায় সপ্তাহাবধি আরাগৃহ অবরোধ করিয়া রাখে এবং ইংরাজদের একমাত্র অবলম্বন উল্লিখিত শিখ বীরগণকে হস্তগত করিবার মানসে বিবিধ ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে থাকে; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। পরিশেষে দানাপুর সেনানিবেশ হইতে সেনাপতি আয়ার সাহেব সসৈন্যে আসিয়া এই অবরোধ ক্লিষ্ট ক্ষুদ্র বীর মণ্ডলীর উদ্ধার সাধন করেন। কেহ কেহ বলেন আরাগৃহের অবরোধ কালে ইংরাজ পক্ষে কেবল একজন মাত্র শিখ সৈন্য গুরুতর

রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু আরাগৃহের সন্নিকটস্থ ময়দানে কালেক্‌টার সাহেবের আদালতের সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। এই স্তম্ভগাত্রে খোদিত বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিদ্রোহীদের হস্তে এখানকার অনেক ইংরাজকেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। স্তম্ভগাত্রে নিম্ন লিখিত রূপ খোদিত আছে।

"Sacred to the memory of the undermentioned officers and non-officers and men of H. M. 35th Regiment who fell in action in the Sahabad District on the 23rd April 1858. Here lie the remains of the Sergt. W Brilton, Corpl. Hy. Atkin; Pts. St-Fort. Js Dooley, Js Vanghy, Corp A. G. Le, Grand, Js Banker" * * *"

আরা গৃহটী দ্বিতল মধ্যবিৎ অট্টালিকা মাত্র। পূর্ব্বে এখানে কোম্পানীর যত মালামাল থাকিত। বর্ত্তমানকালে ইহা স্থানীয় মাজিষ্টার সাহেবের বিনানুমতিতে কাহারও দেখিতে যাইবার ক্ষমতা নাই।

আরাগৃহের সন্নিকটেই ডোমরাওন মহারাজের সুন্দর উদ্যান মধ্যস্থিত একটী অট্টালিকা আছে। এখানে বড় বড় সাহেব ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিনা ব্যয়ে বাস করিয়া থাকেন।

আরাগৃহ ব্যতিত এখানকার বিচারালয়, স্কুল, কারাগার প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য বিষয়।

আরার ইন্দারা বা কূপের জল দীর্ঘকাল ধরিয়া পান করিলে প্রায়ই পাথুরী রোগ হইতে দেখা যায় ডাক্তার মহাশয়েরা এ কথা বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, এইজন্য এখানকার মিউনিসিপালিটী. বহু অর্থব্যয়ে এখন সুবর্ণরেখা হইতে জল আনাইয়া কলিকাতার ন্যায় এখানেও রাস্তায় রাস্তায় জল যোগাইতেছেন। আরাবাসীদের ইহাতে নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব মোচন হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাদিগকে জলকরের দায়ে বিশেষ উত্যক্ত হইতে হইয়াছে।

আরার জল বায়ু অত্যুত্তম না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। আরা সাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত প্রধান নগর এবং সরকারী দাওয়ানী কার্য্যস্থল (civil station)। ঐ প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই অতি দরিদ্র ও মূর্খ। আরা ডোমরাওন মহারাজের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত। আরার অন্য নাম ভোজপুর।

আরার পর কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেষণ অতিক্রম করিয়া ট্রেণ ডোমরাওন ষ্টেষণে আসিয়া দাঁড়াইল। ডোমরাওন কলিকাতা হইতে ৪০১ মাইল। ডোমরাওনের মহারাজ হিন্দু। শুনিলাম ইনি প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীপতি মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যেরই বংশধর। বর্ত্তমান মহারাজ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া রাজ্যটী এখন ইংরাজ শাসনাধীনে রহিয়াছে। এই নাবালক মহারাজের পিতা ইংরাজ রাজের পরম হিতৈষী সুহৃদ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি সিপাহীবিদ্রোহ কালে ইংরাজদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রটী করেন নাই।

ডোমরাওনে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ট্রেণ আবার হুপ্‌হাপ্ শব্দে ছুটিতে আরম্ভ

করিল। আমরাও তখন নানারূপ খোসগল্প করিতে লাগিলাম। এদিকে ট্রেণও আমাদের অজ্ঞাতসারে বকসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডোমরাওন ও বকসারে কেবলমাত্র ১০ মাইল ব্যবধান। মোগলদিগের সময় হইতেই আমরা ইহাকে এই প্রকার নগরের বেশে দেখিয়া আসিতেছি।

প্রবাদ আছে, ত্রেতাযুগে এই বক্সারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। এই স্থানেই নিশাচরগণ কর্ত্তৃক মহর্ষির তপোবিঘ্ন নিবারণ করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া তাড়কা রাক্ষসীর প্রাণবধ করেন। বকসারে তাড়কা রাক্ষসীর সেই বধ্যভূমী অদ্যাপি 'তাড়কানালা' নামে খ্যাত থাকিয়া পর্য্যটকের মনে ত্রেতাযুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বকসারের দুর্গ অতি দৃঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে ইংরাজ 'মুসলমানে অনেক'গুলি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবাব মীরকাশেম উদয়-নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহায়তায় নিজ ভাগ্য আর এক-বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বকসারের দুর্গে আসিয়া পুনর্ব্বার ইংরাজ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু এবারেও যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়ণ করিলে, ইংরাজরাজ অযোধ্যার নবাবের হস্ত হইতে, যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ, এলাহাবাদ গ্রহণ করেন।

রজনীতে ট্রেণ দিলদার নগরে আসিয়া পৌঁছিল। দিলদার নগর কলিকাতা হইতে ৪৩০ মাইল দূরে কর্ম্মনাশা নদী তীরে অবস্থিত। জগৎবিখ্যাত গোলাপজল, আতর প্রভৃতি ভারতীয় গন্ধ দ্রব্যের প্রধান জন্মস্থান গাজীপুর নগরে যাইবার জন্য এখান হইতে টেরিয়া ঘাট পর্য্যন্ত একটী শাখা রেল পথ গিয়াছে।

মহাভারতের খিল হরিবংশপর্ব্ব হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে ত্রয্যারুণ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রবংশীয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার সত্যব্রত নামে এক অতি বলবান কিন্তু নির্ব্বুদ্ধি ও নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ পুত্র জন্মে। একদা সত্যব্রত স্বভাব সুলভ ইন্দ্রিয় পরায়ণতা নিবন্ধন জনৈক পুরবাসীর কন্যাকে পরিণয় কালে সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বেই হরণ করিয়া আনিয়া আপনার ভার্য্যা করেন। ইহাতে মহারাজ ত্রয্যারুণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে দ্বাদশবৎসর বনবাস দেন। মহর্ষি বশিষ্টদেব সেই সময় রাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি মহারাজকে নিবারণ করিলেন না। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন সত্যব্রতের কিছুকাল পাপের প্রায়শ্চিত হওয়াই আবশ্যক। ফলতঃ যখন তিনি সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বেই কন্যাকে হরণ করিয়াছেন, তখন পরকন্যাপহারী ভিন্ন তাঁহাকে কখনই পরদারাপহারী বলা যাইতে পারে না। অতএব দ্বাদশ বর্ষব্যাপী বনবাস ক্লেশ সহ্য করিলেই তাঁহার পাপের সম্যক্ প্রায়শ্চিত হইবে এবং তৎপরে তাঁহাকে আনা-ইয়া তাঁহার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করাইবেন। কিন্তু সত্যব্রত মহর্ষির মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠি-লেন ও বশিষ্ঠের চিরশত্রু রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পর তিনি আরও দ্বিবিধ পাপে নিজ আত্মাকে কলুষিত করিয়া-

ছিলেন। পিতার আদেশে দ্বাদশবর্ষ বনে অবস্থান কালে একদা সত্যব্রত মাংসের অভাবে বশিষ্ঠদেবেরই এক কামদুগ্ধা পয়স্বিনী ধেনুর প্রাণবধ করিয়া সেই অসংস্কৃত মাংসে নিজ উদর-পূর্ত্তি করেন। সুতরাং এক্ষণে উক্ত ত্রিবিধ শঙ্কু বা পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত করিয়া স্বর্গ-লাভ হইতে বঞ্চিত করেন। এই সকল বিষয়, পরে বিশ্বামিত্র অবগত হইয়া আপনারই তপস্যার্জ্জিত পুণ্য ফলে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ত্রিশঙ্কু পাকশাসন ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যদেশে শূন্য পথে ঊর্দ্ধপদ ও অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তাঁহারই মুখ নিঃসৃত লালা ও শোণিত এই কর্ম্মনাশা নদীতে পতিত হওয়ায় পুরাণমতে উক্ত নদীর জল স্পর্শে মানবের সকল পুণ্য কর্ম্মের ফল বিনষ্ট হয়। এই কারণে উক্ত নদীটি পুরাণে কর্ম্মনাশা নদী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এক্ষণে ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ ভাগ। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। পৌরাণিক নিষেধ বাক্যে এখন আর কে কর্ণ পাত করে? তাই সময় পাইয়া নদীটীও এতদিন পরে আবার মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। স্পর্শের কথা দূরে থাক, অধুনা ইহারই জলে স্নান ও ইহারই জল পান করিয়া শত শত লোক জীবন ধারণ করিতেছে। আজ কএক বৎসর হইল কাশীর প্রসিদ্ধ রাজা পত্নীমল্ল বাহাদুর বহু অর্থব্যয়ে এই কর্ম্মনাশা নদীর উপর এক সুন্দর প্রস্তর সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া জন সাধারণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সেতুর নিকট কর্ম্মনাশা প্রায় ৩০০ ফিট প্রশস্ত এবং ইহার তলদেশ ২০ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত গভীর ও বিপুল বালুকা রাশিতে পরি-পূর্ণ। বর্ষাকালে ইহার জলময় বক্ষ প্রায় ৩০ ফিট পর্য্যন্তও স্ফীত হইয়া থাকে। (১)

যথা সময়ে ট্রেণ দিলদার নগর হইতে ছাড়িয়া রাত্রি প্রায় নয়টার সময় মোগল-সরাইতে আসিল। এখান হইতে কাশী যাইবার জন্য অযোধ্যা রোহিলখন্দ নামক এক স্বতন্ত্র রেলপথ গিয়াছে। ৺কাশীধামের মাহাত্ম্য কথা এখন থাক, পাঠক মহাশয়কে যথা সময়ে বলিব। আমরা মোগল সরাইতে রাত্রির মত আহারাদি করিয়া গাড়ীর এক একটী বেঞ্চের উপর শয্যা করিয়া শয়ন করিলাম। ইহার পর যে কি হইয়াছিল বা কি না হইয়াছিল তাহার কিছুই জানি না।

উষাগমে অকস্মাৎ একটা বিকট গম্ভীর গুম্ গুম্ শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করায় আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম পার্শ্বস্থ সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম ট্রেণ যমুনা সেতুর উপর দিয়া যাইতেছে। এলাহাবাদ আগত প্রায়। আমরা নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। প্রস্তুত হইতে না হইতেই ট্রেণ ষ্টেষণে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম সবে মাত্র ৫টা বাজিয়াছে। সূর্য্যদেব তখনও উদিত হন নাই। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতিক্ষায় ষ্টেষণের প্ল্যাটফরমেই কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকে সৌর-কর নিকরের সহিত অন্ধকার নিশাচরের তুমুল-

(১) Vide Calcutta Review. XLI.

সংগ্রাম বাধিল। ক্ষণমাত্র যুদ্ধের পর অন্ধকার যেন বেশ বুঝিতে পারিল এযুদ্ধে পরাভব অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং সে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত কন্দর অথবা নিবিড় অরণ্যমধ্যে গিয়া সুসময়ের প্রতীক্ষায় লুক্কায়িত হইয়া রহিল। অন্ধকার পলাইলে দিবাকর সদর্পে নীলাম্বরস্থ হৈম সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এদিকে বায়সকুল তাঁহার অভিষেক বার্ত্তা কাকা রবে চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিল। বিটপীদল পুষ্পাঞ্জলী দ্বারা দিনমণির অভ্যর্থনা করিল। চারিদিক হইতে প্রভাত বায়ু চামর হস্তে করিয়া ছুটিল। সরোবরে কমলিনী হাসিল—কাননে কুসুম কলিকাকুল হাসিল—উষার হাসিতে প্রকৃতি হাসিল—প্রকৃতির হাসিতে—ধরিত্রী হাসিল—আমরাও হাসিলাম—হাসিতে হাসিতে শকটারোহণে শ্রীযুক্ত গোকুল চন্দ্র তেজপাল মহাশয়ের ধর্ম্মশালায় গিয়া আশ্রয় লইলাম।

এলাহাবাদ—হিন্দুদিগের পবিত্র প্রয়াগতীর্থ এবং মুসলমানদের 'এলাহি বা আল্লার স্থান'। ইহাই আমাদের কাশীখণ্ডোক্ত প্রজাপতি ক্ষেত্র এবং কাহারও কাহারও মতে শ্রীমদ্ভাগবৎ খ্যাত আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠান-ভূমী। ইহা কলিকাতা হইতে রেলপথে ৫৬৪ মাইল দূরে গঙ্গাযমুনার পবিত্র সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। পুরাণ মতে, এখানে সরস্বতী নাম্নী আরও একটী পুণ্যতোয়া নদী আসিয়া গঙ্গা যমুনার সহিত সঙ্গতা হইয়াছে। এই জন্য প্রয়াগের অন্যতম নাম ত্রিবেণী সঙ্গম। কিন্তু এক্ষণে এখান হইতে এই সরস্বতী নদীর চাক্ষুস অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইয়াছে—চর্ম্ম চক্ষে এক্ষণে আর ইহাকে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে, নারায়ণের তিন স্ত্রী; লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। উঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীহরির নিকট থাকিতেন এবং শ্রীহরিও সকলকে সমচক্ষে দেখিতেন। একদা নারায়ণ পত্নীগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া নানারূপ প্রেমালাপ করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গা শ্রীহরির প্রতি প্রণয়কটাক্ষপাত করিলেন। লক্ষ্মী,সরস্বতী উভয়েই তাহা দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্মী কোনও কথাই কহিলেন না। সরস্বতী স্বভাবতই মুখরা সপত্নীর এতাদৃশ নির্লজ্জ আচরণে নারায়ণকে প্রশ্রয় দিতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও নারায়ণকে বহুবিধ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীহরি গতিক মন্দ দেখিয়া অগত্যা আস্তে আস্তে পত্নীগণের নিকট হইতে উঠিয়া একদিকে সরিয়া পড়িলেন। তাহাতে সপত্নীদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের পথও বিলক্ষণ পরিস্কৃত হইল। যেমন গঙ্গা তেমনি সরস্বতী, কলহে উভয়েই সমান পটু। ক্রমে মুখামুখি ছাড়িয়া পরস্পর হাতাহাতিতে প্রবৃত্ত হন দেখিয়া, অবশেষে লক্ষ্মীদেবী মধ্যস্থা হইলেন। ইহাতে বাগদেবী গঙ্গাকে ছাড়িয়া লক্ষ্মীরই উপর আসিয়া পড়িলেন ও তাঁহাকে পৃথিবীতে নদী ও বৃক্ষরূপা (১) হইয়া থাকিতে অভিসম্পাত করিলেন। লক্ষ্মী অভিশপ্ত হইয়াও কোনও কথাই কহিলেন না। বরং মধুর বচনে নানামত বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সরস্বতী অকারণে লক্ষ্মীকে অভিসম্পাত করিলেন দেখিয়া গঙ্গা আর

(১) "নদীরূপে 'গণ্ডকী' ও বৃক্ষরূপে তুলসী" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সরস্বতীকে কহিলেন "তুমিও আমার শাপে নদীরূপে ভূনিম্নে গিয়া প্রবেশ কর ও কলির বিবিধ কলুষে কলুষিত হও।" ইহাতে সরস্বতী অধিকতর কুপিতা হইয়া গঙ্গাকেও নদীরূপে অবনীতে গমন করিতে অভিসম্পাত করিলেন। এই প্রকারে সপত্নীত্রয় পরস্পরের অভিশাপে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আগমন করেন। কিন্তু সরস্বতী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াই বিকটাকার দৈত্য দিগের উৎকট চীৎকার শ্রবণ করিয়া ভয়ে ভূমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যান। তদবধি তিনি আর দৃশ্যমান মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই—গুপ্তভাবে ভূমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে প্রয়াগে গঙ্গা—সরস্বতীর সহিত আসিয়া মিলিতা হন। এই হইল সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানের পৌরাণিক কথা। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, অতি পুরাকালে বর্ত্তমান দিল্লীর কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিমে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়। তাহাতেই সরস্বতী নদী এরূপ সহসা ভূমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়া গিয়াছেন। (১) ইহার প্রমাণার্থ তাঁহারা অনেক যুক্তিও দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয় লইয়া বৃথা বাদানুবাদ করিবার আবশ্যকতা নাই।

আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই এই প্রয়াগ নগর সংস্থাপিত করেন। এখানে পূত সলিলা ত্রিবেণীর সঙ্গমহেতু প্রকৃষ্টরূপ যাগাদি অনুষ্ঠানের পক্ষে স্থানটীকে বিশেষ অনুকূল দেখিয়া যাগশীল আর্য্যগণ প্রথমতঃ প্রয়াগে তাঁহাদের সর্ব্বসাধারণের যজনভূমি নির্ব্বাচিত করেন। ঐ সময়ে কাহারও কোন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাঁহাকে প্রায়ই এই স্থানে আসিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে হইত। এই জন্যই বোধ হয় আর্য্যগণ তাঁহাদের সর্ব্বসাধারণের যজন ভূমীকে 'প্রয়াগ' নামে প্রথম অভিহিত করেন। তাহার পর দক্ষ যজ্ঞে পতি নিন্দা শ্রবণে পতিপ্রাণা সতীদেবী দেহত্যাগ করিলে চক্রধারী নারায়ণ যখন তাঁহার সেই মৃতদেহ সুদর্শন চক্রে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নানাস্থানে নিক্ষেপ করেন, সেই সময়ে প্রয়াগে সতীর দশাঙ্গুলি পতিত হয়। তাহাতে প্রয়াগ হিন্দুমাত্রেরই একটী প্রধান তীর্থ ও ৫২টী পীঠস্থানের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বলিয়া বহুকাল হইতেই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

কথিত আছে, পুরাকালে বৈবস্বৎমণু সন্তান কামনায় প্রয়াগের যমুনাতীরে স্বীয় পত্নী শ্রদ্ধার সহিত মিত্রাবরুণের কঠোর আরাধনা করিয়া ইলানাম্নী কন্যারত্ন লাভ করেন। ইলা যৌবনস্থা হইলে চন্দ্রপুত্র বুধের সহিত মিলিতা হন ও তাহাতে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ পুরূরবার জন্ম হয়। এই পুরূরবা প্রয়াগতীর্থে সুরপুরী সদৃশ সদুর্গ রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিব্যাপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত বহুকাল বাস করেন। তদবধি প্রয়াগ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের আদিম রাজধানীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং নহুষ, যযাতি, পুরু, দুষ্মন্ত, ভারত প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুরাজগণ ইহার রক্ষ

(১) "Madhya-Desa—"The tract between the Himalaya and Vindhya, to the east of Vinasana and the west of Allahabad is called the central reign (Madhya-Desa)" Mr. Dutt. P. 430.

সিংহাসন সমুজ্জল করেন। প্রবাদ আছে, এই প্রয়াগ ভূমেই মহারাজ যযাতি 'নরমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পিতা নহুষের স্বর্গপথ উন্মোচিত করেন। তদনন্তর বহুকাল পরে মহারাজ হস্তী স্বনামখ্যাত হস্তীনাপুরে এক নূতন রাজধানী সংস্থাপন করেন। বোধ হয় এই কারণেই মধ্যদেশের (১) পূর্ব্বতন রাজধানী প্রয়াগপুরীর গৌরব রবি অস্তমিত হইয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণেতা হুইলার সাহেব বলেন এই প্রয়াগ ভূমে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল এবং এই স্থানেই মহর্ষি বহুশিষ্যে পরিবৃত হইয়া পরমপুরুষের শ্রীপদধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। (১)

পদ্মপুরাণে উক্ত আছে, প্রয়াগে ষষ্টি সহস্র প্রমথগণ জাহ্নবী, সত্যবাহন সবিতা যমুনা, শূলপাণী শিব অক্ষয় বট; বাসব নগর এবং ভগবান্ হরি সর্ব্ব দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সদা মণ্ডল রক্ষা করিয়া থাকেন। এই পৌরাণিক বর্ণনাটীতে প্রয়াগের পূর্ব্বাবস্থার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। ইহা যে পুরাকালে আর্য্যগণের অতি পবিত্র ও সুরক্ষিত নগর ছিল উক্ত পুরাণ কথাই তাহার প্রমাণ স্থল।

সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক মহামতি হিউন্‌স্যাঙ্ ভারত পর্য্যটনে আসিয়া একবার এই প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। তৎকালে এখান হইতে বৌদ্ধগণ তাড়িত ও বৌদ্ধমঠ সকল সমস্তই হিন্দু দেবালয়রূপে পরিণত ও ব্রাহ্মণ দিগের আধিপত্য পুনঃ দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি তখনও প্রয়াগের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ চিন্তাবলী বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইত (২)। কিন্তু এক্ষণে আর এখানে সেই সকল প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হয় না। হিউনস্যাঙের মতে, ঐ সময়ে প্রয়াগ নগর গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে একটী বিশাল ক্রোশব্যাপী বালুকাময় কান্তারের পশ্চিমভাগে অবস্থিত ছিল। এই সকল কারণে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে প্রাচীন প্রয়াগপুরীকে নদীদ্বয় একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে এই বর্ত্তমান নূতন প্রয়াগ নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। (১)

প্রয়াগ তীর্থের প্রধান মাহাত্ম্য ত্রিবেণী সঙ্গমে, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর পবিত্র মিলনস্থলে। আমরা ধর্ম্মশালায় দ্রব্যাদি রাখিয়া শকটারোহণে প্রথমতঃ এই ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রা করিলাম। এখানে তীর্থ যাত্রীদিগের সংখ্যা বারমাসই সমান, তবে পুণ্যাহ মাঘ মাসে মেলার সময় যাত্রীদলের একটু অধিক বাড়াবাড়ি হইয়া পড়ে। ত্রিবেণীতে মস্তকমুণ্ডন, স্নান, দান ও পিতৃপুরুষ দিগের শ্রাদ্ধ তর্পনাদির মহাফল। প্রবাদ, "এখানকার পবিত্র সলিলে পতিত মানবের প্রতিকেশের পরিবর্ত্তে মরণান্তে লক্ষ বৎসর করিয়া স্বর্গবাস হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি যমরাজের শাসনাধীন হইয়া নরকে পচ্যমান হয় এবং স্বকৃত কর্ম্মবশে মোহিত হইয়া

(১) "At Prayaga, Bharadwaja the Brahman had already established a hermitage"—Wheeler's s. His. Ind. P. 53.

(২) Vide Travels of Buddhist Pilgrims.

(১) Vide Travels of a Hindu by Bhola Nath Chunder.

সতত ক্রন্দন করিতে থাকে, যদি দৈবাৎ তদ্বংশীয়েরা বেণী জলে স্নান করিয়া তর্পন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। আর যে ব্যক্তি এস্থানে স্নান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মাঘ মাস প্রয়াগে স্নান করে, মোক্ষ তাহার সন্নিহিত, তাহার কামনা সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে।" একেত হিন্দুজাতি স্বভাবতই ধর্ম্মগত প্রাণ—ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের অদেয় কিছুই নাই। তাহার উপর আবার এইরূপ শাস্ত্রাদির প্রলোভন। সুতরাং এই সকল কারণে এখানে অনেকেই ক্ষৌরকার হস্তে আপাদ মস্তক—সর্ব্বাঙ্গ এমন কি চক্ষের ভ্রূদ্বয় পর্য্যন্তও মুণ্ডিত করিয়া এরূপ বিকৃতি মূর্ত্তি ধারণ করেন যে, স্নানান্তে অন্যের কথা দূরে থাক, তাঁহাদের নিজ নিজ গর্ভধারিণীগণও তাঁহাদিগকে হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারেন কি না সন্দেহ!

আমাদের পাণ্ডাঠাকুর মস্তক মুণ্ডনের জন্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পীড়াপীড়ি করাই সার হইল। আমাদের ৺তারকেশ্বরের মানসিক চুল ছিল; সেই জন্য আমরা প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করাইতে পারি নাই। সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া গাড়ী ছাড়িয়া নৌকা করিয়া যমুনা সেতুর নিকট গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, এ সেতুটীও অনেকাংশে শোণ সেতুরই অনুরূপ। কএকটী বৃহদাকার নদীগর্ভোত্থিত ইষ্টক স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। দ্বিতল সেতুর উপর দিয়া রেল পথ ও তন্নিম্ন দিয়া সর্ব্বসাধারণের গমনাগমন মার্গ। ইহা ৩,২৩৫ ফিট দীর্ঘ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে কোম্পানীর ৪৪,৪৬,৩০০ টাকা ব্যয়ে এই যমুনা সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বক্ষে করিয়া নাচিতে নাচিতে নৌকাখানি যমুনা সেতুর স্তম্ভাবলীর মধ্য দিয়া তরতর বেগে দুর্গ প্রাকারের নিকট আসিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগল কুলতিলক সম্রাট আকবর সাহ এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন (১)। ইংরাজরাজ ১৮০১ সাল হইতে উহা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। এক দিন যখন সিংহাসনাকার দুর্গ বারান্দায় উপবিষ্ট হইয়া মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহ সগর্ব্বে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া ছিলেন, তখন কি তিনি একবার ভ্রমেও ভাবিয়া ছিলেন, যে, কালস্রোতে পড়িয়া তিনি ও তাঁহার বংশাবলী কোথায় ভাসিয়া যাইবেন, আর, সেই স্রোতের আনুকূল্যে সহস্র সহস্র যোজনান্তরবর্ত্তী তদানিন্তন নগণ্য ইংলণ্ড দ্বীপের মুষ্টিমেয় অধিবাসী বণিক বেশে ভারতে আসিয়া একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক তদীয় দুর্গ বারান্দায় বসিয়া তদপেক্ষা অধিকতর দর্পভরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবে! কি প্রকাণ্ড দুর্গ!! ইহার গঠন প্রণালীই বা কি অত্যদ্ভুত!! শুনিলাম এই দুর্গের অনুকরণে কলিকাতার ফোর্টউইলিয়াম দুর্গটী নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গের পশ্চিম দিকস্থ প্রাকার ভিত্তি বিপুল জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া জলপথে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে নগরটীকে রক্ষা করিতেছে। ন্যূনাধিক চারি শতাব্দীর প্রবল বর্ষা প্রবাহ ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি

(১) Cunningham.

দুর্গ এখনও অটল পাষাণপ্রায় দণ্ডায়মান। ইহা যে কি উপকরণে নির্ম্মিত হইয়া এরূপ বজ্রদৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইংরাজগণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অদ্যাপি তাহা আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে বিদ্রোহীগণের সপ্তাহাবধি অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে নদীর ধারে দুর্গের এক স্থান একটু বিদীর্ণ হইয়া যায়। ইংরাজরাজ যত বারই ইহার সংস্কার করাইতেছেন, ততবারই ইহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—কোন প্রকারেই পূর্ব্ব-দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতেছে না।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান দুর্গস্থলে পূর্ব্বে একটী সুদৃঢ় হিন্দু দুর্গ ছিল। কিন্তু সে দুর্গটী যে কোন্ হিন্দুরাজার শাসনকালে প্রথম নির্ম্মিত হয়, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে এ পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পাঠানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে দিল্লী ও আজমীড়াধিপতি পৃথ্বীরাজ একবার এই পূর্ব্বোক্ত হিন্দু দুর্গটীর জীর্ণ সংস্কার করাইয়া ছিলেন। তৎপরে সম্রাট মহামতি আকবর সাহের শাসনকালে ইহার সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যদিও ইংরাজ-রাজের অধীনে দুর্গটীর অনেকাংশই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়াছে, তথাপি বলিতে গেলে আকবর সাহই ইহার এক প্রকার জন্মদাতা।

যমুনাতীরে দুর্গ নিম্নে একটী ধ্বজা প্রোথিত দেখিলাম। কিম্বদন্তী এই ধ্বজানিম্নস্থ কূপ মধ্যেই একণে সরস্বতী বিরাজিতা—ইহার নাম 'সরস্বতী কূপ'। আমরা যখন প্রয়াগে তখন দুর্গ হইতে প্রকৃত সঙ্গমটী একটু সরিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শুনিলাম বর্ষাকালে ইহার পবিত্রবারি দুর্গ স্পর্শ করিয়া দুর্গস্থ জীবগণকে মোক্ষপদ প্রদান করিতে ক্রটী করে না।

দেখিতে দেখিতে আমাদের নৌকাখানি দুলিতে দুলিতে প্রকৃত সঙ্গমের উপর আসিয়া উপনীত হইল। এখানে তরঙ্গমালার কি ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস ও কি ভীম আস্ফালন !! দুইটী নদীই যেন এখানে দুইটী প্রকাণ্ড মত্তমাতঙ্গিনী—পরস্পর ঘোরতর দ্বন্দযুদ্ধে ব্যাপৃতা অথবা দুই সপত্নী যেন বিবাদোন্মত্তা হইয়া পরস্পরকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। এইরূপ উভয়েই যেন উভয়ের সংঘর্ষণে কাতর হইয়া এবং বিবাদে কেহ কাহারও ন্যূন নহে দেখিয়া কিয়ৎপরে আবার পরস্পর প্রণয় সংস্থাপন করিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া এক হইয়া প্রশান্ত ভাবে গন্তব্য পথের পথিক হইয়াছে। তপন-নন্দিনী কৃষ্ণ-সলিলা যমুনার সহিত শুভ্রতোয়া ভাগিরথী মিলিতা হইয়া এক অতি অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। এ রূপ দর্শন করিয়া আমাদের মনে 'হরিহর' মিলনের ভাব আসিয়া উদয় হইল। আহা আধো কালো, আধো ধল, আধো মণি, আধো ফণি, আধো সুধা, আধো গরল, আধো চন্দন, আধো ভষ্ম যে দিকে চাহিয়া দেখি সেই দিকেই এই আধো আধো মিলনের ছটা দেখিয়া মন অপার আনন্দসাগরে সুখে সাঁতার দিতে লাগিল।

এখান হইতে দেখিলাম, নদীর উভয় পারের দৃশ্যাবলী সম্পূর্ণই বিভিন্নরূপ। আমাদের দক্ষিণ দিকে (অর্থাৎ প্রয়াগের পরপারে) গঙ্গার উপরেই কিয়দংশ লইয়া 'ঝুসি' নামে এক অতি বন্ধুর পর্ব্বতময় স্থান। ইহার কোন স্থানে কোন

প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ কোথাও কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের সমষ্টি লইয়া একটী পল্লী এবং কোথাও বা ঘনসন্নিবেশিত বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে একটী সামান্য দেবমন্দির দণ্ডায়মান। নদীর এই পারের দৃশ্য দেখিলে বোধ হয় যেন প্রকৃতিসতী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া তাঁহার মুখাবগুণ্ঠন মোচন পূর্ব্বক স্বীয় নায়কের সহিত প্রাণভরে প্রেমালাপ করিতেছেন। আমাদের বাম দিকে (অর্থাৎ বেণী ঘাটের দিকে) দৃষ্টিপাত করিলে, তথায় লোভ ও কলহময় একটী সংসারমূর্ত্তী দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘাটতীর লোকে লোকে, পতাকায় পতাকায় সমাচ্ছন্ন। সেই সকল পতাকার মধ্যে নদীর জলময় বক্ষে সারি সারি তক্তা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর দাঁড়াইয়া কোথাও কেহ আদ্র বস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন, কোথাও কেহ স্নানান্তে আহ্নিকাদি সারিয়া লইতেছেন এবং কোথাও বা কোনও লম্বোদর পাণ্ডা মহাশয় দক্ষিণা লইয়া যজমানের সহিত বিষম কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রামায়ণে কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে এই বেণী ঘাটেই নদী পার হইয়া পরপারবর্ত্তী ভীলরাজ গুহক চণ্ডালের আথিত্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ ঘাটের উপরেই মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রী৺বেণীমাধবদেব বিষ্ণুমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। বিগ্রহের নামানুসারেই এই ঘাটের নাম "বেণীঘাট" হইয়াছে। প্রবাদ আছে, 'বেণী-জলে স্নান বা উহা পান করিলে সপ্তপুরুষ পবিত্র হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। এবং এই স্থানে বিধান সহ ভক্তিভরে মাধবের পূজা করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হইয়া থাকে।' কেহ কেহ বলেন পুরাকালে এই স্থানেই আর্য্যদিগের প্রসিদ্ধ বারণাবত' নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল (১) আমরা এই ঘাটেই নৌকা হইতে নামিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া পাণ্ডা মহাশয়ের সহিত দুর্গ মধ্যে অক্ষয়বট দেখিতে চলিলাম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এখানকার এই দুর্গের অনুকরণেই কলিকাতার ফোর্টউইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতার দুর্গের ন্যায় এলাহাবাদ দুর্গটীও দেখিতে অষ্টভুজাকৃতি (Octagon) ও প্রায় দ্বিতল পর্য্যন্ত ভূনিম্নে অবস্থিত। ইহার পরিধি প্রায় ২,৫০০ গজ। দুর্গের প্রবেশ পথগুলি সুড়ঙ্গের ন্যায় ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া গিয়াছে।

এই সকল প্রবেশ পথ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেই দেখা যায় সম্মুখে বিস্তৃত পরিখা দুর্গটীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পরিখাটী এরূপ সুকৌশলে রক্ষিত যে প্রয়োজন মাত্রেই দুর্গদ্বারের নিম্নে দুই পার্শ্বস্থ স্থান একেবারে জলমগ্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরিখার পরেই দুর্গের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একে একে এইরূপ চারিটী দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রত্যেক দ্বারেই সশস্ত্র প্রহরীগণ দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে দেশীয় সিপাহী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ দ্বারে ইংরাজ সৈন্য প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত। লোকে সচরাচর তৃতীয় দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে পারে। কিন্তু চতুর্থ দ্বারে প্রবেশ

(১) "Here was the Aryan city, varanavata mentioned in the pages of Moha Varata"—

করিতে হইলে অত্রস্থব্রিগেডিয়ার জেনারালের 'পাস' বা অনুমতি পত্র আবশ্যক করে।

এই স্থানেই ১৭২ ফিট্ দীর্ঘ দুর্গের অস্ত্রাগার। আমাদের এই স্থানে যাইবার জন্য পাশ ছিল না। সুতরাং উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই নাই। কিন্তু উহাব বিবরণ যেরূপ আমি অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এস্থলে বিবৃত করিলাম ; "অস্ত্রাগার মধ্যে নানা প্রণালীতে বন্দুক সজ্জিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে চাক্‌চিক্যশালী বর্ষা, তরবারি, সঙ্গীন ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রাদি ঝক্‌মক্ করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত হয়, সেই দিকেই যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়।" মোগল সম্রাট আকবর সাহের সময় এই গৃহটী সম্রাটের মনোহর বৈটকখানারূপে ব্যবহৃত হইত। তখন ইহার সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে আকবরও নাই সে বৈটকখানাও নাই। আকবর সাহের সাধের বৈঠকখানাটী এক্ষণে ইংরাজরাজের অস্ত্রাগার রূপে পরিণত হইয়া কাল মাহাত্মেরই স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। প্রবল কালঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়া ইহার যে কেবলমাত্র পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, ইহার আকৃতিরও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। মহামতি ফার্গুসন্ সাহেব ইহার যেরূপ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম (১)। গৃহটী চল্লিশটী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত বলিয়াই ইহাকে চল্লিশৎ থাম্বা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

অস্ত্রাগারের নিম্নেই কালিন্দী কুল কুল শব্দে প্রবাহিতা। ইহার এক দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী শোভিত একটী অতি রম্য ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অসূর্য্যম্পশ্যা মোগল-রমণীগণ এই ঘাট দিয়া যমুনা সলিলে অবতরণ পূর্ব্বক জলকেলী ও স্নানাদি করিতেন।

শস্ত্রধারী প্রহরীগণের নিকট দিয়া দুর্গমধ্যে

---

(১) "Allahabad was a more favourite residence of this monarch (Akbar) than Agra, perhaps as much so as even Futtehpore Sikri ; but the English having appropriated the fort, its glories have been nearly obliterated. The most beautiful thing was the pavilion of the *Chalis situn*, or 40 pillars, so called from its having that number on the principal floor, disposed in two concentric octagonal ranges, one internal of sixteen pillars, the other outside of 24. Above this, supported by the inner colounade, was an upper ranges of the same number of pillars crowned by a dome. The building has entirely disappeared, its materials being wanted to repair the frotifications. The great hall, however, still remains. It is how the *arsenal ;* a brick wall has been run up between its outer colownades with window of English architecture, and its curious pavilions and other accopmaniments removed ; and internally, whatever could not be conveniently cut away is carefully covered up with plaster and white-wash, and hid by stands of arms and deal fittings. Still its plan can be made out ; a square hall supported by eight rows of columns, eight in each row, thus making in all sixty-foun, surround by a deep varandha of double columns, with groups of four at the angles, all surrounded by tracket capitals of the most elegant and richest design, and altogether as fine in style and as rich in ornament as any thing in India."

Fergussion.

প্রবেশ করিবার সময় আমাদের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া তিনটী দ্বার অতিক্রমের পর সম্মুখের প্রাঙ্গনে একটী প্রকাণ্ড গোলাকার প্রস্তরস্তম্ভের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমাদের পাণ্ডা মহাশয় বলিলেন "ইহা ভীমসেনের গদা। পণ্ডবেরা যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই স্থানে তাঁহার গদা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি ইহা এই রূপেই পড়িয়া রহিয়াছে।" আমাদের কিছু পরেই আর একজন পাণ্ডা যাত্রী সহ সেই স্থানে আসিয়া উক্ত স্তম্ভটীকে "অশ্বত্থামার গদা' বলিয়া তাঁহার যজমানদের এক প্রকার বুঝাইয়া দিলেন শুনিলাম।

উক্ত প্রস্তরস্তম্ভটী এদেশের সাধারণ অজ্ঞ-লোকদিগের নিকট 'ভীমের গদা, অশ্বত্থামার গদা' প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত হইয়া আসি-তেছে। বস্তুতঃ ইহা ভীমের গদা বা তদ্রূপ কিছুই নহে। ইহার নাম "অশোকস্তম্ভ'। স্তম্ভের প্রকৃত ইতিহাস স্তম্ভগাত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এদেশে কোনও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত লেখার প্রথা একেবারেই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যে সকল প্রাচীন রাজগণ সর্ব্বাধিক প্রবল হইয়া উঠিতেন তাঁহা-রাই কেবল মধ্যে মধ্যে প্রস্তরস্তম্ভ, তাম্রফলক অথবা পর্ব্বতগাত্রে নিজ নিজ কীর্ত্তিনিচয় ও আদেশাবলী খোদিত করাইয়া জন সাধারণের নিকট প্রচারিত করিতেন। ২৫০ পূঃ খৃঃ—মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে যে সকল ধর্ম্মলিপি সম্বলিত প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া-ছিলেন, এটীও তন্মধ্যে একটী স্তম্ভ। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজকদ্বয় মহারাজ অশোক কৃত এইরূপ অনেকগুলি স্তম্ভেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কিন্তু তন্মধ্যে অতি অল্প স্তম্ভই বর্ত্তমান আছে। তাহারও আবার সকলগুলিতে কোনও খোদিত অক্ষরের চিহ্নমাত্রও এক্ষণে দৃষ্ট হয় না খোদিত ছয়টী মাত্র স্তম্ভ অদ্যাপি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে উহার পাঁচটীতে অশোকের সপ্তবিংশতি রাজত্বকালে যে ছয়টী ধর্ম্মাদেশ প্রচারিত হয় তাহা খোদিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এলাবাদের এই স্তম্ভটী ৩৫ ফিট উচ্চ এক খানি বেলে প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার নিম্নে ও উপরিভাগের পরিধি' যথাক্রমে ২ ফিট্ ১১ ইঞ্চ ও ২ ফিট্ ২ ইঞ্চ। মহারাজ অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের ন্যায় ইহারও মস্তকদেশ ঘণ্টাকৃতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই. কিন্তু অধুনা তাহার কোনও চিহ্ন এ স্তম্ভে দেখা যায় না। স্তম্ভের মস্তকে একটী সিংহের প্রতিমূর্ত্তি ছিল. কিন্তু ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ জাহাঙ্গীর ইহাকে অপসৃত করান। অশোকের অন্য চারিটী স্তম্ভের ন্যায় ইহার গাত্রে তাঁহার ছয়টী আদেশ পালী বা প্রাচীন মাধবী ভাষায় খোদিত আছে। অক্ষরগুলি এরূপ গভীর ভাবে খোদিত হইয়াছিল যে অদ্যাপি তাহার কোনও অংশ নষ্ট হইত না; কিন্তু উদ্ধত জাহাঙ্গীর বাদসাহ অশোকের তৃতীয় ও চতুর্থ আদেশদ্বয় একেবারে তুলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিজ পিতৃ-পুরুষগণের নাম খোদিত করিয়া দিয়াছেন।

অশোকলিপির পর স্তম্ভগাত্রে আরও একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহার নাম মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত। অনুমান ৩৮০ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি একচ্ছত্রী ভূপতি হইয়া এই বিশাল ভারত শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহার শাসনকালে প্রধান প্রধান ঘটনা ও ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপ ইনি এই স্তম্ভগাত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর স্তম্ভগাত্রে যে সকল দেশীয় পর্য্যটক ও তীর্থযাত্রীদিগের নাম ধাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় সমস্তই এরূপভাবে খোদিত যে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে স্তম্ভটী সমুদ্রগুপ্তের পর বহুকাল ধরিয়া ভূতলে পতিত ছিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপির অধিকাংশই স্তম্ভের কেবলমাত্র তিন দিকেই দেখা যায়। কারণ স্তম্ভটীর যেদিক তখন ভূমির সহিত সংলগ্ন ছিল, সেদিকে কেহ কিছুই লিখিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত এইরূপ উক্ত লিপির কতক-গুলি স্তম্ভের একেবারে শীর্ষভাগে ও কতকগুলি স্তম্ভের পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত লম্বভাবে লিখিত। সুতরাং তখন স্তম্ভটী পতিতাবস্থায় না থাকিলে ভূমী হইতে ৩৫ ফিট্ উর্দ্ধে পূর্ব্বোক্ত-রূপ লম্বভাবে ইহার গাত্রে কাহারও কিছু লেখা কোনও প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

সমুদ্রগুপ্ত ও অশোক কৃত লিপি দুইটার মধ্যস্থলে আর একটী পারস্যলিপি দৃষ্ট হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর বাদসাহ এলাহাবাদ দুর্গের জীর্ণ সংস্কার করিবার সময়ে ভূ-শায়িত স্তম্ভটীকে পুনর্ব্বার উত্থাপিত করিয়া, পারস্য ভাষায় আপনার রাজ্যাভিষেক ও বংশ পরিচয় প্রভৃতি খোদিত করিয়া দিয়াছেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে দুর্গের নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ কালে স্তম্ভটীকে স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যক হওয়াতে ইহাকে আর একবার ভূশায়িত হইতে হয়। তদনন্তর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি কাপ্তেন স্মীথ সাহেব দুর্গমধ্যে ইহাকে পতিতাব-স্থায় দেখিতে পাইয়া বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। স্তম্ভের পাদদেশে ইংরাজীতে ইহার নিম্নরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

"This monolith was first erected by King Asoka about B. C, 250, the peo ple inscribing his edicts regarding the propagation of Budhism. It was next made use of by Saumudra Gupta about the seventh century, for the recor d of his extensive Sovereignty over the va-rious nations of India—from Napal to the Deccan and from Gujrat to Assam. Lastly it was re-erected by the Moghul Emperor Jahangir to commemorate his accession to the thrown A. D 1605. The above are the principle inscription on the Column. There are also a number of minor records of travellers and pil-grims of various dates. The column was overthrown, because it stood in the way of the new line of rampart near the main gate about A. D. 1800. The Column was set up in 1838 in its

position by the British Government of India."

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনস্যাঙ, এই এলাহাবাদ স্তম্ভের কথা তাঁহার গ্রন্থে আদৌ উল্লেখ করিয়া যান নাই বলিয়া এবং আরও অন্যান্য কারণে আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে এলাহাবাদের এই অশোক স্তম্ভটী সম্রাট ফিরোজ সাহ তোগলক কর্তৃক কোশাম্বী হইতে আনীত হইয়া এলাহাবাদে স্থাপিত হইয়াছিল।

অশোক স্তম্ভের অনতিদূরেই 'পাতালপুরী' বা অক্ষয়বটের জীবন্ত সমাধি। পাতালপুরীর দ্বারদেশ শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত। ইহার অন্ধকারাবৃত কক্ষে অবতরণ করিবার জন্য কতিপয় সোপান শ্রেণী আছে। আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর মহাশয় প্রদীপ হস্তে করিয়া সেই সকল সোপান দিয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন। আমরা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। পাতালপুরীর নিম্নে অবতরণ করিয়াই এক পার্শ্বে একটী প্রস্তর দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। পাণ্ডা মহাশয় বলিলেন "ইহার নাম শ্রীশ্রী৺ত্রিবেণী মাধব।" পাতালপুরী উচ্চে ১০।১২, প্রস্থে ৭।৮ ও দৈর্ঘে ২০৷৩০ হাত বলিয়াই অনুমান হইল। গৃহতল সুন্দর মর্ম্মরে মণ্ডিত। পাণ্ডাজী বলিলেন "এই সুড়ঙ্গটী ত্রিবেণী সঙ্গম পর্য্যন্ত গিয়াছে, দুর্গমধ্যে যেমন ইহার একটী দ্বার সেখানেও ঐরূপ ইহার আর একটী দ্বার আছে। ইহার অপর মুখটী বাহির করিতে গিয়া কত লোকেই সহসা গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই।" সুড়ঙ্গের দেয়ালের গায়ে অনেকগুলি কোলঙ্গ ও তাহাতে নিতান্ত অদ্ভুত অদ্ভুত যত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। এখান হইতে আমরা একটী চতুষ্কোণ ভগ্নপ্রায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি শিব স্থাপনা দেখিলাম। তন্মধ্যে দু একটী শিবলিঙ্গের কিয়দংশ করিয়া ভগ্ন দেখিয়া পাণ্ডা মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, পাপিষ্ঠ সম্রাট আরঙ্গজীব ঐ সকল দেবতাদিগের এ প্রকার দুর্দ্দশা করিয়াছেন। পাণ্ডা ঠাকুরের এ কথাটী বিশ্বাস যোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। কারণ দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজীব যে কতদূর অত্যাচারী ও হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিল ভারতের ইতিহাসই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া থাকে। মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে একটী ছিন্ন মস্তক বটবৃক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া পাণ্ডাজী বলিলেন "বাবু, এই দেখুন সম্মুখেই 'অক্ষয় বট।' এই বৃক্ষটী সৃষ্টির প্রারম্ভেই জন্মিয়াছে এবং মহাপ্রলয় কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে ইহা হইতে তিনটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পত্র বহির্গত হইয়া সেই প্রলয় নীর আবৃত করিবে। তখন সেই পত্র তিনটীতে আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিবেন।' বৃক্ষটির মূল স্কন্ধ ভূমী হইতে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত উঠিয়া দুইটী বৃহৎ শাখায় বিভক্ত হইয়া প্রায় মন্দিরের মস্তক স্পর্শ করিয়াছে। পাণ্ডা ঠাকুরের কথামত বৃক্ষটীর বয়ঃক্রম অন্ততঃ ২০০০০ বৎসর হয়। কিন্তু এত দিনের প্রাচীন বট বৃক্ষটী যে এই রৌদ্র বায়ুহীন দিবালোক ভূগর্ভ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও অদ্যাপি যে জীবিত রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় !!

সম্ভবতঃ পাতালপুরীর এই মন্দির ও বটবৃক্ষ

উভয়েই এক সময়ে সমতল ভূমীর উপরেই ছিল। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনস্যাঙ্গের প্রয়াগ বর্ণনাটীতে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যথেষ্ট কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন ঐ সময়ে (৭ম শতাব্দীতে) নগরের মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণদিগের একটী সুন্দর শিব মন্দির ও তাহার সম্মুখেই একটী অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। তখন প্রয়াগে ভয়ঙ্কর নরবলী প্রথা প্রচলিত থাকায় শত শত নরনারি দেবালয়ের সম্মুখে নিজ নিজ প্রাণ দেবতাকে বলি স্বরূপ প্রদান করিত। তাহাদের অস্থি রাশি সেই বটবৃক্ষের মূলে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিত। মামুদ গজনীর ভারতাক্রমণের সময় প্রসিদ্ধ যবন পণ্ডিত আবুরিহান একবার মামুদের সহিত প্রয়াগে আসিয়া এই 'অক্ষয় বট' দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালেও বৃক্ষটী বর্ত্তমানরূপ ভূগর্ভে সমাধি প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি ইহাকে প্রয়াগের হিন্দুমাত্রেরই অতি পবিত্র বৃক্ষ বলিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই বট বৃক্ষটী যে বর্ত্তমান পাতালপুরীস্থ অক্ষয় বট, তৎ বিষয়ে আমাদের মনে অত্যন্ত সন্দেহ হয়। যাহা হউক মামুদের পর হইতে হুমায়ুন বাদসাহের রাজত্ব শেষ পর্য্যন্ত এই নয়শত বর্ষব্যাপী যবনদিগের দারুণ অত্যাচার নিবন্ধন দেবালয়টী কিছুকালের জন্য একপ্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিলেও চলে। ইত্যবসরে গঙ্গা যমুনা নদীদ্বয়ের আনীত বালুকাস্তরে ইহা একেবারেই ভূনিম্নে প্রোথিত হইয়া পড়ে। এই প্রকার প্রোথিতাবস্থায় বহুকাল থাকিবার পর মহামতি আকবর সাহ ইহার উদ্ধার সাধন করিয়া হিন্দুদেবালয় হিন্দুদিগেরই হস্তে প্রত্যর্পন করেন। কিন্তু মন্দিরটী অতি অল্পকালমাত্র সমতল ক্ষেত্রের উপর থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার মৃত্তিকা নিম্নে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই অবস্থাতেই থাকিয়া ইহা পাতালপুরী নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

পদ্মপুরাণে কথিত আছে, "যে ব্যক্তি প্রয়াগধামে অক্ষয় বটমূল প্রাপ্ত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন সে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া শিবলোকে গমন করে। এই স্থানে দ্বাদশ আদিত্য রুদ্রকে আশ্রয় করিয়া তাপ প্রদান করেন এবং অখিল জগৎ দগ্ধ করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ বটমূলকে দগ্ধ করিতে পারেন না। ভগবান্ বালকরূপী হইয়া বটবৃক্ষ শাখায় পত্রপুটে শয়ন করিয়া থাকেন।" আমরা যথাবিহিতরূপে এখানে পূজাদি সারিয়া লইলাম।

হিন্দুজাতি চিরকালই ধর্ম্মপ্রিয়। ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি তাহাদিগকে কণামাত্র উপকার করেন, তাঁহাকে প্রাণান্তেও ভুলিতে পারে না। বোধ হয় তাই আকবর সাহ যবন কুলোদ্ভব হইলেও তিনি পূর্ব্বজন্মে হিন্দুছিলেন এরূপ কল্পনা অনেকে করিয়া থাকেন। এখানে এরূপ প্রবাদ বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে যে আকবর পূর্ব্বজন্মে মুকুন্দ শর্ম্মা নামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈভব পিপাসার শান্তি না হওয়ায়, তিনি একদা এক তাম্রফলকে নিজ জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিয়া ত্রিবেণী জলে প্রাণ বিসর্জন দেন। ইহাও কথিত আছে; ত্রিবেণীতে কে যে প্রকার কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করে, জন্মান্তরে তাহার তদ্রূপ

যোনী লাভ হইয়া থাকে। মুকুন্দ শর্ম্মা সম্রাট পদপ্রার্থী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং তিনি মোগল সম্রাট হুমায়ুনের ঔরসে ও সুলতান্ হামিদ্ বানুর গর্ভে আকবররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আমরা পাতালপুরী হইতে একেবারেই ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। উত্তর পশ্চিমের গ্রীষ্মাতিশয্যের সহিত পাঠকের ইতিপূর্ব্বেই মোকামেতে পরিচয় করিয়া দিয়াছি। সুতরাং এখানকার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুগুলি একবার দেখিয়াই অদ্যই রাত্রিতে আমাদিগকে স্থানান্তরে গমন করিতেই হইবে। সেই কারণ আহারাদির পরে ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া 'খসরুবাগ' দেখিতে যাইলাম।

খসরুবাগ রেলওয়ে ষ্টেষনের অতি সন্নিকটে। মানসিংহের ভগ্নীর গর্ভজাত মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিই উদ্যানটী প্রস্তুত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই সাধের উদ্যানে তাঁহার সমাধি হয়। এক্ষণে উদ্যানটী এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর অধীনে থাকিয়া অতিযত্নে রক্ষিত আছে। উদ্যানের প্রবেশ দ্বার দুইটী। প্রথম দ্বারের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড এক্ষণে উদ্যানের অন্তর্গত নহে। উহা মিউনিসি-পালের মহলভুক্ত। ইহার সন্নিকটেই দ্বিতল কূপবাটী। গ্রীষ্মকালে পূর্ব্বে বেগম বিবিরাই নাকি এই বাটীতে বাস করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সাহেব বিবিরাই উঁহাদের স্থানে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। প্রথম দ্বারের মধ্যস্থিত ভূমির পর আর একটী প্রকাণ্ড দ্বার। ইহা উচ্চে প্রায় ৫০' হস্ত অপেক্ষা অধিক বলিয়াই বোধ হইল। ইহার শিল্প ও কারুকার্য্য এতাদৃশ মনোহর যে, একবার দেখিলে তৃপ্ত হওয়া যায় না বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। দ্বারটী অতিক্রম করিয়াই দেখিলাম যেন পথের দুই পার্শ্বে চিত্রবিচিত্র মখমল শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। পাঠক! ইহা উর্ণা নির্ম্মিত মখমল নহে, শ্যামল নবদূর্ব্বাদলের মধ্যে নানা জাতীয় নানা বর্ণের ফুল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া মখমল শয্যার আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পর পুষ্পোদ্যান শত শত বিবিধ বর্ণায়তনের গোলাপ, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সুষমা ছটায় আমোদিত করিয়া রহিয়াছে। উদ্যান মধ্যস্থলে তিনটী সমাধি মন্দির তন্মধ্যে প্রথমটীতে খসরুর জননী (১) দ্বিতীয়টীতে স্বয়ং খসরু ও তাঁহার দুই পুত্র এবং তৃতীয়টীতে খসরুর মধ্যম ভ্রাতা পরভিজ্—সকলেই পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত হইয়া চির নিদ্রায় অভিভূত। হতভাগ্য খসরুর সহিত অনেক দিন হইতেই তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীরের বিবাদ চলিতেছিল। পিতা সিংহাসনে আরোহন করিলে পুত্র নিজ বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিয়া পঞ্জাবে পলায়ন

(১)। প্রবাদ আছে, নুরজাহানের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া জাহাঙ্গীর বাদসাহ খসরুর মাতাকে আর তাদৃশ ভাল বাসিতেন না। তাহাতে হতভাগিনী অন্তঃপুরস্থ একটা কূপ মধ্যে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন তিনি আত্মহত্যা করেন নাই। নুরজাহানই এক রাত্রে নিজালয়ে নিমন্ত্রন করিয়া আনাইয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখাইবার ছলে কূপমধ্যে নিক্ষেপে গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়া-ছিলেন।

করিয়া পিতার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হন। কিন্তু তিনি পিতা কর্তৃক বিতস্তানদীতীরে পরাজিত ও বন্দীকৃত হন তৎপরে খসরু অশেষবিধ কারাযন্ত্রনা ভোগ করিয়া নিজ সহোদর সম্রাট সাহাজাহানের কুচক্রে ১৬২১ খৃঃ দুই পুত্রের সহিত নিধনপ্রাপ্ত হন। খসরুর সমাধিমন্দিরে পারস্য ভাষায় অনেকগুলি কবিতা লিখিত আছে। সকল কবিতারই প্রায় এক ভাব। তাহাদের ভাবার্থ এই রূপ—"অর্থের জন্য কিনা হয়। পিতা, পুত্র-স্নেহ বিসর্জ্জন দেন, পুত্র পিতার অবাধ্য হয়। ভ্রাতা ভ্রাতাকে হত্যা করে। ইহ সংসারে অর্থই একমাত্র যত অনর্থের মূল, পরম শত্রুকেও বরং বিশ্বাস করিও, ভাই, তথাপি অর্থকে কখনও বিশ্বাস করিও না' ইত্যাদি। সকল কবিতাই অর্থের অপকর্ষতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

খসরুবাগ অত্রস্থ লোকদিগের অত্যন্ত প্রিয় উদ্যান। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে কলিকাতার ইডেন উদ্যানের ন্যায় এখানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিয়া বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই উদ্যানে আকবর সাহের ইউরোপীয় তুরস্ক-বাসী হাম্বলী বেগমবিবি বাস করিতেন। কিন্তু কাল মহাত্ম্য এরূপ যে, তিনি পূর্ব্বে যে গৃহে থাকিতেন এক্ষণে সেই গৃহে প্রধান উদ্যানরক্ষক বাস করিতেছে। গৃহটী কিন্তু হাম্বলী বিবির গৃহ বলিয়াই অদ্যাপি খ্যাত আছে।

এখান হইতে আমরা 'মেওহল' দেখিতে যাই। 'মেওহল' মেও সাহেবের স্মরণ চিহ্ন-স্বরূপ একটী সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকামাত্র। ইহার প্রধান দ্রষ্টব্য মেওস্তম্ভ। স্তম্ভটী কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা উচ্চতর না হইলেও প্রায় সমান হইবে সন্দেহ নাই। আমরা ইহার উপরে উঠিয়া এলাহাবাদের বাহ্যদৃশ্যাবলী একবার দেখিয়া লইলাম। নিম্নস্থ বৃক্ষ, লতা, মন্দির, অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্ত যেন পরস্পর লিপ্ত বলিয়া আমাদের বোধ হইল। বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ-গুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যষ্টির ন্যায় হইয়াছে। মনুষ্য, গো, মহিষাদি যেন ক্ষুদ্র কীটাবলীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

মনুমেণ্ট হইতে নামিয়া আমরা এ প্রদেশের ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের বাড়ী দেখিতে গমন করিলাম। তখন ছোট লাট-সাহেব শৈলাবাগে অবস্থান করিতেছিলেন। বাটীর কর্ত্তার অবর্ত্ত-মানে বাটীর যেরূপ দুরবস্থা হইয়া থাকে এখানেও আমরা তাহাই দেখিলাম। রাজ বাড়ীটী আমা-দের দেশের কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির ফ্যাসানের বাটীর ন্যায় দেখিতে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত বড় ও সুন্দর।

এখান হইতে আমরা 'বাসকীদেবের মন্দির হইয়া শিবকোটী দেখিলাম। প্রবাদ আছে, শ্রীরামচন্দ্র বনগমন কালে স্বয়ং এই শিব স্থাপনা করিয়া পার্ব্বতীনাথের উপাসনা করিয়াছিলেন। এই শিব পূজা করিলে লোকে লক্ষ শিব পূজার ফল প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম শিব-কোটী হইয়াছে।

এখান হইতে প্রত্যাগমনের কিছু পরেই পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল। আমরাও আলোপী বাগে আলোপী দেবীর মন্দিরে আরতি দেখিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। এই আলোপীদেবীই প্রয়াগ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বর্ত্তমান এলাহাবাদ নগরকে মোটামুটি তিন অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। দুর্গ বা সৈনিক বিভাগ, দ্বিতীয় প্রকৃত সহর দুর্গ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে, তৃতীয় ইংরাজী কোয়াটার।

এলাহাবাদ বর্ত্তমানে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীরূপে পরিণত হওয়ায় এখানেও কলিকাতার ন্যায় কলের জল প্রভৃতি ব্যাহ্যিক উন্নতিরও চিহ্ন দেখা দিয়াছে। সরকারী রাস্তা ঘাটের অবস্থাও অন্যান্য সহর অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। কলিকাতার ন্যায় এখানেও একটী মিউনিসিপালীটীর বাজার আছে। যদিও বাহ্যাকৃতিতে এখানকার এই বাজারটী কলিকাতার বাজারের ন্যায় তত সুন্দর নহে, কিন্তু এখানকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়াই বোধ হইল। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে প্রয়াগ সহরকে কখনও কখনও ফকিরাবাদ নামে অভিহিত করা হইত। শুনিলাম বারাণসীধামের তুলনায় এখানকার অট্টালিকাদির সংখ্যা অতি অল্প এবং এখানে ফকির সন্ন্যাসীর বাস অধিক এবং কতকটা অত্রস্থ জন সাধারণের অবস্থা তত ভাল নহে বলিয়াই ইহা এই নূতন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গাতীরে দারাগঞ্জ নামক পল্লীটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া আমাদের বোধ হইল।

এখন এখানে চাকরী ও জলবায়ু পরিবর্ত্তন উপলক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে ও দিন দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশের অধিবাসীরা অতি ভদ্র ও বিনয়ী, কিন্তু লেখাপড়ার উন্নতি সম্বন্ধে ইঁহারা আমাদের অনেক পশ্চাৎবর্ত্তী। সুতরাং এখানে যত কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন হয়, তাহা সমস্তই এক মাত্র প্রবাসী বাঙ্গালীর উদ্যোগে। এলাহাবাদ হইতে প্রসিদ্ধ অর্দ্ধসরকারী পাইওনিয়ার ও মর্ণিংপোষ্ট নামক দুইখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়।

সন্ধ্যা অতীত হইলে আমরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের প্রাতঃকালের পাণ্ডাজীর পিতা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের অগ্রে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

পাণ্ডাঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৮০ বৎসর হইবে। তিনি এক্ষণে নিজ পুত্রের হস্তে কার্য্যের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাটী বসিয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা সন্ধ্যাকৃত সমাপনান্তে জলযোগ করিয়া শয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ক্রমে কথায় কথায় সিপাহী বিদ্রোহের কথা উঠিল। বৃদ্ধ পাণ্ডাঠাকুর অনেক গৌর চন্দ্রিকার পর এখানকার বিদ্রোহের গল্প যুড়িয়া দিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বলিলাম।

"মিরাট, কাণপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহের কথা শুনিয়া এখানকার অনেকেই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়াছিলেন। বড় বড় ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীরা দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাদের বড় একটা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁহারা নিজ নিজ অদৃষ্ট ও সাহসে ভর করিয়া সহরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আর দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল, সিপাহীরা প্রথমতঃ তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক হরণ করিল ও তাহার পর বিবিধ পৈশাচিক ও নৃশংস ব্যবহারে

তাঁহাদের অবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই হত্যা করিয়া আপনাদের রক্ত পিপাসা মিটাইল।

"ইহার পর দুর্গাবরোধ—ইংরাজের কামান ভেদ করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করা দেবতার পক্ষেও দুঃসাধ্য মনুষ্যেরত কথাই নাই। সুতরাং বিদ্রোহী সেনা সম্মুখ সংগ্রামে ইংরাজকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবার আশা ত্যাগ করিয়া প্রায় সপ্তাহাধিক কাল দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিল। বিদ্রোহের আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইতিপূর্ব্বেই প্রচুর খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং দুর্গ অবরোধ জনিত দুর্গ মধ্যে অন্নাভাব হয় নাই।

এদিকে লুটের লোভে দিন দিন শত শত দুষ্ট লোকেরা আসিয়া বিদ্রোহীদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রয়াগে প্রায় দুই হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বসতি ছিল। ইঁহারা এখানকার তীর্থ যাত্রীগণের উপর মধ্যে মধ্যে অত্যাচার করিতেন। সেই জন্য ইংরাজ রাজ তাঁহাদিগকে দমন করিতে বাধ্য হন। সেই সময় হইতে ইংরাজের উপর পাণ্ডাদিগের মনে মনে বিলক্ষণ আক্রোশ ছিল। একণে সুযোগ পাইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকেই গিয়া বিদ্রোহে যোগ দিল।

"এই সময়ে এখানে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিতেন। একেত তাঁহারা স্বভাবতই ভীরু, তাহাতে আবার চক্ষের উপর এই মহামারি বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত। চারি দিকেই ঘোর বিপদ, দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা দুর্গ মধ্যে একটু আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাতও করে নাই। অনন্যোপায় হইয়া যিনি যেরূপে পারিলেন সেই রূপেই তিনি আত্ম রক্ষায় যত্নবান হইলেন। সুখের বিষয় এই যে, এ বিদ্রোহে এখানে একজন মাত্র বাঙ্গালীকেও প্রাণ হারাইতে হয় নাই।"

"যাহা হউক, কাল কাহারও অধীন নহে। সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক কাল এক রকমে কাটিয়া যাইবে। এ দুর্দ্দিনেও যথানিয়মে কাল কাটিতে লাগিল। প্রায় ৭।৮ দিন পরে ইংরাজ সেনাপতি সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অলৌকিক সাহস ও রণদক্ষতার গুণে প্রবল নদী স্রোতে তৃণগুচ্ছের ন্যায় অসংখ্য বিদ্রোহীসেনা সমস্তই ভাসিয়া গেল। এইবারে ইংরাজহৃদয়ে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। বোবার হাতে কালার আর পরিত্রাণ নাই। অনেকে ফকীর সন্ন্যাসী প্রভৃতির ছদ্মবেশে দেশ ছাড়িয়া পলাইল। যাহারা স্ত্রী পুত্রাদির মায়া কাটাইয়া দেশ ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহারা প্রায়ই একণে বিজয়ী ইংরাজ রাজ্যের সামরিক বিচারে (courtmartial) প্রাণ হারাইতে লাগিল। যাহা হউক, পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপায় ২।১ দিনের মধ্যেই ইংরাজ হৃদয় হইতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি তিরোহিত হইলে নৃশংসতার অভিনয় ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। তখন শান্তিদেবী হাসিমুখে আবার নগর মধ্যে আসিয়া আবির্ভূতা হইলেন। এই সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে এখানে দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বপ্রকার জনতা অবৈধ বলিয়া একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গল্প শুনিতে ট্রেনের সময় হইয়া আসিল দেখিয়া আমরা পাণ্ডাজীকে বিদায় দিয়া ধর্ম্মশালা হইতে ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। ধর্ম্মশালাটীর কথা এ

পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। ধর্ম্মশালাটী দ্বিতল বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার মধ্যস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গন বিবিধ ফলপুষ্পে শোভিত ও তন্মধ্যস্থ একটী অতি ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। একটী অতি সৎব্রাহ্মণ দেব-পূজার জন্য নিযুক্ত আছেন। এই ব্রাহ্মণই এ বাটীর দারগা বা একরূপ কর্ত্তা। ইঁহার অধীনে অনেকগুলি দাসদাসী যাত্রীদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত আছে। দারগা—ধর্ম্মশালাটী যেরূপ যত্নে পরিষ্কৃত রাখিয়াছেন এবং আগত যাত্রী দিগকে যেরূপ ভাবে যত্ন ও আপ্যায়িত করিয়া থাকেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ধর্ম্মশালাটী দ্বিমহল। বাহির মহলের দ্বিতলে ভদ্রবংশীয় ও সম্ভ্রান্ত অথিতিবর্গ ভিন্ন অন্য কেহ থাকিতে পায় না। ভিতর মহলে সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্ত্রী লোকেরাই থাকিতে পান। অধিকাংশ গৃহ গুলিই ইংরাজি ফ্যাসানে চিত্রিতও গৃহের তলদেশ মাদুর দ্বারা (mating) আবৃত। গৃহগুলিতে টেবিল. চেয়ার প্রভৃতি সমস্তই আছে দেখিলাম। বোম্বাই প্রদেশস্থ বিখ্যাত ধনবান আঢ্য শ্রীযুক্ত বাবু গোকুল চন্দ্র তেজপাল এই ধর্ম্মশালাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তেজপাল মহাশয়ের এই পুণ্যকর্ম্মে বস্তুতঃই অনেকের উপকার হইয়াছে আর তিনিও শত সহস্র যাত্রীগণের আশীর্ব্বাদ প্রত্যহই গ্রহণ করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

যথা সময়ে ট্রেণ ষ্টেশনে আসিল অদ্য এ ট্রেণে যাত্রী সংখ্যা অতি অধিক দেখিয়া আমরা সকলে একটী কামরায় উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে শয্যা বিস্তার করিয়া এক একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বসিলাম। দুই একজন সাহেব কেবল মধ্যে মধ্যে আমাদের এক চেটে কামরায় উঠিতে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত স্থানাভাব বুঝিয়াই হউক, বা কালা আদমীর সহিত একাসনে বসিলে পাছে তাঁহাদের গৌরাঙ্গও কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই আশঙ্কাতেই হউক, তাঁহারা অস্ফুটস্বরে কি জানি কি বলিতে বলিতে অন্য কামরায় গিয়া উঠিলেন। তাঁহারাও বাঁচিলেন আমরাও বাঁচিলাম। ইহার পর একটী ফিরিঙ্গী যুবক বিকট চিৎকারের সহিত 'টিকেট' 'টিকেট' করিতে, করিতে আসিয়া ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে আমাদের কামরার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দূর হইতে সাহেবের সাঙ্কার গলা বাজী শুনিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার জামাতা আসিতেছেন বলিয়াই আমাদের ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ষ্টেশনের উজ্জল দিপালোকে সাহেবের জাপান বার্ণিস্ বিনিন্দিত মুখকান্তি দেখিয়া বেশ চিনিতে পারিলাম ইনি আমাদের কলিকাতার চূণাগলীর ইন্দু পিন্দু প্রভৃতি সাহেবদের সহোদর ভাই। সাহেব খাঁটী ব্রিটিশ বরণ. লণ্ডন হইতে ইণ্ডিয়ায় আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণসাগরের হাওয়া লাগিয়া বোধ হয় ইহাঁর সুন্দর কলেবর এক্ষণে এইরূপ পাকা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য বোধ হয় সাহেব অনেক কামা বসিয়াছেন ও অনেক বারসোপ্ সাজীমাটী প্রভৃতি মাখিয়াছেন, তথাপি গায়ের পাকা ছিট উঠে নাই। আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল সাহেবের পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করিয়া লই। কিন্তু সাহসে কুলাইল না, কারণ ইহাঁর কলি-

কাতা বাসী সহোদরদের চলিয়া যাইতে যাইতে গায়ে দৈবাৎ কালা আদ্‌মির হাওয়াটি পর্য্যন্ত লাগিলে তাঁহারা প্রায়ই হস্তস্থিত সারমেয় কুলান্তকারী প্রকাণ্ড লগুড় খণ্ডের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ বাতরোগের চিকিৎসা যুড়িয়া দিয়া থাকেন। ইনিওত সেই দাদার ভাই। শেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া একটা গোলযোগ বাধাইয়া বসিব। সাহেব টিকিট গুলি দেখিয়া গমন করিলেই ষ্টেশণ হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

প্রহেলিকা।

(শেষ অংশ।)

রামশরণ এখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দুজনে রোজ প্রাতে—হাবড়া পুল হইতে আরম্ভ করিয়া আহিরীটোলার ঘাট পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাই। দিন দিন রামশরণ শরীরের সহিত মানসিক স্বস্থতা লাভ করিতে লাগিল।

ইন্দুমতীর কথা সে এখনও ভুলে নাই, ভুলিবেও না। মধ্যে মধ্যে ঐ প্রকারে কোন প্রসঙ্গ তুলিলেই আমি তাহা অন্য কথায় উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু তাহার সন্তপ্ত—হৃদয়ের এক একটী লুক্কায়িত দীর্ঘশ্বাস—এক একটী মর্ম্মোচ্ছাসময়ী কথা, আমাকে মধ্যে মধ্যে বড়ই ব্যাকুল করিত।

একদিন রামশরণ আমায় বলিল—"ভাই, সত্য কথা বলিতে কি? এ দেশে আমার আর শান্তি নাই। স্থান ও দৃশ্য—পরিবর্ত্তনে জীবন নাটকের নূতন অঙ্ক উদ্‌ঘাটন না করিতে পারিলে আমার জীবন কেবল নরকযন্ত্রণাময় হইবে। আমি নির্জ্জনে থাকি—শত চিন্তার মধ্যে ইন্দুর চিন্তা আমার হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে আসিয়া দেখা দেয়। আমি আহার করিতে বসি—দেশের সে এক সময়ের শান্তিময় জীবনের গৃহ-চিত্র সজীবতা লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমি রাত্রে নিদ্রা যাই—আমার মনে হয়—ইন্দু যেন ক্ষমা ভিক্ষার জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। সে যেন আরও মলিন হইয়া গিয়াছে—সে অপ্সরী সৌন্দর্য্যে কত যেন কালিমা পড়িয়াছে—চক্ষু মগ্ন, শরীর শীর্ণ, মুখ বিবর্ণ, আর সেই বিবর্ণ—গণ্ডে ধারাপ্রবাহী অশ্রুজল। সে যেন বলে—আমি অপরাধিনী বটে—কিন্তু কলঙ্কিনী নহি। স্বামিন্! যাহা কিছু দেখিয়াছ সবই ভ্রম।" ভাই! দিবারাত্র এই সব চিন্তা আমার মনকে—বাত্যাবিক্ষুব্ধ জলধিবৎ আকুলিত করিয়া রাখে। চিন্তা-তরঙ্গের প্রবল আঘাতে—এই ক্ষীণ হৃদয় আরও ক্ষীণতার মধ্যে ডুবিয়া পড়ে। এ কঠোর পরীক্ষা—আর আমি সহিতে পারিতেছি না। চল এমন কোন স্থানে যাই, যেখানে প্রকৃতির কোলে থাকিয়া নিসর্গের মধুর—মহান—গরীয়ান্ দৃশ্য দেখিয়া

সকল অসুন্দর চিন্তাকে মহা—সুন্দরের চিন্তার অন্তর্ভূক্ত করে।”

আমি সমস্ত কথাই বুঝিলাম। যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বেশী বিলম্বে সুফলের আশা নাই। সেইদিন রাত্রেই কলিকাতা ত্যাগ করিবার কল্পনা হইল।

সমস্ত দিন আয়োজনে গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধুবান্ধবদের নিকট বিদায় লইয়া আসিলাম। ডাকগাড়ীতে আমরা যাইব, এইরূপ স্থির হইল।

দীর্ঘ প্রবাস—যাত্রা কখনও করি নাই। দীর্ঘ প্রবাসের স্মৃতি সুখময় কি দুঃখময় তাহা জানি না। বাড়ী হইতে দুরদেশে—দীর্ঘকালের জন্য বিদায় লইতে গেলে হৃদয়ের মধ্যে কি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাও অনুভব নাই। আত্মীয় পরিজনের মলিন মুখ, বিদায়ী অভিনন্দন, অশ্রু-উচ্ছাসিত ধারাপ্লাবিত গণ্ডস্থল—হৃদয়ের তুমুল আন্দোলন-পরিজ্ঞাপক সংযমিত, সংক্ষুব্ধ—দীর্ঘশ্বাস আর অতীতের যত মধুর স্মৃতি—ভবিষ্যত বিরহের যত কষ্টকর কল্পনা—মনে যে কি এক অভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়া দেয়, তাহা আজ ভোগ করিলাম।

সোমবার—২৮এ ফাল্গুন আমরা কলিকাতা ছাড়ি—আজ ৩০এ, আমরা বেনারসে আসিয়া পূর্ণ একদিন বিশ্রাম করিলাম। পথে রামশরণ বেশ প্রফুল্লভাবে আসিয়াছিল। সে কখনও জীবনে, পাহাড় দেখে নাই—সেই শস্যশ্যামল চিরসমতল বাঙ্গালার প্রান্তরপ্রদেশের শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমরা উভয়েই—বাল্যকাল হইতে পরিপুষ্ট হইয়াছি। নওয়াদি পার হইবার পর, চন্দ্রালোক প্লাবিত—বায়ুতরঙ্গ-চুম্বিত, বন জঙ্গল সমন্বিত সাঁওতাল পরগণার রুক্ষকায় পাহাড়ের দৃশ্যে তাহার মন বড়ই প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। পর দিন যখন ডফারিনপোলের উপর হইতে—সূর্য্যালোক বিভাসিত—শত শত সুবৃহৎ সৌধমণ্ডিত—বারাণসীর গৃহচূড়া ও সুপ্রশস্ত বিশাল দর্শন ঘাটশ্রেণী তাহার চক্ষে পড়িল—তখন সে আরও উল্লাসিত হইয়া উঠিল। যাহাকে স্নেহ করা যায়—যাহাকে ভালবাসা যায়, আর আনন্দে কি যেন একটা সংক্রামকতা আছে। রামশরণের আনন্দে আমি সেই জন্যই বড় পুলকিত হইলাম।

কাশীতে পৌছিয়াই—রামশরণ প্রথমেই—দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া—বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া আসিল। আমি কাশীর নূতন আগন্তুক নহি—এবং তদ্ব্যতীত এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে—এক পাও নড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না। মুক্তিক্ষেত্রে দেব-দর্শনের উৎসাহ রামশরণের হৃদয়কে খুব বলীয়ান করিয়া রাখিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, রামশরণ সর্ব্বপ্রথম মন্দির—দর্শনের বিস্তৃতকাহিনী আরম্ভ করিল। স্নানের ঘাটে—ইচ্ছাময়ীর সহিত—সেই দিনই দুই চারিজন স্ত্রীলোকের পরিচয় হইয়াছিল—সে তাহাই বলিয়া ফেলিল। সেদিন আমাদের আনন্দে কাটিল।

আমরা নদীয়াছত্রে বাসা লইয়াছিলাম। এখানে আমার একটী পরিচিত লোক ছিলেন। আরও দুইবার আমি বেনারসে আসিয়াছিলাম, সেই সময়েই ইহাঁর সহিত আলাপ হয়। বলিয়া রাখি—লোকটী বড় ভদ্র ও প্রবীণ। একসময়ে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে

তাহাই লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। বাড়ীর মধ্যে তাহার প্রৌঢ়া গৃহিণী, দুই পুত্র ও পুত্রবধূ ভিন্ন আর কেহ নাই। দাসী চাকর বাহিরের একটী কুঠুরীতে থাকে।

যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহার নাম, সর্ব্বেশ্বর মিত্র। আমি মিত্রজার বাড়ীতেই প্রায় থাকিতাম, রামশরণও থাকিত। মিত্রজার বহির্বাটীতে তাস পাশা ও দাবার আড্ডা ছিল—দু চারিজন মিত্রজার সমবয়স্ক লোকেই—দিবাভাগে আসর জমাইয়া রাখিতেন। "কচে বার" "কিস্তিমাৎ" প্রভৃতি অর্থযুক্ত শব্দ সমূহ—সকলের মহা কোলাহলে প্রতিশব্দিত হইয়া সেই প্রস্তরময় গৃহ প্রাকার পরিকম্পিত করিয়া তুলিত।

পলে পলে দিন যায়—আবার রাত্রি আসে। আবার রাত্রি পোহাইয়া দিন হয়, দিনে দিনে সপ্তাহ চলিয়া যায়, সপ্তাহের পর পক্ষও যাইতে বসিয়াছে—এর মধ্যে এমন কোন ঘটনা হয় নাই যাহা লিখিবার উপযুক্ত। আমি মিত্রজার বৈঠকখানায় তাস পাশা লইয়াই কাটাইয়াছি—রামশরণ কোন দিন বা খেলায় যোগ দিয়া—কোন দিন বা মিত্রজার মলাট—পরিপুষ্ট, যত্নে রক্ষিত, "কাশীখণ্ড" খানি নাড়াচাড়া করিয়া—কোন দিন দু চারিটা খোস গল্পে যোগ দিয়া কাল কাটাইয়াছে। আর ইচ্ছাময়ী! সে আমাদের ক্ষুদ্র বাড়ীটীতে অবরুদ্ধা থাকিয়া—আমাদের হিন্দুস্থানী পাচিকার কন্যাদের লইয়া গল্প শুনাইত—কখনও বা তাহাদের চুলের গোছা লইয়া—প্রচুর—তৈলসিক্ত করিয়া, সুরঞ্জিত, সুচিক্কণ, সুবৃহৎ, সুকৌশলময়, সুন্দর মণ্ডলাকার, বেণী রচনা করিয়া, নিজের কলকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পাচিকার প্রশংসাবাদে আত্মগর্ব্বিতা হইত। কখনও গৃহস্থালী করিত, কখনও বা বহুকালের সঞ্চিত একখানি বটতলার "মনসার ভাসান" বাহির করিয়া—নানাবিধ সুরে পাঠ করিত। সর্ব্বেশ্বর বাবুর অন্তঃপুরে এ পর্য্যন্ত ইচ্ছাময়ীর পদার্পণ হয় নাই। ইচ্ছাময়ী এখানে নির্জ্জনতা প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে—ইন্দুমতী সংলিপ্ত ঘটনা তাহার চক্ষে বাহ্যজগতের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সে কোথাও যাইতে চাহে না—পাছে তাহার ভ্রাতৃজায়ার কোন কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে। সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটী আমাদের বাসা হইতে এক রশী দূর। গলি বাঁকা চোরা বলিয়া যেন—তদপেক্ষা দূর বলিয়া বোধ হয়। ইচ্ছাময়ী এক দিনও সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই।

আত্মীয়তার নিদর্শন স্বরূপ—আমি একদিন সর্ব্বেশ্বর বাবু ও তাঁহার দুই পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিলাম। এই ঘটনার ৩।৪ দিন পরে একদিন সর্ব্বেশ্বর বাবু আমাদের দুই জনকে তাঁহার বাটীতে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

আমি সব কথা ভুলিতে পারি, কিন্তু এই স্মরণীয় রাত্রিটী কখনও ভুলিব না। আমি বক্ষ হইতে একে একে সব ঘটনা অপসারিত করিয়া বিস্মৃতিগর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে পারি, কিন্তু এ রাত্রির ঘটনা চিরকাল আমার চক্ষে জাগ্রত স্বপ্নের ন্যায় থাকিবে। হায়! হায়! সে নিমন্ত্রণ কি কাল নিমন্ত্রণই হইয়াছিল! এখন ভাবি কেন বা সে সর্ব্বনেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম? মানুষ যে ভবিষ্যতে অন্ধ। বর্ত্তমানেও যখন সে পূর্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াও কার্য্য

করিতে পারে না, তখন ভবিষ্যতের যবনিকার অন্তরালে যে কি আছে, তাহা সে জানিবে কি করিয়া? হায়! এক একটী ক্ষণ, এক একটী মুহূর্ত্ত, এক একটী দিন, কি ভয়ানক হইয়াই, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের বীজ বপন করে।

হে অনন্ত ক্ষমতাময় মুহূর্ত্ত! তোমায় শত শত নমস্কার। তুমি কর্ম্মের উপর অধিষ্ঠান কর এবং স্বয়ং বিধাতাও কর্ম্মের অধীন। তুমি যে সময়ে, কোন গৃহে নব শিশুর জন্মজনিত আনন্দ কোলাহল অনুভব কর, আবার সেই সময়ে, অন্য গৃহে উপযুক্ত গুণধর-বংশধরের বিয়োগের মহা-বিষাদিত-দৃশ্য অবলোকন কর। তুমি যে সময়ে কোন সংসারে শান্তির প্রস্রবণ বহাও, আনন্দের পূর্ণ উচ্ছাস প্রবাহিত কর—আবার ঠিক সেই সময়ে তাহার অতি সন্নিকটে অশান্তির বিষাদ-কাহিনীর খরস্রোত উচ্ছলিত কর। তোমার প্রসাদে, একই সময়ে—কেহবা চিরসুখী, কেহবা চিরদুখী, কেহবা শান্তিময়, কেহবা জ্বালা-ময়, কেহবা ধনী কেহবা হৃতসর্ব্বস্ব—কেহবা পুত্রবান্ কেহবা পুত্রহীন, কেহবা প্রেম, কেহবা বিরহ, কেহবা ধর্ম্ম, কেহবা অধর্ম্ম, কেহবা পুণ্য কেহবা পাপ, কেহবা আশা, কেহবা নিরাশা, সম্ভোগ করে। তুমি বৈষম্যের আধার হইয়াও সাম্যের প্রধান নিদর্শন। হে মুহূর্ত্ত! তোমার প্রভাবেই নিম্নলিখিত শোচনীয় ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে—তোমারই আদেশে আমি তাহা জন-সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিতে বসিয়াছি।

২৫এ বৈশাখ, বার—শুক্রবার। আমরা সন্ধ্যার পর, সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণে গেলাম। রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত খেলা চলিল, তার পর অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আসিল, আহার প্রস্তত। তিনখানি থালে, সুপরিষ্কৃত, সুপাচ্য অন্ন—নানাবিধ সুরসাল ব্যঞ্জন। চারিদিকে নানাবিধ মুখরোচক তরকারীর বাটী। আমরা আসন গ্রহণ করিলাম—আহার চলিতে লাগিল।

এমন সুন্দর রন্ধন অনেক দিন খাই নাই। সব যেন দেশের মতন বোধ হইতে লাগিল। হিন্দুস্থানীর রান্না খাইয়া খাইয়া, মুখটা বড় খারাপ হইয়াছিল—আজ বড় সুন্দর সুখ-সম্ভোগ করিল। রামশরণ বলিল—"মহাশয়! তরকারী গুলি বড় পরিপাটী হইয়াছে। ঠিক যেন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনার পাচিকা কি হিন্দুস্থানী?"

সর্ব্বেশ্বর বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—তা বটে, যা বলিতেছেন সত্য বটে। হিন্দুস্থানীর হাতের রান্না আমারও ভাল লাগেনা। আমি আগা গোড়া এ ভোগ ভুগিয়াছি, তবে আজ ৩.৪ মাস আমার কষ্ট দূর হইয়াছে। যাঁহার হাতের রান্না আপনারা খাইতেছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে আমার বেতন-ভোগী নহেন। আমি তাঁহাকে কন্যার মত দেখি। আমি, গত অগ্রহায়ণ মাসে আমার জ্যেষ্ঠ-পুত্রবধুর পীড়ার জন্য দেশে যাই—সেই সময়ে আমার গৃহিণী একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়া, একটী নিরাশ্রয়া যুবতীকে দেখিতে পান। সেই অনাশ্রয় যুবতীকে আমি সঙ্গে করিয়া এখানে আনিয়াছি, যাহা কিছু সামান্য পাক শাক হইয়াছে তাহা তাঁহারই প্রস্তত। যা'ক সে অনেক কথা—আহারান্তে বলিব। কই আপ-নার পাতে যে অন্ন নাই সুশীলা মা! চারিটী ভাত নিয়ে এস। মশায় মেয়েটী যেন লক্ষ্মী।

আমার গৃহিণী হাঁপানীতে বড় কষ্ট পান— তাহাকেও কিছু করিতে দেয়না।"

পাচিকা অন্ন লইয়া আসিল—আ মরি! মরি! কি সুন্দর ভুবনমোহিনী তার রূপ। মুখে অবগুণ্ঠন, তবু তাহার মধ্যে দিয়া যেন রূপজ্যোতিঃ উছলিতেছে। সে গতিতে চঞ্চলতা নাই—সে সৌন্দর্য্যে কলুষিতা নাই—সে অঙ্গ চালনায় অস্থিরতা নাই। যখন সে হাত খানি বাহির করিয়া অন্নের থাল হইতে, পাতে অন্ন ঢালিল মরি! মরি! সে বাহুতে তাহার সর্ব্ব শরীরের অতুল সৌন্দর্য্যের—ছায়া আসিয়া দেখা দিল। রামশরণের দিকে একবার তাকাইলাম, দেখি সে মুখ নীচু রহিয়াছে। অন্ন দেওয়া হইল, পাচিকা (এখন পাচিকাই বলি) নিঃশব্দে চলিয়াগেল, সে গতিতে যেন সেই দালানের উপর বসন্ত-বায়ু-বিতাড়িত, ধীর সমীর-চুম্বিত, কতই নবীন-সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। মৃদু লহরীময় স্রোতস্বিনীর মৃদুতরঙ্গের ন্যায় কি একটা সৌন্দর্য্য-স্রোত যেন সেই থানে ছড়াইয়া পড়িল।

কেন এই পাচিকার সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম জানিনা। তাহার পরিধেয়-বস্ত্র মলিন, গাত্র অলঙ্কার-হীন, হাতে দুই গাছি শাঁখা মাত্র সম্বল, তথাপি সেই মলিন ভাবের মধ্যেও যেন একটী ধীর-তরঙ্গায়িত, যৌবনের—অকলুষিত, অস্ফুট সৌন্দর্য্য ধীর-ভাবে সংযমিত হইয়া রহিয়াছে।

রামশরণের পাতে অন্ন দিবার সময় পাচিকার হাত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, অন্নের থালাখানি তাহার পাতে পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল; আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া ছিলাম। রামশরণও যে করে নাই এরূপ নহে।

পাচিকা যখন চলিয়া যায়, তখন রামশরণ একদৃষ্টে তাহার প্রত্যাগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল। যুবতী যখন রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন রামশরণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমাদের আহার শেষ হইল, আচমনের পর আমরা বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু আমাকে এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই তাঁহার স্ত্রী উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে, গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া, জগন্নাথঘাটে এই স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পান। সেই পথ পরিত্যক্ত যুবতীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া দয়াবশে তাহাকে বাড়ী লইয়া আসেন। আকারে ও পরিচ্ছদে তাহাকে সধবা বলিয়াই বোধ হয়—এবং সে সেইরূপই আচরণ করে। পরিচয়ে কেবল এই মাত্র বলিয়াছে, সে কায়স্থের কন্যা। কি কারণে সে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। কেবল নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে। এরূপ সুশীলা যুবতী আমরা কম দেখিয়াছি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার মনে নানা কথার উদয় হইতে লাগিল। বাস্তবিক এ বড় অদ্ভুতকাহিনী। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করা অপ্রাসঙ্গিক ও অযথা ভাবিয়া আমরা সে রাত্রের মত বিদায় লইলাম।

পরদিন প্রাতে সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাড়ীর বেহারা

আসিয়া বলিল, বাবু "দিদিমণিকে" পাওয়া যাইতেছে না।

আমি বলিলাম দিদিমণি কেরে? তোর বাবুর কি মেয়ে আছে! তাত জানিনা! তা সে কোথায় গেল!

বেহারা বলিল, না—বাবুর মেয়ে নাই। যিনি কাল আপনাদের পরিবেশন করিলেন, আমরা তাঁহাকে "দিদিমণি" বলি।

আমি কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সহিত সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। সর্ব্ব বাবু একখানি পত্র আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—ভায়া এখানি পড় দেখি। আমি পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, পড়িতে পড়িতে শরীর কণ্টকিত হইল। হা! ভগবান, যেথানে যাই সেথানে একটা না একটা কাণ্ড ঘটে! পত্র খানি এই—

"বাবা! অভাগিনী কন্যাকে মার্জ্জনা করিবেন। আজ পাঁচ মাস আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া সংসারের জ্বালা সব ভুলিয়া ছিলাম। আমার শোচনীয় জীবন-কাহিনী একদিন বলিবার সাধ ছিল, আর বলা হইল না। সকল কথা আপনার নিকট বলা যায় না। এইটুকু বলি আমার জীবনে এমন মহাপাপ ঘটিয়াছে, যে তাহার প্রায়শ্চিত্তের বড়ই আবশ্যক। কাল রাত্রে ভবানী আমায় স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন, জীবন ত্যাগ ভিন্ন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি ভবানীর আদেশ পালন করিতে চলিলাম।"

"আমি সধবা। আমার ইষ্টদেব আমায় পরিত্যাগ করেন নাই. আমি স্বেচ্ছায় কোন কারণে তাঁহার সোণার সংসারে আগুণ জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমি স্বামী গৃহ ত্যাগ ব্যতীত আর কোন পাপে কলুষিতা নহি। তাঁহার কাছে—জগতের চক্ষে, অবিশ্বাসিনী বটে, কিন্তু ধর্ম্মের চক্ষে নহি।

আমি স্বামী গৃহে ফিরিতে পারিতাম কিন্তু আর সে সাধ নাই। তাঁহার স্বর্গীয়—প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এ পাপিনীর জন্য আর তিল মাত্র স্থান থাকিতে পারে না। আমার মনে একটী আশা ছিল, যদি যথার্থ পতিরতা হই—তবে যেন মরিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই। কাল রাত্রে ভবানী আমায় তাঁহাকে দেখাইয়াছেন। ভবানীর আদেশেই আমি তাঁহার সগম্ভীর কোমল—ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে চলিলাম।

পিতঃ! ক্ষমা করিবেন। এ পাপিনীর জ্বালা-ময় হৃদয়, জাহ্নবীর অনন্ত-শীতল গর্ভ ভিন্ন কোথাও শান্তি লাভ করিবে না। আপনি আমার অন্বেষণে কোন চেষ্টা করিবেন না। করিলেও পাইবেন না। হয়তঃ প্রভাতেই শুনিবেন, কোন না কোন স্থানে আমার শব-দেহ ভাসিতেছে!

"আপনার সুশীলা।"

পত্র পড়িয়া আমার যে ধারণা ও সন্দেহ হইল, তাহাতে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলাম। রামশরণ আমার সঙ্গে আসে নাই—ভালই হইয়াছে। তখন কেন এরূপ ভাবিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, এখন বুঝিতেছি। আমি পত্র খানি সযত্নে রাখিয়া দিলাম, সর্ব্বেশ্বর বাবু তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না।

সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন "দেখুন—মেয়েটার

উপর আমার বড় মায়া বসিয়াছিল, বিশেষতঃ আমার গৃহিণী বড় কাতর হইয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই রমণীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ও পরিস্ফুট। তবে আমার সন্দেহ হইতেছে কোন অব্যক্ত যাতনায় সে এখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছে। তাহা জানিবার আর উপায় নাই ও সম্ভাবনাই নাই।"

আমি বলিলাম—খোঁজখবরের জন্য কোন লোক পাঠাইয়াছেন? পুলিসে খপর দেওয়া সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন? মিত্রজা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন আর পুলিষ! গঙ্গাগর্ভ হইতে পুলিস্ তাহাকে যে উদ্ধার করিবে ইহা অসম্ভবের অপেক্ষাও অসম্ভব। তবে লোক জন চারিদিকে পাঠাইয়াছি এইত দশটা বাজিতে যায় কোন সংবাদই নাই।

আমি কথাবার্ত্তা উপদেশ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম বাড়ীতে আসিবা মাত্রই রামশরণ বলিল "ভায়া এত দেরী হইল কেন?"

আমি উত্তর দিলাম না। নানা কথা বিশ্বব্যাপী প্রলয়ঝটিকার ন্যায় আমার ক্ষুদ্র-মস্তিকে অসম্ভব আলোড়ন করিতেছিল। কিন্তু আমার মনের ভিতর কি হইতেছে রামশরণকে জানিতে দিলাম না। যে হাতের লেখা আমি এই কয়েক মূহর্ত্ত পূর্ব্বে পড়িয়াছি তাহা আমার পরিচিত না হইলেও—যেন ছায়ার মত সন্দেহ আসিয়া ইন্দুমতিকে তাহার সহিত জড়াইতেছে। গত রাত্রের সেই যুবতীর দীর্ঘাবগুণ্ঠন, পরিবেশন কালে কম্পিত হস্ত, ও অন্যমনস্ক-ভাব আমার এ সন্দেহ দৃঢ়মূল করিয়া দিতেছে। কিন্তু আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ ত কিছুই নাই সবই অনুমান।

আমি বলিলাম—ভাল, দেখ রাম, গত-রাত্রে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ী যে যুবতী পাচিকাকে দেখিয়া ছিলে তাহাকে সকাল হইতে পাওয়া যাইতেছে না।'

রাম শরণ বলিল—বল কি? বড় আশ্চর্য্য কথা ত? কেন এরূপ হইল? আশ্চর্য্য আর কি ছাই মাথামুণ্ড! জগতের অনেক কার্য্য আজ-কাল আর আমার পক্ষে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

'আমি পত্রখানি রাম শরণের সম্মুখে ফেলিয়া দিলাম—সে পত্রখানি খুলিয়া দু চার লাইন পড়িয়া বড় অন্যমনস্ক হইল—পড়া বন্ধ করিয়া জানালার কাছে প্রস্ফুটিত আলোক ধরিয়া আদ্যোপান্ত তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে—রামশরণ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল—বলিল ভাই! আমার মাথা ঘুরিতেছে—এ হাতের লেখা—এযে সেই —সেই—এযে ইন্দুর লেখা—

আর বলিতে হইল না রামশরণ বিছানার উপর পড়িয়া গেল—আমি তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

রামশরণের চেতনা লাভের সঙ্গেসঙ্গে শরীরের সুস্থতা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমি তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া অধিকতর বিস্ময়ান্বিত হইলাম। দেখিলাম—তাহার চক্ষু উজ্জ্বল বিস্ফারিত—স্থির-দৃষ্টি—শূন্য। চিন্তাঙ্কিত হইয়াও, বদনমণ্ডল প্রশান্ত ও চিন্তাশূন্যের মত। তার পর রামশরণ স্থির-গম্ভীর—কণ্ঠে যাহা বলিল আজ, কি যেন এক বিষম প্রহেলিকার" মত তাহা আমার কাণে বাজিতেছে। রামশরণ বলিল

কি এক ভারী দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। সিঁড়ির উপর যে স্ত্রীলোককে দেখা যাইতে ছিল সে আর সেখানে নাই। আমি বুঝিলাম সে জাহ্নবীজলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে।

বিলম্ব করিয়া ভাল করি নাই—তখন একথা মনে হইল। দ্রুতপদে ত্বরিত-গতিতে প্রস্তরময় সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিলাম। সহসা অন্ধকারে পদস্খলন হইল—সেই পাষাণবক্ষ সোপানে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেলাম—আঘাতও বড় লাগিল, দেখিলাম এক স্থান কাটিয়া গিয়াছে। গ্রাহ্য না করিয়া গঙ্গায় নামিলাম।

সন্তরণে আমি আজন্ম পটু। শরীরে বলও যথেষ্ট ছিল। দেখিলাম কি একটা পদার্থ ভাসিতেছে ডুবিতেছে। আমার বাহু-সঞ্চালিত তরঙ্গোচ্ছাসে সেটা আর উঠিল না। ভাবিলাম আমার ভ্রম, হয়ত একটা জল-জন্তু।

স্থলে ও জলে, নষ্টবস্তু অনুসন্ধানের কার্য্য মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। ভুক্তভোগী ভিন্ন একথা অপরে বুঝিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ অন্ধকারে—ও জীবন-মৃত্যুর প্রতিদ্বন্দিতা সময়ে। কাশীর গঙ্গা একটানা স্রোত। এই স্রোতের বিরুদ্ধে অঙ্গ ভাসাইয়া রামনগরের দিকে চলিলাম। স্রোতের প্রাখর্য্য সেই দিকেই বেশী।

খানিক দূরে আর একটা শুভ্র-পদার্থ ভাসিতে দেখিলাম। সন্তরণে ধরিলাম। সেটা একখানা আর্দ্র-পরিধেয়। বুঝিলাম জলনিমজ্জিতা রমণী এই খানেই কোথাও আছে এবং আমি প্রয়োজনীয় দিকেই আসিয়াছি।

প্রতিকুল-স্রোতে সন্তরণ হেতু, আমার সামর্থ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—বাহুযুগ শক্তিশূন্য হইতেছিল। উপরে অনন্ত নীলিমাময় আকাশে স্থির জ্যোতিঃ নক্ষত্র পুঞ্জ—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বলিত হইয়া, যেন আমায় উৎসাহ প্রদান করিতেছিল। তরঙ্গ ভেদ করিয়া খানিক দূর গিয়া দেখিলাম ৩।৪ খানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে।

নৌকার উপর উঠিলাম। একটা মাজি পাটাতনের উপর ঘুমাইতেছিল, আমার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। সে চিৎকারে সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া সকলেই বাঁশ, দাঁড় ও লগী লইয়া, আমার নৌকা হইতে নৌকান্তরে লাফ্ দিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "জোয়ান লোক্" সব স্থির হও। আমি ভূত প্রেত বা ডাকাত নহি, সন্ন্যাসী মাত্র—এইমাত্র একটী স্ত্রীলোক জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, আমি তাহার দেহ খুঁজিতে খুঁজিতে, ওপার হইতে সন্তরণ করিয়া আসিতেছি।"

আমার কথায় দেখিলাম কেহ অবিশ্বাস করিল না। এক জন আলো জ্বালিল, প্রদীপের আলো আমার মুখের নিকট আনিয়া ধীরে ধীরে প্রদীপ নামাইয়া বলিল "স্বামিজী! স্বয়ং! কে ডুবিয়াছে বলুন। আমি বলিলাম তা জানি না দুরমন্—তুমি লোকজন হইয়া এখনই জলে পড়। আমার আদেশ।

বেশী বলিতে হইল না—পাঁচ সাত জন লোক ঝুপ ঝাপ্ করিয়া জলবিহারি জীবগণের ন্যায় চারিদিকে নামিয়া পড়িল। আমি নৌকার উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

ভাই! আমি উন্মাদ নহি। আমার জীবনে এরূপ অবস্থা আসে নাই—আসিবেও না। যে পত্র আমি পড়িলাম তাহা ইন্দুর লেখা। যাহাকে আমি কাল দেখিয়াছি সে ইন্দু। তাহার আর কোন ভুল নাই। সে নদীগর্ভে-নিমজ্জিত হইয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আমি তাহার চিন্তাকে আজ হইতে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া, মহাপ্রায়শ্চিত্তে ব্রতী হইলাম। সে তাহার পথ বুঝিয়াছে, আমি আমার পথ অনুসন্ধান করিব। তাহার গৃহত্যাগে আমি যত দুঃখিত ও আকুল হইয়াছিলাম তাহার শোচনীয় মৃত্যুতে ততোধিক আনন্দিত হইতেছি।

আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিলাম—ভাবিলাম এ এক নূতন প্রহেলিকা!!

—*—

(যোগানন্দ স্বামীর কথা)

ঘটনা ও কার্য্যক্ষেত্র আজ আমাকে নূতন ব্রতে ব্রতী করিতেছে। আমি সংসারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি—কিন্তু আজ এক বিসদৃশ ঘটনা আমায় পুনর্ব্বার সংসার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। আমি তিন দিন পূর্ব্বের ঘটনা লিখিতেছি।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। চারিদিকে তামসীর বিকট নৃত্য। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর পথঘাট প্রকাণ্ড সৌধমালা সবই সেই মহান্ধকার কবলে কিয়ৎকালের জন্য লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি জাহ্নবীর বালুকাময় সৈকতে বসিয়া সেই গভীর নিশীথে ঘুমন্ত নিশীথ শোভা দেখিতেছিলাম। অদূর প্রবাহিত জাহ্নবীর চল্ চল্ কল্ কল্ শব্দ, সন্ সন্ প্রবাহী—নৈশ সমীরণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। নৌকামধ্যে মাঝিরা বাজখাঁই আওয়াজে সংগীত বন্ধ করিয়াছে, ঘাটের চত্বরের উপর কুকুরেরা চীৎকার বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে। জগদ্বারে জাগিয়া আছে কেবল অন্ধকারময় প্রকৃতি, আর স্থির তরঙ্গময় নদী প্রবাহ।

সহসা অদূরে আমি কাহারও সাবধান বিন্যস্ত পদশব্দ পাইলাম। আমি স্থির করিতে পারিলাম না যে কে এই ভয়ানক নিশীথে নদীকূলে বিচরণ করিতেছে। অস্ফুট নক্ষত্রালোকে—গতি ভঙ্গী দেখিয়া যতদূর বুঝিলাম তাহাতে বোধ হইল নিশাবিহারিণী—কোন স্ত্রীলোক।

সিন্ধিয়াঘাটের পার্শ্বে সূর্য্যমল শেঠীর ঘাট। দেখিলাম—সেই অন্ধকারবেষ্টিত চলন্তমূর্ত্তি ঘাটের সোপানের উপর উঠিতে লাগিল। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে অতি শীঘ্র শেঠী ঘাটে যাইতে হইলে গঙ্গার গর্ভ দিয়া না গেলে কোন উপায় নাই। তত দ্রুত যাইবারও প্রয়োজন তখন বোধ করি নাই। এখন বুঝিতেছি সেরূপ ইচ্ছা হইলে ভালই হইত। কিন্তু বিধিলিপি, কর্ম্মফল, কেহই খণ্ডন করিতে পারে না।

রাস্তায় উঠিয়া সহরের মধ্য দিয়া ঘাটে পৌঁছিলাম। আমি প্রথম সোপানের উপর দাঁড়াইয়া—এবং সেই নিশাবিহারিণী আমার পদনিম্নস্থ কুড়িটী সিঁড়ির নিম্নে। পাছে সে জানিতে পারে, কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে, তজ্জন্য আমি ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

সহসা নৈশান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থির নিস্তব্ধতাকে মথিত করিয়া “মাগো! এই শব্দ আমার কাণে পৌছিল। তৎপর-ক্ষণেই জলমধ্যে

খানিকক্ষণ পরে একজন মাজী নৌকার নীচে হইতে চেঁচাইয়া উঠিল। বলিল "লাস্" পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বড় ভারি—একলা তুলিতে পারিতেছিনা!

আর ও পাঁচ ছয় জন তখনই সেই খানে লাফাইয়া পড়িয়া ধরাধরি করিয়া একটী দেহ নৌকার উপর তুলিল।

আমি সর্ব্ব প্রথমে আলোকে, জলমগ্না স্ত্রীলোক-টীর মুখ চোখ্ পরীক্ষা করিলাম, দেখিলাম তখনও ক্ষীণ শ্বাস আছে। তাহার আর্দ্র বস্ত্র তাহাকে পরাইয়া দিলাম। মাজিদের একজনকে বলিলাম শীঘ্র আগুণ কর। আমার পরিচিত লোকটীকে বলিলাম শীঘ্র নৌকা বাহিয়া রামনগরের রাজার ঘাটে লইয়া যাও।

নৌকায় যাহা কিছু উপস্থিতকর্ত্তব্য তাহা করা হইল। রামনগরে আমার এক শিষ্য ছিল। তাহার বাটীতে গিয়া সেই গভীর রাত্রে দ্বার ঠেলাঠেলি করিলাম। সমস্ত কথা তাহাকে সংক্ষেপে বলিয়া, স্ত্রীলোকটীকে অন্তঃপুরে পাঠাই-লাম। নিজের কতকগুলি ঔষধ পত্র জানা ছিল তদ্দারা রোগীর চেতনা সম্পাদন করিলাম।

রোগীর চেতনা হইল বটে, পুর্ণজ্ঞান হইল না। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। রাত্রে জ্বরের বেগ বড় বাড়িল। প্রভাতে জ্বর কম কিন্তু রোগী বড় দুর্ব্বল—তখন দেখিলাম বেশ জ্ঞানের সহিত কথা কহিতেছে। আমায় বলিল "বাবা! আপনি আমায় উদ্ধার করিয়া ভাল করেন নাই। এ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করিবেন। আমার শেষ একটী অনুরোধ—আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে।

আমি বলিলাম—"বল মা! তোমার যাহা ইচ্ছা, সম্ভব হইলে তখনি তাহা পুর্ণ হইবে।"

রমণী বলল—"আমার অঞ্চলে একখানি পত্র আছে যদি নষ্ট না হইয়া থাকে তবে—তাহাতে আপনি আমার শোচনীয় জীবনের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিবেন। আমার স্বামী এখন কাশীতে। তাঁহাকে ভাল করিয়া না দেখিলে, তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া পদধুলি দিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা না করিলে, আমার মৃত্যু হইবে না। নিশ্চয় জানিবেন—এই জ্বর আমার জীবনের শেষ স্তিমিত-প্রভা নির্ব্বাপিত করিয়া দিবে। আমি বেশ বুঝিতেছি, আপনি যদিও আমায় গঙ্গাগর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সহস্র চিকিৎসাতে এই রোগ হইতে আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমার স্বামীকে একবার এই খানে লইয়া আসুন। তাঁহার ঠিকানা এই পত্রেই লেখা আছে।

আমি তৎক্ষণাৎ গৈরিক-উত্তরীয় গ্রহণ করিলাম। যাইতে উদ্যত, এমন সময়ে ইন্দু-মতী আমায় ডাকিয়া বলিল—"বাবা! তাঁহাকে এখানে আনিবার পূর্ব্বে আমার জীবনের সমস্ত কথা বলিবেন। আমার অঞ্চলের পত্রে সবই আছে।"

আমি সহরে গেলাম—বাড়ীর সন্ধান করিতে বেশী কষ্ট হইল না। রামশরণকেও সহজে পাইলাম। আমার কথা শুনিয়াই রামশরণ—বলিল—"চলুন—ইন্দু কোথায়? দেখিয়া আসি। আমি স্বহস্তেই প্রতিমা-বিসর্জ্জন করিব।" আমি দ্রুতপদে রামশরণকে লইয়া নৌকায় উঠিলাম।

নৌকায় উঠিয়া বলিলাম—"রামশরণ তুমি

আমার পুত্র-স্থানীয়। ইন্দুমতী আমার কন্যা-স্থানীয়। আমি সংসার বিরাগী উদাসীন। কিন্তু ইন্দুকে জল হইতে তুলিয়া অবধি, ভগবান আবার জানি না—কি ছলনায় পুনরায় সংসারে লিপ্ত করিতেছেন। বৎস! ইন্দুর সম্বন্ধে আমি যে প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছি এবং গত রাত্রে ইন্দু, বিকারের মুখে যে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা তুমি শুনিলে বোধ হয়, অশ্রু সংবরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।”

“ইন্দুর জীবনের সমস্ত কথা সে আজ আমায় খুলিয়া বলিয়াছে। যে দিন সে আত্মহত্যা করিতে যায়, সে দিন তাহার আঁচলে একখানি পত্র বাঁধা ছিল। ইন্দুর অজ্ঞান অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাইবার জন্য তাহা আমি পড়িয়াছি। এই সময়ের মধ্যে ইন্দুকে পরীক্ষা দ্বারা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস সে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা। গৃহত্যাগিনী হইলেও কলঙ্কিনী নহে।

“তাহার গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা তুমি জাননা। শুনিলেই বুঝিবে, ইন্দু কেন গৃহত্যাগ করিয়াছিল। ইন্দুর স্বর্গীয় মাতার সম্বন্ধে একটা ধড়িবাজ লোক, বৃথা কলঙ্ক প্রকাশ করিয়া তোমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল তাহা তুমি জান। সে ঘটনা—তোমার ভগিনী ইচ্ছাময়ী, পরদার অন্তরালে থাকিয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতেই দুর্ব্বলা স্ত্রীপ্রবৃত্তি বশে, সময়ে সময়ে ইচ্ছাময়ী এই কথা তুলিয়া ইন্দুকে বড় যন্ত্রণা দিত। স্বামীগৃহে স্ত্রীলোকে সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মাতা পিতার অপবাদ তাহার পক্ষে বড় অসহ্য। ইন্দু সকল কথা তোমায় বলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি ভগিনীকে যেরূপ ভালবাস, তাহাতে তাহার অভিযোগে আরও নূতন লাঞ্ছনার সৃষ্টি করিবে জানিয়া, সে তোমায় কিছু বলে নাই।

ইন্দুমতীর এক দূরসম্পর্কীয় মাতুল পুত্র তাহাদের বাটীতে মানুষ হইয়াছিল। ইন্দু—লাঞ্ছনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে গোপনে পত্র লিখিয়া তাহাকে আনাইল এবং সেই দিনই গভীর নিশীথে তাহার পরামর্শক্রমে গৃহত্যাগ করিয়া তাহাদের বাটীতে দিনকতক বাস করিতে মনস্থ করিল।

লোকে সরল বুদ্ধিতে যে কাজ করে—সহজ বিশ্বাসে যে কাজ করে, সংসারের ঘটনাচক্র এমনই কুটিল যে তাহাকে—প্রকারান্তরে বক্র করিয়া দেয়। পুরুষের যখন এরূপ শতশত ভ্রম ঘটিতে পারে—স্ত্রীলোকের পক্ষে তখন তাহা খুবই সম্ভব ও সহজ।

ইন্দুর মাতুলপুত্রের নাম বিধুভূষণ। বিধুভূষণের চীনাবাজারে একটী গ্লাস-ওয়ারের ক্ষুদ্র দোকান ছিল। সে কলিকাতায় একটী ছোট বাড়ী কিনিয়াছিল। বাড়ীতে প্রায়ই অন্য ভাড়াটে থাকিত, বিধুভূষণ তাহার বাহিরের কক্ষ দখল করিয়া একরকমে চালাইয়াদিত। কোন কারণ বশতঃ ভাড়াটিয়া জুটে নাই—কাজেই নিজের স্ত্রী এক মাতৃস্বসা ও ইন্দুমতীকে লইয়া বিধুভূষণ কলিকাতায় আসিল। ইন্দুমতী তোমার গৃহত্যাগ করিবার ৭ দিন পরে এই ঘটনা ঘটে।

তুমি জানিতে না—যে ইন্দুমতীর এই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বিধুভূষণ বর্ত্তমান। বিবাহের

পর তুমি কখনও শ্বশুর বাড়ী যাও নাই। ইন্দু কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইল। তাহার অনেকগুলি কারণও ঘটিয়াছিল।

বিধুভূষণ কি চরিত্রের লোক, ইন্দু তাহা প্রথমে জানিতে পারে নাই। বাল্যসঙ্গী দরিদ্র—বিধুভূষণকে সে আজও সেইরূপ সচ্চরিত্র বলিয়াই জানিত। সম্পর্কে বাধে না বলিয়া এক সময়ে ইন্দুর মাতা বিধুভূষণের সহিত ইন্দুর বিবাহ দিবার কথা পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন।

ইন্দু কলিকাতায় আসিবার ৫।৭ দিন পরে, একদিন গভীর রাত্রে মদিরা-উন্মত্ত হইয়া বিধুভূষণ বাটীতে ফিরিয়া আসিল। বালিকা স্ত্রীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াই বিধু ক্ষান্ত হইল না। নেশার ঝোঁকে ইন্দুকে অনেক অশ্রাব্য ও অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি দিল। মাতালের অসাধ্য কিছুই নাই, সে পশুর অপেক্ষা হীনতর প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া ইন্দু সেই দিন গভীর রাত্রে বিধুভূষণের গৃহত্যাগ করিল।

অনাথিনী স্বকর্ম্ম-ফলভোগিনী—আশ্রয় হীনা হইয়া সমস্ত রাত্রি পথে পথে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে জগন্নাথ-ঘাটে আশ্রয় লয়। এই ঘাটেই, কাশীর সর্ব্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহার পরের ঘটনা সমস্তই তুমি সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীতে শুনিয়াছ, পুনরায় বলিবার আবশ্যকতা নাই। এখন তুমি ইন্দুমতীকে ক্ষমা করিতে পার কি না? এবং যদি সে বাঁচিয়া উঠে, তবে তাহাকে গৃহে লইতে সম্মত আছ কিনা?

রামশরণ নির্ব্বাত—নিষ্কম্প-সমুদ্রের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। তাহার বিগু-গণ্ড-প্রবাহী অশ্রু ধারাই তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিল। রামশরণ কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিল—"ইন্দু—ইন্দু কি বাঁচিবে?"

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। আমরা নির্দ্দিষ্ট বাটীতে প্রবেশ করিলাম।

বেশী কথা বলা আমার অভ্যাস নহে। তবে যে এত বলিয়া ফেলিলাম, সেটা কেবল ঘটনাচক্রে পড়িয়া। জোর করিয়া বাধ্য হইয়া কোন কথা বলিতে হইলে, অনেক সময়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হয়। এ পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি রামশরণ সে দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ইন্দুকে ঔষধ পত্র খাওয়াইল, নিজে জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল না। অত যত্ন, অত স্নেহ, অত মনোযোগ, অন্য স্বামীতে নিরপরাধিনী ও অনুরক্তা স্ত্রীর প্রতি প্রকাশ করিতে পারে কি না তাহা জানি না। রামশরণ এই পথভ্রষ্টা গৃহ পরিত্যক্তা পত্নীর প্রতি এরূপ উদারতা প্রকাশ করিল, যে তাহা অনেক সংযমী মহাপুরুষের পক্ষে—সেই প্রকারে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করা নিতান্ত অসম্ভব।

কিন্তু নিয়তি-স্রোত অনন্ত, অব্যাহত, অপরিবর্ত্তনীয়, অপরিরোধনীয়। আজীবন বসিয়া বসিয়া নিয়তির চরণে অশ্রুপাত কর, অভিধানের সমস্ত করুণবাক্যগুলি বাছিয়া লইয়া—মর্ম্মদাহের প্রবল উচ্ছ্বাসে সেইগুলি সিক্ত করিয়া নিয়তির কর্ণ কুহরে প্রতি ধ্বনি কর, সে তোমার কথা শুনিবে না। সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত দ্যুতিময় রত্নরাজি যত পারে তাহার পথের সম্মুখে ধরিয়া রাখ, কিছুতেই তাহাকে রোধ করিতে পারিবে না। করুণারঅশ্রু বিনয়, অর্থ শক্তি, সামর্থ্য

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও কৌলিন্য কিছুতেই তাহার পথরোধ করিতে পারিবে না। মনুষ্যের চেষ্টা অশ্রু, হাহুতাশ, ক্রন্দন, অভিশাপ—নির্ব্বেদ তাঁহার প্রচণ্ড তরঙ্গমুখে বালির বাঁধ মাত্র। জগতের সৃষ্টি হইতে যাহা হইতেছে, চিরকালই তাহা হইবে। কর্ম্ম, বিধাতা, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বাঁধ ভাঙ্গিতে যাহারা মনোমধ্যে তিল মাত্র স্পর্দ্ধা করে, তাহারা বাতুল মাত্র!

সেই রাত্রে রামশরণের চরণতলে—মাথা রাখিয়া, ইন্দুমতী প্রাণ ত্যাগ করিল। ইন্দুর শেষ কথা—"স্বামিন্! প্রভু! ক্ষমা—চির বিদায়। পাপীয়সীর পাপমার্জ্জনা—অনন্ত নরক—আ—শী—র্ব্বাদ—ক—" আর কথা বাহির হইল না। দীপ নির্ব্বাণ হইল!

অনেক আজন্মব্রতপরায়ণা, পতিপ্রেমোদ্ভ্রান্তা পতিগতপ্রাণা, কুলকামিনী মৃত্যুর সময়ে সে সৌভাগ্য পায় না—গৃহপরিত্যক্তা, সমাজ চক্ষে পাপকলুষিতা—স্বামীর পদযুগলে মাথা রাখিয়া, সে অভীপ্সিত সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া অনায়াসে দিব্যধামে চলিয়া গেল!

ইন্দুর সে মুখও আমি দেখিয়াছি। আজও ভুলি নাই। তাহা স্থির, প্রশান্ত, উজ্জ্বলিত, প্রফুল্ল, বিস্ফারিত, প্রীতি-প্রসাদিত। চক্ষু অশ্রুহীন পক্ষ্ম নিমেষহীন, মুখ বিষণ্ণতাহীন, কি অতুলনীয় মুখজ্যোতিঃ—কি এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ—কি এক অপূর্ব্বপূর্ণতা—তাহার শব মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল!

ইন্দুর দেহ—মণিকর্ণিকায় জ্বলন্ত চিতাবক্ষে ভস্মীভূত হইল। সেই সুন্দর, সুগঠিত, সুডৌল কাঞ্চন-বিনিন্দিত নবনীত-কোমল সুগঠিত অতুল-রূপ সমন্বিত দেহযষ্টি ধীরে ধীরে, বৈশ্বানরের ভৌতিক মায়ায় কে জানে, কোথায়—অদৃশ্য হইল! ধূঃ—ধূঃ—ধূঃ! অই দেখ জলন্ত চিতা জ্বলিতেছে! ইন্দু যে গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল, সেই গঙ্গায় তাহার চিতা ভস্ম—ধৌত হইয়া যাইতেছে। আর দেখ—চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কে এক জন রুক্ষকেশ, উত্তরীয় হীন, বিকৃত-বদন লোহিত চক্ষু স্থিরদৃষ্টি দীর্ঘাকার লোক, নিমেষ শূন্য নয়নে—সেই জলন্ত চিতার নিষ্ঠুর কার্য্য উন্মাদের ন্যায় দেখিতেছে। চিতার শেষ স্ফুলিঙ্গ নিভিল। শবদাহ করিয়া কে কোথা চলিয়া গেল। দেখিলাম রামশরণ তখনও সেই ভীষণ স্থানে দাঁড়াইয়া।

আমি বলিলাম "বৎস! এ সংসারে এক মহাপ্রহেলিকা—"এই ছিল এই নাই।" শ্মশানে—চিত্তসংযম, চিত্তসংযমে চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধিতে যোগ ও যোগ হইতে ভগবৎ-ভক্তি লাভ হয়। বৎস! গৃহে ফিরিয়া চল! রামশরণ বিকৃত কণ্ঠে বলিল—

আমার গৃহ কোথায়!!

সে বিকৃত স্বরে আমার ন্যায় সন্ন্যাসীরও হৃৎকম্প হইল। আমি বলিলাম—"গৃহে না যাও বৎস! আমার সঙ্গে এস!"

রামশরণ বলিল—"আমার ন্যায় হতভাগার লোকালয়েও স্থান নাই। নরক আমার উপযুক্ত আশ্রয়-স্থল। আমি আর এ কলুষিত নিশ্বাসে, আপনার পবিত্র সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করিব না। প্রভো! আপনি সংসার-বিরাগী আমার হৃদয়ে কি হইতেছে, তাহা আপনি কি বুঝিবেন? আমি নিজ হস্তে যে পুষ্পটী বৃন্তচ্যুত

করিয়া ছিলাম, আজ তাহাকে অনন্ত কালের সাক্ষী, এই পবিত্র মণিকর্ণিকায় ভস্মীভূত করিলাম। আমায় কিছুকাল এই নির্জ্জনে স্থানে থাকিতে দিন, প্রভাতে যাহা হয় হইবে।”

প্রভাতের ও আর বিলম্ব নাই। শীতল হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাপিয়া আওয়াজ দিতেছে, মাঝীরা নৌকা খুলিয়াছে, পূর্ব্বাকাশ—অন্ধকারকলঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছে। বিশ্বনাথের মঙ্গল-আরতির ঘণ্টানিনাদ সেই প্রভাতে সমীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি প্রাতঃস্নানের জন্য অদূরে ঘাটে আসিলাম। রামশরণকে বলিলাম—“বৎস! আমি ঘাটে রহিলাম, আমার কাছে আসিও।”

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল, তবু রামশরণ ফেরে না। আমি তখন মনিকর্ণিকার শবদাহ ঘাটে পুনরায় গেলাম। সেখানে তাহাকে পাইলাম না। একজন বলিল—যে লোক দাঁড়াইয়াছিল সে এই নদীতীরে উন্মাদের ন্যায় বরাবর উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে।

রামশরণের বন্ধুকে খপর দিলাম। সকল স্থানই ভাল করিয়া অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আজও পর্য্যন্তও যায় নাই। এই অদ্ভুত প্রহেলিকা আজও আমার চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ ঘটনাবৎ উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলিতেছে।

সমাপ্ত।

সাংখ্য স্বরলিপি।

স্বর সঙ্করণ।

স্বরমিশ্রণ বা স্বরমিশ্রকে আমরা স্বরসঙ্করণ স্বরসঙ্কর এই নূতন নামে ও অভিহিত করিতে পারি। স্বরসঙ্কর কথাটী ‘স্বরমিশ্র’ কথাপেক্ষা যেন কিঞ্চিৎ মধুর শোনায়।

সঙ্কর অর্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থের একত্রাবস্থান। যথা, বর্ণসঙ্কর বলিলে যেমন বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ বুঝায় সেইরূপ স্বরবর্ণসঙ্কর বলিলে পরস্পর বিভিন্ন স্বরবর্ণ সমূহের একত্র মিশ্রণ বুঝায়।

স্বর সঙ্কলন।

অঙ্কশাস্ত্রে সঙ্কলন বলিলে যেমন অঙ্কযোগ বুঝায় সেইরূপ সাংখ্য স্বরলিপিতে স্বর সঙ্কলন কথাটীতে স্বরযোগকেই বুঝাইবে।

সঙ্করণ ও সঙ্কলন।

স্বরসঙ্করণ ও স্বরসঙ্কলন এই কথাদ্বয় হইতে ‘স্বর’ কথাটী বাদ দিয়া আমরা সংক্ষেপে সঙ্করণ ও সঙ্কলন এরূপও ব্যবহার করিতে পারি। এইরূপে সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরবিয়োগকে আমরা

স্বরব্যবকলন বা শুদ্ধ 'ব্যবকলন' কথাটী দ্বারাও ব্যক্ত করিতে পারি।

ছেদ যোগের অদৃশ্যভাব।

যেমন গ্রহদল এই আকাশে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়াও যুক্ত ভাবে আছে, শূন্যে অদৃশ্যভাবে তাহদের যোগসূত্র বিদ্যমান; সেই রূপ স্বরগ্রহদলও পরস্পর বিযুক্তভাবে থাকিলেও অদৃশ্য ভাবে তাহারা যোগসূত্রে আবদ্ধ। সাংখ্যস্বরলিপিতে সাধারণতঃ স্বরগুলির এই অদৃশ্য যোগসূত্রের নামই ছেদযোগ। ইহা বাহিরে যেন বিয়োগ রূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া ইহাকে বিয়োগ নামেও অভিহিত করা যায়। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটী বিশেষ যোগ। যেমন বায়ু থাকাতেই আমাদের আয়ুক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়, সেইরূপ এই ছেদযোগ বা বিয়োগ থাকাতেই অন্যান্য যোগক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়। এই হেতু ছেদযোগকে বিয়োগ অর্থে বিশিষ্ট যোগ-বাচক রূপেও আখ্যাত করা যাইতে পারে।

"ডাঁ" চিহ্ন।

ডাহিন বা "ডান" হাত বা ডাহিন দিকের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন=ডাঁ।

"বাঁ" চিহ্ন।

বাম হাত বা বাম দিক বুঝাইবার সংক্ষিপ্ত চিহ্ন="বাঁ"।

সাংখ্য স্বরলিপিতে স্বরসঙ্করণের এক প্রকার প্রণালী।

সাংখ্য স্বরলিপিতে প্রায় সকল বিষয়েই মূল প্রাণ "এক" (১) রক্ষা করিয়া তাহার দুই দিক রক্ষা করা হয়। স্বর ও গুণনের বেলায় ও তাই। একটী স্বরকে মধ্য স্বরিত রূপে স্থির করিয়া বা স্থাপন পূর্ব্বক সেইটাকে ১ চিহ্নিত করণানন্তর তার, মন্দ্র বা উদাত্ত অনুদাত্ত অংশে কার্য্য করিতে হইবে।

যেমন এক ঈশ্বর, আর তাঁহা হইতে সৃষ্টিতে পুরুষ প্রকৃতি—দক্ষিণ বাম, এইরূপ দুই বিচিত্র ভাব দুই বিচিত্র দিক নামিয়াছে সেইরূপ, সাংখ্য স্বরলিপিতেও মূল একভাব হইতে বিভিন্ন ভাবে গমন করা হয়। মূল সপ্তক, মূল মাত্রা সব 'এক' তাহাদের প্রত্যেকের চিহ্ন ১; তাহার পর সেই ১ চিহ্নিত সপ্তক, মাত্রা হইতে উচ্চ ও নিম্ন সপ্তক, দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রা (গুণিত ও অংশ মাত্রা) জন্ম লাভ করে ও মূল ১ চিহ্ন হইতে রসাকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে চিহ্নিত করে। এইরূপে, স্বরসঙ্করণের বেলায়ও মূল একটী স্বর ধরিতে হইবে, তাহার চিহ্ন হইবে ১; সেই ১ চিহ্নিত স্বরকে মধ্যে রাখিয়া তাহার দুইধারে (তার ও মন্দ্র অথবা ঐ উদাত্ত ও অনুদাত্ত অংশে) কার্য্য করিতে হইবে অর্থাৎ পত্রোল্লিখিত স্বরের ডান ও বাঁদিকে গমন করিতে হইবে। গমন করিবার কালে শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে বিকৃত স্বর সমূহকেও বাহিয়া বা স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে; তাহাদের বাদ দিলে চলিবে না। মূল ১ চিহ্নিত স্বর হইতে ক্রমগতিতে তাহাদের লইয়া অতিক্রান্ত সংখ্যা গণনা করিতে হইবে। যে স্বরে গণনার গতি নিবৃত্ত করিয়া থামিব সেখানকার স্বরটী স্বরসঙ্করণের কাজে লাগাইতে হইবে। অর্থাৎ ভাবটী এই:—

মূল ১ চিহ্নিত স্বর হইতে ডান দিকে গমন

করিয়া ডান দিকে যে স্বরে গণনা থামিবে সেইস্বর এবং বাঁদিকে গমন করিয়া যে স্বরে গণনা থামিবে সেইস্বর, এই দুই স্বর লইয়া, তাহাদিগকে গুণিত করিয়া তাহাদের স্বর-সঙ্করণ সাধন করিতে হইবে। মূল ১ চিহ্নিত স্বরটীকেও ইচ্ছানুসারে তাহাদের সহিত গুণিত করা যায়। আসলে ডান ও বাঁদিকের গণনার সীমাস্থিত যে সংখ্যাদ্বয়, তাহাদের গুণন বা সঙ্করণ লইয়াই একটী নিয়ম-ফল উৎপন্ন হইবে। মূল স্বরটী অর্থাৎ স্বরিৎ স্বরটীর যে ১ সংখ্যা তাহা-দের সঙ্গে গুণ কর, তাহাতে সেই নিয়মফলসংখ্যা (সংক্ষেপে ফলসংখ্যার) কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না অথচ তাহাতে আরেকটী ও স্বর লাভ হইবে। সেই ফলসংখ্যা-সঙ্কেতে ডান, বাঁ ও মধ্যটীকে লইয়া স্বরত্রয়ের গুণনও জানিতে পারা যাইবে।

সাংখ্য স্বরলিপিতে ১ চিহ্ন যেন নির্লিপ্ত অথচ লিপ্তভাবে কার্য্য করে। ঐ মূল এক-চিহ্নিত স্বরকে লইয়াই ডান ও বাঁদিকের কার্য্য চলে, তথাপি যেন উহা স্বতন্ত্রভাবেও উহ্যভাবে অবস্থান করে। সঙ্করণ-নিয়মসূত্র ও তাহার সংক্ষেপ দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। যথা—

একটী নিয়মসূত্র। বাঁ'য়ে পাঁচ ডাঁ'য়ে চার, গুণন মধুর তার।

অর্থাৎ—

সংক্ষেপেঃ—

৫ × ১ × ৪

অর্থাৎ—

এই সূত্র অনুসারে যে কোন স্বরকে ১ রূপে ধরিয়া তাহার ডানদিকে স্বর গণনায় বাহিয়া গিয়া (স্মরণে থাকে, গণনায় বিকৃত স্বরকে বাদ দিয়া গেলে হইবে না) চতুর্থ স্বরে অর্থাৎ ৪এ গিয়া দাঁড়ায় আর বাঁদিকেও যদি গমন করিয়া পঞ্চম স্বরে অর্থাৎ ৫এ গিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে একটী ৫ × ৪ বা ৫ × ১ × ৪এ একটী মধুর স্বরসঙ্কর জন্ম লাভ করে।

স্বরগুণন চিহ্ন।

স্বরগুণনের চিহ্ন = × ইহার কাজ স্বর-সমূহকে গুণিত করা—স্বরসমূহকে একসাথ বা ' এক্সা ' করা। এই ' এক্সা ' করে, আর দেখিতে গুণন চিহ্নের অনুরূপ বলিয়া গুণন চিহ্নকে আমরা এক কথায় X চিহ্ন বলিয়া অভিহিত করিতে পারিব এবং তাহার স্থানে ব্যবহার করিতেও পারিব।

শৃঙ্খল চিহ্ন।

শৃঙ্খল চিহ্ন = দিগ্‌বলয়বর্ত্তীভাবে অবস্থিত ' এস্ ' (S) চিহ্ন। অর্থাৎ ၯ চিহ্ন ইহা স্বর-গুলির মধ্যে স্থাপিত হইয়া তাহাদিগকে শ্রেণী-বদ্ধ করে। স্বরগুলিকে কোনরূপে সাধারণতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এই চিহ্ন ছন্দলয়ের পরি-পোষক। ইহা সঙ্গীতে অনিয়মও বিশৃঙ্খলতার বিরোধী চিহ্ন।

স্বর রেখা।*

খণ্ডমাত্রিক স্বর ছাড়া অন্যান্য স্বর স্বর রেখার ভাব ধারণ করে।

---

* পূর্ব্ববারের সমীরণে লিপিকরপ্রমাদে এই ভুল রহিয়া গিয়াছে দেখিলাম, তাহাতে ছিল।
খণ্ডমাত্রিক স্বর স্বররেখার ভাব ধারণ করে।

জয়দেবের গান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(স্তু) ঃ— গা গা মা। পা২। ম্পা২। প্ধা পা পা।
(স্তু) ঃ— ক্ষি তি —। রু। তি। বি পু ল।

২.................................
গা মা পা২। পা ধা২। ধ্সা না। সা সা। পা ধা
ত — রে। তি —। ষ্ঠ তি। ত ব। পৃ —

২............ ....
ধান্বি পা২। প্সা২। সা সান্বীং। প্সান্বীং সা সা।
— —। ষ্ঠে। — —। ধ র —।

ধ্নি২ পা২। মা পা২। ম্গা২। গাঁ২। গাঁ৩। গাঁমা২।
ণী ধা। র ণ। কি। ণ। চ। ক্র।

মা রে। রে২ সা২। সা২। + সা২। (ধ্রু)ঃ—। গা৩।
গ —। রি —। ষ্ঠে। —। (ধ্রু)ঃ—। কে।

২...
পা ৴মা। ধা পা। প্সা৩। + সা২। সা সা।
শ —। ব —। —। —। ধৃ ত।

....
২
সরেঁ২ সা২ নি২। সা২। নি২ ধা২ নি। "ধ্পা৩" বা "ধ্৴মা২
২..................
মী — —। —। ন — শ। রী রী
পা"। পা২। + পা পা। প্ধা৩। ৴মা২। গা২। গা২
— র। — জ। য়। জ। গ। দী

গা২ রেঁ২। গা২। রেঁ২। সা৩। + সা২। + সা২॥
— —। শ। হ। রে। —। —॥
(স্থা—পু) সাঃ
(স্থা—পু) প্র

অবশিষ্ট সমুদয় অংশে ধ্রবটী এইরূপই গাহিতে হইবে। ধ্রবটী আস্থায়ীর সঙ্গে, প্রত্যেক অন্তরার সঙ্গে পৃথকভাবে গাহিতে হইবে।

গীতের মধ্যস্থিত অবশিষ্ট অন্তরা গীতের। ২। সংখ্যাস্থিত 'ক্ষিতিরতি—' নামক অন্তরার ন্যায়ই গাহিতে হইবে।

বরাহপুরাণ।

রাজা প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! অন্য জন্মে আপনি কি প্রকার ছিলেন এবং কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন কহিতে আজ্ঞা হউক আমার মহৎ কৌতুহল হইতেছে।

নারদ কহিলেন হে রাজেন্দ্র! আমি সাবিত্রীর বাক্যে সেই দেব সরোবরে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ আমার সহস্র জন্মের বিবরণ স্মরণ হইয়াছিল এক্ষণে অন্য জন্মের বিবরণ বলি শ্রবণ কর। হে রাজন্! অবন্তী নামে যে এক দেশ আছে তথায় আমি পূর্ব্বজন্মে স্বারস্বত নামে ব্রাহ্মণ ছিলাম বেদ বেদান্তে আমার বিলক্ষণ বিদ্যা ছিল; অপর আমার বহুতর ভৃত্য ও অনেক পরিবার এবং প্রচুর ধন ধান্য ছিল। ঐ যুগে প্রায় কোন মানবই নির্ব্বোধ ছিল না আমিও বুদ্ধিমান থাকাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে মনোমধ্যে বিবেচনা করিলাম আমার এই যে সকল স্ত্রী পুত্র ধন ধান্য ইত্যাদি রহিয়াছে এ সকলই অনিত্য ও অচিরস্থায়ী ইহাতে আমার কি হইবেক? অতএব পুত্রগণের প্রতি এই সকল সমর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে যাই। এই প্রকার চিন্তা করিয়া প্রথমতঃ বিবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা ভগবন্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলাম, এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণকে ও যাগযজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করিলাম। তদনন্তর গৃহ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক তপস্যার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সারস্বত সরোবর, যাহার নাম পুষ্কর তীর্থ, তথায় গিয়া পুরাণপুরুষ ভগবান হরির আরাধনায় রতহইলাম, এবং নিরন্তর নারায়ণ এই নাম জপ করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মপারময় যে স্তব তাহা জপ করত আমি সর্ব্বদা ভগবানের স্তব করিতাম। হে রাজেন্দ্র, আমার এই সকল আচরণে তুষ্ট হইয়া ভগবান বিষ্ণু অচিরেই আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মণ, ব্রহ্ম পারস্তোত্র কিদৃশ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, হে দেবর্ষে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

নারদ কহিলেন ভগবান বিষ্ণু অমৃতস্বরূপ, পুরাণপুরুষ পরম, পার, অপরিচ্ছিন্ন বীর্য্যবান, আমি তাহাকে নমস্কার করি। তিনি নিত্য সকলের আধার এবং পরম পদার্থ সকলের পরম অয়ন। অপর তিনি পুরাতন পুরুষ, তাঁহার

প্রতিমা নাই। তিনি পর ও অপর এবং সকলের পারগামী আর অতিশয় উগ্রতেজা। অপিচ তাঁহার বুদ্ধি অতি গম্ভীর, তিনি সকলের প্রধান সকলের প্রভু স্বয়ং হরি, অতএব আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

অপিচ তিনি পরাপর পরম প্রধান, পর সকলের আস্পদ, এবং বিমল ও পরম শুদ্ধ। অপর তিনি পর হইতে পর এবং পর সকলের ঈশ্বর ও অতিশয় বিশুদ্ধভাব। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকেই প্রণাম করি।

তিনি পূর্ব্বে এই পুর (শরীর) সকল সৃষ্টি করিয়া পরে এ সকলে অধিষ্ঠান করিয়া থাকাতে তাঁহাকে প্রধান পুরুষ বলা যায়। সকল লোক মধ্যে তাহার পরম খ্যাতি তিনি সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁহার সন্নিধানে আমি শরণ প্রার্থনা করি।

অপর সেই বিষ্ণু পরমপার, এবং অপারস্বরূপ আর তিনি নীতি জ্ঞানের প্রধান তাঁহাতে ধৃতি ক্ষমা ও শান্তি সদাই বিরাজমান অতএব তাঁহাকে মহানুভব জানিয়া আমি সদা স্তব করি।

তাঁহার সহস্র মস্তক, অনন্তচরণ, এবং অনন্ত বাহু। অপর চন্দ্র ও সূর্য্য এই দুই তাঁহার দুই চক্ষু। তিনি ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ। আর তিনি ক্ষীর সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন। অতএব সেই অমৃত ও পরেশ স্বরূপ ভগবান নারায়ণকে আমি স্তব করি।

তিনি ত্রিবেদ দ্বারা গম্য, এবং সেই বেদত্রয়ই তাঁহার এক মূর্ত্তি অপর তিনি গুরুত্রয়ে অবস্থিত এবং গায়ত্র্যাদি তিন প্রকার অগ্নি স্বরূপ। আর তিন তত্ত্ব দ্বারা লক্ষ্য হয়েন। তাঁহার তিন যুগ ও তিন নয়ন। তিনি স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

যাহার শরীর সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পীতবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ, আমি সেই কৃতাত্মা ভগবান নারায়ণকে প্রণাম করি। যাঁহার বদন হইতে বিপ্রবর্ণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য, এবং পাদাগ্র হইতে শূদ্রজাতি সৃষ্ট হয় সেই বিশ্বমূর্ত্তি ভগবান নারায়ণকে আমি প্রণাম করি। যিনি পর হইতে পর, এবং সকলের পারগত ও অপ্রমেয় আর বুদ্ধির গতিস্বরূপ, অপর যাঁহার পরিচ্ছেদ নাই, যিনি কার্য্যতঃ কৃষ্ণ অর্থাৎ সকলের আকর্ষক, যাঁহার হস্ত চতুষ্টয়ে গদা অসি, চর্ম্ম ও শঙ্খ বিরাজমান, আমি সেই অপ্রমেয় নারায়ণকে নমস্কার করি।

হে রাজন! ভগবান নারায়ণ এই প্রকারে স্তুত হইলে প্রসন্ন হইয়া আমার প্রত্যক্ষ গোচর হইলেন, এবং মেঘ গম্ভীরবাক্যে বারম্বার কহিতে লাগিলেন, বৎস বর প্রার্থনা কর। আমি তাঁহারই দেহে লীন হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। ভগবান আমার ঐ বাসনা বিদিত হইয়া বলিলেন হে বিপ্র! কিয়ৎকাল যাবৎ ধরামণ্ডলে ভ্রমণ কর, পরে আমাতে লীন হইবে, তদনন্তর ব্রহ্মার সহস্র যুগ গত হইলে পুনরায় তোমার জন্ম হইবে, তখন তুমি নারদ এই নাম পাইবে। হে বিপ্র! নীর শব্দের মর্ম্ম জল, তুমি তাহা সর্ব্বদা পিতৃলোকদিগকে দান করিবে, এই কারণে তোমার নারদ নাম হইবেক।

হে রাজন ভগবান নারায়ণ আমাকে এই

প্রকার কহিয়া তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইলেন। আমিও তাহার পর কলেবর ত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার অঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইলাম। নির্ণীত-কাল পরে পুনরায় আমার উৎপত্তি হইল। অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবস হইলে প্রথমে তিনি দশটী তনয়ের সহিত আমাকে সৃষ্টি করিলেন। হে রাজন! ভগবান ব্রহ্মার যে দিনাদি, তাহাই সকল দেবতা প্রভৃতির সৃষ্টির আদি, ফলতঃ ভগবান ব্রহ্মাই অখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা! হে রাজন! আমার এই প্রকৃত জন্মের বিবরণ বলিলাম বৎস আমি ভগবান নারায়ণের নাম জপ করিয়াই গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব তুমিও বিষ্ণুপরায়ণ হও।

অশ্বশিরা কহিলেন অনুগ্রহ করিয়া আপনারা দুইজনে আমার একটী সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিউন, ঐ সংশয় ছিন্ন হইলেই আমার সকল সংশয় বিনাশ হইবেক। অশ্বশিরা রাজা এই প্রকার কহিলে যোগিবর ধর্ম্মাত্মা মহামুনি কপিল কোমল বচনে তাঁহাকে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজন! তুমি পরম ধার্ম্মিক, তোমার মনে কি সন্দেহ আছে বল, শুনিলেই তোমার অভিলাষানুসারে ছেদন করিয়া দিব।

রাজা কহিলেন ভগবন! কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি জ্ঞান দ্বারা লব্ধ হয়? আমার এই এক সংশয় আছে, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ছেদন করিতে আজ্ঞা হউক।

কপিল কহিলেন হে মহারাজ! পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরকালে ব্রহ্মপুত্র উরভ, যাঁহা হইতে ব্রহ্মার বংশ বৃদ্ধিশীল হয়, তিনি বৃহস্পতিকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক সময়ে বসু ব্রহ্মদর্শন কামনায় তাঁহার সদন গমন করিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে চৈত্ররথ নামে একজন বিদ্যাধরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন এখন ব্রহ্মার অবকাশ আছেত? তাহাতে সেই বিদ্যাধর এই প্রতিবচন দিলেন অদ্য ব্রহ্মার ভবনে দেবতাদের সভা আছে। বসু এতৎ শ্রবণে ব্রহ্মপুরে গমন করিলেন কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া ব্রহ্মাগারের দ্বারেই অধিবেশন করিয়া থাকিলেন। এই সময়ে মহাতপস্বি রৈভ্যের তথায় আগমন হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বসু প্রীত মনে পূজা করত জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গমন হইতেছে!

রৈভ্য কহিলেন রাজন দেবপুরোহিত বৃহস্পতির নিকট আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে তাঁহার সমীপে গমন করিতেছি।

তিনি এই কথা কহিতেছেন ইতিমধ্যে ব্রহ্মার ভবনাভ্যন্তরস্থ দেবসভা ভঙ্গ হইল। দেবতারা নির্গত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহস্পতিও বহির্গত হওয়াতে রৈভ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূজা করিলেন এবং আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

হে মহারাজ, রৈভ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বৃহস্পতি কহিলেন তবে উপবেশন করা যাউক আইস। তাহাতে রৈভ্য ও বসু আসন পরিগ্রহ করিলে বৃহস্পতিও সুখাসীন হইয়া রৈভ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক তদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বৃহস্পতি কহিলেন পুরুষ ভদ্র অথবা অভদ্র

যে কোন কর্ম্ম করে, সমুদায় ভগবান নারায়ণে অর্পণ করিলে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে লুব্ধক ও বিপ্রের এক ইতিহাস শ্রুত আছে।" অত্রি বংশোদ্ভব কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সর্ব্বদা বেদাভ্যাসে রত ও পরমার্থ চিন্তনে তৎপরে থাকিতেন। তাঁহার নাম সংযমন। তিনি একদিন ভাগিরথী স্নানার্থ গমন করিয়া ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন তথায় যূথবদ্ধ বহুসংখ্যক হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছে, এবং অদূরে নিষ্ঠুরক নামে এক ব্যাধ কৃতান্তের তুল্য হস্তে ধনু ধারণ করিয়া বাণ সন্ধান করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ সংহার বাসনায় আসিতেছে। সেই ব্রাহ্মণ ঐ ব্যাধকে মৃগয়ারত দেখিয়া বারণ করিলেন, ভদ্র, জীবহত্যা করিও না।'

ঐ ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্যাধ হাস্য করিল এবং তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল হে দ্বিজবর, আমি পৃথক জীবের হিংসা করি না। পরমাত্মা স্বয়ং এই সকল প্রাণীর দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ আমি এই জ্ঞানই অবিদ্যা, মুমুক্ষু পুরুষেরা অবিদ্যা বিধ্বংস করিতে যত্ন পাইয়া থাকেন। যদিও এই সমস্ত জগতই অবিদ্যার বিলসিত, তথাচ আমি ইত্যাকার যে অহংবুদ্ধি, তাহা অতি ভয়ানক, তাহাতে কদাপি উদ্যত হয় না।

হে রাজন্, সেই বিপ্রেন্দ্র সংযমন ঐ ব্যাধের মুখে এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন, পরে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্র, তুমি এই সকল প্রত্যক্ষ ও হেতুযুক্ত বাক্য কোথা হইতে কহিতেছ?

সেই ব্যাধ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঐ কথায় তাঁহার সাক্ষাতে একটা লৌহময় জাল প্রস্তুত করিয়া তাহার নীচে অগ্নি প্রদান করিল এবং ঐ ব্রাহ্মণকে বলিল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা এই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ তাহার উপদেশানুসারে দারু আহরণ পুরঃসর মুখ মারুত দ্বারা যখন অগ্নি জ্বালিতে বসিলেন তখন সেই ব্যাধ একবার বিশ্রাম করিল। কিন্তু অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবামাত্র সে তন্মধ্যে সেই লৌহময় জাল নিক্ষেপপূর্ব্বক পোড়াইতে আরম্ভ করিল, যদিও সেই অগ্নি একস্থানে ছিল তথাচ ঐ জালের পৃথক্ পৃথক্ লৌহমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহা আলোকরূপে প্রকাশ পাইল। অনন্তর সেই ব্যাধ ঐ ব্রাহ্মণকে বলিল তুমি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লৌহখণ্ডস্থ বহ্নির মধ্যে একটা গ্রহণ কর, দেখ আমি অন্য সকল নির্ব্বাণ করিলে সেটাও নির্ব্বাণ হইবেক। এই কথা বলিয়া এক কলস জল লইয়া অন্য সকল বহ্নির উপরে জল প্রক্ষেপ করিল তাহাতে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় লৌহজালস্থ অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

অনন্তর সেই ব্যাধ ঐ ব্রাহ্মণকে কহিল তুমি যে অগ্নিময় লৌহখণ্ড গ্রহণ করিয়াছ তাহা দাও দেখি, তাহাতে মাংস দগ্ধ করিয়া খাই। এই কথায় সেই বিপ্র যখন সেই লৌহখণ্ডে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন দৃষ্ট হইল মূল নাশ হওয়াতে ঐ অগ্নিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ এতদবলোকনে চমৎকৃত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন ব্যাধ তাঁহাকে কহিতে লাগিল ব্রহ্মণ, এই লৌহজালে এক বহ্নি প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল যেমন মুল অগ্নি বিনষ্ট হওয়াতে ঐ সমস্ত বিনষ্ট হইল তেমনি মূল বিনাশ হইলেই সকলই বিনষ্ট হয়। ফলতঃ প্রকৃতিস্থ যে আত্মা তিনিই সকল ভূতের আশ্রয়, সেই আত্মা হইতে জগতের সৃষ্টি এবং তাঁহাতেই সমুদায় বিলীন হইয়া থাকে। অতএব এই সকল হরিণ যদি আমা কর্ত্তৃক নিহত হয় ইহাদের আত্মা তাঁহাতেই গিয়া বিলীন হইবেক ইহাতে আমা কর্ত্তৃক পৃথক্ জীবহিংসা কি হইল?

হে রাজন! সেই ব্যাধ এই প্রকার কহিতে থাকিলে তাহার উপর আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং ভূরি ভূরি সমলঙ্কৃত দিব্য রত্ন বিমান হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংযমন ব্রাহ্মণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন সমস্ত বিমানেতেই সেই ব্যাধ বসিয়া রহিয়াছে। সে ব্যক্তি অদ্বৈত বাসনায় সিদ্ধ হইয়াছিল অতএব যোগবলে ঐরূপ বহু শরীর ধারণ করিল।

হে রাজন: সংযমন ব্রাহ্মণ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আত্মজ্ঞান লাভানন্তর নিজাশ্রমে গমন করিলেন।

অতএব যে ব্যক্তি জ্ঞানবান হইয়া কর্ম্ম করে তাহার যেমন আত্মবিদ্যা হয় কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষেরও কর্ম্ম দ্বারা তদ্রূপ ক্রমে জ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ প্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লভ্য হয়।

হে রাজন, রৈভ্য রাজা ও বসু এই প্রকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বৃহস্পতির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও ভগবান নারায়ণ দেবকে আপনা হইতে অভিন্ন দর্শন করত তাঁহার আরাধনা কর।

কপিলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বশিরা রাজা আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনি নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন, তথায় বিবিধ যজ্ঞ ও স্তবস্তুতি দ্বারা যজ্ঞপতি পরম গুরু ভগবানের আরাধনায় তাঁহার কাল যাপন হইতে লাগিল।

ধরণী কহিলেন অশ্বশিরা রাজা কি প্রকার স্তোত্র দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।

বরাহ কহিলেন যিনি দেবাদি দেব, মহেশ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সকলের নমস্য, যাঁহার রূপ অনেক, সেই যজ্ঞতনু ভগবানকে নমস্কার করি। যাঁহার দশন অতিশয় ভীষণ, চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার নয়ন, সম্বৎসরের দুই অয়ন যাঁহার দুই কুক্ষি, যাঁহার অঙ্গের রোম দর্ভ, সেই সনাতন যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানকে নমস্কার করি। যাঁহার শরীরে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল এবং সকলদিক ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই স্তবনীয় জগজ্জনক ভগবান জনার্দ্দনকে নিত্য প্রণাম করি। যিনি সুরাসুরদিগের জয়াজয় নিমিত্ত যুগে যুগে পরম সুন্দর শরীর গ্রহণ করেন সেই যজ্ঞমূর্ত্তি পরমেশ্বরের প্রতি প্রণত হই। যিনি মায়াময় চক্র গদা অসি শার্ঙ্গ এই চারি অস্ত্র আপনার চারি হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানকে প্রণাম করি। যিনি কখন সহস্র মস্তক ধারণ করেন, যাঁহার শরীর কখন মহা সর্প তুল্য হয়; যিনি কখন ঐ শরীরকে পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম করেন, সেই যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানকে সদা নমস্কার করি।

যিনি চতুর্ভুজ হইয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি ও পালন করেন এবং কালে যিনি আপনিই এই সকলের প্রতি কালতুল্য হইবেন, সেই যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানকে প্রণাম করি। হে ভগবন, আমি আপনার মন তোমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অর্পণ করিলাম, তোমা ব্যতীত অন্য কেহ নাই আমার এই স্থির বুদ্ধি হইয়াছে, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

হে ধরণি, অশ্বশিরা রাজা এই প্রকার স্তব করিতে থাকিলে তাঁহার সম্মুখে অগ্নির শিখা তুল্য একটী জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। তদবলোকনে রাজা জ্ঞান লাভ করিয়া বিবেচনা করিলেন ইহা অবশ্য ভগবানের মূর্ত্তি, ইহা স্থির করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন সুতরাং যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানেই তাঁহার লয় প্রাপ্তি হইল।

গৃহ ও গৃহিণীপনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৃহিণীপনার উপযোগিতা।

বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে গৃহিণীপনায় নিপুণতা থাকিলে সংসারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি, গৃহিণীপনার অভাবে অবনতি ও বিশৃঙ্খলা। কেহ সারাদিন পরিশ্রম করিতেছে, তথাপি সংসারের সকল কর্ম্ম সময়ে সম্পন্ন হইতেছে না, নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য গৃহে আছে, কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহা পাওয়া গেল না। আর যাহারা গৃহিণীপনায় পটুতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাংসারিক কর্ম্মের এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে যথাসময়ে সকল কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইতেছে। কোন সময়ে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইবে কর্ম্মসূচনার পূর্ব্ব হইতেই তাহার সংগ্রহ হইতেছে, অথবা বাটীর কোন দ্রব্য প্রতিবেশীর বাটীতে থাকিলে, তাহাও আনাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখাইয়া দিতেছেন। গৃহিণীর গৃহিণীপনায় দরিদ্র কুটীরও শান্তি নিকেতন বলিয়া বোধ হয়, চিন্তা সন্তপ্ত চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনের উপযোগি স্থান বলিয়া অনুমিত হয় এবং বিশাল সংসার মরুভূমে আরাম স্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। আবার গৃহিণীপনার অভাবে বিপুল বিভবশালী ধনবানের সৌধ প্রাসাদেও মনের বিষাদে বাস করিতে হয়, সেখানে চিত্তের হর্ষ, অন্তরের শান্তি দেহের কান্তি, কিছুই থাকে না, সেখানে কর্ম্মে উৎসাহ অথবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কোন বিষয়েই আস্থা থাকে না। গৃহিণীপনার প্রভাবে কর্ত্তা অল্প আয় সত্বেও সংসারের সকল অভাব সংকুলান করিয়া শাক অন্নও সুধা ভাবিয়া ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সাহসে বুক বাঁধিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন বলিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মে রত হন। গৃহিণীর কার্য্য কুশলতা বশতঃ তাঁহাকে সুখের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আবার অকূল নিরাশ সাগরে আসিয়া ডুবিতে

হয় না, তাঁহার হৃদয়াকাশের সন্তোষ সুধাকর কিরণ সহসা বিষাদ রাহুর করাল গ্রাসে পতিত হয় না, দৈবী আপদ ভিন্ন আর কোন কারণেই তাঁহার প্রফুল্ল বদনকমল মলিন হয় না। কিন্তু যেখানে গৃহিণীপণার অভাব, সেখানে কর্ত্তা, অশান্তির বিকট মুখ ব্যাদান, অভাবের ভীতি ব্যঞ্জক ভ্রূকুটী, দুশ্চিন্তার দারুণ বৃশ্চিক দংশন ও হতাশের মর্ম্মভেদী যাতনায় সর্ব্বদাই কাতর, অধীর ও অস্থির।

যেখানে সেনাপতির সৈন্য চালনে দক্ষতা, রণকার্য্যে নিপুণতা, এবং আত্মপক্ষে ও পর-পক্ষের বল বুঝিয়া, প্রতিপক্ষের অপেক্ষাকৃত সমধিক বলে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিবার ক্ষমতা, বিজয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, আর যেখানে সেনাপতির রণ-কৌশল নাই, প্রতিপক্ষের বলাবলের প্রতি লক্ষ্য নাই, পরিণাম দর্শিতা নাই, সেখানে ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন না। তিনি অসীম কলসম্পন্ন ও অসংখ্য সৈন্যের নেতা হইলেও আপনার নেতৃত্ব দোষে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন। যেখানে সেনাপতি সমর কৌশলবিৎ, সাহসী ও পরিণামদর্শী, সৈন্যবল সে পক্ষের অল্প হইলেও বিজয়ের আশা। যেমন সেনাপতি না থাকিলে রণস্থলে সৈন্যগণ যথেচ্ছ যুদ্ধ করিয়া সমরসাগরে ডুবিয়া বিজয়রত্ন উদ্ধার করিতে পারে না। গৃহিণী না থাকিলেও, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। রাজ্য শাসন অপেক্ষা সংসার পালন যে অধিকতর কঠিন ব্যাপার এ কথা এগৃকোলার ন্যায় (Agricola) মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীকৃত। বিশিষ্ট গুণসম্পন্না গৃহিণীর গৌরব, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক বলিতে গেলে, একজন দক্ষ সেনাপতির অপেক্ষা কম নহে।

যেমন কর্ণধার বিনা নৌকা চলে না, গৃহিণী বিনা সংসারও তদ্রূপ। নৌকা মাল্লাগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইতে পারে। স্রোতের অনুকূলে চলিতে পারে পালভরে ছুটিতে পারে, কিন্তু কর্ণধার বিনা তরী নিরাপদ নহে। মাল্লাগণ তরী চালাইতে পারে, কিন্তু চলিতে চলিতে কোন বৃহৎ নৌকা বা জাহাজের সম্মুখে পড়িলে, কর্ণ বিনা আর কে ফিরাইবে? এই নৌকা অনুকূল স্রোতে চলিতেছে, দুই দণ্ড পরে স্রোত ফিরিলে তরী কোথায় যাইবে? এখন দেখা যাইতেছে যে নৌকা পালভরে ছুটিতেছে, কিন্তু বাতাস যদি সহসা ভিন্ন দিক হইতে প্রবাহিত হয়, অথবা হঠাৎ বিষম ঝড় উঠিতে আরম্ভ হয়, তখন কর্ণধার বিনা কে তরণী বাঁচাইবে? কর্ণধার বিনা তরী চলে না। তবে কর্ণধার সুনিপুণ ও নৌকাচালনদক্ষ হইলে উত্তাল তরঙ্গ-রাশি ভেদ করিয়া, নৌকা ও আরোহীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, ভীমপ্রভঞ্জন মহীরুহচয় ভূতলশায়ী করিয়া প্রবাহিত হইলেও তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে, অথবা দ্রুতগামী অর্ণবযানের সম্মুখস্থিতা নৌকা তিলার্দ্ধ সময় মধ্যে নিরাপদ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা সুদক্ষ কর্ণধার নয়, স্রোতস্বতীর তরঙ্গ দেখিয়া তাহাদের আশা ভঙ্গ হয়, কলনাদিনী কল্লোলিনীর বর্ষাকালের কূলপ্রমাথিনী ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হয়, কখন বা আকাশে মেঘমালা সন্দর্শনে সন্ত্রাসিত চিত্তে গমনে বিরত হয়। গৃহিণী

সংসার তরণীর কর্ণধার, তাঁহারা গৃহিণীপনায় দক্ষতা লাভ করিলে, আপন ক্ষমতায় সংসার নিরাপদে চালাইতে পারেন, ভাবী বিপদের সূচনা বুঝিতে পারিলে, পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতীকার করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা গৃহিণীপনায় পটুতা লাভ করিতে পারেন নাই, কেবল স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ হাতে লইয়া আপন মনে ব্যয় করিয়া থাকেন, সময় অসময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, একভাবে দিন কাটিবে স্থির করিয়া চলেন, তাঁহারা সহসা বিপৎপাতে অধীর হন এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া পারিবারিক দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করেন। আর যে সংসারে গৃহিণী নাই, কর্ত্তার উপর গৃহিণীপনার ভার ন্যস্ত অথবা নববধূ কিম্বা অল্পবয়স্কা কন্যার হস্তে অর্পিত, সে সংসারে সুখ দুর্লভ। সে সংসারে নিত্য অভাব, সারাদিন কলহ, সর্ব্বদাই মনের অশান্তি। সে সংসারে পুত্র, কন্যা ও বধূ সকলেই অদূরদর্শী সহগুণ কাহারও নাই, কেহ এখন ক্ষমা করিতে শিক্ষা করে নাই। সুতরাং সামান্য বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় বিবাদ বাড়িয়া চলে, একজন সহ্য করিয়া চুপ করিবে, এমন নাই, অথবা দোষ গুণ বিচার করিয়া কর্ত্তা যে বিবাদ মিটাইবেন তাহাও ঘটে না।

কর্ত্তা বাটীতে না থাকিলে সংসার সুনিপুনা গৃহিণীর দ্বারা নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে, পরিবারের মধ্যে সকলেই সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইতে এবং আপন অবস্থানুরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে, কিন্তু গৃহিণী দুই দিনের জন্য কোন কর্ম্ম উপলক্ষে পিত্রালয়ে যাইলে বা তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলে অমনি সংসারের শান্তি ভঙ্গ হইল। যথাসময়ে স্নান আহারের ব্যাঘাত হইল, সকলই আছে তথাপি যেন কিছু নাই, সকলেই পূর্ব্ববৎ উদয়াস্ত কর্ম্মরত, কিন্তু কর্ম্ম ফুরাইতেছে না। রাজা না থাকিলে, মন্ত্রীর দ্বারা রাজ্য দুই চার দিন সুশৃঙ্খলায় চলে, নাবালক রাজা লইয়া, মন্ত্রীর সুমন্ত্রণায় রাজকার্য্য সুচারুরূপে সমাহিত হইতে পারে, কিন্তু গৃহিণীর একদিন এমন কি দণ্ডকাল অনুস্থিতিতে সংসারের নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। আর সর্ব্বকর্ম্ম তৎপরা সুদক্ষা গৃহিণীর লোকান্তরে, একজন নাবালিকা গৃহিণীর হস্তে সংসার ভার পড়িলে, স্বামীর সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া তিনি সেরূপ ভাবে চালাইতে পারিবেন না। যে সমস্ত আদর্শ ও গুণগ্রাম ভূষিত হইলে তিনি গৃহিণীপনায় পটুতা লাভ করিবেন এবং সাধারণের নিকট প্রশংসার পাত্রী হইবেন, সে সমস্ত গুণ তাঁহার অন্তরে এখন বিকাশ পায় নাই। তিনি যদি তাঁহার জননী অথবা শাশুড়ীর নিকট গার্হস্থ নীতি শিক্ষা করিয়া দুর্ম্মদ সংসার তুরঙ্গের বল্গা ধারণে অগ্রসর হন, তবে তিনি সাহসে ভর করিয়া আপন শিক্ষাবলে কখন বহুবিস্তৃত বিভীষিকাময় ঘোর নিরাশার মরুভূমে কখন বা দুর্ভেদ্য মনোমালিন্য কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন অন্তর প্রান্তরে, কখনও অভাব কঙ্করপূর্ণ দুর্গম পার্ব্বত্যপথে গমন করিতে পারিবেন। তিনি নিবিড় সংসার কাননের দুর্গতি গিরিসঙ্কটে আসিয়া পড়িলেও, অধীর ও অবসন্ন না হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া কখনও অশ্ব চালান নাই, অশ্বপৃষ্ঠে

আরোহণ করিবামাত্রই তাহাদের বিপদ, কি করিয়া অশ্ব চালাইবেন, কোনদিকে যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না, হয়তো ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া পতিত হইলেন।

গৃহিণীপনায় দক্ষতা না জন্মিলে, পারিবারিক সুখ একান্ত দুর্লভ। কিন্তু আজকাল গৃহিণীপনার আদর নাই, শিক্ষা করিবার ঔৎসুক্য নাই, এবং শিক্ষা দিবার গুরু থাকিলেও শিক্ষা করিবার পাত্রী নাই। পাঠশালা বা বিদ্যালয়ে ইহার শিক্ষা হয় না, উপন্যাস বা পাঁচালী পাঠে অধিকার জন্মিলে. কাব্য বা কবিতা পড়িলে গৃহিণীপনায় জ্ঞানলাভ হয় না, ইহার শিক্ষা অন্যরূপ। বালিকা বয়স হইতে পুতুল খেলা করিয়া, ধূলা মাটী লইয়া রন্ধনাদির দ্বারা যে শিক্ষা হয়, সাহিত্য সেবায় তাহা হইতে পারে না। অধুনা কুলকামিনীগণ শৈশবকালে পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বিবাহের পর স্বামীর সহিত একত্র বিদেশে চলিয়া যায়, এবং স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ আপনমনে খরচ করে, গৃহিণীপনা শিক্ষা করিবার অবসর থাকে না। শৈশবে পিত্রালয়ে মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী অথবা মাতৃস্থানীয়া অন্য রমণীর নিকট, যৌবনে শ্বশুর বাটীতে শ্বাশুড়ী বা ননন্দার নিকট গৃহকর্ম্মের গূঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। কিন্তু গৃহিণীপনা আজকাল শিক্ষা না করায়, সংসারের আয় বাড়িলেও অভাব ঘুচিতেছে না, কষ্ট কমিতেছে না, পরিবারবর্গের সহাস্য বদন দেখা যাইতেছে না।

প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, হাঁসপাতালে গিয়া দেখা যায় অহিফেনভুক্ত কুলমহিলা অজ্ঞান অবস্থায় হাঁসপাতালে আনীত হইয়াছে, অর্ণবযানে বা বাষ্পীয়-শকটারোহণে স্থানান্তর গমনকালে পরস্পরের নিকট শুনিতে পাইবে—সেই অকালমৃত্যুর কথা, আফিস যাও, সেথাও সেই লোমহর্ষণ ব্যাপারের অবতারণা। পদব্রজে জনপদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও সেই হৃদয়বিদারক আত্মহত্যা বিবরণ শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া প্রশান্ত হৃদয় সাগরকে উদ্বেলিত করিবে। আমরা সংবাদপত্রে এইরূপ অহিফেন সেবন অথবা উদ্বন্ধন দ্বারা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগের বিবরণ পাঠ করি, কিন্তু এ সমস্ত অকালমৃত্যুর কারণ যে কি, তাহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুমাত্রের চিত্ত আকার্ষণ করে নাই। গৃহিণীপনায় দক্ষতা লাভ অথবা গৃহিণীপনা শিক্ষাভাবে যে এরূপ অকালমৃত্যু ঘটে, এরূপ কারণ আমরা নির্দ্দেশ করি, আর ইহা একমাত্র কারণ না হইলেও প্রধান কারণ বটে। বাল্যকাল হইতে বালিকাগণ পাঠশালায় চলিল, বিবাহের পর শ্বাশুড়ীর নিকট না থাকিয়া ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইল। পতির উপার্জ্জিত অর্থে অধিকারিণী হইয়া একেবারে স্বয়ংসিদ্ধ বিচক্ষণ গৃহিণী হইলেন, সংসারের দুর্ব্বহ ভার আপনার লঘু মস্তকে লইলেন। পূর্ব্বে যিনি একদণ্ডের জন্য স্থির নদী চক্ষে দেখেন নাই, আজ তিনি সংসার তরণীর কর্ণ ধারণ করিয়া ভবার্ণবে আবির্ভূত। এ সাগরের কোনদিকে সুখের কূল, কোনদিকে দুঃখের কূল একথা কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই, অসংখ্য বিপদ হিমশিলা একটার পর একটা তরীর উত্তরদিকদিয়া ভাসিয়া চলিতেছে. একবার ইহার সহিত সংঘর্ষণ হইলে অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে এ বার্ত্তা কাহারও নিকট পান নাই, গুপ্ত শত্রুবেশে কোথায় যে শৈল সলিলরাশির মধ্যে ডুবিয়া আছে, এ বিষয় তাঁহার জ্ঞান নাই। উত্তমর্ণের ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গরাশি মধ্যে কি করিয়া যে তরী

চালাইতে হয়, এ কথা শ্বাশুড়ীর নিকট শ্রবণ করেন নাই, অনুকুল অর্থব্যয় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে কিরূপে যে ধৈর্য্য পাল তুলিয়া তরী চালাইতে হয় সে বিষয়ে অধিকার জন্মে নাই। সেই জন্ত অনেক সময় অনুকুল অর্থ বায়ু দ্বারা কর্ণধারের অদুরদর্শিতায় ধৈর্য্য পাল উল্টাইয়া বালিকার সহিত তরণী অতল জলধিজলে চিরদিনের জন্ত নিমগ্ন হয়।

যাঁহারা অদুর দর্শিনী গৃহিণী হইয়া সংসার ভার স্বকরে গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা প্রথমে বড়ই সন্তুষ্ট, কিন্তু যখন তাঁহারা দোকানদারগণের প্রাপ্য টাকা না দিতে পারায় তাহাদের রোষ কষয়িত নেত্র দেখিলেন, কর্কশ, মর্ম্মবিদারক কথা শ্রবণ করিলেন, অমনি অধীর হইলেন। আপন আয়ের অনুরূপ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া অবস্থার অতিরিক্ত চালে বসন ভূষণ করিতে গেলে, কালে তাহা ভোগ হয় না। অধিকাংশ অপমান ও মনস্তাপ। একে রমণীজাতি স্বভাবতঃ অভিমানিনী, তার উপর শিক্ষাপ্রাপ্ত, সুতরাঃ পাওয়ানাদারের কথায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। সকল দিক সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারা অনেক দূরদর্শিতার ফল আর সেই দুরদর্শিতা শ্বশুর ভবনে শাশুড়ী অথবা তৎস্থানীয়া বহুজ্ঞান সম্পন্ন গৃহিণীর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা সে শিক্ষালাভ করেন নাই, সংসারের বিশৃঙ্খলা তাহাদের দিন দিন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রফুল্ল বদনকমল নিরাশহিমসিক্ত হইয়া ক্রমশঃ মলিন ও নিষ্প্রভ হয়। একে একে সকল বিষয়ে নিরুৎসাহ জন্মায়, তখন রমণী স্বভাব সুলভ জ্ঞান, তাহার মন মাতঙ্গিকে সংযত করিয়া সংসারপথে চালিত করিতে পারে না। তখন মন উন্মার্গপ্রস্থিত হইয়া নিরাশ-সাগরের উপকূলে উপনীত হয়। সেখানে ধর্ম্মতরুর ছায়া নাই, অপত্য স্নেহের মায়াকুঞ্জ নাই, পিতামাতার স্নেহ উপবন নাই, চারিদিকে বিশাল বারিধি। সেখান হইতে ফিরিবার পথ নাই, আশা নাই, উপায় নাই। সুতরাং নিরাশ সাগরে নিমগ্ন হইয়া অকালে প্রাণ হারাইয়া থাকে। যে সমস্ত ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুর্ব্বহ সংসার ভার অকালে স্বইচ্ছায় বহন করিতে গিয়া সেই ভারে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন, আর যখন সে ভার বহনে একান্ত অসমর্থ হন, তখন সে গুরুভার ফেলিয়া লোকান্তরে পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। *

এখন সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে গৃহিণীপনা শিক্ষা একান্ত আবশ্যক এবং সে শিক্ষা মাতা অথবা শ্বাশুড়ীর নিকট। তবে অনেকে এরূপ কারণ উত্থাপিত করিতে পারেন, যে সকলকার মাতার গৃহিণীপনায় দক্ষতা নাই, শ্বাশুড়ী যোষিৎ যোগ্য গুণোপযুক্তা নয়, সুতরাং সকলে কি করে গৃহিণীপনায় পারদর্শিতা লাভ করিবে। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে সকলে তুল্য গুণসম্পন্ন না হইলেও সবারই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, প্রথমে তাঁহাদের নিকট থাকিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ জন্মায়। সুবীজ বপন করিলে কালে সেই বীজ হইতে সুবৃক্ষ হইবে। কিন্তু যে হৃদয়ক্ষেত্রে গৃহিণীপনার বীজ উপ্ত না হইল, সে ক্ষেত্রে আগাছা বা বিষবল্লী ভিন্ন আর কি জন্মিবে? যাহারা গৃহিণীপনার সুবীজ বপন দ্বারা সুবৃক্ষ উৎপাদন করে; সুফলাস্বাদনে পরিতৃপ্তি লাভ করে, আর যাহারা আগাছা বা বিষবল্লী দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্র পূর্ণ করে, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশৃঙ্খলা ভোগ করে, আর কেহ বা বিষবল্লী নিঃসৃত বিষপানে অকালে প্রাণত্যাগ করে।

(ক্রমশঃ)

* আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করি, কিন্তু তত্ব অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ যদি ইহার সার্থকত্ব বা আমূলকত্ব প্রমাণ করিয়া দেন তবে উপকৃত হইব।

রাজা হরিশ্চন্দ্র।

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারং।

আমি ঋত বলিব, আমি সত্য বলিব, সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা জানে না, এমন হিন্দু এই ভারতে, অন্তত এই বঙ্গদেশে আছে কি না সন্দেহ। বিশেষত আজকাল হরিশ্চন্দ্রকথা যাত্রাদলে গীত ও নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের শীঘ্র অতীত হইতে পারিতেছে না। আমাদের কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে এই হরিশ্চন্দ্রকথা প্রবেশ করাইয়া দেওয়াতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার করুণরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। এই হরিশ্চন্দ্রকথা যে কত লোকের নির্জীব ধর্ম্মভাবকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, কতলোককে স্বার্থত্যাগের অধিক আত্মত্যাগে উৎসাহিত করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও এই হরিশ্চন্দ্রকথা নানা সময়ে নানা অবস্থায় ধৈর্য্য সংযম প্রভৃতি বিষয়ে, কেবল কথা দ্বারা নহে, জলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক দিন পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দিয়াছে, আজ তাহার দক্ষিণাস্বরূপে তৎসম্বন্ধীয় আমাদের দুই চারিটী সামান্য বক্তব্য সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

কবি কৃত্তিবাস যখন তাঁহার রামায়ণে সুদীর্ঘ হরিশ্চন্দ্রকথা প্রবেশ করাইয়াছেন, তখন স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তিনি খুব সম্ভবত কোন পুরাণগ্রন্থে তাহা পাইয়াছিলেন। আমরাও দেখি যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে কৃত্তিবাস-কথিত হরিশ্চন্দ্রকথার অনুরূপ একটী হরিশ্চন্দ্রকথা রহিয়াছে। কিন্তু ইহাকেও আমাদিগের মূল কথা বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, ইহার প্রথমেই লেখা আছে—

"হরিশ্চন্দ্রেতি রাজর্ষিরাসীত্ত্রেতাযুগে পুরা।"

"পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামক এক রাজর্ষি ছিলেন।" ইহা হইতেও আমাদিগের অনুমান হয় যে মূল হরিশ্চন্দ্রকথা মার্কণ্ডেয় পুরাণের বহু পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল। আর, বাস্তবিকও আমরা ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে (৭ম, ১৩) সর্ব্বপ্রথম হরিশ্চন্দ্রের নাম ও তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা দেখিতে পাই। তাহার পর তদনুযায়ী কথা বাল্মীকি-রামায়ণে এবং মহাভারতেও দেখিতে পাই। এই সকল ঐতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকথা হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত পৌরাণিক কথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা যায়। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। সম্প্রতি ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ঐতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকথারই আলোচনায় সর্ব্বপ্রথম প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

সেই হরিশ্চন্দ্রকথাটী এই। ব্রহ্মা হইতে

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রকথা।

পরম্পরাগত * ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিশ্চন্দ্র নামক এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। তাঁহার একশত পত্নী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহাদের কাহারই গর্ভে তাঁহার পুত্র লাভ ঘটে নাই। এক সময়ে পর্ব্বত ও নারদ নামে দুই ঋষি হরিশ্চন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। রাজা এক দিন নারদকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই যে পুত্রমুখদর্শন প্রার্থনা করে, পুত্র লাভের ফল কি? নারদ দশটী মন্ত্রে পুত্রের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে উপদেশ দিলেন যে "বরুণরাজার নিকটে এই বলিয়া পুত্রের জন্য প্রার্থনা কর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই তাঁহারই নিকটে তাহাকে যজ্ঞার্থে বলিদান করিবে।" হরিশ্চন্দ্রও বরুণরাজার নিকটে তদনুরূপ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে "আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার দ্বারা তোমারই যজ্ঞ করিব।" অবশেষে রোহিত নামে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বরুণরাজা স্বীয় প্রাপ্য প্রার্থনা করাতে হরিশ্চন্দ্র স্বাভাবিক সন্তানবাৎসল্যবশত "বয়ঃক্রম আর একটু অধিক হউক" এইরূপ বৃথা আপত্তি করিয়া অনেকবার রোহিতকে বলিদান করিবার দায় হইতে এড়াইয়া গেলেন। কিন্তু রোহিত যৌবনে পদার্পণ করিলে যখন বরুণরাজা পুনরায় স্বীয় প্রাপ্য প্রার্থনা করিলেন, তখন হরিশ্চন্দ্র আর আপত্তি দ্বারা তাঁহার প্রার্থনা এড়াইতে না পারিয়া স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস, যাঁহার কৃপায় আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, হায়! তোমারই দ্বারা সেই বরুণরাজার যজ্ঞ করিতে হইবে।" রোহিত এখন বর্ম্মধারণের উপযুক্ত বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি যজ্ঞার্থে আপনাকে বলি-স্বরূপে অর্পণ করিতে সহজে সম্মত হইবেন কেন? তিনি ধনুর্ব্বাণমাত্র সহায় করিয়া নিকটস্থ অরণ্যে পলায়ন পূর্ব্বক তথায় এক বৎসরকাল কোন রূপে কাটাইয়া দিলেন।

অনন্তর বরুণরাজার কুদৃষ্টিতে বা "আক্রমণে" ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের উদরস্ফীতি রোগ

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে "হরিশ্চন্দ্রোহ বৈধস ঐক্ষ্বাকো রাজা অপুত্র আস।" ইহার অন্তর্গত "বৈধস" শব্দের অর্থে সুবিখ্যাত পণ্ডিত মার্টিন হেগ বেধস্-পুত্র করিয়াছেন। আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই আখ্যানেই দেখা যাইবে যে, অজীগর্ত্ত নামক এক ঋষি তাঁহার পুত্রকে অঙ্গিরস্-কুলোদ্ভব বশত "আঙ্গিরস" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সেইরূপ এখানেও বেধস্ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে পরম্পরাগত অর্থে "বৈধস" শব্দের ব্যবহার অনুমান করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ হরিশ্চন্দ্র একজন সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁহার ব্রহ্মা হইতে বংশোৎপত্তি উল্লেখ করিতে যাওয়া খুব সম্ভব। এখনও ইংরাজ সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, যাঁহারা প্রথম উইলিয়ম প্রভৃতি যত প্রাচীন রাজা হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি দেখাইতে পারেন, তাঁহারা আপনাদিগকে তত অধিক সম্মানিত বোধ করেন। ইহার উপরে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ আছে, সকলেতেই তাঁহাকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলা হইয়াছে এবং ত্রিশঙ্কুপুত্রও বলা হইয়াছে কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে বেধস্-পুত্র বলা হয় নাই। আরও, ব্রহ্মা হইতে এই ইক্ষ্বাকুবংশের উৎপত্তিবর্ণনা ঐ সকল গ্রন্থে স্পষ্টোল্লিখিত দেখা যায়। এই সকল কারণে আমরা "বৈধস্" শব্দের "বেধস্-পুত্র" না ধরিয়া "ব্রহ্মা হইতে পরম্পরাগত" এইরূপ অর্থই ধরিলাম।

জন্মিল সেই কথা শ্রবণ করিয়া রোহিত অরণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে দেশ ভ্রমণের গুণবর্ণন করিয়া অরণ্য পরিত্যাগে নিরস্ত করিলেন। তিনিও আর এক বৎসর অরণ্যবাস করিলেন। এইরূপে প্রতি বৎসরের শেষে তিনি যেই গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, অমনি ইন্দ্রও ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত করেন। এই প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন ষষ্ঠ বৎসর অরণ্য ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়ে তিনি ক্ষুৎপ্রপীড়িত সুয়বসনন্দন অজীগর্ত্ত ঋষিকে সেই বন মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। অজীগর্ত্তের তিন পুত্র—শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোলাঙ্গুল। রোহিত অজীগর্ত্তের নিকটে গিয়া স্বীয় বিপদ্ বর্ণন করিয়া বলিলেন "হে ঋষি, আমি আপনাকে গো-শত প্রদান করিতেছি, তৎপরিবর্ত্তে আপনার এই পুত্রগণের মধ্যে একটীকে ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা আমি নিষ্কৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া রোহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইতে যাইলে অজীগর্ত্ত "ইহাকে নহে" বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে অজীগর্ত্তপত্নী দিতে অসম্মত হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে রোহিত মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে শত গাভীর বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া একেবারে পিতা হরিশ্চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন "পিতঃ, আমি এই ব্রাহ্মণ বালককে যজ্ঞার্থে প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করি।" হরিশ্চন্দ্রও বরুণরাজার নিকটে জানাইলেন যে তিনি স্বীয় পুত্র রোহিতের পরিবর্ত্তে শুনঃশেপের দ্বারাই তাঁহার যজ্ঞ করিবেন। বরুণরাজা "ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণ আরও ভালই" ইহা বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। এই সূত্রে বরুণরাজা হরিশ্চন্দ্রকে রাজসূয় যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রও অভিষেচনীয় দিবসে যজ্ঞীয় পশুর পরিবর্ত্তে শুনঃশেপকে যজ্ঞস্থলে রক্ষা করিলেন।

এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বসিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং আয়াস্য উদ্গাতা ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভকার্য্যগুলি সমাপন হইলে পর তাঁহারা শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিবার জন্য লোক অন্বেষণ করিলেন কিন্তু এই ভীষণ কার্য্যে উপস্থিত দ্বিজদিগের মধ্যে কেহই অগ্রসর হইলেন না। অজীগর্ত্ত লোভ বশতঃ স্বয়ং আসিয়া অপর একশত গাভীর বিনিময়ে তাহা করিতে স্বীকার করিলেন। শুনঃশেপ তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে নিহত করিবার লোক পাওয়া গেল না। এবারেও অজীগর্ত্ত লোভপরবশ হইয়া আরও এক শত গাভীর বিনিময়ে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান করিতেও অগ্রসর হইলেন। এই খানে ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন যে, যখন শুনঃশেপ দেখিলেন যে তাঁহাকে পশুর ন্যায় সত্য সত্যই বলিদান করিবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন তিনি প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক ক্রমে ক্রমে নানা দেবতার স্তব পঠিত হইলে পর তাঁহার বন্ধনদাম মুক্ত হইয়া গেল এবং হরিশ্চন্দ্রেরও পীড়ার উপশম হইল।

বন্ধনদাম মুক্ত হইয়া গেলে যজ্ঞের পুরোহিত-

গণ শুনঃশেপকে আপনাদিগের মধ্যে আসন প্রদান করিয়া তাঁহাকেও রাজসূয়-যজ্ঞের কতকটা কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শুনঃশেপ সেই যজ্ঞাবসরে অঞ্জঃসব নামক এক প্রকার আসব আবিষ্কার করিয়া ঋষি হইলেন। অভিষেচনীয় দিনে সোমবলি দিয়া যজ্ঞাবসান হইল। যজ্ঞাবসানে তিনি বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন সৌয়বসি অজীগর্ত্ত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন "আমার পুত্র প্রতিপ্রদান কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন "দেবতারা ইহাঁকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি ইহাঁকে প্রতিপ্রদান করিব না।" অজীগর্ত্ত তখন শুনঃশেপকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন "এস, তোমার মাতা ও আমি, আমরা উভয়েই তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি অঙ্গিরস্-কুলোদ্ভূত ও অজীগর্ত্তপুত্র কবি শুনঃশেপ বলিয়া বিখ্যাত। অতএব হে ঋষি, তোমার পৈতামহ তন্ত (ancestral home) হইতে চলিয়া যাইও না; আমাদের নিকটে ফিরিয়া আইস।" তদুত্তরে শুনঃশেপ বড়ই মনঃকষ্টের সহিত বলিলেন "শূদ্রও স্বীয় পুত্রবধার্থে অস্ত্র উদ্যত করে না তুমি তাহাও করিয়াছ; হে আঙ্গিরস! তোমার নিকটে আমা অপেক্ষা তিনশত গাভী অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হইয়াছে।" তখন অজীগর্ত্ত মৃদুভাবে বলিলেন "বৎস! মৎকৃত পাপকর্ম্ম আমাকে অত্যন্ত তাপ প্রদান করিয়াছে, তোমাকে একশত গাভী প্রদান করিয়া সেই পাপ ধৌত করিতে ইচ্ছা করি।" শুনঃশেপ বলিলেন 'এ প্রকার পাপ যে একবার করিতে পারে, সে দ্বিতীয় বারও তাহা করিতে পারে; তোমার মন হইতে শূদ্রোচিত এই নিষ্ঠুর ভাব এখনও অপসৃত হয় নাই; তোমার সহিত পুনর্মিলন হওয়া অসম্ভব।"

মুনি বিশ্বামিত্র তখন শুনঃশেপকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "অজীগর্ত্তের সহিত তোমার পুনর্মিলন অত্যন্ত অসম্ভব। যখন সৌয়বসি অজীগর্ত্ত তোমার বধার্থে শস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি কি ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে আর পুত্ররূপে যাইও না, আমারই পুত্রস্থানীয় হও।" এই সময় হইতে দেবপ্রেরিত বলিয়া শুনঃশেপের আর এক নাম হইল দেবরাত। দেবরাত শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি অঙ্গিরস্-কুলোদ্ভূত হইয়া এখন তাঁহার পুত্র হইলে কিরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বামিত্র পুত্রগণের সমক্ষে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার দিলেন। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র ইহাতে অসন্তুষ্ট হওয়াতে পিতার শাপগ্রস্ত এবং মধুচ্ছন্দস্ প্রভৃতি কনিষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র সন্তোষের সহিত পিতৃ-আজ্ঞা পালন করাতে পিতার আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। এই রূপে দেবরাত শুনঃশেপ জহ্নু বংশের রাজকীয় মহিমা * এবং গাধিকুলের বিজ্ঞানে সমুজ্জ্বল হইলেন।

ঋগ্বেদে শৌনঃশেপ মন্ত্র।

ইহাই হইল ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত হরিশ্চন্দ্র-কথার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে আমরা দেখি যে, ইহাকে শৌনঃ-

* অঙ্গিরসকুলে জহ্নু নামক এক রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শেপাখ্যান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আর সত্যসত্যই, এই আখ্যানে হরিশ্চন্দ্রের প্রাধান্য কিছুই নাই বলিলেও চলে—শুনঃশেপেরই মাহাত্ম্য সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল বৈদিক ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা শুনঃশেপ দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন, সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের নাম গন্ধও নাই; শুনঃশেপ যে নিজের নামোল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ আছে—

"শুনঃশেপো যমহ্বদ্গৃভীতঃ সোঽস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু।" ১ম, ২৪সূ, ১২

"শুনঃশেপ গৃহীত হইয়া যাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, সেই রাজা বরুণ আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন।"

'শুনঃশেপোহ্যহ্বদ্গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।

অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বিমুমোক্তু পাশান্॥" ১ম, ২৪সূ, ১৩

"শুনঃশেপ গৃহীত ও তিন কাষ্ঠ দণ্ডে বদ্ধ হইয়া যাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাতিগ বরুণরাজা সর্ব্বতোভাবে পাশ সকল মুক্ত করিয়া দিউন।"

ঋগ্বেদে যখন এরূপ স্পষ্টভাবে নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রার্থনা উল্লিখিত আছে এবং যখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এই শৌনঃশেপ আখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতেছি, তখন এই আখ্যানকে একটী কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের বিশ্বাস যে এই হরিশ্চন্দ্র-সংযুক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। আমরা যেমন আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহগণসম্বন্ধীয় জ্ঞাত কথা আখ্যানচ্ছলে উল্লেখ করিতে পারি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্রকথাও পড়িলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ঐতরেয় ঋষি ঋগ্বেদের শৌনঃশেপ মন্ত্র সমূহের উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞাত কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনা জ্ঞাপক অতীতকাল (লিট্) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ঋগ্বেদীয় মন্ত্র সমূহে বর্ত্তমান ভাবই সুব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় যে ঋগ্বেদ এবং তাহার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ন্যূনাধিক শতবর্ষকাল ব্যবধান পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে ঋষিরা ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত নাম ধাম ভুলিতে পারেন নাই, ঠিক ঠিক রাখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

ঋগ্বেদের শৌনঃশেপ ঋক্‌সমূহে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শৌনঃশেপ আখ্যানে এমন এক সরলতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে যে, সেই গুলি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঋগ্বেদোক্ত উক্ত পাশ সমূহও কল্পিত পাশ নহে এবং ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যান কল্পিত উপাখ্যান নহে; উভয়েরই ভাষা লিখিবার রীতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ-ব্যঞ্জক (ইংরাজীতে যাহাকে realistic বা dramatic বলা যাইতে পারে।) ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যানে কেবল বরুণরাজার (অথবা ভগবানের) প্রত্যক্ষ আবির্ভাবরূপ কবিত্বের একটু আবরণ রহিয়াছে। *

* ঋগ্বেদোক্ত শৌনঃশেপ মন্ত্রগুলি যে হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক শুনঃশেপের বন্ধন বিষয়েই লিখিত হইয়াছে, এবিষয়ে একেবারে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না। তাহার কারণ,

বৈদিক হরিশ্চন্দ্র-কথা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ।

এখন আমরা ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্রকথা অথবা শৌনঃশেপ আখ্যান আলোচনা করিয়া কি ঐতিহাসিক সত্যরত্ন সকল সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাই দেখা যাউক। আমাদের বোধ হয় যে, এই আখ্যানের মূল সূত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ সূত্রেই এই আখ্যানোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই আখ্যান উক্ত হইবার অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে, বিশ্বামিত্র রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের উদ্যোগ করিতেছিলেন। † এই আখ্যানে দেখিতে পাই যে, বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে প্রধান হোতৃপদে অভিষিক্ত আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; আবার শুনঃশেপ তাঁহাকে দুই এক স্থলে 'রাজপুত্র', "ভরত-ঋষভ" প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত বাক্যেও সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, তখনও বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়কুলোৎপত্তি ব্রাহ্মণেরা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই; তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে দু একটী ভিন্ন ব্রাহ্মণোচিত সকল কর্ম্মে অধিকার প্রদান করিলেও তখন অবধি ক্ষত্রিয়োচিত সম্বোধনে আহ্বান করা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং বিশ্বামিত্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য পূর্ব্বক সমগ্র আখ্যানটী পড়িয়া আমাদের প্রতীতি হয় যে, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের প্রতি ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টার জন্য তখন অত্যন্ত জাতক্রোধ ছিলেন —অজীগর্ত্ত যখন তাঁহার পুত্র প্রতিপ্রদানের প্রার্থনা করেন, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র তাহাতে বাধা দেওয়াতে ঐতরেয় ঋষি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা কিছু বিরক্ত হইয়া, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রতাপে ভীত হইয়া গম্ভীর-নীরব ছিলেন। ‡

প্রথমত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র সমূহে হরিশ্চন্দ্রের কোন প্রকার নামই দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা দেখিতে পাই যে শুনঃশেপ বন্ধনমুক্ত হইবার পর অঞ্জঃসব নামক আসব আবিষ্কার করিলেন; কিন্তু অঞ্জঃসব সম্বন্ধীয় ঋকসমূহ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৮ তম সূক্তে দেখি এবং শুনঃশেপের বন্ধনমুক্তির ঋকসমূহ ৩০ তম সূক্তের শেষে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, অনেকগুলি শৌনঃশেপ মন্ত্রেই পাপ হইতে মুক্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমাদেরও মনে সন্দেহ হয় যে, ইতিপূর্ব্বে যে ঋকমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে "ত্রিষু দ্রুপদেষু" শব্দের অর্থে সত্যসত্যই তিনটী কাষ্ঠদণ্ড বুঝাইবে অথবা রূপকচ্ছলে কায়মনোবাক্যের ত্রিদণ্ড বুঝাইবে? আমরা অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না যে কায়মনোবাক্যের ত্রিদণ্ড বুঝাইবেই—আমরা কেবল একটী ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। কোন্ অর্থ নিশ্চয় বুঝাইতে পারে, সে বিষয়ে কোন বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইলে পরম উপকৃত হইব। আমরা আপাততঃ মহামতি সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে ঋগ্বেদোক্ত ঐ সকল মন্ত্র হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক শুনঃশেপের বন্ধন বিষয়কই বটে।

† অধ্যাপক মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন যে এই সময়ে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহা যে ঠিক নহে, তাহা বাল্মীকিপ্রোক্ত বিশ্বামিত্রের চরিতাখ্যানেই (রামায়ণ আদি, ৫৭।৫৮ সর্গ দেখ) দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ মনুসংহিতায় অজীগর্ত্তের নির্দ্দোষিতা উল্লেখ করিয়া যে শ্লোক আছে, তাহাতেও বোধ হয় যে, বিশ্বামিত্রের এই কার্য্যে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট ছিলেন না—বিশ্বা-

ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের এই বিদ্বেষভাব সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই, ইত্যবসরে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, হরিশ্চন্দ্র যখন শুনঃশেপকে যজ্ঞীয় পশুরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন বরুণরাজার (অর্থাৎ ভগবানের) নিকটে রাজসূয় যজ্ঞ করিবারই "আদেশ" প্রাপ্ত হইলেন; অর্থাৎ এই সময়ে তাঁহার রাজসূয় অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প স্থির হইল। রাজসূয় যজ্ঞ অতিশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইত; ইহার আয়োজন অতি বিপুলরূপে সংগৃহীত হইত; এবং এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিলে অনুষ্ঠাতা ইন্দ্রতুল্য মর্য্যাদা এবং অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানের সংকল্প এক দিনে যে স্থির হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এবং যে অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয়গণ ক্ষণকালের জন্যও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহার জন্য অধিকতর উত্তেজিত হইতে পারিতেন, হরিশ্চন্দ্র সেই অনুষ্ঠান করিতে যাওয়াতে নারদপ্রমুখ ব্রাহ্মণ ঋষিগণ যে তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা অনুমান করিবার জন্য বোধ হয় আমাদিগকে অতিরিক্ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। আমাদের বিশ্বাস যে, হরিশ্চন্দ্র রোহিতের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা কিছু বিরক্ত বা আশঙ্কিত হইয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অংশে (৭ম. ১৯) রাজসূয় যজ্ঞের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই অংশ দেখিলেই আমাদের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ বুঝা যাইবে। সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে এই রাজসূয় যজ্ঞ লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পরের মধ্যে মহান্ বিরোধ ঘটিয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা স্থূল ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা জয়লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণদিগেরই জয়লাভ হইল। কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে যজ্ঞফল হইতে একেবারে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। স্থির হইল যে, ক্ষত্রিয়েরা নিজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের দ্বারা করাইতে পারিবেন। কেবল তাহাই নহে, যখন ক্ষত্রিয় রাজা যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইবেন, তখন তাঁহাকে সম্মত হইতে হইবে যে, কোনরূপে তিনি ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মানমর্য্যাদা, ধন, আয়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্ব, এমন কি সন্তানসন্ততি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইহার অধিক আরও স্থির হইল যে, ক্ষত্রিয় রাজন্য যতক্ষণ অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন, ততক্ষণমাত্র তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে. কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণের নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিবরণ দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব লাভের কিছু পরেই হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করায়, বিশেষতঃ যে অনুষ্ঠানে

মিত্র অজীগর্ত্তকে দোষী বলায় যেন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র খুব সম্ভবতঃ আমরা মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকে প্রাপ্ত হই।

সর্ব্বপ্রধান হোতৃপদ তদানীন্তন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকেই দিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল তাহাতে যে, নারদপ্রমুখ ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের বিরক্তি ও ক্রোধ হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কিছুমাত্র অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ইহার উপর বাল্মীকিপ্রোক্ত বিশ্বামিত্র সম্পর্কীয় পূর্ব্ব ঘটনাগুলি আমাদের এই প্রকার প্রতীতির সপক্ষে গুরুতর সাক্ষ্য দান করিবে। হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কুর সমকালে বিশ্বামিত্র কোন প্রদেশের প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অবশেষে বসিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্যা যে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠ', বসিষ্ঠ তাহা বিশ্বামিত্রকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তখন বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিবার অভিলাষ জন্মিল। তিনি বসিষ্ঠের নিকটে রাশি রাশি ধনরত্নের বিনিময়ে সেই ব্রহ্মবিদ্যা ক্রয় করিবার বাসনা জানাইলেন। বসিষ্ঠ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে তিনি বলপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। রাজসূয় যজ্ঞ লইয়া একবার ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; আবার এই সূত্রে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ পুনঃ জাগ্রত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণেরা শক, যবন হুন প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিদিগের সহায়তায় বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিতে পারিল। অবশেষে তিনি তপস্যা বা কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রাহ্মণত্ব লাভের যত্ন করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজর্ষিত্ব লাভ করিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তপস্যার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছাতে কুলপুরোহিত বসিষ্ঠের নিকট যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বোধ হয়, বিশ্বামিত্রের কারণে ক্ষত্রিয়দিগের উপর ঘোরতর ক্রোধ সঞ্জাত হওয়ায় বসিষ্ঠ "তাহা হইবার নহে" বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ত্রিশঙ্কু বসিষ্ঠের নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে তাঁহার পুত্রগণের নিকটে সেই প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন অথবা তাঁহাকে 'একঘরে' করিলেন। অগত্যা ত্রিশঙ্কু রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়া সেই প্রস্তাব করিলেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বসিষ্ঠপুত্রেরা এই যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না আসাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে মুষ্টিক (ডোম) হইবার অভিশাপ দিয়া 'একঘরে' করিয়া ফেলিলেন। এই স্থলে দেখি যে বিশ্বামিত্রের হোতৃত্ব করিবার অধিকার হয় নাই—তিনি এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর নিম্নপদে বরিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগের সাহায্যে এই যজ্ঞের ইষ্টফল বিষয়ে বিশ্বামিত্রকে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই। এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, ইত্যবসরে ত্রিশঙ্কু পরলোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব লাভ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প করিলেন। ব্রহ্মণেরা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র কোন শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিবেন, আর বাস্তবিকও তিনি শ্রেষ্ঠ হোতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন; এই

অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রাহ্মণদিগের ক্রোধ ও বিরক্তি পুনঃ সন্দীপিত হওয়াই সম্ভব।

যাই হৌক্, আমাদের অনুমান হয় যে, হরিশ্চন্দ্র নারদ প্রভৃতির নিকটে রাজসূয় অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প প্রকাশ করাতে তাঁহারা তাঁহাকে যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহার নবজাত পুত্র বলিদানে করিতে পরামর্শ দিয়া কোন প্রকারে সম্মত করাইতে পারিয়াছিলেন; অথবা এই যজ্ঞ করিলে তাঁহার নবজাত পুত্রকে হত্যা করিয়া বংশলোপ করিবেন, হরিশ্চন্দ্রকে ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাও অনুমান হয়। হরিশ্চন্দ্র, স্বাভাবিক পুত্রবাৎসল্য বশত রাজসূয় স্থগিত রাখিয়া রোহিতকে রক্ষা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে, যখন তিনি বরুণরাজার (অর্থাৎ বরুণরাজার হইয়া নারদপ্রমুখ যে সকল ব্রাহ্মণ রোহিতের বলিদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের) অনুরোধ এড়াইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না; অথবা যখন তিনি দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া তাঁহার যৌবনারূঢ় পুত্রবধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন, তখন তিনি রোহিতেকে ডাকিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহাকে যজ্ঞক্ষেত্রের পশু হইয়া নিহত হইতে হইবে; এই সূত্রে পূর্ব্বাহ্লেই হরিশ্চন্দ্র যে স্বীয়পুত্রকে পলায়নের পরামর্শ দেন নাই, একথা কে বলিতে পারে? আর, রোহিতেরও তখন "বর্ম্মধারণের" উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, সুতরাং তিনিই বা সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কেন? তিনি এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে প্রবল দেখিয়া, ধনুর্ব্বাণমাত্র সহায় করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেন। এই বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের নিশ্চয় সহায়তা ছিল, অন্যথা তাঁহার প্রতি রোহিতের ভক্তি থাকিতে পারিত না— শুনঃশেপেই আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। কিন্তু রোহিতের পিতৃভক্তি অব্যাহত ছিল, পিতার উদরী হওয়াতে তাঁহার গৃহাগমন-চেষ্টাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

আখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে হরিশ্চন্দ্রের উদরী হওয়াতে রোহিত তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-বেশে উপস্থিত হইয়া অরণ্য পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে রোহিত পঞ্চ সুদীর্ঘ বৎসর অরণ্যেই যাপন করিলেন। বোধ হয়, কতকগুলি ব্রাহ্মণ রোহিতের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা হয়ত গ্রামের সংবাদ আনিয়া রোহিতকে প্রদান করিতেন। অনুমান হয় যে, যতদিন ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন সেই দলস্থ ব্রাহ্মণেরা রোহিতকে গ্রামে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন—বোধ হয় তথায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। অবশেষে ষষ্ঠ বৎসরে যখন রোহিত ঋষিপুত্র শুনঃশেপকে প্রাপ্ত হইলেন (তখন বোধ হয় হরিশ্চন্দ্রের অনেক বন্ধু লাভও হইয়াছিল এবং রোহিত সম্ভবতঃ গ্রামের এই সকল সংবাদও পাইয়া থাকিবেন), তখন তিনি মহানন্দে পিতৃসমীপে আসিয়া তাহা নিবেদন করিলেন। হরিশ্চন্দ্রও তাহা বরুণ রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন অর্থাৎ নিজে এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলেন।

অবশেষে যখন হরিশ্চন্দ্র বরুণরাজার 'আদেশ' অথবা নিজের মনে সায় পাইলেন যে বলির জন্য

ক্ষত্রিয়পুত্র রোহিত অপেক্ষা ব্রাহ্মণপুত্র, বিশেষত ঋষিপুত্র শুনঃশেপ অধিকতর দেবপ্রিয় অর্থাৎ যখন তিনি ভাবিলেন বোধ হয় যে, মরিতে গেলে তাঁহার বীরপুত্র আপেক্ষা বামুনের ছেলেরই মরা ভাল এবং তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের উপর প্রতি-হিংসাবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে, তখন তিনি শুনঃ-শেপকেই যজ্ঞস্থলে যজ্ঞীয় পশুর পরিবর্ত্তে রক্ষা করিলেন। তখন হয়ত ব্রাহ্মণদিগের চৈতন্য হইয়াছিল—তাঁহারা দেখিলেন, হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ইহার বিরুদ্ধে নরবলি ইত্যাদিরূপ কোনই আপত্তি করিতে পারিতে-ছিলেন না, কারণ তাঁহারাই এক সময়ে রোহিতের বলিদান প্রশস্ত বলিয়াছেন। আর এখন নরবলি বলিয়া আপত্তি করিলে হরিশ্চন্দ্রই বা শুনিবেন কেন? হরিশ্চন্দ্র ব্রহ্মহত্যারও আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না, কারণ শুনঃশেপকে মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণেরা হরিশ্চ-ন্দ্রকে কৌশলে জব্দ করিবার জন্য শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন—যূপ-কাষ্ঠে বদ্ধ না করিলেও বলির জন্য বধ করা যাইবে না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না বোধ হয় যে অর্থলোভে মনুষ্য সকল কুকর্ম্মই করিতে পারে। তাঁহারা অবাক্ হইলেন যে শুনঃশেপের পিতা স্বয়ং একশত গাভীর লোভে তাঁহাকে বদ্ধ করিতে স্বীকার করিলেন। তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের কেহই ঘাতুকের কর্ম্ম করিবেন না। হায়! অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। তাঁহারা যেমন রোহিতকে বলিদানের প্রস্তাব কালে ভাবিতে পারেন নাই যে কোন ব্রাহ্মণ ঋষি অর্থলোভে তাঁহার পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারেন, সেইরূপ ইহাও তাঁহাদের চিন্তার অতীত ছিল যে, ব্রাহ্মণ ঋষি অর্থলোভে তাঁহার পুত্রের ঘাতুকেরও কর্ম্ম করিতে পারেন। অজীগর্ত্ত স্বয়ং ঘাতু-কের কর্ম্ম করিতে উদ্যত। এই সময়ে বোধ হয় যে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উদ্ধারের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ যখন শুনঃশেপ অঞ্জঃসব আসব অবিষ্কার করিলেন এবং যখন তিনি অতি সুন্দর ঋক্‌মন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবস্তুতি করিতে লাগিলেন, -তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে, এই ঋষিবালক সামান্য বালক নহে, নিজেও একজন ঋক্‌দ্রষ্টা ঋষি, এবং তখন তাঁহারা, বোধ হয়, এই অসামান্য ঋষিবালকের জীবন রক্ষা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। আমাদের অনুমান হয় যে, তাঁহারা এখন বিপদ গণিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে নানা প্রকারে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, এমন অসাধারণ ব্যক্তিকে বলি-দান করা সঙ্গত নহে; হয়ত ইহাও বুঝাইয়া-ছিলেন যে, আর কোন প্রকার নরবলি দেওয়া হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে সোম প্রভৃতি বলি দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে; সম্ভবত হরিশ্চন্দ্রকে এই-রূপ বুঝাইয়া দেওয়াতে তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইল এবং তিনি শুনঃশেপের পাশমুক্তি বিধান করি-লেন। আখ্যানে আমরা দেখি যে শুনঃশেপের দেবস্তুতি যেই শেষ হইয়া গেল, অমনি তাঁহার বন্ধনপাশ মুক্ত হইয়া গেল, জীববলির পরিবর্ত্তে সোমবলি দেওয়া হইল এবং (সম্ভবত তাঁহার মনের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করাতে) হরিশ্চন্দ্রের রোগও ভাল হইয়া গেল।

শুনঃশেপের এই বন্ধনমোচনে বোধ হয় বিশ্বামিত্র খুব সহায়তা করিয়াছিলেন; আমরা

দেখি যে তিনি বন্ধনমুক্ত হইলে প্রথমেই বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং এবং তাঁহারই পুত্রস্থানীয় হইবার ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহার পিতা পুত্রের এত গুণ দেখিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে শতগাভী প্রাপ্তির প্রলোভন সত্ত্বেও শুনঃশেপ তাঁহার ঘাতুককল্প পিতার নিকটে যাইতে স্বীকার করিলেন না। বিশ্বামিত্রও তাঁহাকে তাঁহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিয়া, উদারভাবে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রের সমুদয় অধিকার প্রদান করিয়া আপনার "দেবরাত" বা দেবদত্ত পুত্র বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্রের বিশেষ একটী লাভ হইল। শুনঃশেপের ন্যায় উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ঋষি যখন তাঁহার পুত্র হইলেন, তখন তাঁহার নিজের ব্রাহ্মণত্বও ঐ খানেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং শুনঃশেপকে সেই ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র পাইলেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা আমাদের ধারণা হইয়াছে যে এই শৌনঃশেপাখ্যানের অথবা ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার মূলসূত্র ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ।

এই শৌনঃশেপাখ্যান পাঠ করিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মত প্রচার করেন যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হইবার সময় যজ্ঞার্থে নরবলি প্রচলিত ছিল। আমাদের বিশ্বাস যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময়েই যে নরবলি অপ্রচলিত ছিল তাহা নহে; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই আখ্যানে যে বৈদিক সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে সময়েও তাহা প্রচলিত ছিল না। এক সময়ে আর্য্যদিগের মধ্যে যে নরবলি একটা প্রচলিত প্রথা ছিল, তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু ধ্যানপরায়ণ আর্য্যজাতি তাহার দোষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচিত হইবার বহুপূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় এত হীনবীর্য্য ছিলেন না যে, প্রচলিত কোন প্রথার দোষ দেখিয়ামাত্র নীরব থাকিবেন, সংশোধনের চেষ্টা করিবেন না। তাঁহারা দোষ দেখিয়া নরবলি প্রথা এবং ক্রমে ক্রমে যজ্ঞার্থে জীবহিংসা পর্য্যন্ত রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্রীহি প্রভৃতি বলি দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হইবার এত কাল পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, ঐতরেয় ঋষি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে "দেবতারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন"; অর্থাৎ তিনি বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, যদিও বহুকালের ব্যবধান বশতঃ এই বিধিপ্রবর্ত্তকদিগের নামধাম জানা অসম্ভব, কিন্তু তাঁহারা যে দেবহৃদয়, সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই (২ পং, ৮)।

দ্বিতীয়তঃ, যদি নরবলি প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে তদ্বিষয়ে নূতন করিয়া নারদের পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক হইত না। তৃতীয়তঃ, অজীগর্ত্ত শস্ত্রহস্তে পুত্রসমীপে আসিবার পূর্ব্বে শুনঃশেপের বিশ্বাসই হয় নাই যে, সত্য সত্য তাঁহাকে বলি দেওয়া হইবে; পরে যখন তাহা বুঝিলেন, তখন দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন, এইরূপ ভাবের কথা আখ্যানে উল্লিখিত আছে। যদি নরবলি প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে শুনঃশেপের বধ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াও এরূপ অবিশ্বাস আসিতে পারিত না। নরবলি চলিত

থাকিলে ব্রাহ্মণ হইলেও অরণ্যনিবাসী অজ্ঞাত-কুলশীল এক ব্যক্তিকে হনন করিবার জন্য ঘাতুকের অভাব হইত না—একমাত্র তাঁহার পিতা অর্থলোভে পড়িয়াই তাদৃশ নিষ্ঠুর কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক ঋষি যে পুত্রবধ-রূপ কুকর্ম্মে উদ্যত হইতে পারেন এবং তাহা যে অত্যন্ত ঘৃণিত, তাহা দেখাইবার জন্যই যেন ঐতরেয় ঋষি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং কুকর্ম্মের জন্য অজীগর্ত্ত তাঁহার পুত্র ও বিশ্বামিত্রের নিকট কিরূপ তীব্র তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সকল কারণে আমরা একটী নরবলির উদ্যোগ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে পারি না যে তখন নরবলি দেওয়া একটী প্রচলিত প্রথা ছিল। ভীম ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ দুঃশাসনকে বধ করিয়া রক্ত পান করিয়াছিলেন। তাহা হইতে কি আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ যে মহাভারতের সময়ে অথবা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্যকালে শত্রুর বুক চিরিয়া রক্তপান করা প্রচলিত প্রথা ছিল?

এই শৌনঃশেপ আখ্যান উপলক্ষে পণ্ডিত মোক্ষমূলের একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে অজীগর্ত্ত ঋষি আর্য্য বা অনার্য্য? * তাঁহার মতে অজীগর্ত্ত হয় অনার্য্য বা শূদ্র ছিলেন; অথবা যদি ইহা স্থির হয় যে তিনি আর্য্য ছিলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তখন এমন এক সম্প্রদায় আর্য্য ছিলেন, যাঁহারা আপনাদের পুত্র বিক্রয় করিতে ও তাহাদিগের হননকার্য্যে পর্য্যন্ত উদ্যত হইতে পারিতেন; তাঁহারা হয়ত অন্যান্য আর্য্যদিগের সঙ্গে আসেন নাই, পৃথক্ আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি। আমাদের মনে কিন্তু এ সকল কথার কোনটীই সায় পায় না। আমাদের ধারণা এই যে, অজীগর্ত্ত প্রকৃতই একজন ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন; কিন্তু তিনি সপরিবারে বহুকাল যাবৎ বনবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রত্রয়ের নাম দেখিলেই অনুমিত হইতে পারে যে, তিনি নগরগ্রামের মুখ বহুকাল যাবৎ দেখেন নাই—পুত্রত্রয়ের নাম, শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ এবং শুনোলাঙ্গূল; যেন মনুষ্য অপেক্ষা কুক্কুরাদির সহিত তাঁহার অধিকতর পরিচয় ছিল। কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি একশত গাভী প্রাপ্ত হইলেন, তখন ক্রমশ তাঁহার লোভ বাড়িয়া গেল এবং সেই লোভে পড়িয়াই তিনি পুত্রবধরূপ কুকর্ম্মে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া তাঁহাকে অনার্য্য কল্পনা করিবারও প্রয়োজন নাই এবং ইহাও বলা সঙ্গত নহে যে, একদল আর্য্য ছিলেন, যাঁহাদের হৃদয় পুত্রবিক্রয় অথবা পুত্র-হননকার্য্যে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। অজীগর্ত্ত যে অনার্য্য ছিলেন না, শুনঃশেপের উক্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। শুনঃশেপ যখন বলিতেছেন যে 'শূদ্রেরও হস্তে পুত্রবধে উদ্যত অস্ত্র দেখা যায় না, কিন্তু তোমার হস্তে তাহা দেখা গিয়াছে'—ইহাতেই কি সপ্রমাণ হয় না যে অজীগর্ত্ত শূদ্র বা অনার্য্য ছিলেন না। আর, যদি কোন সাধু খৃষ্টান দৈবাৎ মোহবশতঃ খৃষ্টের কোন একটী অনুজ্ঞা অমান্য করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে একেবারে অখৃষ্টান বলাও সঙ্গত।

* His. of Ancient Sans. Literature.

নহে এবং তাঁহার একটী দৃষ্টান্তের বলে এমন বলাও কি সঙ্গত যে একদল ভদ্র খৃষ্টান খৃষ্টের সেই অনুজ্ঞা পালন করেন না? তাহা কখনই হইতে পারে না।

অজীগর্ত্ত ও মনুসংহিতা।

যাই হউক, শুনঃশেপের বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার পিতা অজীগর্ত্ত যে গুরুতর অন্যায় করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতরেয় ঋষি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে অজীগর্ত্ত নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিয়া যথেষ্ট পশ্চাত্তাপ এবং নিজের কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু মনুসংহিতা, কি জানি কেন, অজীগর্ত্তের কার্য্যকে দোষশূন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় আছে—

"অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥"
১০ম, ১০৫

"অজীগর্ত্ত বুভুক্ষিত হইয়া পুত্রকে বধ করিবার জন্য উদ্যক্ত হইয়াছিলেন; ক্ষুৎপ্রতীকারার্থে এরূপ আচরণ করিলেও পাপলিপ্ত হয়েন নাই।" মনুসংহিতার এরূপ কথা বলা, আমাদের বোধ হয়, যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। যখন অজীগর্ত্ত নিজে অনুভব করিয়া বলিতেছেন যে এরূপ কর্ম্মে তাঁহার পাপ হইয়াছে, তখন তাঁহার যে পাপ হয় নাই, অপরের মুখের এরূপ কথা গ্রাহ্য হইবে কেন? আর একটী কথা এই যে, মনু এস্থলে বলিতেছেন যে, দুর্ভিক্ষাদির সময় ক্ষুধায় দিশাহারা হইয়া পুত্রবধার্থে উদ্যত হইলেও কোন দোষ হয় না! না হয়, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম। কিন্তু অজীগর্ত্তকে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে আনয়ন করা আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। অবশ্য অজীগর্ত্ত সর্ব্বপ্রথমে করাল অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই একশত গাভীর বিনিময়ে পুত্র শুনঃশেপকে বিক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে যে দুই শত গাভীর বিনিময়ে পুত্রকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ও তাঁহাকে হনন করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাও কি অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—কখনই নহে, তাহা অর্থপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এই অবস্থায় মনু যে কি কারণে অজীগর্ত্তকে পাপশূন্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

একটী কথা এই যে, হয়তো উক্ত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত? আমরা কিন্তু সে কথায় সায় দিতে পারিতেছি না। জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে কতকগুলি কার্য্য যে দোষাবহ হয় না, এই বিষয়ের উপদেশ এবং তৎসঙ্গে অজীগর্ত্তের দৃষ্টান্ত এত প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক ভাবে আসিয়াছে ও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, মনুসংহিতার এই অংশটা বারম্বার আলোচনা করিয়াও আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে উক্ত শ্লোকটা প্রক্ষিপ্ত।

আমাদের মীমাংসা এই যে, মনু অজীগর্ত্তের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমুলরের ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরও নিকটে এই মীমাংসায় সায় পাই। মনু যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত আখ্যান জানিতেন না তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে তিনি ঐ একটী শ্লোকের মধ্যে সমুদয় আখ্যানের স্থূল কথা সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন না। আর মনুসংহিতার রচ-

য়িতার ন্যায় মহাপুরুষকে বৈদিক বিষয়ে অজ্ঞ বলিতে, আশা করি, আমাদিগের মধ্যে কেহই সাহস করিবেন না। সুতরাং মনু যে অজীগর্ত্তের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা আর সন্দেহ করিতে পারি না। তাঁহার এরূপ চেষ্টা করিবার যে অনেক কারণ ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। মনু সমাজকে বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য না রাখিলে খুব সম্ভবত সমাজকে সুশৃঙ্খলায় আনা অসম্ভব হইত। আমাদের বোধ হয়, ব্রাহ্মণ অজীগর্ত্ত যে তাঁহার পুত্রবধে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা মনুসংহিতার সময়ে গল্পভাবে প্রচলিত ছিল—ঐতরেয়োক্ত আখ্যান লোকের মনে তত জাগ্রত ছিল না। যাহাতে অজীগর্ত্তকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা না জন্মে অথবা ব্রাহ্মণের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সাধারণ লোকের কুকর্ম্মে মতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, এই সকল মনু কর্ত্তৃক অজীগর্ত্তের দোষ ঢাকিবার উদ্দেশ্য হইতে পারে। আর একটী কারণ বোধ হয় এই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের প্রতি বিরক্ত ছিলেন; বোধ হয় বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্তকে দোষী বলায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র আমরা মনুসংহিতার এই শ্লোকে প্রাপ্ত হই। যাইহোক মনুর এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে যাওয়া নিতান্তই অযুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে।

মনুসংহিতায় এইরূপ উল্লেখ থাকাতে আর একটী বিষয় অনুমিত হইতেছে যে, মনুসংহিতার সময়ে বেদপাঠ প্রভৃতির বিধি থাকিলেও তখন সাঙ্গ বেদপাঠ তত প্রচলিত ছিল না; কারণ তাহা প্রচলিত থাকিলে অনেকেই বৈদিক গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সহিত মনুসংহিতার এই বিষয়ে বিরোধ দেখিতে পাইতেন। তখন তাঁহারা শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই অবলম্বনীয়, মনুসংহিতারই এই বচনানুসারে অজীগর্ত্তের যে পাপ হইয়াছিল, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কথাই মানিয়া লইতেন এবং তাহা হইলে মনুও শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্য লিখিতে সাহসী হইতেন না। মনুসংহিতার এই অংশ হইতে বুঝিতেছি যে, মনুসংহিতা ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থের ন্যূনাধিক শতবর্ষ পরে রচিত হইয়াছে, কারণ, ইহাতেও আখ্যানের সারভাগের সঙ্গে সঙ্গে অজীগর্ত্ত নামটীও অবিকৃত দেখিতে পাই।

এইবারে আমরা বাল্মীকি-রামায়ণে আসিয়া উপনীত হইলাম (আদি, ৬১ সর্গ)। ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থের বহু পরে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, আমাদের এইরূপ অনুমান হয়। আমরা ইহাতে দেখি যে ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্র-কথা বা শৌনঃশেপাখ্যানের মূল অংশ ঠিক রাখা হইয়াছে, কেবল আখ্যানোল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তি ও স্থানের নামধাম পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র রাজা, বিশ্বামিত্র হোতা ও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত, হরিশ্চন্দ্র-তনয় রোহিত, অজীগর্ত্তপুত্র শুনঃশেপ রোহিত কর্ত্তৃক অরণ্যবাসকালে দৃষ্ট হয়েন এবং শুনঃশেপ

রামায়ণে শৌনঃশেপ আখ্যান।

বিশ্বামিত্রের নিকটে কোন ঋক্ শিক্ষা না করিয়া স্বয়ংই তাহা দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। রামায়ণে আছে যে, অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করিতে গেলে ইন্দ্র কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছিল। পুরোহিত তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে এক নরবলি দিবার বিধি দেওয়াতে অম্বরীষ উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অবশেষে তিনি ভৃগুতুঙ্গ নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় ঋচীকমুনিকে পত্নী ও পুত্রত্রয়ের সহিত আসীন দেখিতে পাইলেন। এইখানে সেই শৌনঃশেপ আখ্যানের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এখানে মধ্যম পুত্রের নাম শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শুনক বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। আরও দেখি যে, রামায়ণে রাজার নিকটে শুনঃশেফ ঋচীক কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বিক্রীত হন নাই। ঋচীক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং ঋচীকপত্নী কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করায় শুনঃশেফ অভিমানভরে স্বয়ং রাজার নিকটে বলিলেন "হে রাজপুত্র! আমার পিতা বলিলেন 'জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রদান করিব না' এবং মাতা বলিলেন 'কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না' সুতরাং বোধ হইতেছে "আমি মধ্যম, আমি বিক্রেয়,' আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।" অম্বরীষ অবশ্য ঋচীককে ধনরাশি প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে শুনঃশেফকে রথে আরোহণ করাইয়া রাজধানীর অভিমুখে ফিরিলেন। পথে পুষ্কর তীর্থ; তথায় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রকে তপস্যা করিতে দেখিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্রদিগকে তাঁহাদিগের কাহারও জীবনের বিনিময়ে শুনঃশেফের রক্ষাসাধনে আদেশ করিলেন। কিন্তু মধুষ্যন্দ প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের তনয়েরা তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে পিতা কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হইলেন। তাহার পরে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে আগ্নেয় মন্ত্র এবং দুইটী গাথা শিক্ষা দিয়া তাহাই তাঁহার মুক্তির উপায় বলিলেন। তদনন্তর যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া শুনঃশেফ যথাবিধি সেই আগ্নেয় মন্ত্র ও দুই গাথাদ্বারা ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবদ্বয়কে স্তব করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

রামায়ণের এই শৌনঃশেফ উপাখ্যানে দেখিতেছি যে, বাল্মীকি এই আখ্যানের সহিত ইন্দ্র কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় পশু হরণের একটা বৃথা কথা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ প্রক্ষেপ বা সংযোগ মূল ঘটনার অনেক পরে ব্যতীত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি নাম পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। শুনোলাঙ্গূল নাকি রামায়ণের সাময়িক সভ্যভব্য শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বড়ই কর্কশ লাগিতে পারে, অথবা হয়তো "লাঙ্গূল" শব্দের অস্তিত্বই ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাই ঋচীকের কনিষ্ঠপুত্রের শ্রুতিমধুর শুনক নাম রাখা হইল। সেইরূপ অজীগর্ত্ত বড়ই নাকি অসভ্য কর্কশ নাম, তাই তৎপরিবর্ত্তে সভ্যভব্য ঋচীক নাম রাখা হইল। সম্ভবতঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে সুদূরব্যবহিত রামায়ণের কালে অজীগর্ত্তের নাম আধস্পষ্ট আধ অস্পষ্ট ভাবে স্মরণ হইতে হইতে ঋচীক আকারই ধারণ করিয়াছিল—অজীগর্ত্ত ও ঋচীক, এই উভয় নাম শীঘ্র শীঘ্র উচ্চারণ করিলেই উভয় নামের সৌসাদৃশ্য দেখা যাইবে। এইরূপ হরিশ্চন্দ্রের পরিবর্ত্তে অম্বরীষ স্থান পাইয়াছেন।

রামায়ণে এই সকল নামপরিবর্ত্তন এবং

বিশ্বামিত্রের পুষ্করতীর্থে তপস্যা ও তথায় শুনঃশেফকে মন্ত্রশিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে রামায়ণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং মনুসংহিতারও অনেক পরে রচিত হইয়াছে; রামায়ণের সময়ে লোকে মূল আখ্যান একেবারে বিস্মৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু অনেকটা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। রামায়ণের সময়েও লোকে জানিত যে শুনঃশেফ নানা দেবস্তুতি করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অঞ্জঃসব নামক আসব প্রস্তুত করা যে মুক্তিলাভের অন্যতর হেতু ছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। তখনও লোকের ধারণা ছিল যে বিশ্বামিত্রের সহায়তায় শুনঃশেফের মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্র যে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া এই সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল; তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের পুষ্করতীর্থে তপস্যা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ উপকথা রামায়ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তখনও লোকদের এইটুকু স্মরণ ছিল যে, বিশ্বামিত্রের অবাধ্য হওয়াতে তাঁহার পুত্রগণ শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সকল পুত্রের যে এরূপ দশা ঘটে নাই তাহা স্মরণ ছিল না, তাই সকল পুত্রকেই এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে। রামায়ণে শুনঃশেফের অভিমান সুব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু চোরের উপর রাগ করিয়া ভূমিতে ভাত খাইবার ন্যায় পিতামাতার উপর অভিমান করিয়া বধ্যভূমিতে নীত হইবার জন্য আত্মসমর্পণ করা সুসঙ্গত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ভাব ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সমসময় অপেক্ষা অধিকতর সভ্যভব্য সময়েই সম্ভবে।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা রামায়ণকে পরিত্যাগ করিব। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র এবং লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ত্রিশঙ্কুর পুত্র অম্বরীষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দেখিতেছি যে ইক্ষ্বাকু বংশীয় হরিশ্চন্দ্রেরই সহিত শৌনঃশেপ আখ্যান সংযুক্ত এবং কোথায়ও ইক্ষ্বাকুবংশে এক হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ দেখা যায় না; মহাভারতেও ইহারই পরিপোষক বাক্য দেখিতে পাই —তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এই সকল কারণে শৌনঃশেপ আখ্যানের সহিত রাজা অম্বরীষের নাম সংযুক্ত করিয়া বাল্মীকি ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

মহাভারতে হরিশ্চন্দ্রকথা।

এইবারে মহাভারতে আমরা হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে কি ঐতিহাসিক তথ্য দেখিতে পাই তাহারই আলোচনা করিয়া হরিশ্চন্দ্রকথার প্রাচীন অংশ সমাপন করিব। হরিশ্চন্দ্রকথাকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রাচীন ও নবীন। যে হরিশ্চন্দ্রকথায় রাজসূয়যজ্ঞ অথবা শৌনঃশেপ বিবরণের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে, সেইগুলি আমরা প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথা বলিয়া ধরিব এবং যেগুলিতে অন্য প্রকার বিবরণ দেখা যাইবে, সেগুলি নবীন হরিশ্চন্দ্রকথা বলিয়া ধরিব। আমরা এখনি দেখিতে পাইব যে মহাভারত পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীন কথা স্থান পাইয়াছে, মহাভারতের পরে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবধি নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার সূত্রপাত হইয়াছে এবং হরিশ্চন্দ্রের এই নবীন কথাই আজ পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির নিকটে বিশেষ সমাদর পাইতেছে।

মহাভারতের দুই তিনটী বিভিন্ন স্থলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমত সভাপর্ব্বে (১২ অধ্যায়ে) আছে যে, নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট ইন্দ্রসভার বর্ণনকালে রাজগণের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন অপর কাহারও নামোল্লেখ না করাতে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে নারদ বলিলেন "সেই বলবান রাজা সমস্ত মহীশ্বরদিগের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শাসনে সকল ভূপালেরাই অবনত হইয়াছিলেন। হে লোকপতে! তিনি সুবর্ণ-বিভূষিত একমাত্র জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া শস্ত্রপ্রতাপে সপ্তদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! তিনি শৈল, বন ও কানন সম্বলিত সমগ্র মহীমণ্ডল জয় করিয়া রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকল ভূপাল তাঁহার আজ্ঞানুসারে ধনাদি আহরণ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞকালে যাচকেরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র প্রীতিসহকারে তাহাদিগকে তাহার পঞ্চগুণ অতিরিক্ত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত হইলে তিনি নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ নানা প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য ও বহুবিধ ধন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও রত্ননিকর দ্বারা তর্পিত ও সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র এইরূপ উদ্বোধন করিয়াছিলেন যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল ভূপাল অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছেন। হে রাজন্! এই কারণে হরিশ্চন্দ্র সেই সহস্র সহস্র রাজন্যগণ অপেক্ষা সমধিক বিরাজমান হইতেছেন। সেই প্রতাপবান্ মহীপতি উক্ত যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন।"

শান্তিপর্ব্বে (২৯ অধ্যায়ে) যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উৎসাহিত করিয়া দেবস্থান ঋষি বলিতেছেন "আপনি শুনিয়া থাকিবেন, পার্থিবেন্দ্র হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই পুণ্যভাগী ও শোকরহিত হইয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য হইয়াও ঐশ্বর্য্যে দেবরাজকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

অনুশাসনপর্ব্বে (৩য় অধ্যায়) আমরা শৌনঃশেপ আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হই; কিন্তু এখানে শুনঃশেপকে ঋচীকপুত্র বলা হইয়াছে এবং বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশ পুত্রেরই শাপগ্রস্ত হইবার কথা আছে। এই আখ্যানটী কুশিকবংশের গুণকীর্ত্তন উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মর্ষিসঙ্কুল বিদ্যাবান্ অতি মহান্ কুশিকবংশ এই নরলোকে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে; ঋচীকপুত্র মহাতপা শুনঃশেপ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে আত্মপ্রভাবে সন্তুষ্ট করত মহাসত্র হইতে বিমোক্ষিত এবং ধীমান্ বিশ্বামিত্রের পুত্রতা প্রাপ্ত হয়েন (এই) জ্যেষ্ঠ নরাধিপ (বংশীয়) দেবরাতকে (দেবদত্ত বিশ্বামিত্রপুত্র শুনঃশেপকে) বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পঞ্চাশ পুত্র অভিবাদন না করাতে শাপবশত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" *

* সংস্কৃত শ্লোকগুলি এই—
ঋচীকস্যাত্মজশ্চৈব শুনঃশেপো মহাতপাঃ।
বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুতামভ্যুপাগতঃ॥

হরিবংশ যদিও মহাভারতের ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি ইহাতেও হরিশ্চন্দ্র বিষয়ক যাহা পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ এইখানেই করিয়া রাখা ভাল। হরিবংশে (১৩ অধ্যায়ে) আছে—"সর্ব্বশক্তিমান্ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দেবগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠের সাক্ষাতে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করাইলেন, ত্রিশঙ্কুর সত্যরথা নামে কেকয়বংশজা ভার্য্যা ছিলেন। সেই ভার্য্যাতে তিনি হরিশ্চন্দ্র নামক নিষ্পাপ কুমারের জন্মদান করেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রিশঙ্কুর পুত্র বলিয়া ত্রৈশঙ্কব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হন; হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত অতিশয় বীর্য্যবান্ ছিলেন; তিনি রাজ্যের উন্নতি করিবার কারণ এই রোহিতপুর নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই রাজর্ষি রোহিত রাজ্য ও প্রজাবর্গকে যথাবৎ পালন করিয়া সংসারের অসারতা জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সেই নগর সম্প্রদান করেন।"

মহাভারতোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হইতে আমরা ঐতরেয়োক্ত হরিশ্চন্দ্রকথারই বিশেষ পোষকতা প্রাপ্ত হইতেছি—একটী স্থান সামান্য বিভিন্ন দেখি। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র যে রোহিত, তদ্বিষয়ে মহাভারত ও হরিবংশ উভয়েতেই সায় পাইতেছি। বিষ্ণুপুরাণে রোহিতাশ্ব বলিয়া উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ তাহা হইতেই এই নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণে এবং নবীন হরিশ্চন্দ্রকথা-সম্বলিত অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে। ইহা অতি সামান্য প্রভেদ, ধর্ত্তব্য নহে। রামায়ণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার আলোচনাকালে বলিয়া আসিয়াছি যে রামায়ণে শৌনঃশেপ আখ্যানের সহিত রাজা অম্বরীষের নাম সংযুক্ত এবং লিঙ্গপুরাণে ত্রিশঙ্কুর পুত্র অম্বরীষ, এরূপ উল্লেখ থাকিলেও আমরা বিষ্ণুপুরাণের সমর্থনে এবং মহাভারতের পোষকতায় হরিশ্চন্দ্রকেই ত্রিশঙ্কুর পুত্র ও শৌনঃশেপাখ্যানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহার উপর যখন হরিবংশেও এই বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতেছি, তখন এবিষয়ে অধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করা শ্রেয় নহে বিবেচনা করি। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেরও বর্ণনা হইতে দেখিতেছি যে, অজীগর্ত্তের নাম, কি জানি কেন, মনুসংহিতার পর হইতেই বিস্মৃত হইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঋচীক নাম আনীত হইয়াছে। আরও দেখিতেছি যে, মহাভারতের সময়ে বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বসাধার-

---

হরিশ্চন্দ্রক্রতৌ দেবাংস্তোষয়িত্বাত্মতেজসা।
পুত্রতামনুসম্প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ॥
নাভিবাদয়তে জ্যেষ্ঠংদেবরাতং নরাধিপং।
পুত্রাঃ পঞ্চাশদেবাপি শপ্তাঃ শ্বপচতাং গতাঃ॥

মহাভারতের বর্দ্ধমান সংস্করণে "হরিশ্চন্দ্রঃ ক্রতৌ" এইরূপ আছে এবং "হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের পুত্র হইলেন" ইত্যাদিরূপ অদ্ভুত অনুবাদ করা হইয়াছে। তাঁহার কারণ আর কিছুই নহে—সম্পাদক ও অনুবাদকগণের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই অধীত ছিল না, সেই কারণে তাঁহারা প্রত্যেক শ্লোকের একটী কর্ত্তা ও একটী সমাপিকা ক্রিয়া রাখিতে গিয়াই এরূপ গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাই আমরা "হরিশ্চন্দ্রঃ" শব্দের বিসর্গ উঠাইয়া দিয়া "ক্রতৌ" শব্দের সহিত তাহার সমাস করিয়া তদনুরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি। এইখানে দেখা যাইবে যে সংস্কৃত ভাষায় একটী অক্ষরের বিপর্য্যয়ে কিরূপ অর্থ বিপর্য্যয় ঘটে।

ণের নিকটে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাভারত পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি হরিশ্চন্দ্রকথা পাইয়াছি, সকলেরই মূল অংশ দেখি ঐতরেয়োক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান। এই পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকথা দেখিতে পাই। ঐতরেয়োক্ত এই প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথার প্রত্যেক চরিত্রে কেমন এক বীরত্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়—যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহা অনেকটা অবিকৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই বৈদিক আখ্যানে এই বীরত্বের ছবি থাকিয়া গিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, রোহিত, বিশ্বামিত্র, শুনঃশেপ প্রভৃতি সকলেরই চিত্র অতি স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাই আমরা এই শৌনঃশেপাখ্যানে সেই অতি পুরাকালের আর্য্যজাতির ক্ষত্রিয়বীরত্ব এবং ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, উভয়ই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথা উপসংহার করিব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অংশে এই শৌনঃশেপ আখ্যান বা হরিশ্চন্দ্রকথা রহিয়াছে, সেই অংশেই (৮পং, ২১ ইত্যাদি) পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়, দুষ্মন্তপুত্র ভরত প্রভৃতি অনেক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। বোধ হয়, এই কারণে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ "অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিবেচনা করেন।"* আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। দুষ্মন্তপুত্র ভরত কিছু মহাভারতের সমসাময়িক লোক ছিলেন না; বরঞ্চ মহাভারতেই দেখি যে মহাভারতের সময়ে দুষ্মন্ত হইতে ভরতোৎপত্তি যেন বহুপূর্ব্বাবধি প্রচলিত একটী উপাখ্যান ছিল। সুতরাং এই ভরতের কথা থাকাতেই আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই অংশকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিবার কোনই প্রয়োজন দেখিনা। অবিক্ষিৎতনয় মরুত্ত প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল রাজার কথা সেই অংশে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদেরও অনেকের কথা মহাভারতে পুরাকালীন ইতিবৃত্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের কথা থাকিলেও আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই অংশকে "অপেক্ষাকৃত আধুনিক" বলিবার হেতু দেখিতে পাই না।

তবে সেই অংশকে আধুনিক সন্দেহ করিবার পক্ষে একটী কথা দেখিতে পাই—তাহা "পারিক্ষিৎ জনমেজয়।" এই শব্দটী দেখিলেই সন্দেহ হয় বটে যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে অংশে এই শব্দদ্বয় পাওয়া যায়, সেই অংশটী বুঝি অভিমন্যুপৌত্র ও পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের রাজ্যাধিষ্ঠানের পর এবং অন্ততঃ কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের পর লিখিত হইয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে পাশ্চত্য পণ্ডিতেরা এই পারিক্ষিৎ ও পরিক্ষিত-তনয় জনমেজয়ের নাম দেখিয়া এই অংশকে আধুনিক বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। ইহাতে আমরা কিছু আশ্চর্য্য হই নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি মহাভারতটী ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদিগকে এই ভ্রমে পড়িতে হইত না। মহাভারতেই (শান্তি, ১৫০ অ) আমরা দেখিতে পাই যে, মহাভারত-রচনার অথবা কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় সম্পাদিত "হিন্দুশাস্ত্র" প্রথম খণ্ড দেখ।

বহুকাল পূর্ব্বে জনমেজয় নামে এক রাজা ছিলেন এবং তাঁহারও পিতার নাম দুর্ভাগ্যক্রমে পরিক্ষিৎ ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের কোন প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন "শুনকতনয় দ্বিজবর ইন্দ্রোত যাহা জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন, আমি এই বিষয়ে তোমার নিকটে সেই ঋষিগণসংস্তুত পুরাতন বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয় নামা মহাবলপরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন" ইত্যাদি। সুতরাং দেখিতেছি যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই শৌনঃশেপ আখ্যানসম্বলিত অংশকে আধুনিক বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অধিকাংশ স্থলে ভ্রমাত্মক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের শাস্ত্র সমূহকে কোন গতিকে ন্যূনাধিক পাঁচটী হাজার বৎসরের অন্তর্বর্ত্তী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। এই খানে আমরা প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথার উপসংহার করিলাম।

এই বারে আমরা নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার অলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতেই যে এই নবীন কথার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছি। কএকটী নাম ব্যতীত এই নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার সহিত প্রাচীন হরিশ্চন্দ্রকথার কোন অংশেই সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত (৭ম অধ্যায়ে) উপাখ্যানটী আলোচনা করিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। সেই পৌরাণিক

মার্কণ্ডেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রকথা।

উপাখ্যানটী এই—"ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামক এক রাজর্ষি ছিলেন; তাঁহার রাজ্যকালে রাজ্যমধ্যে ব্যাধি, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কোন প্রকার অমঙ্গল প্রবেশ করিতে পারিত না। একদিন তিনি মৃগয়াতে বহির্গত হইয়া এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে বিশ্বামিত্র সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপী ও স্ত্রীমূর্ত্তিধারী বিদ্যাত্রয়ের সাধনা করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্রকে এই বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহারা আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। সেই আর্ত্তনাদ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি বিঘ্নরাটপ্রেরিত হইয়া অভয় প্রদান করিতে করিতে সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া অবশেষে স্ত্রীমূর্ত্তিধারী বিদ্যাত্রয়কে দেখিতে পাইলেন, নিকটে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বিদ্যাত্রয়কে সামান্য মানবী ভাবিয়া এবং তাঁহাদিগকে নিশ্চয় কেহ যন্ত্রণা দিতেছিল এইরূপ স্থির করিয়া যন্ত্রণাদাতার উদ্দেশে নানা ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কোথায়ও অন্তরালে ছিলেন; তিনি হরিশ্চন্দ্রের এই সকল বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং এই ক্রোধবশত বিদ্যাত্রয়ও বিশ্বামিত্রের নিকট চিরবিদায় লইলেন। হরিশ্চন্দ্র ক্রোধপ্রজ্বলিত বিশ্বামিত্র মুনিকে দেখিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার অনেক অনুনয়বিনয় করিলেন; কিন্তু বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নি কিছুতেই প্রশমিত হইল না। তিনি অবশেষে হরিশ্চন্দ্রকে কৌশলক্রমে সত্যপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রজা, কোষাগার প্রভৃতির সহিত

সমস্ত রাজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত রাজ্য অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করিতে এবং দানের আনুসঙ্গিক দক্ষিণা দিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণকে দানের সহিত কিঞ্চিৎ দক্ষিণা না দিলে সে দান নিষ্ফল হয়, এইরূপ ধারণাবশত বোধ হয়, হরিশ্চন্দ্র দানের উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহা প্রার্থনা করাতে হরিশ্চন্দ্র স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র শাপ দিতে উদ্যত, তখন হরিশ্চন্দ্র এক মাসের সময় ভিক্ষা করিলেন। বিরক্তির সহিত ক্রোধান্ধ মুনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন যে তিনি কোথায় যাইবেন; যখন তিনি তাঁহার সমগ্র পৃথ্বীরাজ্য বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিয়াছেন এবং যখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সপরিবারে এই অর্পিত রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন, তখন তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া বিশ্বামিত্রের রাজ্য মধ্যে বাস করিতে পারেন না। অবশেষে তিনি সপরিবারে কাশীগমনই একমাত্র বাসস্থান স্থির করিলেন, কারণ বারাণসী কখন মনুষ্য ভোগ্য হইতে পারে না (তখন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছিল); এইরূপ ভাবিয়া তিনি সপরিবারে কাশীর অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। যাত্রাপথে লোক আর ধরে না—লোকে লোকারণ্য। তাঁহার প্রজাগণ দলে দলে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাজেই হরিশ্চন্দ্রের শীঘ্র প্রস্থান বিষয়ে কিছু বাধা পড়িতে লাগিল। তাহাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং সহসা একটা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা নিরপরাধা হরিশ্চন্দ্র-পত্নীকে তাড়না পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাহাতে কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ না করিয়া "যাইতেছি" এইমাত্র বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রকে টানিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন, তখন ভিক্ষাপ্রাপ্ত এক মাস সময় পূর্ণ হইতে এক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই দিন তাঁহারা কাশীতে পৌঁছিবামাত্রই বিশ্বামিত্রও কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন এবং তাহা না পাইলে অভিশাপ দিবারও যথেষ্ট ভয়প্রদর্শন কবিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্বীকার করিলেন যে, সমস্ত দিবসের মধ্যে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দিতে না পারিলে তিনি নিশ্চয়ই শাপগ্রস্ত হইবার যোগ্য। বিশ্বামিত্র এই কথায় চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি চলিয়া যাইতে না যাইতেই হরিশ্চন্দ্রের মহাচিন্তা আসিল যে কি উপায়ে এই দক্ষিণা সংগ্রহ করিবেন। অবশেষে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহাদের উভয়ের আত্মবিক্রয় ব্যতীত এই দক্ষিণা সংগ্রহের অন্য উপায় নাই। এইরূপ স্থির হইবার পর তাঁহারা এক দোকানের প্রান্তে বসিয়া আপনাদিগকে বিক্রয়ার্থ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার অর্দ্ধেক মুদ্রা মূল্য স্বরূপে দিয়া হরিশ্চন্দ্রপত্নীকে ক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন। এইরূপে হরিশ্চন্দ্রপত্নী শৈব্যাকে ব্রাহ্মণ ক্রয় করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। তাহা দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রতনয় রোহিতাশ্ব মাতার বস্ত্র ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তজ্জন্য উক্ত ব্রাহ্ম-

ণের নিকটে এক পদাঘাত পাইয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে শৈব্যার অনুরোধে ব্রাহ্মণ আরও কিছু দিয়া হরিশ্চন্দ্রতনয় বালক রোহিতাশ্বকেও ক্রয় করিয়া লইলেন। বিশ্বামিত্র পুনরায় আসিয়া দক্ষিণা প্রার্থনা করিলে হরিশ্চন্দ্র কতকটা আশ্বাসের সহিত স্ত্রীপুত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিতে গেলেন, কিন্তু সেই মুনি তীব্র তিরস্কারের সহিত প্রতিশ্রুত দক্ষিণা সেই দিবসের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুনরায় আপনাকে বিক্রয়ার্থ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে এক চণ্ডাল আসিয়া দক্ষিণার অবশিষ্ট অংশের বিনিময়ে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালদাসত্ব প্রথমে অস্বীকার করিয়া, অবশেষে বিশ্বামিত্র আসিয়া শাপভীতি প্রদর্শন করাতে, পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সেই চণ্ডালের অধিকারে একটী মহাশ্মশান ছিল; হরিশ্চন্দ্র সেই শ্মশানে থাকিয়া মৃতব্যক্তিগণের পরিধেয় বস্ত্রসংগ্রহের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, এক দিন শৈব্যা সর্পদংশনে মৃত বৎস রোহিতাশ্বকে শ্মশানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা প্রকার দুঃখে কষ্টে, চণ্ডালোচিত আহার ব্যবহারে, দাসীবৃত্তিরূপ কষ্টকর কর্ম্মে হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর মঙ্গলমূর্ত্তির অনেক বিকৃতি সাধিত হওয়াতে তাঁহাদের কেহই পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন না। সর্পদংশনে রোহিতাশ্বেরও মূর্ত্তি বিকৃত হওয়াতে হরিশ্চন্দ্র তাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার নিকটে অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভুর আদেশানুসারে মৃত শিশুর বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। ইত্যবসরে শৈব্যার বিলাপোক্তিতে তাঁহার আপনার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া তিনি শৈব্যাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার নিকটে নিজেও আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। অবশেষে তাঁহারা উভয়েই মৃতপুত্রের চিতাগ্নিতে দেহত্যাগ করাই পরামর্শসিদ্ধ স্থির করিলেন। ধর্ম্ম তখন সমস্ত দেবগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাদিগকে এই কঠোর কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহারাই এইরূপ লীলা করিয়াছেন। ইন্দ্রদেব অমৃতবৃষ্টি দ্বারা রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবিত করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশেষে দেবগণ হরিশ্চন্দ্রকে সপরিবারে স্বর্গ গমনের বর-প্রদান করিলেন। হরিশ্চন্দ্র তদুত্তরে ভক্তত্যাগের দোষ দেখাইয়া বিনীতভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার রাজ্যের ভক্তপ্রজাগণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিতেও ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু যদি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া একটী দিনও স্বর্গভোগ করিতে পারেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। অগত্যা দেবগণ তাহাতেই অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরিবার ও প্রজাবর্গের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন।

প্রচলিত নবীন হরিশ্চন্দ্রকথার মূল উপাখ্যান হইল এই। ইহা একটী করুণসোদ্দীপক উপাখ্যান বটে, কিন্তু এই উপাখ্যানে ঐতিহাসিক সত্যের একটা প্রাণ নাই। এই কৃত্রিম

উপাখ্যান যে কিরূপে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইল, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই উপাখ্যানে প্রাচীন আখ্যানের দুএকটী নাম ছাড়া অন্য সংশ্রব যেন ইচ্ছা করিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা পড়িলেই বুঝা যায় যে, ইহার কবি একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাখ্যান রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—তাই ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের অন্তরে বিঘ্নরাজের প্রবেশ, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বিনাদোষে হরিশ্চন্দ্রপত্নীর তাড়না, এই সকল আড়ম্বর স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাতে শৈব্যাতাড়না, হরিশ্চন্দ্রতনয় রোহিতাশ্বকে বৃদ্ধব্রাহ্মণের পদাঘাত, ক্ষুধিত রোহিতাশ্বের পিতামাতার নিকটে অন্নভিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি করুণরসের প্রাদুর্ভাব অনেকটা রাখিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্র তেমন ভালরূপে প্রত্যেকের উপযুক্তমত অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। কবি যদি ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত সত্য আখ্যানকেই কবিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে চরিত্র বিকশিত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না—সত্যেরই বলে তাহা সহজেই সুসিদ্ধ হইত।

এই কৃত্রিম হরিশ্চন্দ্রকথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্থান পাওয়াতেই আমাদের বোধ হয় যে এই পুরাণ অত্যন্ত আধুনিক—মহাভারতের অত্যন্ত পরবর্ত্তী কালে রচিত। এই পুরাণ যে মহাভারতের অনেক পরে রচিত, এই একটী ছাড়া আরও কতকগুলি কারণে আমরা তাহা অনুমান করি। ইহার প্রথমেই ব্যাসরচিত মহাভারতের কথা উক্ত হইয়াছে; দ্রৌপদী কি প্রকারে পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হইতে পারিলেন তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে, ইত্যাদি। ইতিহাস আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়প্রতাপ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল এবং সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ও তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন। বোধ হয়, সময়ে এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের অতিমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা হইতেছিল এবং খুব সম্ভবতঃ সেই প্রতিবিধান-চেষ্টারই অভিব্যক্তিতে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে, এই বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় ও মহাভারত রচনা, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালেরই হস্ত দেখা যায়। বুদ্ধদেব ও মহাভারতের অন্তর্বর্ত্তী সময়কে পৌরাণিক সাহিত্যের কাল বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে মহাভারত হইতে পৃথক্ পৃথক্ আদর্শ লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পুরাণও লিখিত হইয়াছিল; এইরূপে পৌরাণিক সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিলে সর্ব্বশেষে বোধ হয়, বিরোধবিবাদ-ভঞ্জনব্রত লইয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণকার তাঁহার পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে, অনুমান হয় যে, সাহিত্যক্ষেত্রের নেতামাত্রেই এইরূপ পুরাণের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মত প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।*

* মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিভিন্ন অংশে ব্রহ্মার, বিষ্ণুর এবং দেবীর অথবা শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে দেখা যায় অর্থাৎ ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব দেখা যায় না, সেই কারণে পরলোকগত অধ্যাপক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-

মার্কণ্ডেয় পুরাণকার তাঁহার হরিশ্চন্দ্রকথায় যে করুণরসোদ্দীপনায় বহুল যত্ন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের মতে এই পুরাণের আধুনিকত্বের অন্যতর পরিচায়ক*। আমরা দেখি যে, দেশ যতই সভ্যভব্যতার দিকে অগ্রসর হয় ততই লোকে পরুষ বীরভাব, চঞ্চল অশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসকলের অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া উঠে†। ইংলণ্ডের যে সময়ে মহাকবি সেক্ষপীয়র তাঁহার অশান্তিমাখা গানে সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে সময়ে টেনিসনের কোমলতাময় গার্হস্থ্যসুখগীতি হাস্যাস্পদ হইত। আবার এখন টেনিসনের কবিতা আমাদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু এ সময়ে অশান্তি ও চপলতার আদর্শধারী সেক্ষপীয়রের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা দুরাশা। সেইরূপ যে সময়ে নানাবিধ রসের আধার মহাভারতের অশান্তিময় গীত সকল ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই সময়ে মার্কণ্ডেয়পুরাণের ন্যায় ধীরগম্ভীর পুরাণ সকলের অভ্যুত্থান অসম্ভব। এবং যে সময়ে কবি হরিশ্চন্দ্র-কথায় করুণগীতি গাহিয়া লোকের মন আর্দ্র করিবার মন্ত্র পাইয়াছেন, সে সময় মহাভারতের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব। যে মার্কণ্ডেয় পুরাণে এমন করুণরসাত্মক হরিশ্চন্দ্রকথা স্থান পাইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ অপেক্ষাকৃত অ-প্রাচীন—আধুনিক। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রাচীনযুগ নূতনযুগের জন্মদান করিয়া চলিয়া যাইবার পর যখন পৃথিবী শান্ত হইল, যখন সকলেই আপন আপন রাজার অধীনে থাকিয়া পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল, যখন মহাভারতের মহাযুদ্ধ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকল অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, যখন ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের কারণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে "বিপ্রমুখ্য"-রূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন সেইরূপ সময়েই শান্তিপ্রিয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের আবির্ভাব হইতে পারে। ইহার বহুকাল পরে এইরূপ অপর কোন সুশান্ত সময়েই উত্তররামচরিত, অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতির জন্মলাভ হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ এইরূপ শান্তিপূর্ণ কালে মার্কণ্ডেয়-পুরাণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই—ইহার সময়ে যুদ্ধবিগ্রহাদির কোনরূপ গোলযোগের সম্পর্কমাত্র ছিল না বলিয়াই, পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র একেবারে ভীরু ও কাপুরুষ অথচ বাগাড়ম্বরপ্রিয়রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখে খুব লম্বাচৌড়া কথা আছে, কিন্তু কাজের বেলায়

পাধ্যায় ইহাকে অন্যতর প্রাচীনতম পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মনিয়র উইলিয়মস্‌ও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন ("Indian Wisdom, 2ed. P. 494)। কিন্তু এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকাতেই আমাদের অনুমান হয় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্যতর নবীনতম পুরাণ। যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের পরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চলিয়া গিয়াছিল, যখন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ধীরতার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়াছিলেন যে, কোন সম্প্রদায়ই বিদ্বেষের অথবা ঘৃণার পাত্র হইতে পারে না, তখনই এরূপ সমন্বয়কারী অসাম্প্রদায়িক পুরাণের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব—বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত হইবার কালে এবং সুতরাং বিদ্বেষভাবের অস্তিত্বকালে অথবা বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত হইবার পূর্ব্বে কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে।

† তাই বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে আমি মহাভারতীয় কালকে অসভ্যতার কাল বলিতেছি।

তদনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত-কলেবর। স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র মহা আস্ফালন করিয়া ধাবিত হইলেন যে, তাঁহার শাসনকালে যে দুর্বুদ্ধি স্ত্রীলোকদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করে, শীঘ্রই তাহাকে যমসদন দর্শন করিতে হইবে—

"ময়ি শাসতি দুর্মেধাঃ কোঽয়ন্যায়বৃত্তিমান্॥
মাং পুং ৭অ, ৫
কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ।
বলোষ্ণতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে॥
ঐ, ১২
সোঽদ্য মৎকার্মুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি॥
ঐ, ১৩

কিন্তু যেই ক্রোধপ্রজ্বলিত বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইলেন, অমনি "অশ্বত্থপত্রের ন্যায়" কাঁপিতে লাগিলেন—"ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ।" তাহার পরে তিনি সভয়ে বিপ্রশ্রেষ্ঠদিগকে দান করা কর্ত্তব্য, আর্ত্তদিগের রক্ষা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদিরূপ রাজধর্ম্মের দুএকটী কথা বলিলেন। তদন্তর বিশ্বামিত্র উপযুক্ত দক্ষিণার সহিত দান ভিক্ষা করিলে রাজা আপনাকে "পুনর্জাত বলিয়া বিবেচনা করিলেন।" এবং তিনি যেন কাপুরুষোচিত ভয়ে আপনার সর্ব্বস্ব, এমন কি স্ত্রীপুত্র অবধি সকলই, বিশ্বামিত্রের চরণে সমর্পণ করিতে অবসর পাইতেছিলেন না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখে প্রভুর খামখেয়ালী মেজাজে ভীত মোসাহেবদিগের "যে আজ্ঞা" যেন সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। বিশ্বামিত্র বলিলেন "কোষাগার ও ধনরত্নের সহিত সমস্ত রাজ্য আমাকে প্রদান কর।" হরিশ্চন্দ্র হৃষ্টমনে (?) "যে আজ্ঞা" বলিলেন।

"প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোঽবিকারমুখো নৃপঃ।
তস্যর্ষের্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥"

আবার যখন প্রজাবর্গ তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, তখন সেই বিশ্বামিত্র আসিয়া ভৎসনা করিলেন, অমনি তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে "আজ্ঞে যাচ্চি" বলিয়া পত্নী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতকে দ্রুত টানিয়া লইয়া চলিলেন। পরক্ষণেই যখন বিশ্বামিত্র নিরাপরাধা শৈব্যাকে দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা আঘাত করিলেন, তখনও হরিশ্চন্দ্র "আজ্ঞে যাচ্চি"র অধিক কথা বলেন নাই এবং একথা কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হয়াছেন।—

"তাং তথা তাড়িতাং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
গচ্ছামীত্যাহ দুঃখার্ত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদুদাহরৎ॥"

কবি ভাবিয়াছেন, বুঝি এইরূপ চিত্রে রাজার সমধিক বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার ইহা বুঝিবার ভুল। ইহাতে সমধিক কাতরতা প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে রাজোচিত বীরত্ব, ক্ষত্রিয়োচিত তেজ এবং মনুষ্যোচিত সাহসের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। এমন কি, ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজে যে রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন "রক্ষ্যাভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরিপন্থিভিঃ", স্বীয় ধর্ম্মপত্নী শৈব্যাকে তাড়না হইতে রক্ষা না করায় আমাদিগের মতে তিনি সেই রাজধর্ম্ম হইতেও বিচ্যুত হইয়াছেন—বিশেষতঃ তখনও শৈব্যা তাঁহারই অধীনে ছিলেন, কাহারও নিকটে বিক্রীত হয়েন নাই।

কবি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সত্যপালনের জন্য সর্ব্বত্যাগী এইরূপ একটী আদর্শ চরিত্র দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। প্রথমেই হরিশ্চন্দ্র একেবারে সর্ব্বস্ব দিতে স্বীকার করায় তাঁহার অত্যন্ত অবিবেচনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরেও দেখি যে হরিশ্চন্দ্র প্রতিপদে শাপভয়ে ভীত হইয়াই কার্য্য করিতেছেন, প্রকৃত সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাবে তাঁহার অধিকাংশ কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে দেখি না। স্ত্রীপুত্রবিক্রয়ে হরিশ্চন্দ্র অবশ্য প্রথমে অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পত্নী শৈব্যা তাঁহাকে বারম্বার ব্রহ্মশাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য উত্তেজিত করায় তিনি যখন স্ত্রীপুত্রবিক্রয় করিয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণার অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হইলেন, তখন যেন তাঁহার কতকটা নিষ্কৃতির ভাব আসিয়াছিল—মনে করিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্রকে আপাতত এই অর্দ্ধেক দক্ষিণা দিয়া আরও কিছু বেশী সময় ভিক্ষা করিয়া লইবেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র সমস্ত দক্ষিণা একেবারে প্রার্থনা করাতে তিনি যখন আপনাকে বিক্রয়ার্থ বিপণিতে উপনীত করিলেন, তখনই তাঁহার অন্তরস্থিত শাপভয় প্রকাশ পাইয়া গেল। চণ্ডালবেশী ধর্ম্ম তাঁহাকে ক্রয় করিতে আসিলেন; কিন্তু হরিশ্চন্দ্র যেই জানিতে পারিলেন যে তাঁহার ক্রেতা একজন চণ্ডাল, তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন যে শাপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়া ভাল কিন্তু চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার শ্রেয়স্কর নহে।

"নাহং চণ্ডালদাসত্ব মিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতং।
বরং শাপাগ্নিনা দগ্ধো ন চণ্ডালবশংগতঃ॥"

এখানেই দেখা যাইতেছে যে হরিশ্চন্দ্র এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা শাপাগ্নিতে দগ্ধ হইবার ভয়ে ভীত হইয়াই করিয়াছিলেন; তবে চণ্ডালদাসত্ব নাকি অত্যন্ত ঘৃণিত বোধ হইয়াছিল, তাই এরূপ আন্তরিক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত। আবার তাঁহার শাপভয়ে হরিশ্চন্দ্রের সেই চণ্ডালদাসত্ব স্বীকার করিতে হইল, কেবল ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি বালকোচিত অভিমান প্রকাশ পাইল মাত্র।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের হরিশ্চন্দ্রকথায় একটীও চরিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের চিত্র যেমন একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বামিত্র, শৈব্যা এবং হরিশ্চন্দ্রতনয় রোহিত, সকলেরই চিত্র অতি অমনোগ্রাহী রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। শৈব্যাকে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের পত্নী রূপে অঙ্কিত করিতে গেলে তাঁহাতে একপ্রকার তেজোময় ধৈর্য্য আরোপ করা উচিত ছিল। এবিষয়ে আর বাহুল্য রূপে বলিতে ইচ্ছা করি না—যাঁহারা ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে বীরপত্নীর চিত্র কিরূপ হওয়া উচিত। উক্ত গ্রন্থে যখন যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর তীব্র তিরস্কারপূর্ণ অথচ গুরুগম্ভীর উক্তি সকল পাঠ করা যায়, তখন তাহার প্রত্যেক কথা যেন হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিতে থাকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কবি তাঁহার হরিশ্চন্দ্র কথাকে করুণরসাত্মক করিতে গিয়া ক্ষত্রিয়বীর হরিশ্চন্দ্রকে নিরীহ বাঙ্গালীর ন্যায় নিতান্ত দীন-

চরিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন; হরিশ্চন্দ্রপত্নী শৈব্যাকে অন্তঃপুরবদ্ধা বঙ্গীয় কুললললনার ন্যায়, বীরবালক রোহিতকে একটি ভীরু, পদাঘাত-সহিষ্ণু সাত আট বৎসরের দুর্ব্বলদেহী, মাতার অঞ্চলধারী সুকুমার বঙ্গীয় শিশুর ন্যায় এবং বিদ্বান্, ন্যায়পর তেজস্বী মুনি বিশ্বামিত্রকে কোপনস্বভাব, প্রতি নিঃশ্বাসে শাপভীতি-প্রদর্শক, অর্থগৃধ্নু, শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও বাক্যসার বঙ্গদেশীয় অতৃপ্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

যাই হোক্, মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত এই হরিশ্চন্দ্রকথা করুণরসোদ্দীপক হওয়াতে ভব্যতাভিমানী আধুনিক কালের যে সকল লেখক এই বিষয়ে লিখিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথারই অনুসরণ করিয়াছেন। কবি আর্য্যক্ষেমীশ্বর সংস্কৃতভাষায় এই পৌরাণিক কথাকেই এক আধটুকু পরিবর্ত্তন সহকারে নাটকের পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক চণ্ডকৌশিক গ্রন্থ রচনা করিয়া সমুদায় ভারতবর্ষে ইহার প্রচার হইবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। * পণ্ডিতগণের মতে ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে বেণীসংহারের সমান আসন অধিকার করিতে পারে—তাহার কারণ, ইহাতে অলঙ্কার—শাস্ত্রানুযায়ী দোষের ভাগ অতি অল্পই আছে। হইতে পারে যে, আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী ইহার বিচার করিলে অধিক দোষ প্রকাশ পাইবে না। এরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কারণ ইহাতে মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথাকে অত্যল্প পরিবর্ত্তন সহকারে অনুসরণ করা হইয়াছে। এরূপ অবলম্বন পাইলে একটী গ্রন্থকে আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী বিশুদ্ধ করা অধিক চিন্তারও কার্য্য নহে এবং দুঃসাধ্যও নহে। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে, ইহাতে নাটকের একটা প্রাণ রক্ষিত হয় নাই। কেমন করিয়াই বা হইবে—একটা গ্রন্থের বিষয়টী প্রাণের ভিতরে না মিলাইয়া লইয়া অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিলে কখন কি সেই নূতন গ্রন্থে প্রাণ দেওয়া যাইতে পারে? চণ্ডকৌশিকে এই অন্ধ অনুসরণ এত অধিক করা হইয়াছে যে, পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, ইহারও চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। ততোধিক, চণ্ডকৌশিকপ্রণেতা কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়া দৃশ্যকাব্যের সহজ ভাবকে একেবারে বধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। একটী কথায় তাঁহার

চণ্ডকৌশিকে হরিশ্চন্দ্রকথা।

* পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই নাটক অন্যূন ৪০০ বৎসর ও অনধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। এই পুস্তক খুব সম্ভবতঃ কোন দক্ষিণাত্যনিবাসী পণ্ডিত রচনা করিয়া থাকিবেন। শ্রীযুক্ত ই, বি, কাবেল মহোদয় (Prof. E. B. Cowell) যখন সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি এই পুস্তক মুদ্রিত করাইবার অভিপ্রায়ে আর্য্যাবর্ত্তে সেই পুস্তক কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে একখানি হস্তলিপি এবং একখানি প্রস্তরলিপি আনাইয়াছিলেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্যেই ইহার বহুল প্রচার ছিল অনুমিত হইতে পারে। বিশেষতঃ সুত্রধারের উক্তি হইতে আমাদের আরও অনুমান হয় যে, ইহার কবি কর্ণাটবিজয়ী কার্ত্তিকেয় শ্রীমহীপালদেবের অন্যতর সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার দোষ বড়ই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালেই তাঁহাকে আড়ীবকযুদ্ধ-সম্বলিত বাক্যে সম্বোধন করিয়াছেন। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরের অভিশাপে আড়ীবকরূপ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণোক্তি আছে; কিন্তু আর্য্যক্ষেমীশ্বরের জানা উচিত ছিল এবং অনেকেই বোধ হয় জানেন যে তাঁহাদের সেই আড়ীবকরূপ প্রাপ্তির কারণ হইল হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রের মুখে আড়ীবকের কথা বসান নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কৃত্তিবাসোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথা।

সংস্কৃত ভাষায় আর্য্যক্ষেমীশ্বর এই হরিশ্চন্দ্রকথাকে নাটকাকারে পরিণত করাতে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যেমন এই কথার কোমলতাময় করুণরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, বঙ্গদেশে কবি কৃত্তিবাস এই করুণ-রসাত্মক হরিশ্চন্দ্রকথাকে তাঁহার রামায়ণে (আদি, হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান) স্থানদান করাতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার করুণরস আস্বাদন করিয়া ততোধিক পরিতৃপ্ত হইতেছে। আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের ন্যায় কবি কৃত্তিবাসও মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই হরিশ্চন্দ্রকথাকে অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন বলিলেও চলে। তবে, কৃত্তিবাস রোহিতাশ্বকে রুহিদাস এবং আরও কতকগুলি নিতান্ত বাঙ্গালীভাব প্রবিষ্ট করাইয়া তাঁহার হরিশ্চন্দ্রকথাকে একেবারে নিছোক বাঙ্গালী করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি মূল কথাকে কিরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহা দেখিবার বিষয় বটে। একটী প্রধান দৃষ্টান্ত দিই—

কৃত্তিবাসের মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বিপদের অবসানে স্বীয় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠারোহণের চেষ্টা করিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে হরিশ্চন্দ্র একাকী স্বর্গে যাইতে অস্বীকার করায় দেবগণের নিকটে স্বীয় ভক্ত প্রজাগণের সহিত স্বর্গগমনে অনুমতি পাইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস আর একটু মাত্রা চড়াইয়া বলিলেন যে হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে—

"পুরীর সহিত চলে বৈকুণ্ঠ ভবনে।
কুকুর বিড়াল আদি যে ছিল যেখানে॥"

এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাসের মনে সন্দেহ হইল যে, তিনি বৈকুণ্ঠে কুকুর বিড়ালদিগকে সশরীরে প্রেরণ করিয়া ভাল করেন নাই; তাই তাড়াতাড়ি তাহাদের স্বর্গগমন বন্ধ করিতে গিয়া একটা বৃথা আপত্তি দেখাইয়া একেবারে রাজা হরিশ্চন্দ্রেরই বৈকুণ্ঠগমন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বলেন যে, বিষ্ণু হরিশ্চন্দ্রের এই উৎপাতজনক ব্যাপারে ভীত হইয়া নারদকে বিপদ জানাইয়া বলিলেন "স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।" তখন নারদ যথাসত্বর হরিশ্চন্দ্রের নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে তিনি প্রায় স্বর্গে উঠিয়াছেন। নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন্ পুণ্যের বলে তিনি স্বর্গে যাইতেছেন। তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হরিশ্চন্দ্র যেমন আত্মপ্রশংসা করিবেন, অমনি তাঁহার স্বর্গে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই বিষ্ণু তাঁহার বৈকুণ্ঠ-ভবনে কুকুর

বিড়ালাদির সশরীরে প্রবেশভয় হইতে নিশ্চিন্ত হইবেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটিল,—

"মুনি বলে যাও রাজা কোন্ পুণ্য ফলে॥
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব আপনি কহিতে লাগিল॥
বাপী কূপ তড়াগাদি নানা স্থানে করি।
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি॥
* * * *
পুণ্য কথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল॥
* * * *
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্ত না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল॥

মধ্যপথে অবস্থিতিরূপ এই ঘটনাটী কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছাতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আত্মপ্রশংসাতে যে স্বর্গ-হানি হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক উপাখ্যানের উল্লেখ আছে এবং পুরাণে হরিশ্চন্দ্রপিতা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যপথে থাকিবার উল্লেখ দেখা যায়। কবি কৃত্তিবাস কাহাকেও একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বেমালুম উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন।

চণ্ডকৌশিকোক্ত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথা পড়িলেই বুঝা যায় যে, আর্য্যক্ষেমীশ্বর এবং কৃত্তিবাস উভয়েই এই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথা করুণরসোদ্দীপক বলিয়াই আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে অধিকতর করুণরসোদ্দীপক করিবার চেষ্টাও পাইয়াছেন। করুণরস অধিকতর উদ্দীপিত করিবার জন্য উভয় গ্রন্থেই হাহুতাশব্যঞ্জক কতকগুলি শব্দ ও কৃত্রিম ক্রন্দনের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও যে এরূপ করা হয় নাই তাহা নহে—প্রত্যুত মার্কণ্ডেয় পুরাণই ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ—তবে তাহাতে ক্রন্দনের এতটা আধিক্য নাই। আমাদের মতে এইরূপ ক্রন্দনভাবের বাহুল্যই ইহাদিগের আধুনিকত্বের অন্যতর সুপরিচায়ক। মহাভারতেও নলদময়ন্তী প্রভৃতি অনেক করুণরসপূর্ণ আখ্যান আছে, কিন্তু সেগুলিতে ক্রন্দনের অথবা হাহুতাশব্যঞ্জক শব্দের এত বাহুল্য নাই। এইরূপ ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের আধিক্য অনেক দুর্ব্বলচিত্ত বালকের সহানুভূতি ও করুণার ভাব উদ্রেক করিবার সহায়তা করিতে পারে, জ্ঞানোন্নত যুবকদিগের নহে। পুরাকালের বীরহৃদয় আর্য্যসন্তানগণ নিতান্ত বালকস্বভাব ছিলেন না, তাই মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে ক্রন্দনের সেরূপ একটা মহারোল উঠিতে দেখা যায় না। যখন সংস্কৃতভাষা আর্য্যদিগের মধ্যে কথোপকথনের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত এবং যখন আর্য্যদিগের প্রাণমন বীরোচিতভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন ক্রান্তদর্শী কবিগণও জানিতেন যে তাঁহারা স্ত্রীজনসুলভ হাহুতাশ অতিমাত্র ব্যক্ত করিবার এবং বালকোচিত ক্রন্দনরোল উঠাইবার চেষ্টা করিলে পাঠকদিগের সহানুভূতি লাভ করিবেন না এবং সুতরাং সে বিষয়ে চেষ্টাও করেন নাই। ক্রমে যখন আর্য্যসন্তানেরা দুর্ব্বলহৃদয় হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহারা ভব্যতার ক্রীতদাস হইতে লাগিলেন, তখন হাহুতাশের অতিমাত্র ব্যবহার

এবং প্রতিপদে ক্রন্দনরোল আনয়ন করা সহানুভূতি আকর্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ অথবা গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীজনের আর্ত্তোক্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখ, দেখিবে যে, সেই বিলাপের মধ্যেও কেমন এক বীরভাব, কেমন এক মনুষ্যোচিত সংযতভাব পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। অপরদিকে উত্তররামচরিতের রামবিলাপ, কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ প্রভৃতি পড়িয়া দেখ, কি এক প্রকার অসংযতভাব আসিয়া যেন মনুষ্যত্বকে দলিত করিতে উদ্যুক্ত রহিয়াছে। কালিদাস একজন প্রকৃত কবি ছিলেন, তাই তিনি ইহার অসঙ্গতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভিজ্ঞানশকুন্তলে করুণভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বও ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বর্ত্তমানে হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া যে সকল কাব্যনাটক রচিত হয়, তাহাদের প্রায় সকলেতেই মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করা হয়, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

এতক্ষণে আমরা দেখাইয়া আসিলাম যে আধুনিক হরিশ্চন্দ্রকথার মূল আদর্শ মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত উপাখ্যান; এবং ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,কবি সেই পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রগুলি সুন্দররূপে বিকশিত করিতে পারেন নাই। এই গুরুতর দোষসত্ত্বেও এই উপাখ্যানের এত সুদূরব্যাপী প্রচলন হইল কেন? আমরা এই উপাখ্যানকে উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারি কি না? আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের সহিত একমত হইয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, হিন্দুজাতি এই উপাখ্যান পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই উপাখ্যানের সহিত সমস্ত ভারতের কি না জানি না, অন্তত এই বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের শুভাশুভ এতদূর জড়িত হইয়া আছে যে ইহাকে পরিত্যাগ করা অসম্ভব। এই উপাখ্যান শত শত হিন্দু নরনারীকে শুভকর্ম্মে, ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগে উৎসাহ ও বল প্রদান করিয়াছে এবং এই উপাখ্যান সমগ্র হিন্দুজাতির সম্মুখে একটী মহান্ আদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই পৌরাণিক উপাখ্যানের কবি ইহার পাত্রগণের চরিত্রগুলি সম্যক্ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু তিনি প্রধান পাত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে যে আদর্শকেন্দ্রে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই হিন্দুজাতি মুগ্ধ হইয়া ইহাকে এত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিরকাল করিতে থাকিবেন।

হিন্দুজাতি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধনা লইয়াই চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাই যখনই তাঁহারা এই উচ্চ আদর্শকেন্দ্রে স্থাপিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, তখনই তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। সাগরে এক গভীর জলরাশি সঞ্চিত আছে বলিয়াই যেমন আমরা যেখানেই উপযুক্তরূপ খনন করি, সেইখানেই জল প্রাপ্ত হই—সাগরের জল অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইয়া যেমন সমুদয় পৃথিবীকে সিক্ত রাখিয়াছে; সেইরূপ পিতৃ-

পুরুষদিগের সঞ্চিত ধর্ম্মের বিমল বারি আমাদের আত্মার গভীর অন্তস্তলে অন্তঃপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া এই অশান্তিময় কালের সাগরে আমাদিগকে একেবারে ভাসিয়া যাইতে দিতেছে না, আমাদিগকে স্থিরপথে ধরিয়া রাখিতেছে। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি এখনও অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইতে পারেন, সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারেন। ধর্ম্মের এই গূঢ়প্রবাহ স্রোত থাকাতেই আমরা সেই উচ্চ আদর্শে স্থাপিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথাকে আদরের সহিত গ্রহণ করি। সেই উচ্চ আদর্শ কি—না, নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির আদর্শ থাকাতেই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথা আমাদের এত প্রিয়। আমরা দেখিতে চাই না যে,উপাখ্যানটী সত্য বা মিথ্যা, প্রকৃত বা কল্পিত; আমরা দেখিতে চাই না যে কবি চিত্রগুলি প্রকৃত চিত্রকরের তূলিকায় সুন্দররূপে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন কি না। সমস্ত উপাখ্যানটীর অন্তর্নিহিত নিবৃত্তিভাবের প্রবাহই আমাদিগকে সমধিক আকৃষ্ট করে।

হিন্দুজাতি যখন সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে নিবৃত্তিই একমাত্র ধর্ম্মরক্ষা করিতে এবং সুতরাং জগতের হিতসাধনে সমর্থ। তাই ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতা নিবৃত্তিকেই মহা পুণ্যজনক ঘোষণা করিয়া সকলকে ধর্ম্মের পথে, সংযমের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিয়াছেন। প্রবৃত্তির ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে নিবৃত্তিই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্তম্ভ, একমাত্র রক্ষাকবচ; নিবৃত্তিই ধর্ম্মের প্রাণ, ধর্ম্মের কেন্দ্র। মনুসংহিতার আরও পূর্ব্বে যাইয়া দেখ, উপনিষদও জলদের ন্যায় মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন যে শ্রেয় অর্থাৎ নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিলেই আমাদের মঙ্গল এবং প্রেয় অর্থাৎ নিবৃত্তির পথে চলিলে আমাদের মঙ্গল নাই—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব উপভোগ করা যায়। আবার মনুসংহিতার বহু পরে ভগবদ্গীতা খুলিয়া দেখ, কেমন সুন্দর ভাষায় এই নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিবার যত্ন ও চেষ্টা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে পারি যে, নিবৃত্তিই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাণ। এই নিবৃত্তিভাবই হিন্দুজাতির হৃদয়মনকে ধর্ম্মাভিমুখী রাখিয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত রাখিয়াছে। কিন্তু আর বুঝি তাহা থাকে না—বর্ত্তমানে আমরা নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া অধোগতির দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

বর্ত্তমানে কালস্রোতের প্রতিকূলে এইরূপ হস্তোত্তোলন করাতে অনেকেরই নিকট যে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হইব, তাহা জানি। কিন্তু সত্যের সম্মুখে উপহাসের ভয়ে ভীত হইলে মঙ্গল হইবে না, তাহাও নিশ্চিত। আমাদের ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, আমরা উদ্দাম প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া অবনতির পথ, বিনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছি, তথাপি আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিা কিরূপে নিদ্রিত থাকিব? আমরা নিজে সেই বিনাশের পথে দণ্ডায়মান হইলেও, স্রোতের প্রতিকূলে এক পা উঠিতে না পারিলেও আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ চীৎকার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরাকে

রক্ষার একটী প্রধান উপায় বলিয়া যাইতে পারিব,—যাহাতে তাহারা আমাদের পতনদৃষ্টে প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইবার পূর্ব্বেই অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও স্থিরভাবে, ধীরভাবে চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় যে তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে কি না। এই মহান্ উদ্দেশ্যেই আমরা সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়াই বলিতেছি যে, আমরা পাশ্চাত্যদিগের নিকটে প্রবৃত্তির অনুকূল ভাব সকল ধার করিয়া লইতেছি—খাল কাটিয়া কুমীর আনিতেছি বলিলেও চলে।

নিবৃত্তির ভাব বিশেষভাবে প্রাচ্য এবং প্রবৃত্তির ভাব বিশেষভাবে প্রতীচ্য। প্রাচ্য-জগতের সমুন্নত অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাহার নিবৃত্তি-ভাবের অস্তিত্বের সুপরিচয় দিতেছে; পাশ্চাত্য-দিগের সমুন্নত আইনবিজ্ঞান তাহার প্রবৃত্তি-ভাবের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা সকল কর্ম্মে দেখি অথবা দেখিতে উপদেশ দিই যে ধর্ম্ম কি বলিতেছেন; পাশ্চাত্যেরা কথায় কথায় দেখিতে চাহেন যে আইন কি বলিতেছে। একদিকে আমাদের বেদবেদান্ত প্রভৃতি আত্মার অনন্তকালের জন্য শান্তিবিধায়ক গ্রন্থ সকল; অপরদিকে রোমপ্রদত্ত পাশ্চাত্যজগতের রাশি রাশি আইন কানুনের গ্রন্থ—ইতিহাসের এই দুইটী বিষয় আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, নিবৃত্তি প্রাচ্যদিগের বিশেষ ভাব, প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদিগের বিশেষ ভাব।

এই নিবৃত্তিভাবের বিশেষ লক্ষণ আত্মসং-হরণ। আমাদের সকল কর্ম্মেরই ফলাফল ভগবানের প্রতি সমর্পণ করিয়া, তিনি যেরূপ শুভবুদ্ধি আমাদের অন্তরে প্রেরণ করিবেন, তদনুযায়ী কর্ম্ম করাই, এক কথায় আত্মসংহরণ করাই সমুন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রের এবং সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রেরও বিধি। এই ভাবটী সর্ব্বদাই মনে জাগ্রত রাখিবার জন্য আমাদিগকে ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ইহাতে নিবৃত্তিভাবের ক্বাথটুকু রহিয়াছে বলিয়াই ইহা সেই অতি প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে আজিপর্য্যন্ত সমান-ভাবে সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। এই ভাবেই বিভোর হইয়া কোন প্রাচান ঋষি বলিয়া-ছেন—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকণ্ঠ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ বিষ্ণুপুরাণ।

যে ঋষি এই ক' বলিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃতই একটী গভীর নিবৃত্তির ভাব এবং ঈশ্বরের উপর একটী গভীর নির্ভরের ভাব হই-তেই ইহা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল আমরা এমনি প্রবৃত্তির বশীভূত হইতেছি যে. আমরা এমন সুন্দর নিবৃত্তিমূলক শ্লোকটীকেও নিজের ইচ্ছামত প্রবৃত্তির অনুকূলে অর্থ করিয়া লইয়া অধঃপাতের পথ হইতে মানসিক বাধা-সকলও অপসরণ করিতে উদ্যত হই। হিন্দু-জাতির মধ্যে এই নিবৃত্তির ভাব প্রবল থাকা-তেই একসময়ে ভারতের কত উন্নতি হইয়াছিল এবং আমাদের বিশ্বাস যে ইহারই ফলে শত

শত বৎসর দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, শত শত বৎসর কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভারত জগতের পৃষ্ঠে আপনার অস্তিত্ব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রাখিতে পারিয়াছে। এই নিবৃত্তির ফলে যেরূপ শান্তিভাব আসিয়াছিল, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাহার চিহ্নমাত্র দেখিয়া যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিবার অধিকারী এবং তাহাতে আমাদের হৃদয়মন আবার সেই গভীর শান্তিভাব এদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে লোকদিগের গৃহদ্বারে চাবি লাগাইবার প্রয়োজন ছিল না; লোকেরা প্রায় সকলেই সত্যবাদী ছিল, সুতরাং মোকদ্দমার বাহুল্য ছিল না; তখন রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিলেও কোনরূপ উপদ্রব অত্যাচারের সম্ভাবনা ছিল না।* সমস্ত জাতির পক্ষে ইহা কি কম সম্মানের কথা ও কম শুভজনক? এই নিবৃত্তিকে আমাদের কেন্দ্র করাতেই আমরা অহিংসা প্রভৃতি উচ্চতম ভাবসমূহকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিতে সমর্থ হইতেছি। এইরূপে আমরা আত্মসংহরণকে মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জগতের মনোরাজ্যে আত্মকর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

অপরদিকে, প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা। পাশ্চাত্যেরা এই আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়া প্রকৃত পক্ষে আত্মসংহরণ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই আত্মসংহরণ অধ্যাত্মরাজ্যের আত্মসংহরণ, যাহার বিষয় পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা নহে—ইহা প্রকৃতই আত্মসংহরণ বা আত্মবিনাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে পরেরও বিনাশ সাধন। পাশ্চাত্যগণ এই প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইয়াই আপনাদের তৃপ্তিসাধনের জন্য কত দেশপল্লী, নগরগ্রাম কামানের মুখে উড়াইয়া দিতেছে; আত্মতৃপ্তির জন্য সমস্ত পৃথিবীকে দোহন করিয়াও যেন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। রোমীয় সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শিখরে, তখন তাহা প্রবৃত্তিরও শিখরে দণ্ডায়মান ছিল। বিলাসিতা সমস্ত সাম্রাজ্যকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই অচিরেই তাহার অতি কঠোর পতন ঘটিল। বর্ত্তমানেও দেখি যে, সমস্ত ইউরোপ যেমন উন্নতির শিখরে দাঁড়াইয়া আছে, সেইরূপ প্রবৃত্তিরও শিখরে দাঁড়াইয়া আছে। ইউরোপ যদি শীঘ্রই প্রবৃত্তির প্রতিকূলে না ফিরিয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ভাবিতে কিরূপ আতঙ্ক হয় যে, এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র ইউরোপ একটী অতি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডরূপে সমরসজ্জিত হইয়া আছে। এই প্রবৃত্তির অধীন হইবার ফলে ইউরোপের গার্হস্থ্যজীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। একদিকে স্ত্রীলোকেরা গাত্রের চর্ম্মভেদ প্রভৃতি নানা উপায়ে গাত্রের অভ্যন্তরে সুগন্ধি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া আমোদ করিবেন,* অপরদিকে পুরুষেরা (আজ কাল স্ত্রীলোকেরাও) হোটেল প্রভৃতি স্থানে

* হণ্টার প্রভৃতি মহোদয়গণের লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসন্দেখ।

* ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশ।

পাঁচজন ইয়ারের সহিত বাসা বাঁধিয়া থাকিবেন; অনেকেই সহজে গার্হস্থ্যজীবনের নিবৃত্তিমূলক বন্ধনের ভিতরে আসিতে চাহে না। বহুদিন ধরিয়া এই ভাবে ইউরোপ চলিতে থাকিলে তাহার বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলিবার জন্য ভবিষ্যৎ-গণনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় না বলিয়াই বোধ হয়।

পাশ্চাত্যদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহাদের সমাজ-নিয়ম প্রভৃতি সমবেত হইয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তির অভিমুখে চালিত করিতেছে। সমগ্র বাইবেলটী পড়িলে তাহাতে প্রবৃত্তিরই অনুকূল কথা, দ্বেষহিংসার কথাই অধিক দেখা যায়। বাইবেলের আদিতে আদম ও ঈবের নিষিদ্ধ ফল সেবন এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের ক্রোধাৎপত্তি ও স্বর্গ হইতে আদম ও ঈবের তাড়িত হওন। এইরূপে বাইবেলের আদিতে প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য দেখা যায়। বাইবেলের অন্তে অভিশাপ—যে কেহ বাইবেলের একটি অক্ষর বৃদ্ধি বা হ্রাস করিবেন, তাঁহার সর্বনাশ; ইহাও প্রবৃত্তিমূলক। ইহার প্রতিকূলে আমাদের কেমন উদার ও সর্ব্বভৌমিক মত যে, যে যে পথ দিয়াই চলুক না কেন, অবশেষে ভগবানের ক্রোড়ে সকলেই আশ্রয় পাইবে—"নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব।" এরূপ উদার মতের উৎপত্তির হেতু একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার নিবৃত্তিমূলক অভাব। বাইবেলে যে নিবৃত্তির আশ্রয়স্তম্ভ নাই তাহা নহে, তাহা না থাকিলে কোন ধর্ম্মই দাঁড়াইতে পারে না। বাইবেলে যে নিবৃত্তিকথা আছে, এখন পাশ্চাত্যদিগকে প্রবৃত্তির পথ হইতে ফিরাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট; কিন্তু তাহাতে নিবৃত্তি অপেক্ষা প্রবৃত্তিভাবই প্রবল থাকাতে ততটা সহজে ফিরাইতে পারিতেছে না।

আবার পাশ্চাত্যদিগের সমাজনিয়মও প্রবৃত্তির বড়ই অনুকূল। তাহাদের নৃত্য, তাহাদের বিবাহপদ্ধতি, তাহাদের পূর্ব্বানুরাগ-প্রথা, এসকলই প্রবৃত্তির অনুকূল পথেই লইয়া যায়। এখন তাহাদের প্রবৃত্তি-স্রোত এত ভীষণবেগ ধারণ করিয়াছে যে তাহা আর সহজে বন্ধনের ভিতর থাকিতে চাহিতেছে না। তাহাদের ভব্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি-স্রোতও দিন দিন ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে। দিন দিন বিলাসিতা, আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ সকল তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টায় নিরন্তর ফিরিতেছে। হায়! পাশ্চাত্য দেশে এমন প্রশ্নও উঠিয়াছে যে, আত্মহত্যা সভ্যভব্যতার একটী লক্ষণ কি না! ইউরোপের মধ্যে দেখা যায় যে, যে দেশ যত সভ্যভব্য, সেই দেশ আত্মহত্যা বিষয়ে তত অগ্রসর। পর্টুগল, আয়র্লণ্ড, স্পেন, হঙ্গেরী, ইতালী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সর্ব্বশেষে জর্মনি আত্মহত্যাবিষয়ে যথাক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান গ্রহণ করিতেছে। মদ্যপান, কামবৃত্তি ঈর্ষা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমূহ ইহার উৎপত্তির মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। * ইহার সহিত হিন্দুদিগের এই বিষয়ে শিক্ষা তুলনা করিলে মন্দ হয় না। হিন্দুদিগের এই শিক্ষা আছে যে আত্মহত্যা করিলে ধর্ম্মহানি হয়, পাপ হয়—সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, কিন্তু আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এইরূপ কঠোর

* Pearson's magazine Christmas number.

ধর্ম্মশাসন থাকাতে হিন্দুজাতি আত্মহত্যা বিষয়ে অত্যন্ত পরাঙ্মুখ। তবে সম্প্রতি ইউরোপীয় সভ্যভব্যতার তরঙ্গ আসিয়া যতই আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, যতই প্রবৃত্তির বৃথা উদ্দীপক নবেল নাটক দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, ততই আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ সকলও আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে।

ইউরোপে কোন কোন দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল প্রবৃত্তিস্রোতকে কি যুক্তিবলে প্রশস্ত করিয়া দেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপে ফ্রান্সের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। ফ্রান্সের রাজধানীর লোকেরা নাকি ভব্যতম এবং প্রবৃত্তির স্রোতে দিবানিশি নিমগ্নপ্রায় থাকে, তাই বুঝি পারিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া যেটুকু ধর্ম্মের বন্ধন ছিল, তাহাও ঘুচাইয়া দিলেন— আদেশ করিলেন যে সরকারী বিদ্যালয়ে এমন একখানি পুস্তক পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে না, যাহাতে ঈশ্বরের কোন প্রকার নাম আছে। ইহার ফলে যে যৌবনোন্মত্ত বালকদিগের দুর্নীতিপরায়ণতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। দুর্নীতিপরায়ণতা বর্দ্ধিত হইলে দেশের পতনও অনিবার্য্য। এই দুর্নীতি-বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপে পারিসের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এবং যখন রাজধানী সমস্ত দেশের আদর্শ স্বরূপ, তখন ইহাও অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে যে সমস্ত ফ্রান্সদেশে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তজ্জন্য তাহার লোক সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। এই কথা আমরা মিথ্যা বলিতেছি না, বিলাতের কোন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার এক সুবিখ্যাত লেখক ইহা লিখিয়াছেন। *

এইরূপে প্রবৃত্তির অনুকূলে চলিবার ফলে পাশ্চাত্যখণ্ডে এত বিচারালয়, এত সভাসমিতি, এত আইনকানুন ও এত সৈন্যসামন্তপ্রহরী বিদ্যমান থাকিলেও তাহা যেন অশান্তির একটা ভীষণ আগার হইয়া উঠিয়াছে; তথায় কেহ যেন হাঁপ ছাড়িতে অবকাশ পায় না। বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, সংবাদপত্রের হুড়াহুড়ি প্রভৃতি এই অশান্তির যৎসামান্য বহির্বিকাশ মাত্র। এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অত্যাচার ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইয়া ইহার কঠোর ফল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমগ্র পাশ্চাত্যখণ্ড হইতে এক অতি কাতর দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিয়াছে। ইহার তুলনায় আমরা দেখি যে, আর্য্য ঋষি মুনিগণ আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্ম ধর্ম্মসংযুক্ত করিয়া দিয়া কি সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতারই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সুন্দর বিধি ব্যবস্থার ফলে আজও আমরা গর্ব্বের সহিত ও গৌরবের সহিত মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি; এবং তীব্র অসোয়াস্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গভীর শান্তি-ভোগে সক্ষম হইতেছি।

এতদূর পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে এমন যেন কেহ মনে না করেন যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে উদ্দাম প্রবৃত্তির অতিরিক্ত নিবৃত্তির কোন প্রকার ভাবই পাওয়া যায় না, অথবা প্রাচ্য ভারতবর্ষ একেবারে নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া আপনার

* Mr. Stoddard Dawey in the Westminster Review.

পরম কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে। ঈশ্বরের মঙ্গলভাব হইতে কেহই সম্পূর্ণ বিচ্যুত থাকিতে পারে না, একথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা নিশ্চয়ই জানিতেছি যে পাশ্চাত্য দেশসমূহেও নিবৃত্তিভাব কার্য্য করিবেই। আর বাস্তবিকও যে পাশ্চাত্য জনগণের হৃদয়ে নিবৃত্তিভাব প্রবৃত্তিভাবের উপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, চিকাগো নগরের মহা ধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিষ্ঠাই তাহার সুপরিচায়ক। যাই হউক, পাশ্চাত্যেরা তো ধীরে ধীরে সুপথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, আমরা পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা অধিকতর পাপী। ঈশ্বরের এমন প্রকৃষ্ট দান নিবৃত্তিভাব আমরা হাতের মধ্যে পাইয়াও যে তাহাকে অবহেলা করিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির শরণাপন্ন হইতে ছুটিয়াছি, আমাদের ন্যায় দোষী ব্যক্তি কোথায়? আজকাল নিবৃত্তির নামোচ্চারণ করিলেই অনেক সুপণ্ডিত স্বদেশীয় ব্যক্তি সন্দেহ করেন যে, আমরা নিবৃত্তির নামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকলকে নিদ্রিত থাকিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উপদেশ দিই। এরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা অসম্ভব এবং সমূহ অমঙ্গলের কারণ বলিয়া তাঁহারা বিপরীত দিকে প্রবৃত্তির বড়ই পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের ইহা ভুল। আমরা নিবৃত্তির নামে লোক সকলকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিই না—বরঞ্চ তাহার বিরুদ্ধেই উপদেশ দিতে চাহি। এইরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকাই তো এক দুষ্প্রবৃত্তি এবং যথার্থই রাশি রাশি দুষ্প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ। আমরা এই কথা বলি যে, আমাদিগকে প্রবৃত্তিস্রোতে তো যাইতেই হইবে—কাহারও সাধ্য নাই যে আমাদিগকে প্রবৃত্তির একেবারে অতীত করিয়া দিতে পারে। তবে প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইয়া সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিলে যে কোন্ আবর্ত্তের মধ্যে যাইয়া একেবারে নিমগ্ন হইব, কোন্ অন্ধকারময় পূতিগন্ধময় স্থানে নিক্ষিপ্ত হইব, তাহার ঠিকানা থাকিবে না। সেই কারণে যাহাতে প্রবৃত্তিস্রোতে পড়িয়া কূলকিনারা না পাইয়া একেবারে ভাসিয়া না যাই, অসহায় হইয়া না পড়ি, তজ্জন্যই আমাদের নিবৃত্তিকে অথবা সংযমকে সর্ব্বকর্ম্মেই সর্ব্বতোভাবে সহায় গ্রহণ করা উচিত। আমরা যখন বলি যে, নিবৃত্তিকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার অর্থ এই যে, আমাদের প্রবৃত্তিসমূহকে নিবৃত্তির আশ্রিত করিতে হইবে, অর্থাৎ সংযমসহায় করিয়া সমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে; এবং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, ইহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার উপদেশ। যেমন ইউরোপে এক সময়ে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান, উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল; কিন্তু এখন যেমন উভয়ের মধ্যে দিন দিন সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে এবং এখন যেমন উভয়ে মিলিত হইয়া সেই বিশ্বপতি ত্রিভুবনপালকের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, সেইরূপ যে দিন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শান্তি ও আনন্দের মলয়বায়ু আনয়ন করিবে, ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, সেই দিন পাশ্চাত্য দেশের জয়; সেই দিন ভারতের জয়, মানবজাতির

জয়, নীতির জয়, ধর্ম্মের জয় এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সত্যের মূলাধার ভগবানের জয়।

এখন, এই নিবৃত্তিভাব আমরা পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথার মধ্যে দেখিতে পাই। কবির বিশেষ রচনানৈপুণ্য না থাকাতে অধিকাংশ স্থানে এই নিবৃত্তিভাব পরিস্ফুট হয় নাই; কিন্তু সমস্ত কথাটী একটু মনোযোগের সহিত পড়িলেই বুঝা যায় যে কবি হরিশ্চন্দ্রকে এই নিবৃত্তিভাবের আদর্শকেন্দ্রে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, তবে ততটা সফল হন নাই। কিন্তু কবি যতটুকু করিয়াছেন, সেইটুকুরও জন্য পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। হরিশ্চন্দ্র যখন চণ্ডালের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে মৃতকম্বল সংগ্রহ করিতেছেন—সে ভাব কি মহান্! এবং সর্ব্বশেষে যখন হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে স্বর্গগমনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বলিতেছেন "আমার ভক্ত প্রজাগণ কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি সুদীর্ঘ স্বর্গভোগেরও ইচ্ছা করি না, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে যদি একটী দিনও আমার স্বর্গভোগ হয় তাহাও শ্রেয়"—সে ভাব কি মহান্! এমন ভাব জানি না অন্য কোন্ ভাষার কোন্ গ্রন্থে আছে। অন্ততঃ কবির এই শেষ উক্তির জন্যও তাঁহাকে শতবার নমস্কার করি।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন ইতিহাসের সম্মান রক্ষার জন্য, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা বৈদিক হরিশ্চন্দ্রকথা অথবা শৌনঃশেপ আখ্যান পরিত্যাগ করিতে পারি না, সেইরূপ আমাদের সম্মুখে নিবৃত্তির উচ্চ আদর্শ স্থাপনের জন্য আমরা পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিব না—উভয়ই আমাদের অতি প্রিয় বস্তু, উভয়ই সমস্ত ভারতের গৌরবের সামগ্রী।

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারং।

জ্যোতিঃ শাস্ত্র।

লগ্ন পরীক্ষা।

উদয়াবধি কিম্বা অস্তাবধি যত দণ্ড সময়ে জন্ম হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ও রবিভুক্তি সেই জাতদণ্ডে যোগ করিলে লগ্ন হইবে।

২য় প্রমাণ—চন্দ্র কিম্বা রাশির অধিপতি গ্রহ যে স্থানে থাকিবে, তথায় অথবা তাহার নবম কিম্বা পঞ্চম স্থানে অথবা তাহার সপ্তমের ত্রিকোণ ঘরে লগ্ন হইবে।

৩ য় প্রমাণ—চন্দ্র যে ঘরে থাকেন, তাহার

ত্রিকোণ স্থানে লগ্ন হয়। আরও যে স্থানে চন্দ্র তথায় লগ্ন অথবা ত্রিকোণ স্থানেও ক্ষেত্রাধিপের বিষম ঘরে লগ্ন হইবে।

রাশিদিগের অঙ্গাদি সংজ্ঞা।

অগ্নিরাশি—	লিঙ্গ।	বায়ুরাশি—	লিঙ্গ
মেষ —	পুং।	মিথুন—	পুং
সিংহ —	পুং।	তুলা—	পুং
ধনু —	পুং।	কুম্ভ—	পুং

(ইহারা পশ্চিম দিক স্বামী)

(এই তিনরাশি পূর্ব্বদিকস্বামী)।

জলরাশি—	লিঙ্গ।	পৃথ্বীরাশি	লিঙ্গ
কর্কট—	স্ত্রী।	বৃষ—	স্ত্রী
বৃশ্চিক—	স্ত্রী।	কন্যা—	স্ত্রী
মীণ—	স্ত্রী।	মকর—	স্ত্রী

(ইহার উত্তরদিক স্বামী)।(ইহারা দক্ষিণদিকস্বামী

পৃথ্বীরাশির সহিত জল রাশির এবং অগ্নি রাশির সহিত বায়ু রাশির মিত্রতা। পৃথ্বীর সহিত বায়ুর এবং অগ্নির সহিত জলের শত্রুতা। পৃথ্বীর সহিত অগ্নির ও জলের সহিত বায়ুর উদাসীনতা।

রাশিদিগের চরাদি সংজ্ঞা।

চর।	স্থির।	দ্ব্যাত্মক।
মেষ।	বৃষ।	মিথুন।
কর্কট।	সিংহ।	কন্যা।
তুলা।	বৃশ্চিক।	ধনু।
মকর।	কুম্ভ।	মীণ।

মেষাদির বিশেষ নাম।

মেষের অন্যনাম—ক্রিয়। বৃষের—তাবুরি। মিথুনের—জিতুম। কর্কটের—কুলীর। সিংহের—লেয়। কন্যার—পাথেব। তুলার—যুক। বৃশ্চিকের—কৌর্পৃথ্য। ধনুর—তৈক্ষিক। মকরের—আকোকেরো। কুম্ভের—হৃদ্রোগ। মীণের—অণ্ত্যভা।

রাশির ক্রূর ও সৌম্য সংজ্ঞা।

ক্রূর—মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ।
সৌম্য—বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন

রাশিদিগের দ্বিপদাদি সংজ্ঞা।

মিথুন, কন্যা, তুলা, কুম্ভ ও ধনুর ১ম অর্দ্ধভাগ দ্বিপদ। ধনুর শেষার্দ্ধভাগ এবং মকরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ ও বৃষ, মেষ, সিংহ চতুষ্পদ।

কীট ও সরীসৃপ সংজ্ঞা।

মকরের শেষার্দ্ধভাগ ও কর্কট মীন ও বৃশ্চিক ইহারা কীট সংজ্ঞা কিন্তু বৃশ্চিক সরীসৃপ।

রাশিদিগের বশ্যাবশ্য কথন।

মিথুন, কন্যা, তুলা, কুম্ভ এবং ধনুর পূর্ব্বভাগ বশ্য সংজ্ঞা মকর ও ধনুর শষার্দ্ধ, বৃষ ও মেষ অবশ্য সংজ্ঞা।

রাশিদিগের গ্রাম্যাদি সংজ্ঞা।

গ্রাম্য—মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনু, বৃশ্চিক এবং রাত্রিতে বৃষ ও মেষ!

অরণ্য—মকরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ, সিংহ এবং দিবাতে মেষ ও বৃষ।

জলজ—কর্কট, মীন ও মকরের শেষার্দ্ধভাগ কোনমতে কুম্ভ রাশি।

রাশিদিগের হ্রস্বাদি সংজ্ঞা।

হ্রস্ব।	দীর্ঘ।	সম।
মেষ।	সিংহ।	মিথুন।
বৃষ।	কন্যা।	কর্কট।
কুম্ভ।	তুলা	ধনু।
মীন।	বিছা।	মকর।

পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞা—মেষ, বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর মীন, এবং ইহারা নিশিবলা।

শীর্ষোদয় সংজ্ঞা—মিথুন, সিংহ কন্যা, তুলা, বিছা, কুম্ভ ও মীন এবং ইহারা দিবা-বলা।

রাশি দিগের বর্ণ।

মেষ অরুণ বর্ণ। বৃষ শুক্লবর্ণ। মিথুন হরিদ্বর্ণ। কর্কট পাটলবর্ণ। সিংহ পাণ্ডুবর্ণ। কন্যা বিচিত্র বর্ণ। তুলা কৃষ্ণবর্ণ। বৃশ্চিক পিষঙ্গবর্ণ। ধনু পিঙ্গলবর্ণ। মকর কুর্ব্বর বর্ণ। কুম্ভ বভ্রুবর্ণ এবং মীন মলিন বর্ণ।

জলচর সংজ্ঞা—কর্কট ও মীন।

স্থলচর সংজ্ঞা—মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ কন্যা, তুলা ও ধনু।

উভচর সংজ্ঞা—মকর ও কুম্ভ।

রবিশুদ্ধি কথন।

জন্মরাশেঃ শুভ সূর্য্যস্ত্রিষষ্ঠ দশলাভগঃ দ্বিপঞ্চ নবমোঽহ পীঠস্ত্রয়ো দশাদিনাৎ পরং॥

চন্দ্রশুদ্ধি কথন।

সপ্তাদ্যচন্দ্রে ধ্রুবমর্থঃ লাভঃষষ্ঠ তৃতীয়ে ধন ভোগমায়ু। সর্ব্বার্থা সিদ্ধিং দশাম বদন্তি একাদশে সর্ব্বসুখানিচৈব। সপ্তমোপচয়াদ্যস্থঃ শশী সর্ব্বত্র শোভনঃ। শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়স্ত পঞ্চম নবমস্তথা।

কর্ত্তার জন্মরাশি এবং ক্রিয়ার দিনের যে নক্ষত্র হইবে সেই নক্ষত্রে যে রাশি হইবে, ঐ রাশি যদি ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১১শ, হন, তাহা হইলে চন্দ্রশুদ্ধি হয়। আর শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবম চন্দ্রশুদ্ধি।

তারাশুদ্ধি।

জন্ম, সম্পৎ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি; সাধকোবধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারা প্রতীর্ত্তিতা॥
সর্ব্বমঙ্গল কার্য্যানি ত্রিসুজন্ম সুকারয়েৎ।
বিবাদ শ্রাদ্ধ ভৈষজ্য যাত্রা ক্ষৌরাণি বর্জ্জয়েৎ॥

জন্ম অবধি নয়টী তারা যথা জন্ম, সম্পৎ বিপদ ক্ষেম প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র ইহাদের মধ্যে জন্ম, বিপদ, প্রত্যরি, বধ, এই চারি তারা মন্দ। ইহাভিন্ন সমস্ত তারা শুভ। শুভ তারাতে সকল শুভ কার্য্য হইয়া থাকে। বিবাদ, শ্রাদ্ধ, ভৈষজ্য, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনজন্ম তারাতে সকল শুভকার্য্য করিতে পারিবে। জন্মতারা ও ক্রিয়ার দিনের তারা একত্র করতঃ যদি সুতারা হয়, তবে সেই শুদ্ধ হইবে। যদি মন্দ হয়, তবে তাহার প্রতিকারার্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। জন্মে শাক, বিপদে গুড়, প্রত্যরিতে লবণ এবং বধেতে তিল ও কাঞ্চন দান করিবে।

ঘাতচন্দ্র কথন।

মেষের প্রথম, বৃষের পঞ্চম, মিথুনের নবম, কর্কটের দ্বিতীয়, সিংহের ষষ্ঠ, কন্যার দশম, তুলার তৃতীয়, বৃশ্চিক ও ধনুর চতুর্থ, মকরের অষ্টম, কুম্ভের একাদশ ও মীনের পঞ্চম চন্দ্র ঘাতচন্দ্র হয়। এই ঘাতচন্দ্রে বিবাহ ও যাত্রাদি নিষিদ্ধ।

গ্রহণের উচ্চ ও নীচ স্থান।

গ্রহের	উচ্চ	নীচ
নাম	রাশি	রাশি
উচ্চাংশের	নীচাংশ	সুনীচাংশ ও
ভোগের	ভোগের	মূচ্চাংশ

ফল	ফল	ভোগেরফল
রবি—	মেষ—	তুলা
১০দিন—	১০দিন—	১দিন
চন্দ্র—	বৃষ—	বিছা
১৩দ। ৩০পল।	১০দ। ৩০পল।	৪দি। ৩০পল
মঙ্গল—	মকর—	কর্কট
৪২দিন—	৪২দিন—	১দিন ৩০দণ্ড
বুধ—	কন্যা—	মীন
৯দিন—	৯দিন—	৩৬দণ্ড
বৃহস্পতি—	কর্কট—	মকর
২মাস—	২মাস—	১২দিন
শুক্র—	মীন—	কন্যা
২৫দিন।০। ১২প।	২৫দিন।০। ১২প।	৫৬দণ্ড
শনি—	তুলা—	মেষ
২০মাস—	২০—	১মাস
রাহু—	মিথুন—	ধনু
১২মাস—	১২মাস—	১৮দিন
কেতু—	ধনু—	মিথুন
১২মাস—	১২মাস—	১৮দিন

কেষ্টী প্রদীপ বলেন একতুঙ্গে ভবেদ্ভোগী দ্বিতুঙ্গেচ ধনেশ্বরঃ ত্রিতুঙ্গেচ ভবেদ্রাজা চতুর্থেঃ চক্রবর্ত্তিনঃ।

অশং শব্দে গ্রহের রাশি ভোগের ৩০ ভাগের এক ভাগ।

অথ রাশির মূল ত্রিকোণ।

মঙ্গলের মূল ত্রিকোণ মেষ।

চন্দ্রের	ঐ	বৃষ
রবির	ঐ	সিংহ
বুধের	ঐ	কন্যা
শুক্রের	ঐ	তুলা
বৃহস্পতির	ঐ	ধনু
শনির	ঐ	কুম্ভ
রাহুর	ঐ	কুম্ভ

এই সকল গ্রহ ঐ স্থানে থাকিলে বলবান হয়।

কালপুরুষের অঙ্গ বিভাগ অর্থাৎ মানব শরীরের কোন কোন অংশ কোন কোন গ্রহের স্থান তাহার চক্র—মেষ শীর্ষে। বৃষ মুখে। মিথুন বাহু। কর্কট হৃদয়ে। সিংহ উদর। কন্যা কটি। তুলা বস্তি। বৃশ্চিক গুহ্যে। ধনু উরু। মকর জানু। কুম্ভ জঙ্ঘ্যা। মীন পাদ।

অথ নক্ষত্র কর্ত্তৃক শরীর বিভাগ।

অশ্বিনী মূর্দ্ধনী। ভরণী ভ্রূ। কৃত্তিকা ভ্রূ। রোহিণী চক্ষু। মৃগশিরা চক্ষু। আর্দ্রা কর্ণ। পুনর্ব্বসু কর্ণ। পুষ্যা নাসা। অশ্লেষা গণ্ড। মঘা ওষ্ঠ। পূর্ব্বফল্গুনী ওষ্ঠ। উত্তরফল্গুনী দন্ত। হস্তা দন্ত। চিত্রা জিহ্বা। স্বাতি গ্রীবা। বিশাখা। স্তন। অনুরাধা স্তন। জ্যেষ্ঠা বক্ষ। মূলা পার্শ্ব। পূর্ব্বাষাঢ়া পার্শ্ব। উত্তরাষাঢ়া নাভি। শ্রবণা নিতম্ব। অভিজিৎ পৃষ্ঠ। ধনিষ্ঠা গুহ্য। শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ পদ। উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতি পদ।

মনুষ্যের যে যে অংশে যে যে রাশির অধিকার। কর্কট কপালের উপরিভাগ। সিংহ দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূ। ধনু দক্ষিণ চক্ষু। তুলা দক্ষিণ কর্ণ। কুম্ভ বামচক্ষুর ভ্রূ। মিথুন এবং মেষ বামকর্ণ। বৃষ কপালের মধ্যস্থল। মকর চিবুক যুতনী দাড়ি। বিছা নাক। কন্যা দক্ষিণ গাল। মীন বামগাল। এই সকল স্থান দ্বারা রাশিজ্ঞান হয়। রাশিজ্ঞান হইলে আকৃতি ও স্বভাব জানা যায়।

গ্রহ দ্বারা মানবমুখ বিভাগ।

মঙ্গল কপালে। রবি দক্ষিণ নয়নে। বৃহস্পতি দক্ষিণ কর্ণে। শনি বামকর্ণে। শুক্র নাসিকায়। বুধ মুখে। জন্মকালে যে গ্রহের ভাগ অধিক হয় সেই সেই স্থানে বিশেষ চিহ্ন উৎপত্তি হয়।

অথ রাশিদিগের বর্গ নির্ণয়।

মেষ ক বর্গ ৩।৫।৭ অক্ষর।
বৃষ চ বর্গ ২।৪।৬ ঐ
মিথুন ত বর্গ ৩।৫।৭ অক্ষর।
কর্কট য ও শ বর্গ ২।৪।৬ অক্ষর।
সিংহ অ বর্গ ৩।৫।৭ অক্ষর।
কন্যা ট বর্গ ২।৪।৬ অক্ষর।
তুলা চ বর্গ ৩।৫।৭ অক্ষর।
মকর প বর্গ ২।৪।৬ অক্ষর।
কুম্ভ প বর্গ ৩।৫।৭ অক্ষর।
মীন ত বর্গ ২।৪। অক্ষর।
বিছা ক বর্গ ২।৪।৬ অক্ষর।
ধনু ত বর্গ ৩।৫।৭ অক্ষর।

ইহা দ্বারা নাম জানা যায়।

গ্রহগণের বলাবল।

কেন্দ্র অর্থাৎ ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ১০ম গৃহে প্রবল ফল দেন।

পণফর অর্থাৎ ৫ম, ২য়, ৮ম, ১১শ গৃহে মধ্য ফল দেন।

আপোক্লিম অর্থাৎ তৃতীয়, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১২শ গৃহে হীনবল অর্থাৎ অফল।

বৃদ্ধিস্থান—বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই চারি লগ্নকে বৃদ্ধিস্থান বলে।

অথ ষড়বর্গ কথন।

ক্ষেত্রং হোরায় দ্রেক্কাণো নবাংশো দ্বাদশাংশক।
ত্রিংশাংশকশ্চ ষড়বর্গস্ত্যাদি প্রাপ্তো ফলপ্রদা॥

ক্ষেত্রচক্র।

গ্রহের নাম	ক্ষেত্রের নাম
রবির	সিংহ।
চন্দ্রের	কর্কট।
মঙ্গলের	মেষ, বৃশ্চিক।
বুধের	কন্যা, মিথুন।
বৃহস্পতির	ধনু, মীন।
শুক্রের	তুলা, বৃষ।
শনির	মকর, কুম্ভ।

হোরা।

লগ্নের অর্দ্ধাংশের নাম হোরা, তন্মধ্যে বিষম রাশির প্রথম অংশ সূর্য্যের ও দ্বিতীয় অংশ চন্দ্রের হোরা। সমরাশির প্রথম অংশ চন্দ্রের ও দ্বিতীয় অংশ সূর্য্যের হোরা।

চক্র।

বিষমরাশি।	সূর্য্য ১ম অর্দ্ধ।	দ্বিতীয়ার্দ্ধ চন্দ্র।
মেষ	২দা৩পা৩৩বি৩০অ।	২।৩।৩৩।৩০
মিথুন	২।৪৪।২০।	২।৪৪।২০
সিংহ	২।৪৬।২৫।৩০।	২।৪৬।২৫।৩০
তুলা	২।৪৭।৪৩।	২।৪৭।৪৩
ধনু	২।৩৮।৩৯।৩০।	২।৩৮।৩৯।৩০
কুম্ভ	১।৫৮।৪৩।	১।৫৮।৪৩
সমরাশি	১ম অর্দ্ধচন্দ্র	২য়ার্দ্ধ সূর্য্য
বৃষ	২।২৪।৫৫।	২।২৪।৫৫
কর্কট	২।৫০।৪৩।	২।৫০।৪৩
কন্যা	২।৪৪।৪০।	২।৪৪।৪০
বৃশ্চিক	২।৫০।২৮।৩০।	২।৫০।২৮।৩০

মকর ২।১৬।৩০।। ২।১৬।৩০
মীম ১।৫৩।২০। ১।৫৩।২০

দ্রেক্কাণ।

রাশির ৩ অংশের এক অংশের নাম দ্রেক্কাণ। রাশির অধিপতি গ্রহ প্রথম দ্রেক্কাণের পতি। এবং সেই রাশির পঞ্চম রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি ও রাশির নবম রাশির অধিপতি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হইবে।

চক্র।

রাশি। তৃতীয়াংশ। ১ম দ্রেক্কাণের অধিপতি ও পুং স্ত্রী কথন।

	রাশি	তৃতীয়াংশ	১ম দ্রেক্কাণের অধিপতি ও পুং স্ত্রী কথন
১।	মেষ	১।২২।২২।২০অ।	ম—পুং
২।	বৃষ	১।৩৬ ৩৬।৪০।	শু—স্ত্রী
৩।	মিথুন	১।৪৯।২৬।৪০।	বু—স্ত্রী
৪।	কর্কট	১।৫৩ ৪৮।৪০।	চ—পুং
৫।	সিংহ	১।৯।৫০।৫৭।০।	র—পুং
৬।	কন্যা	১।৪৯।৪৬।৪০।	বু—পুং

	২য় দ্রেক্কাণাধিপতি ও স্ত্রী পুং কথন।	তৃতীয় দ্রেক্কাণাধিপতি ও পুং স্ত্রী কথন।
১।	র, স্ত্রী	বৃ পুং
২।	বু পুং	শ পুং
৩।	শু পুং	শ পুং
৪।	ম স্ত্রী	বৃ পুং
৫।	বৃ পুং	ম পুং
।৬	শ পুং	শু স্ত্রী

তুলা ১।৫৮.৪৮।৪০। শু, পুং। শ, পুং। বু পুং।
বৃশ্চিক ১।৫৩।৩৭।০। ম, স্ত্রী।। বৃ, স্ত্রী। চন্দ্র পুং।
ধনু ১।৪৫।৫৩।০। বৃহ পুং। ম, স্ত্রী। রবি পুং
মকর ১।৩০।৫৯।২০। শ পুং। শু স্ত্রী। বু পুং।
কুম্ভ ১।১৯।৮।৪০। শ পুং। বু, স্ত্রী। শু পুং।
মীন ১।১৫।৩৩।২০। বৃ পুং। চ স্ত্রী। ম পুং।

বিশেষ এই যে দ্রেক্কাণাধিপ স্ত্রী গ্রহ হইয়া দুর্ব্বল হয় এবং লগ্নাধীপ গ্রহ যদি পুরুষ হয় পুং গ্রহের দৃষ্টি যদি ঐ লগ্নে থাকে তবে স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুং জম্মে। এবং বলবান স্ত্রীগ্রহ যদি লগ্নে অবস্থিত করে, অথবা স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি যদি ঐ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে পুং দ্রেক্কাণে স্ত্রী জম্মে কিন্তু স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুং জন্মিলে ঐ পুরুষের স্বভাব স্ত্রী লোকের ন্যায় হয় এবং পুং দ্রেক্কাণে স্ত্রীর জন্ম হইলে তাহার স্বভাব পুরুষের ন্যায় হয়।

অথ জলদহ মিশ্র দ্রেক্কাণ।

শুভগ্রহের দ্রেক্কাণের নাম জল। পাপগ্রহ দ্রেক্কাণের নাম দহন। জল দ্রেক্কাণে জন্মিলে জলে মৃত্যু জানা যায়। দহন দ্রেক্কাণে জন্মিলে অগ্নিতে মৃত্যু হয়। শুভগ্রহের দ্রেক্কাণে পাপ-হইলে তাহার নাম সলিল এবং মিশ্র সংজ্ঞা হয়।

অথ সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ।

মিথুন ও মীনের প্রথম, কর্কট ও ধনুর দ্বিতীয় ও কন্যা লগ্নের তৃতীয় দ্রেক্কাণের নাম সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ। এই সকল দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুখী হয়।

অথ রত্ন ভাণ্ডান্বিত দ্রেক্কাণ।

কর্কটের ১ম দ্রেক্কাণকে ফলপুষ্পযুক্ত দ্রেক্কাণ কহে এই দ্রেক্কাণে জন্মিলে বাটীতে বাস করে ধনুর দ্বিতীয় এবং তুলার ১ম দ্রেক্কাণকে রত্নভাণ্ডান্বিত কহে। এই দ্রেক্কাণে জন্মিলে রত্নভাণ্ডান্বিত যুক্ত হয়।

অথ রৌদ্র দ্রেক্কাণ।

মেষ, মকর, ও বৃশ্চিকের ২য়, ৩য় ; কুম্ভের

১ম ২য় ও ৩য়, মিথুন ও তুলার ৩য়, মীনের ২য় এবং সিংহের ১ম ও ২য় এই সকল দ্রেক্কাণের নাম রৌদ্র দ্রেক্কাণ।

অথ উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ।

মিথুন, মেষ, মকর ও কুম্ভের এই কয় লগ্নের ১ম, ২য় ও তৃতীয়, ধনুর ১ম ও তৃতীয়, তুলার ৩য় সিংহ ও কন্যা ২য় এই সকল দ্রেক্কাণের নাম উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ। এই সকল দ্রেক্কাণে জন্মিলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

অথ সর্পনিগড় দ্রেক্কাণ।

মীন ও কর্কটের ৩য়; বৃশ্চিকের ১ম ও দ্রেক্কাণের নাম সর্পনিগড়। এই কয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে সর্প দংশন করে এবং সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

অথ ব্যাড় দ্রেক্কাণ।

কুম্ভ ও বৃশ্চিকের ১ম ও ২য়। মীনের ৩য়। সিংহের ১ম ও ২য়। মকরের ৩য় ও তুলালগ্নের ২য় ও ৩য় দ্রেক্কাণের নাম ব্যাড়। এই সকল দ্রেক্কাণে জন্মিলে তাহাকে হিংস্র জন্তুতে নষ্ট করে।

অথ পাপধারি পক্ষী দ্রেক্কাণ।

বৃষের ১ম এবং মকরের ১ম ও ৩য় দ্রেক্কাণে পাপধারি কহে। এই কয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে পাশধারিতে অর্থাৎ বাণবিশেষে মৃত্যু হয়। তুলার ২য় ও ৩য়, সিংহের ও কুম্ভের ১ম দ্রেক্কাণকে পক্ষী কহে। এই দ্রেক্কাণে জন্মিলে পক্ষীতে তাহাকে নষ্ট করে।

নবাংশ।

রাশিকে ৯ ভাগ করিলে, তাহার এক এক অংশের নাম নবাংশ। তিন তিন রাশিতে এইরূপ নবাংশ গণনা করিবে।

চক্র।

রাশি অংশ	১ম রাশির অধিপতি।	২য় রাশির	৩য় রাশির	৪র্থ রাশির	৫ম রাশির	৬ষ্ঠ রাশির	৭ম রাশির	৮ম রাশির	৯ম রাশির
মেষ ০।২৭।২৭।২৬।৪০।	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ
সিংহ ০।৩৬।৫৯।০।০।									
ধনু ০।৩৫।১৭।৪০।০									
মকর ০।৩০।১৯।৪৬,৪০।	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু
বৃষ ০।৩২।৯২।১৩।২০।									
কন্যা ০।৩৬।৩৫।৩৩।২০।									
কর্কট ০।৩৭।৫৬।১৩।০।	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ
বৃশ্চিক ০।৩৭।৫৩।০।০।									
মীন ০।২৫।১১।৬।৪০।									
তুলা ০।৩৭।১৬।১৩।২০।	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
কুম্ভ ০।২৬।২২।৫৩।২০।									
মিথুন ০।৩৬।২৮।৫৩।২০।									

নবাংশ-দ্বারা জাত বালকের চরিত্র আকৃতি ও চিহ্ন বর্ণ বিচার করিতে হয়। যদি নবাংশের অধিপতিগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হন, তবে বালকের নবাংশ কথিত চিহ্নাদি হইবে। যদি তৎকালে চন্দ্রমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান হন, তবে বালক নবাংশোক্ত স্বভাবাদি না হইয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির যেরূপ লক্ষণ বিহিত আছে সেই সমস্ত হইবে।

দ্বাদশাংশ।

রাশিকে ১২ অংশ করিলে তাহার এক এক অংশের নাম দ্বাদশাংশ। যে রাশিকে দ্বাদশাংশ করিবে সেই রাশির অধীশ্বর যে গ্রহ তিনি সেই রাশির প্রথমাংশের অধিপতি হইবেন। এইরূপ পর পর রাশির অধীশ্বর যে যে গ্রহ তাঁহারা সেই সকল অংশের অধীশ্বর হইবেন।

চক্র।

১মাংশের অধিপতি।

রাশি—দ্বাদশাংশ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ,।

মেষ— ০।২০।৩৫।৩৫। ম শু বু চ র, বু, শু ম, বৃ, শ, শ, বৃ।

বৃষ— ০ ২৪।৯।১০। শু বু চ র বু. শু, ম, বৃ, শ, শ, বৃ, ম।

মিথুন— ০।২৭।২১।৪০ বু চ র বু শু, ম, বৃ, শ, শ, বৃ; ম, শু।

কর্কট— ০। ২৮।২৭।১০ চ র বু শু ম, বৃ, শ, বৃ, ম, শু. বু।

সিংহ— ০ ২৭।৪৪।১৫ র বু শু ম বৃ. শ, শ, বৃ, ম, শু, বু, চ।

কন্যা— ০।২।০২৫।০ বু শু ম বৃ শ, শ, বৃ, ম, শু, বু. চ, র।

তুলা— ০।২৭।৫৭।১০ শু ম বৃ শ শ, বৃ, ম, শু, বু, চ, র, বু।

বিছ— ০।২৮।৪৪।৪৫। ম বৃ শ শ বৃ, ম, শু, বু, চ, র, বু, শু।

ধনু— ০।২৬।২৮।১৫ বৃ শ শ বৃ ম, শু, বু, চ, র, বু. শু, ম।

মকর— ০। ২২।২৪।৫০ শ শ বৃ ম শু, বু, চ. র, বু, শু, ম, বৃ।

কুম্ভ— ০।১৯।৪৭।১০ শ বৃ ম শু বু, চ, র, বু. শু, ম, বৃ, শ।

মীন— ০।১৮।৫৩।২০ বৃ ম শু বু চ, র, বু, শু, ম, বৃ, শ, শ।

ত্রিংশাশ।

রাশিকে ৩০ ভাগ করিলে তাহাকে ত্রিংশাশ কহা যায়। বিষম রাশির প্রথম পঞ্চমভাগ মঙ্গলের ত্রিংশাশ তাহারপর পঞ্চভাগ শনির ত্রিশাংশ, তাহারপর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহারপর সপ্তভাগ বুধের ও তাহার পর পঞ্চভাগ শুক্রের ত্রিশাংশ। আর সমরাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের তাহার পর পঞ্চভাগ বুধের, তাহার পর অষ্টম ভাগ বৃস্পতির, তাহার পর সপ্ত ভাগ শনির, তাহার পর পঞ্চ ভাগ মঙ্গলের ত্রিশাংশ হয়।

বিষম রাশি ১ম ত্রিশাংশ ২য়ঐ ৩য়ঐ ৪র্থঐ ৫মঐ
ত্রিশাংশ ৫ ভাগের অধিপতি।

মেষ—০	৮	১৪	১৪	শ বৃ বু শু
মিথুন—০	১০	৫৬	৪০	
সিংহ—০	১১	৫	৪২	
তুলা—০	১১	১০	৫২	
ধনু—০	১০	৩৫	৬	
কুম্ভ—০	৭	৫৪	৫২	

সমরাশি ত্রিংশাশ ১মত্রিশাশের
৫ভাগের অধিপতি।
২য় ঐ ৩য় ঐ ৪র্থ ঐ ৫মঐ

বৃষ—০	৯	৩৯	৪০	শু বু বৃ শ মঙ্গল
কর্কট—০	১১	২১	৫২	
কন্যা—০	১০	৫৮	৪০	
বিছা—০	১১	২১	৫৪	
মকর—০	৯	৫	২৬	
মীন—০	৭	৩৩	২০	

গ্রহণের বিশেষ সংজ্ঞা।

রবির অন্যনাম হেলি ও সূর্য্য। চন্দ্রের নাম চন্দ্রমা, শীত রশ্মি। বুধের অন্যনাম হেমা, বিৎ, জ্ঞ, বোধন, ও ইন্দুপুত্র। মঙ্গলের নাম আর,

বক্র, ক্রূর দৃক ও অবনের। শনির নাম কাণ, মন্দ, সূর্য্যপুত্র, অসিত। বৃহস্পতির নাম জীব, অঙ্গিরা সুরগুরু, বচসাংপতি, ও ইজ্য। শুক্রের নাম ভৃগু, ভৃগুসুত, শিত ও আর্ফুজি। রাহুর নাম তম ও অগুরস্থর। কেতুর নাম শিখী।

অথ শুভ ও পাপগ্রহ।

রবি, মঙ্গল শনি, রাহু, ও কেতু পাপগ্রহ এবং কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পাপগ্রহ। বুধ, পাপগ্রহের সহিত একত্র থাকিলে পাপগ্রহ হন। ইহা ভিন্ন চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা শুভগ্রহ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে রাহু ও কেতু পাপগ্রহ নহে কেবল পাপদায়ক। শুভ গ্রহগণ কর্ত্তৃক সকল সুখ কর্ম্মে শুভদায়ক এবং পাপগ্রহগণ কর্ত্তৃক ক্রূর ও পাপ কর্ম্মে শুভদায়ক হয়।

গ্রহদিগের কালাঙ্কিত।

রবি কালের আত্মা। চন্দ্র হৃদয় ও মন। মঙ্গল বল। বুধ বাক্য বৃহস্পতি জ্ঞান ও সুখ। শুক্র কাল ও শনি দুঃখ।

রবি হইতে আত্মা। চন্দ্র হইতে হৃদয়। মঙ্গল হইতে বল। বুধ হইতে বাক্য। বৃহস্পতি হইতে জ্ঞান ও সুখ, শুক্র হইতে কাম এবং শনি হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়।

গ্রহদিগের নৃপতি সংজ্ঞা।

রবি, চন্দ্র রাজা। মঙ্গল সেনাপতি; বুধ যুবরাজ। গুরু ও শুক্র রাজমন্ত্রী, শনি প্রেষ্যদূত। গ্রহদিগের ঐ সকল বলাবল দ্বারা আত্মাদির এবং নৃপাদি যোগ জানিবে।

অথ গ্রহদিগের বর্ণ।

রবিগ্রহের রক্তশ্যাম। চন্দ্রের বর্ণ গৌর, মঙ্গলের রক্তগৌর, বুধের দূর্ব্বাশ্যাম বর্ণ। বৃহস্পতির বর্ণ গৌর। শুক্রের শ্যাম বর্ণ। শনি ও রাহুর কৃষ্ণবর্ণ, কেতুর ধূম্রবর্ণ। মানব দেহে গ্রহের দৃষ্টি অর্থাৎ যে গ্রহের ভাগ অধিক, মানবের সেই গ্রহের বর্ণ হইয়া থাকে।

গ্রহগণের লিঙ্গাদি সংজ্ঞা।

রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি পুরুষ। চন্দ্র, শুক্র স্ত্রী এবং বুধ ও শনি নপুংসক। ইহা দ্বারা গননা কালীন স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান জন্মে।

গ্রহগণের গুণাধিপ সংজ্ঞা।

চন্দ্র, বুধ ও শনির সত্ত্বগুণ। রবি ও শুক্রের রজগুণ। বৃহস্পতি ও মঙ্গলের তমগুণ। জন্মলগ্নকে যে গ্রহ সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপাত করিবেন। সেই গ্রহের গুণ জাত বালকের হইবে।

গ্রহগণের রসধিপ সংজ্ঞা।

রবি কটুরস। চন্দ্র লবণ, মঙ্গল তিক্ত, বুধ মিশ্ররস, বৃহস্পতি মধুর, শুক্র অম্ল, শণি কষায়রস। যাহার দেহ যে গ্রহের ভাগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টি অধিক পরিমাণে থাকিবে সেই ব্যক্তি সেই রসে অধিক প্রিয় হইবে।

গ্রহদগের প্রভাতাদি সংজ্ঞা।

বুধ, বৃহস্পতি প্রভাতকাল; রবি ও মঙ্গব মধ্যাহ্ন কাল। চন্দ্র, শুক্র অপরাহ্ন কাল এবং শণি রাহু সন্ধ্যাকাল।

গ্রহগণের পৈত্তিকাদি সংজ্ঞা।

রবি. মঙ্গল পিত্ত; চন্দ্র, শুক্র শ্লেষ্মা; বৃহস্পতি বুধ সমধাতু। শণি, রাহু বায়ুধাতু; যে গ্রহের দৃষ্টি অর্থাৎ ভাগ অধিক হইবে সেই গ্রহের যে ধাতু সেই ধাতু সেই মানবের হইবে।

গ্রহদিগের যুবদিসংজ্ঞা।

বুধ বালক, মঙ্গল যুবা, চন্দ্র ও শুক্র মধ্য বয়ক্রমে, এবং রবি বৃহস্পতি বৃদ্ধ।

গ্রহগণের জলচরাদি সংজ্ঞা।

শুক্র চন্দ্র জলচর। বুধ, বৃহস্পতি গ্রাম্যচর, শণি, রবি, মঙ্গল ও রাহু বনচর।

গ্রহদিগের দ্বিপদাদি সংজ্ঞা।

বৃহস্পতি, শুক্র দ্বিপদ; রবি, মঙ্গল চতুষ্পদ; শণি, বুধ পক্ষী; চন্দ্র, রাহু কীট পতঙ্গ; রাহু অপদ।

অথ গ্রহদিগের তির্য্যাক সুখাদি সংজ্ঞা।

শুক্র ও বুধ তির্য্যাক অর্থাৎ বাঁকা দৃষ্টি। রবি ও মঙ্গল ঊর্দ্ধ দৃষ্টি। চন্দ্র ও বৃহস্পতি সমদৃষ্টি। শণি ও রাহু অধোদৃষ্টি। মানবদেহে যে গ্রহের ভাগ অধিক থাকিবে সেই গ্রহের দৃষ্টি অনুযায়ি মানবের দৃষ্টি হইবে।

গ্রহদিগের স্থূলাদি সংজ্ঞা

চন্দ্রস্থূল। শুক্র কৃশ। রবি, মঙ্গল চতুস্কোণ। বুধ বৃহস্পতি বর্ত্তুলাকার। রাহু শণি দীর্ঘাকার মাতান্তরে রবি বর্ত্তুলাকার। চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। মঙ্গল ত্রিকোণ। বুধ ধনুরাকৃতি। বৃহস্পতি পদ্মাকৃতি। শুক্র চতুস্কোণ। শণি দণ্ডাকৃতি রাহু মকরাকৃতি কেতু সর্পাকৃতি।

দিকপতি।

রবি পূর্ব্বদিকের অধিপতি। শুক্র অগ্নিকোণের। মঙ্গল দক্ষিণদিকের রাহু নৈঋত কোণের। শনি পশ্চিম দিকের। চন্দ্র বায়ু কোণর। বুধ উত্তর দিকের। বৃহস্পতি ঈশাণ কোণের অধিপতি।

গ্রহদিগের জাত্যাধিপ।

বৃহস্পতি, শুক্রব্রহ্মণ। মঙ্গল, রবি ক্ষত্রিয়। চন্দ্র বৈশ্য। বুধ শূদ্র রাহু ও শণি অন্ত্যজজাতি।

বেদাধিপ।

বৃহস্পতির ঋগেদ। শুক্র যজুর্ব্বেদের। মঙ্গল সামবেদের চন্দ্র, বুধ, রাহু শণি অর্থর্ব্ব বেদের অধিপতি।

গ্রহগণের মিত্র শত্রু ও সমচক্র।

গ্রহ	মিত্র	শত্রু	সম
রবি	চন্দ্র	শুক্র	বুধ
	মঙ্গল	শণি	—
	গুরু	—	—
চন্দ্র	বুধ	—	মঙ্গল
	রবি	—	
মঙ্গল	রবি	বুধ	শণি
	চন্দ্র	—	—
	বৃহস্পতি	—	—
বুধ	রবি	চন্দ্র	গুরু
	শুক্র	—	শুক্র
			শণি
বৃহস্পতি	রবি	বুধ	শণি
	চন্দ্র	শুক্র	—
	মঙ্গল	—	—
শুক্র	বুধ	রবি	গুরু
	শণি	চন্দ্র	মঙ্গল
শণি	বুধ	মঙ্গল	গুরু
	শুক্র	চন্দ্র	—
	—	রবি	—
রাহু	শুক্র	রবি	—
	শণি	চন্দ্র	—
	—	মঙ্গল	—
কেতু	রবি	শুক্র	—
	চন্দ্র	শণি	—
	মঙ্গল	—	—

তৃতীয় অধ্যায়।

গ্রহগণের তৎকালিক মিত্রাদি।

জন্ম, প্রশ্ন, বিবাহাদি কিম্বা কোন সময় গ্রহগণের তৎকালিক মিত্রামিত্র জানিতে হইলে সেই সময় যে রাশিতে যে গ্রহ থাকিবেক সেই রাশি হইতে গণনা করিয়া ৪র্থ, ১০ম, ২য়, ১২শ ৩য়, ১১শ স্থানে যে যে গ্রহ থাকিবেন তাঁহারা পরস্পরে স্বাভাবিক মিত্র স্থলে তৎকালিক অধিমিত্র হইবেন। যদি স্বাভাবিক সম হন তবে ঐ অবস্থায় থাকিলে সম না হইয়া তৎকালিক মিত্র হইবেন। যদি স্বাভাবিক রিপু হন, তবে তৎকালিক রিপু না হইয়া সম হইবেন। ঐ কয় স্থানে স্বাভাবিক রিপুগ্রহ থাকিলে সেই স্বাভাবিক রিপুগ্রহ তৎকালিক অধিরিপু হইবেন। যদি স্বাভাবিক সমগ্রহ ঐ কয় স্থানে তৎকালে না থাকে তবে ঐ সমগ্রহ রিপু হইবেন। আর ঐ কয় স্থানে স্বাভাবিক মিত্রগ্রহ যদি না থাকেন তবে ঐ স্বাভাবিক মিত্র তৎকালিক সম হইবেন।

কোনমতে, উচ্চ স্থানে যে গ্রহ থাকেন, সেই গ্রহের সহিত ঐ উচ্চ স্থানে ঐ গ্রহের স্বাভাবিক শক্রগ্রহ থাকিলে, সেই শক্রগ্রহ তৎকালেক মিত্র হইবে। নচেৎ শক্র জানিবেন। রবির ৪র্থ, ১০ম, ২য়, ১২শ, ৩য়, ১১শ, এই সকল স্থানে পরস্পর যে যে গ্রহ থাকিবে তাহারা যদ্যপি স্বাভাবিক মিত্র হয় তাহা হইলে তৎকালিক অধিমিত্র হয়, এবং ঐ সকল স্থানে স্বাভাবিক সমগ্রহ তৎকালিক মিত্র হইবে এবং স্বাভাবিক রিপুগ্রহ থাকিলে তৎকালিক সম হইবে। এবং রবির ঐ কয় স্থান না হইয়া স্বাভাবিক রিপু হয় তবে তৎকালিক অধিরিপু হইবে। সম হইলে রিপু হইবে। স্বাভাবিক মিত্র হইলে তৎকালিক সম হইবে। কেহ বলেন উচ্চ স্থানের গ্রহে শক্রগ্রহ থাকিলে সেই গ্রহ মিত্র হয়। অন্যথা হইলে সেই গ্রহ রিপু জানিবে।

গ্রহগণের স্থানবল।

গ্রহগণ স্ব স্ব স্বচ্চাংশে, তুঙ্গস্থানে, মূলত্রিকোণে, মিত্রগৃহে ও স্বীয় ষড়বর্গেস্থিত থাকিলে বলবান হন। সম সংজ্ঞা রাশিতে চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে বলবান হন। বিষম সংজ্ঞা রাশিতে রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনি থাকিলে তাঁহারা বলবান হন।

স্ত্রী সংজ্ঞা গ্রহ প্রথমদ্রেক্কাণে বলবতী হন। রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, এই তিন পুংগ্রহ শেষদ্রেক্কাণে বলবান্ হন। শনি ও বুধ নপুংসক গ্রহমধ্যদ্রেক্কাণে বলবান হন।

গ্রহগণ স্বচ্চাংশে শ্রেষ্ঠবল। মূলত্রিকোণেও আপন গৃহে মধ্যবল। শুভগ্রহের দৃষ্টি ও মিত্রগৃহে থাকিলে কিঞ্চিৎ অধিক বলবান হন।

দিগ্বল।

রবি ও মঙ্গল ১০ম স্থানে থাকিলে দক্ষিণদিক বলী। শনিলগ্নের ৭ম স্থানে থাকিলে পশ্চিম দিকবলী। শুক্র ও চন্দ্র উচ্চ স্থানে থাকিলে উভয় দিকবলী।

চেষ্টাবল।

মকর, কুম্ভ, মীন এই তিন রাশিতে রবি,

মঙ্গল ও বৃহস্পতি কিম্বা চন্দ্র, শুক্র থাকিলে বলবান হন। কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা ও ধনু রাশিতে শনি থাকিলে বলবান। বুধ উভয় স্থানে বলবান। চন্দ্র, বুধ, গুরু ও শুক্র শুক্লপক্ষে বলবান। রবি, শনি, মঙ্গল ও বুধ কৃষ্ণপক্ষে বলবান। শুক্ল প্রতিপদ হইতে শুভ গ্রহগণ প্রতিদিন ৪ পল করিয়া পূর্ণিমার দিন সম্পূর্ণ বলবান হন। আর কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত, প্রতিদিন ৪ পল করিয়া বল কমিয়া, অমাবস্যাতে সম্পূর্ণ বলহীন হন।

পাপ গ্রহগণ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন ৪ পল করিয়া বলের বৃদ্ধি হইয়া ঐ অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণ বলবান হন। আর শুক্ল প্রতিপদ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৪ পল করিয়া বলহীন হইয়া পূর্ণিমার দিন সম্পূর্ণ হীন-বল হন।

বর্ষ বল।

বর্ষের অধিপতি গ্রহ, এক পাদ বলবান। মাসাধিপগ্রহ দ্বিপাদ বলবান, দিনাধিপতিগ্রহ ত্রিপাদ বলবান। কালহোরাধিপতি গ্রহ সম্পূর্ণ বলবান।

বর্ষাধিপতিগণনার প্রকরণ।

শকের অঙ্ককে দ্বিগুণ করতঃ ঐ গুণফলে দুই যোগ করিয়া ৭ দ্বারা হরণ করিয়া যদি ১ থাকে তবে রবির বর্ষ জানা যায়। ২ থাকিলে চন্দ্র, ৩ থাকিলে মঙ্গল ইত্যাদি ক্রম জানিবে।

ঋতু বল।

শনি শিশিরকালে বলবান। শুক্র বসন্তকালে বলবান, মঙ্গলগ্রহ ও রবিগ্রহ গ্রীষ্মকালে বলবান, চন্দ্র বর্ষাকালে, বুধ শরৎকালে, বৃহস্পতি হেমন্তকালে বলবান হন।

যাম ও দিবা রাত্রিকালে গ্রহদিগের বল নির্ণয়।

রবি, গুরু ও শুক্র দিবাভাগে বলবান, বুধ দিবারাত্রি উভয়কালে বলবান, ইহার মধ্যে দিবাভাগের পূর্ব্বার্দ্ধে শুভগ্রহ বলবান ও দিবাভাগের পরার্দ্ধে পাপগ্রহ বলবান হন। ঐরূপ রাত্রির পূর্ব্বার্দ্ধে শুভগ্রহ বলবান। দিবা ও রাত্রির তৃতীয় যম বা প্রহরে রবি, বুধ, শনি চন্দ্র বলবান হন, বৃহস্পতি দিবারাত্রি মধ্যে সকল কালেই বলবান।

গ্রহদিগের স্বাভাবিক বল।

জাতকে, কিম্বা প্রশ্নকালে, লগ্নের অধিপতি গ্রহদ্বারা বল জানা যায়, যথা—শনিলগ্নে থাকিলে যে পরিমাণে বলবান হয়েন, ঐ ঐ শনি হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে গুরু, গুরু হইতে শুক্র, শুক্র হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে রবি উত্তোরত্তর বলবান হয়েন, অর্থাৎ শনি একগুণ মঙ্গল ২গুণ, বুধ ৩গুণ, গুরু ৪গুণ, শুক্র ৫গুণ, চন্দ্র ৬গুণ, ও রবি ৮গুণ বল। শনি ৮ পল ৩৪ বিপল; মঙ্গল ১৭ পল ১৮ বিপল; বুধ ২৫ পল ৪২ বিপল; গুরু ৩৪ পল ২৬ বিপল; শুক্র ৪২ পল ৫১ বিপল। শনি ৫১ পল ২৬ বিপল; রবি ৬০ পল বল। লগ্নাধিপ গ্রহের দ্বারা বিবেচনা করিতে হইবে। লগ্নাধিপের যে বল বলা হইল তাহাতে লগ্নের বল বুঝাইবেক।

চন্দ্রের বিশেষ বল।

শুক্ল প্রতিপদ অবধি দশমী পর্য্যন্ত এই দশ দিবস চন্দ্র মধ্যমবল; শুক্ল একাদশী অবধি কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত এই দশদিন চন্দ্র সম্পূর্ণ

বলবান; কৃষ্ণ পক্ষের ষষ্ঠী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্র দুর্ব্বল থাকেন, চন্দ্রের উপর শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে চন্দ্র সর্ব্বত্র বলবান হন।

অথ গ্রহগণের দৃষ্টি স্থান।

প্রশ্ন কিম্বা জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে থাকেন, তথা হইতে গণনায়, ৩য় ও ১০ম স্থানে; সেই গ্রহের একপাদদৃষ্টি। ৫ম ও ৯ম স্থানে অর্দ্ধদৃষ্টি; ৪র্থ ও ৮ম স্থানে তিনপাদদৃষ্টি, এবং ৭ম স্থানে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হয়। বিশেষ এই যে ৩য় ও ১০ম স্থানে শণির পূর্ণ দৃষ্টি। ৯ম ও ৫ম স্থানে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি; এবং ৪র্থ ও ৮ম স্থানে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি থাকে। ইহা ভিন্ন ১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ১১শ ও ১২শ স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি নাই।

রাহুর দৃষ্টি।

যে রাশিতে রাহু থাকেন, তাহা হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে ৫ম, ৭ম, ৯ম ও ১২শ রাশিতে রাহুর পূর্ণদৃষ্টি। ২য়, ১০ম, স্থানে তিন পাদ দৃষ্টি; ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৪র্থ ও ৮ম স্থানে অর্দ্ধদৃষ্টি। যে রাশিতে রাহু থাকেন, সেই রাশিতে ও ১১শ স্থানে রাহুর দৃষ্টি নাই। কেতুর দৃষ্টি নাই। এই সকল দৃষ্টি ও গ্রহগণের বলাবল অনুসারে, ফলাফলের বিবেচনা হইয়া থাকে।

বৃহৎজাতকে গ্রহগণের আকৃতি কথন।

রবি—মধু পিঙ্গল চক্ষু, চতুচস্র তনু, পিত্ত-প্রকৃতি, অল্পকেশ।

চন্দ্র—ক্ষীণ অথচ গোল, বাত শ্লেষ্ম প্রকৃতি প্রাজ্ঞ, মেধাবিশিষ্ট, মৃদুবাক্য ও শোভন চক্ষু।

মঙ্গল—ক্রূরদৃষ্টি অর্থাৎ (অশোভন দৃষ্টি) যুবামূর্ত্তি, দাতা, পিত্ত প্রকৃতি, চঞ্চল, মধ্যদেশ কৃশ।

বুধ—বাকপটু, সতত হাস্যযুক্ত, নিত্য পরিহাসশীল, ত্রিদোশ অর্থাৎ কফ, পিত্ত, বায়ু ধাতু।

বৃহস্পতি—স্থূল শরীর, চক্ষু কেশ পিঙ্গলবর্ণ, উত্তম বুদ্ধি কফাশ্রিত ধাতু।

শুক্র—সুখাবিলাসী, মনোজ্ঞ শরীর, সুন্দর বায়ুধাতু, চুল অতি কৃষ্ণবর্ণ, এবং বক্র।

শনি—অলসযুক্ত, পিঙ্গল চক্ষু, কৃশ, এবং দীর্ঘ শরীর, দন্তগুলি স্থূল, এবং দীর্ঘ, অল্প, এবং রুক্ষচুল অল্পলোম বায়ু ধাতু। যাহার দেহে যে গ্রহের ভাগ অধিক, তাহার সেই গ্রহের আকৃতি প্রকৃতি হয়।

সপ্ত ধাতুর অধিপতি।

শিরার শনি; অস্থির রবি, রক্তের চন্দ্র ত্বকের, বুধ শুক্রের শুক্র, হৃদয় ও মেদের বৃহস্পতি এবং মজ্জার মঙ্গল অধিপতি হন।

গ্রহের বলাবলে দেহমাত্রেই ঐ সকলের স্থূলতা ও ক্ষীণতা হইয়া থাকে অতএব গ্রহগণ যখন বিরুদ্ধ হন, তখনই গ্রহের যে ধাতু সেই ধাতু কুপিত হইয়া উপরি উক্ত স্থানে পীড়া জন্মাইয়া দেয়।

গ্রহদিগের স্থান।

রবি দেবতার স্থানের, চন্দ্র জলের, মঙ্গল অগ্নির, বুধ বিহার স্থানের, বৃহস্পতি ধনাগারের, শুক্র শয়ন স্থানের অধিপতি হয়েন।

এই সকল স্থানের গ্রহের বলাবলে প্রসবের হৃত ও নষ্ট বস্তর স্থান নির্ণয় হয়।

গ্রহদ্বারা বস্ত্রজ্ঞান।

রবির স্থুলবস্ত্র, চন্দ্রের নূতন বস্ত্র, মঙ্গলের অগ্নিদগ্ধবস্ত্র, বুধের আদ্রবস্ত্র, শনির জীর্ণ ও বস্ত্র।

এই সকল গ্রহের বলাবল দৃষ্টে প্রসব সময়ে প্রসূতির পরিধান বস্ত্র নির্ণয় হয়।

প্রসব ঘরের দ্রব্য নির্ণয়।

রবি তাম্র ঘটিত দ্রব্যের অধিপতি, চন্দ্র মণি মানিক্যের, মঙ্গল সুবর্ণের, বুধ পিতল কাঁসাদির, বৃহস্পতি রূপার আর ঐ বৃহস্পতি নিজ গৃহে থাকিলে সুবর্ণের, শুক্র মুক্তার, শনি লৌহ সীশকাদির অধিপতি হন। এই সকল গ্রহের বলাবল বিবেচনা করিয়া সূতিকাগারে ঐ সকল ধাতু ঘটিত দ্রব্যের স্থিতি নির্ণয় করা যায়।*

ধাতুজ্ঞান।

লগ্নে শনি থাকিলে শিশিরকালে জন্ম, শুক্র থাকিলে বসন্তকালে মঙ্গল থাকিলে গ্রীষ্মকালে, চন্দ্র থাকিলে বর্ষাকালে, বুধ থাকিলে শরৎকালে বৃহস্পতি থাকিলে হেমন্তকালে জন্ম জানাযায়। দুই বা তিন গ্রহ থাকিলে বলাধিক্য বিবেচনায় ফল পাইবে। দ্রেক্কাণ ভাগকরতঃ সেই দ্রেক্কাণাধিপতি দ্বারা ধাতু নির্ণয় হয়। নষ্ট জাতকে এই গণনার প্রয়োজন।

অয়ণাদির অধিপতি গ্রহ নির্ণয়।

রবি অয়ণের, চন্দ্র ক্ষণের, মঙ্গল বারের, বুধ ধাতুর, বৃহস্পতি মাসের, শুক্র পক্ষের, শনি বৎসরের অধিপতি হন।

গ্রহণাং রাশিভোগ কাল নিরূপণ।

রবির্মাসং নিশানাথং সপাদ দিবসদ্বয়ং।*
পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রঃ বুধো ইষ্টাদশ বাসরাণঃ
বর্ষমেকং সুরাচার্য্য শষ্টাবিংশ দিনং ভৃগুঃ।

দিবসের যামার্দ্ধপতি গণনা।

দিনমান যত দণ্ড হইবে, তাহাকে ৮ ভাগ করিলে তাহার প্রতিভাগের নাম যামার্দ্ধ, অতএব সেই দিনে যেবার হইবে, সেই বারের অধিপতিগ্রহ প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি হইবেন, আর তাঁহাহইতে ছয়,ছয় বার অন্তরে গণনায় যে যে বারাধিপতি হইবেন। সুবোধার্থে নিম্নে একটী চক্র দেওয়া গেল।

বার, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম,

রবি—রবি—শুক্র—বুধ—সোম—শনি—গুরু—মঙ্গল—রবি

সোম—সোম—শনি—গুরু—মঙ্গল—রবি—শুক্র—বুধ—সোম

মঙ্গল—মঙ্গল—রবি—শুক্র—বুধ—সোম—শনি—গুরু—মঙ্গল

বুধ—বুধ—সোম—শনি—গুরু—মঙ্গল—রবি—শুক্র—বুধ।

গুরু—গুরু—মঙ্গল—রবি—শুক্র—বুধ—সোম—শনি—গুরু।

শুক্র—শুক্র—বুধ—সোম—শনি—গুরু—মঙ্গল—রবি—শুক্র।

শনি—শনি—গুরু—মঙ্গল—রবি—শুক্র—বুধ—সোম—শনি।

রাত্রি যামার্দ্ধপতি গণনা।

রাত্রিমান যত দণ্ড হইবে তাহাকে ৮ ভাগ করিলে, তাহার প্রথম যামার্দ্ধভাগে যে দিবসের গণনা করিবেন সেই দিবসের বারাধিপতি যে গ্রহ হইবেন তিনি সেই বারের রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি হইবেন। এবং ঐ প্রথম যামার্দ্ধ পতিগ্রহ হইতে ৫ম গণনাক্রমে যে যে বারাধিপতি হইবেন তাঁহারা যথাক্রমে রাত্রির

* শনিঃ স্বার্দ্ধদ্বয়ং বর্ষং স্বর্ভানুঃ সার্দ্ধ বৎসরং।

দ্বিতীয়াদি যামার্দ্ধের অধিপতি হইবেন, নিম্নে একটী দেওয়া হইল।

সুখে প্রসবজ্ঞান।

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবেন সেই রাশিস্থ চন্দ্রের উপর যদি শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, কিম্বা শুভ গ্রহের সহিত একরাশিতে চন্দ্র থাকেন, তাহা হইলে প্রসুতি সুখে প্রসব করে।

ঐ চন্দ্র যদি পাপ গ্রহের সহিত একরাশিতে থাকেন বা চন্দ্রের প্রতি পাপ গ্রহের দৃষ্টিথাকে তাহা হইলে প্রসুতি বহুকষ্টে প্রসব করে।

জন্ম সময়ে চন্দ্র যদি শনির নবাংশে অর্থাৎ মকর কিম্বা কুম্ভের নবাংশে অথবা যে লগ্নে জন্ম সেই লগ্ন হইতে গণনায় চতুর্থ রাশিতে থাকেন এবং শনি কর্ত্তৃক যদি ঐ চন্দ্র ঈক্ষিত হন, অথবা জলজ অর্থাৎ কর্কট ও মীনে থাকেন অথবা শনির সহিত একরাশিতে থাকেন, তাহা হইলে প্রসুতি অন্ধকারে প্রসবকরে, এবং ইহা দ্বারা অন্ধকারে গর্ভসঞ্চার ও জানাযায়।

প্রসুতির প্রসব কালের শয্যাজ্ঞান।

জন্মকালে যদি দুইটী গ্রহের অধিক তাঁহাদের স্বীয় নীচ রাশিতে থাকেন, তাহা হইলে তৃণ পতিত ভূমিতে প্রসুতির শয়ন জানাযায়। জন্ম-লগ্ন যদি শীর্ষোদয় অর্থাৎ সিংহ কন্যা তুলা, বিছা কুম্ভ ও মীন হয়, তবে জাতবালকের মুখ ঊর্দ্ধে থাকিয়া মস্তক নিঃসৃত হয়। আর যদি পৃষ্ঠোদয় অর্থাৎ মেষ বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর ও মিথুন রাশি হয়, তবে মুখ অধঃ হইয়া ঐ জাতবাল-কের পদ নিঃসৃত হয়। আর যদি মীনলগ্নে জন্ম হয়, তবে হস্ত অগ্রে নিঃসৃত হয়।

পথে প্রসব।

যে লগ্নে জন্ম হইবে, সেই লগ্নে যদি চর রাশি হয় এবং সেই লগ্নের যে নবাংশে জন্ম হইবে, সেই নবাংশ যদি চর রাশির অধিপতি গ্রহের হয়, তবে লগ্নের এবং ঐ নবাংশের অধিপতি গ্রহমধ্যে যে গ্রহ বলবান হইবে, সেই গ্রহের সংজ্ঞাতে যেরূপ ভূম্যাদিস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ স্থানাদি বিশিষ্ঠ পথে প্রসুতির প্রসব হইয়াছিল, জানাযায়।

কহার গৃহে প্রসব।

যে লগ্নে জন্ম হইবে, সেই লগ্ন যদি স্থির রাশি হয় ও সেইলগ্নের যে নবাংশে জন্ম হইবে, সেই নবাংশ যদি স্থির রাশির অধিপতি গ্রহের হয়, তবে লগ্নের ও নবাংশের অধিপতি গ্রহদ্বয় মধ্যে যিনি বলবান হইবেন। সেই গ্রহ রাশির যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ স্বভাব বিশিষ্ঠ ব্যক্তির গৃহে প্রসব হওয়া জানা যায়।

বাহিরে প্রসব।

যে লগ্নে জন্ম হইবে,সেই লগ্ন যদিদ্ব্যাত্মক রাশি হয় এবং সেই লগ্নের যে নবাংশে জন্ম হইবে সেই নবাংশ যদি দ্ব্যাত্মক রাশির অধিপতি গ্রহের হয়, তবে ঐ লগ্নের এবং নবাংশের অধিপতি গ্রহমধ্যে যে বলবান হইবে সেই গ্রহ রাশির সংজ্ঞাতে যেরূপ ভূম্যাদি নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপ ভূমিতে, গৃহের বাহিরে কোন স্থানে প্রসুতি প্রসব করিয়াছে জানিতে হইবে।

স্বীয় গৃহে প্রসব।

যে লগ্নে জন্ম হইবে সেই লগ্নের স্বামী যে গ্রহ, তিনি যদি জন্মলগ্নে থাকেন এবং ঐ লগ্নের

যে নবাংশে জন্ম হয় সেই নবাংশ যদি তাঁহার নিজ নবাংশ হয়,তবে স্বীয় গৃহে প্রসব জানাযায়।

সূতিকা গৃহ নূতন কি জীর্ণ।

জন্মলগ্নে যে যে গ্রহ বলবান থাকিবেন, সেই গ্রহ দ্বারা সূতিকা গৃহের অবস্থা জানাযায়, শনি সর্ব্বপেক্ষা বলবান থাকিলে সূতিকাঘর জীর্ণ এবং বারম্বার মেরামত জানাযায়; মঙ্গল বলবান হইলে দগ্ধঘর; চন্দ্র বলবান হইলে, নূতন ও শুক্লবর্ণ গৃহ; রবি বলবান হইলে বহুকাষ্ঠ যুক্ত ও কম মজবুতঘর; বুধ বলবান হইলে নানা প্রকার শিল্পকার্য্য বিশিষ্ট গৃহ; শুক্র বলবান হইলে মনোরম, চিত্রযুক্ত নূতন গৃহ; বৃহস্পতি বলবান হইলে বহুকাল স্থায়ী ঘর জানাযায়। জন্মকালে রাশিচক্রে যে গ্রহ বলবান হইবেন, সেই গ্রহের দ্বারা সূতিকা গৃহের অবস্থা জানা যাইবে। সেই গ্রহ যে গৃহে স্থিত থাকিবেন, সেই গ্রহের চতু-পার্শ্বের গ্রহদ্বারা সূতিকা ঘরের চতুপার্শ্বের গৃহের অবস্থা জানা যাইবে। যথা ঐ গ্রহের বাম পার্শ্বের গ্রহের দ্বারা বাম দিকের গৃহ এবং দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রহদ্বারা দক্ষিণ দিকের ঘরের অবস্থা জানা যাইবে। এইরূপে সম্মুখাদি গৃহের অবস্থা জানিবেন।

স্বল্প জাতক মতে জন্মলগ্ন হইতে গণনায় কর্কটরাশি যদি ১০ম হয় এবং ঐ কর্কটে যুচ্চাংশে যদি বৃহস্পতি থাকেন তবে বাটীর চতুর্থঃ প্রকোষ্টে, উচ্চাংশে থাকিলে ৩য় প্রকোষ্টে আর কর্কটের অন্যাংশে থাকিলে বাটীর ২য় প্রকোষ্টে সূতিকা গৃহ জানা যায়।

জন্মলগ্ন হইতে গণনায় ১০ম রাশি যদি ধনু হয়, এবং পূর্ণ বলবান বৃহস্পতি যদি ঐ রাশিতে থাকেন, তাহা হইলে ৩য় শালায় জন্ম জানা যায়। জন্মলগ্ন হইতে গণনায় ১০ম স্থানে মিথুন, কন্যা ও মীনরাশি হইলে, তাহাতে যদি বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে ২য় শালায় প্রসব স্থান জানা যায়। প্রকোষ্ঠ ও শালার অর্থ তল; অর্থাৎ দ্বিতল, তৃতল ও ৪র্থ তল ইত্যাদি জানিবেন।

প্রসব গৃহের জ্ঞান।

জন্মলগ্নের কেন্দ্র স্থানে যে গ্রহ থাকেন সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সেইদিকে সূতিকা গৃহের দ্বার হইবে। ঐ কেন্দ্র স্থানে অনেক গ্রহ থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী গ্রহের দিক সূতিকা-গৃহের দ্বার হইবে। কেন্দ্রে কোন গ্রহ না থাকিলে লগ্নপতি গ্রহের দিক, সূতিকা গৃহদ্বার হইবে।

বাটীর কোনদিকে সূতিকা গৃহ।

জন্মলগ্ন যদি মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা ও কুম্ভ হয়, কিম্বা অন্য রাশির নবাংশ ভাগে ঐ ঐ রাশি হয়, তবে সূতিকা গৃহ বাটীর চতুঃসীমার মধ্যে পূর্ব্বদিকে; ধনু, মীন, মিথুন, কন্যা যদি লগ্ন হয়, কিম্বা অন্যান্য রাশির নবাংশ ভাগে ঐ ঐ রাশি নবাংশ হয়, তবে সূতিকা গৃহ উত্তরদিকে; বৃষ কিম্বা অন্য রাশিতে বৃষরাশির নবাংশ হয় তাহা হইলে পশ্চিমদিকে; মকর ও সিংহ যদি লগ্ন হয়, কিম্বা অন্য রাশির নবাংশ ভাগে ঐ ঐ রাশির নবাংশ হয়, তবে সূতিকা গৃহ বাটীর দক্ষিণ দিকে জানাযায়।

ক্রীড়ভবন দেবালয় এবং উষর ভূমিতে প্রসবজ্ঞান।

জন্মলগ্ন যদি জলরাশি অর্থাৎ কর্কট, মীন ও মকর লগ্নের পরার্দ্ধে হয়, এবং ঐ লগ্নে যদি শনি

অবস্থিতি করে, এবং ঐ শনি যদি বুধকর্ত্তৃক ঈক্ষিত হয়, তবে ক্রীড়াভবন অর্থাৎ গৃহে প্রসব হয়; ঐ শনি যদি রবিকর্ত্তৃক ঈক্ষিত হয়, তবে দেবালয়ে; এবং চন্দ্রকর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে বালুকা এবং কাঁকরসংযুক্ত ভূমিতে প্রসব হয়।

গর্ত্ত কিম্বা কারাগারে প্রসবজ্ঞান।

জন্মলগ্নে যদি চন্দ্র থাকেন, এবং তাহার দ্বাদশ রাশিতে যদি শনি থাকেন এবং ঐ শনি যদি পাপগ্রহ গণ কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হন, তাহা হইলে কারাগারে প্রসব হয়।

জন্মলগ্ন কর্কট ও বিছা হইলে এবং শনি ঐ রাশিতে থাকিলে আর ঐ শনিকে চন্দ্র দৃষ্টি করিলে গর্ত্তে প্রসব জানা যায়।

রমণীর গৃহে, শ্মশানে ও দেবালয়াদিতে প্রসবজ্ঞান।

যদি নররাশি অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনু ও কুম্ভরাশির পূর্ব্বার্দ্ধ জন্মলগ্ন হয়, ঐ লগ্নে যদি শনি থাকেন ঐ শনিকে মঙ্গল দৃষ্টি করিলে শ্মশানে, শুক্র দৃষ্টি করিলে রমণীর গৃহে, গুরু দৃষ্টি করিলে অগ্নিশালাদিতে প্রসব জানা যায়, এবং ঐ শনি রবি কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে ঐ রবির স্থিতিস্থানেও বলাবল দেখিয়া রবির সংজ্ঞানুসারে রাজগৃহে কি দেবাগারে, কি গোশালায় প্রসব হইয়াছে জানা যায়, বুধ কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইলে শিল্পগৃহে প্রসব জানা যায়।

জলসমীপে প্রসবজ্ঞান।

জন্মরাশি জলরাশি অর্থাৎ কর্কট, মীন ও মকর রাশির পরার্দ্ধ হয় এবং চন্দ্র যদি ঐ রাশিতে থাকেন, তবে জলসমীপে প্রসব জানা যায়, আর ঐ লগ্ন যদি পূর্ণ দেখেন, তাহা হইলেও জলসমীপে প্রসব জানা যায়, এবং জন্মলগ্ন হইতে গণনায় চতুর্থ, কিম্বা দশমরাশি যদি জলরাশি হয়, আর ঐ জলরাশিতে চন্দ্র থাকিলে জলসমীপে প্রসব জানা যায়।

নৌকায় প্রসবজ্ঞান।

জন্মলগ্নে বুধ, কর্কটরাশিতে পূর্ণচন্দ্র ও লগ্ন হইতে ৪র্থ রাশিতে গুরু থাকিলে নৌকায় প্রসব জানা যায়।

জন্মলগ্ন জলরাশি হইলে, এবং লগ্ন হইতে গণনায় মকর কর্কট ও কন্যারাশি যদি সপ্তম হয়, এবং সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকিলে, নৌকায় প্রসব জানা যায়।

মাতৃ পিতৃ গৃহে প্রসবজ্ঞান।

দিবাভাগে জন্ম হইলে, রবিগ্রহ তৎকালে বলবান থাকিলে, পিতৃগৃহে; ও রাত্রিকালে জন্ম হইলে এবং তৎকালে চন্দ্র বলবান থাকিলে মাতৃগৃহে প্রসব জানা যায়। দিবাভাগে জন্মকালে শনি বলবান থাকিলে পিতৃ ও পিতৃশ্বসাদের গৃহে এবং চন্দ্র বলবান থাকিলে মাতৃশ্বসা ও মাতুলাদির গৃহে প্রসব জানা যায়।

রাত্রিকালে জন্মকালে শনি বলবান থাকিলে পিতৃগৃহে ও চন্দ্র বলবান থাকিলে মাতৃগৃহে প্রসব জানা যায়। এবং রবি বলবান থাকিলে পিতৃব্য ও পিতৃশ্বসা গৃহে. এবং শুক্র বলবান থাকিলে মাতৃশ্বসা ও মাতুলাদির গৃহে প্রসব জানা যায়।

জন্মকালে শুভগ্রহগণ নীচরাশিস্থ হইলে বৃক্ষতলে, চালায়, নদীতীরে কূপসমীপে, বাগানে ও পর্ব্বতের উপরে প্রসব জানা যায়: কোন স্থানে প্রসব, সূক্ষ্ম গণনায় নীচস্থগ্রহ মধ্যে যে

গ্রহ বলবান হইবেন, সেই গ্রহ যে রাশির অধিপতি, সেই রাশির যেরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুরূপ স্থানে প্রসব জানা যায়। যে লগ্নে জন্ম হইবে, সেই লগ্নেও চন্দ্রকে ঐ সব নীচস্থ গ্রহ যদি না দেখেন, তবে জনশূন্য স্থানে প্রসব জানা যায়।

প্রসবঘরের জনসংখ্যা।

যে লগ্নে জন্ম হয়, সেই লগ্ন হইতে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবেন, এই উভয় স্থান মধ্যে যে সংখ্যা গ্রহ থাকিবেন, প্রসবঘরে সেই সংখ্যা উপসূতিকা উপস্থিত, জানা যায়।

উপসূতিকা জনের জাতি বর্ণ ও বয়স।

উক্ত লগ্ন ও চন্দ্র মধ্যে যে যে গ্রহ থাকিবেন, সেই সেই গ্রহের জাতি বয়স ও বর্ণ যেরূপ, উপসূতিকাগণের জাতি, বর্ণ ও বয়স তদনুরূপ হইবে।

প্রসবঘরের মধ্যে ও বাহিরে উপসূতিকাগণের নির্ণয়।

জন্মলগ্নের উদিতাংশ গণনায় যে সকল রাশি ১২শ, ১১শ, ১০ম, ৯ম, ৮ম ও ৭ম হইবে এই ছয় রাশিকে তৎকালে দৃশ্যরাশি বলা যায়, অপর ছয় রাশিকে অদৃশ্য রাশি বলা যায়। ছয় দৃশ্য রাশিতে যে সংখ্যাগ্রহ থাকিবেন সেই সংখ্যা উপসূতিকা সূতিকা গৃহের মধ্যে; এবং ছয় অদৃশ্য রাশিতে যে সংখ্যা গ্রহ থাকিবেন সেই সংখ্যা উপসূতিকা সূতিকাগারের বাহিরে ছিল জানা যায়। জীবশর্ম্মা গ্রন্থকর্ত্তার মতে রাশিচক্রের দৃশ্য অর্দ্ধেক রাশিতে উপসূতিকা গৃহের মধ্যে, আর অদৃশ্য অর্দ্ধেক রাশিতে, উপসূতিকা গৃহের বাহিরে ছিল জানা যায়।

সূতিকাগৃহ ও জনসংখ্যা।

জন্মলগ্ন মেষ, সিংহ ও ধনু হইলে সূতিকা গৃহটীর চতুঃসীমার পূর্ব্বদিকে এবং সূতিকাগৃহে ৫ জন উপসূতিকা।

কন্যা, বৃষ ও মকর হইলে দক্ষিণদিকে এবং সূতিকা গৃহে ৪ জন উপসূতিকা। মীন বিছা ও কর্কট হইলে উত্তরদিকে সূতিকা ঘর হয় এবং ২ জন উপসূতিকা, সূতিকাগারে ছিল জানা যায়।

বৃহজ্জাতকমতে বালকের শয্যাজ্ঞান।

জন্মকালে সূতিকা গৃহ মধ্যে অষ্ট দিকে রাশি সংস্থাপিত করিতে হইবে; পূর্ব্বদিকে মেষ, বৃষ; অগ্নিকোণে মিথুন। দক্ষিণে কর্কট, সিংহ, নৈঋতকোণে কন্যা, পশ্চিমদিকে তুলা, বিছা; বায়ুকোণে ধনু, উত্তরদিকে মকর, কুম্ভ, ঈশানকোণে মীনরাশি সংস্থাপন করতঃ দেখিবে যে, ইহার কোন লগ্নে জন্ম হইয়াছে। যে লগ্নে জন্মিয়াছে সেই লগ্ন যে দিকে পড়িয়াছে সেই দিকে জাত বালকের শয্যা এবং তাহার মস্তক সেই দিকে রাখিয়া শয়ন করাইয়াছিল। যদি খাটের উপর শয়ন করায়, তাহা হইলে যে লগ্নে হইবে সেই রাশি যে দিকে পড়িবেক, সেই দিকে খাটের মস্তক ভাগ সংস্থাপন করিয়া ক্রমে বামাবর্ত্তে গণনায় খাটের পায়া ইত্যাদিক ভাগ কোন দিকে পড়িবে, তাহা জানা যায়।

যথা, যে লগ্নে জন্ম হইবে, সেই লগ্ন রাশি হইতে গণনায় প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি যে দিকে পড়িয়াছে, সেই দিকে খাটের মস্তক ৩য় রাশি খাটের, দক্ষিণ দিকের, পূর্ব্ব পায়া; ও ৪র্থ, ৫ম রাশি খাটের দক্ষিণ, ৬ষ্ঠ রাশি পশ্চিম দিকের দক্ষিণ পায়া, ৭ম,

ও ৮ম রাশি খাটের পশ্চিম অঙ্গ, ৯ম রাশি খাটের বাম দিকের বাম পায়া, ১০ম ও ১১শ রাশি খাটের বাম অঙ্গ, ১২শ রাশি খাটের পূর্ব্বদিকেয় বাম পায়া। ঐ খাটের পায়াদির অঙ্গ যেরূপ রাশি দ্বারা নির্ণয় করা যায় তাহা ঐ সকল রাশিতে শুভ এবং পাপগ্রহগণের অবস্থিতি ও তাহাদের বলাবল জানিয়া খাটের পায়াদির অবস্থা ও রূপ বিচার হইয়া থাকে।

জাত বালকের শিরোজ্ঞান।

মেষ সিংহ ও ধনু লগ্নে জন্ম হইলে প্রসবকালে জাতকের (বালকের) মস্তক পূর্ব্ব দিকে, কন্যা বৃষ ও মকর লগ্নে জন্ম হইলে দক্ষিণ দিকে; তুলা কুম্ভ ও মিথুন লগ্নে পশ্চিক দিকে; মীন, বিছা ও কর্কট লগ্নে জন্মিলে বালকের মস্তক উত্তর দিকে থাকে।

অন্যমতে সূতিকা গৃহের দ্বারজ্ঞান।

কেন্দ্রস্থানে যেগ্রহ থাকে, সেই গ্রহ যেদিকের অধিপতি, সেইদিক সূতিকা গৃহের দ্বার জানিবে। অনেক গ্রহ থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী গ্রহের দিকে সূতিকা গৃহের দ্বার জানা যায়। কেন্দ্র স্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে লগ্ন যে দিকের অধিপতি, সেই দিকে সূতিকা গৃহের দ্বার জানা যায়।

যে লগ্নে জন্ম হইবে সেই রাশির যেরূপ বর্ণ প্রদীপের শলিতারও সেই রূপবর্ণ হইবে।

ধাত্রীজ্ঞান।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ লগ্নে জন্ম হইলে ধাত্রী সধবা, বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক মকর ও মীন এই কয় লগ্নে জন্ম হইলে ধাত্রী বিধবা জানিবে।

পিতৃমাতৃ সদৃশ জ্ঞান।

জন্ম লগ্নে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, সেই শুভ গ্রহের যেবর্ণ ও স্বভাব নির্দ্দিষ্ট আছে সেই বর্ণ ও সেই স্বভাব জাত বালকের হইবে। রবি যদি জন্মকালে বলবান থাকেন, তবে পিতার দৃশ ও চন্দ্র বলবান থাকিলে, জাত বালক মাতার সদৃশ হয়।

সত্যাচার্য্যমতে জাতবালকের অঙ্গের চিহ্ন নির্ণয়।

জন্ম লগ্ন হইতে সপ্তম রাশিতে যদি মঙ্গল বৃহস্পতি ও শুক্র থাকেন, তবে বালকের মস্তকে চিহ্ন দেখা যাইবে।

জন্ম লগ্নে শুক্র, মঙ্গল, ও চন্দ্র থাকিলে জাতকের দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে মস্তকে চিহ্ন দর্শন হইবে। জন্ম লগ্নের ৮ম স্থানে, রাহু ওশুক্র থাকিলে, বালকের বাম কর্ণে চিহ্ন হইবে।

জন্ম লগ্নে গুরু ও সপ্তম স্থানে রাহু থাকিলে, বালকের বাম হস্তে চিহ্ন হইবে। জন্ম লগ্নে রবিও ৮ম কিম্বা ১২ রাশিতে শুক্র থাকিলে, বালকের উভয় বাহুতে চিহ্ন দর্শন হইবে।

জন্ম লগ্নের ৩য় ৬ষ্ঠ কিম্বা ১১শ স্থানে শুক্রে অথবা মঙ্গল থাকিলে, বালকের বামপার্শ্বে চিহ্ন দর্শন হইবে।

জন্ম লগ্নে মঙ্গল ও শনি থাকিলে কিম্বা ঐ মঙ্গল শনিলগ্নের ৫ম ও ৯ম স্থানে অবস্থিতি হইয়া রাহু কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে, বালকের লিঙ্গে ও গুহ্যদেশে তিল চিহ্ন হইবে।

লগ্নের ৫ম ও ৯ম রাশিতে, শুক্র ৮ম স্থানে গুরু ও বুধ, চতুর্থ স্থানে শনি থাকিলে বালকের কুক্ষিদেশে চিহ্ন দর্শন হইবে।

জন্ম লগ্নের অঙ্কল ও শনি, ৪র্থ স্থানে শুক্র ও

রাহু থাকিলে বালকের গুলফে পদে, জানুদেশে অথবা উভয় বাহুতে চিহ্ন দর্শন হইবে।

লগ্নের ৮ম স্থানে চন্দ্র১২শ স্থানে শুক্র ও গুরু ও সম্ভব রাশিতে বুধ ও শনি থাকিলে জাতবালকের উভয় চিহ্ন হইবে।

(ক্রমশঃ)

শিশুশিক্ষা।

দেশে যতই সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই বালকগণ ও যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে। এখন আর তাহারা পূর্ব্বের মত গুরুজন বা প্রবীনদিগকে সমুচিত সম্মান করে না। এখন আর তাহাদের দোষোল্লেখ করিয়া ভৎর্সনা করিলে নীরবে সহ্য করিয়া স্বীয় দোষ শোধনের চেষ্টা করে না। এরূপ যে শুধু আমাদের দেশেই হইয়াছে তাহা নয়, সকল সভ্য সমাজেই এই অবস্থা। কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক ও যুবকদিগের মধ্যে বিনয়াদি গুণের অভাব হয় কেন? শিক্ষার দোষেই যে এরূপ হয় তৎবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু কথা এই, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে—শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে—শিক্ষা বিষয়ে কি এমন দোষ ঘটিতেছে যে দোষ, যে সময়ে শিক্ষার তাদৃশ প্রচলন ছিল না সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিল না?

সে দোষ এই—সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহস্ত হইতে সন্তানের শিক্ষাভার অন্তরিত হইতেছে—সেই জন্যই শৈশব হইতেই দুর্নীতির আধিক্য হইতেছে।

যাহারা শিক্ষা ও গ্রন্থপাঠ এক মনে করেন তাহারাই উল্লিখিত সিদ্ধান্তে দোষারোপ করিবেন, কিন্তু শিক্ষা ও গ্রন্থপাঠ এক নয়। যথার্থ শিক্ষা অধিকাংশ সময়ে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন দ্বারা, ও দৃষ্টান্ত দ্বারা হইয়া থাকে। শিশু, শৈশব হইতে যাহা দেখে, যেরূপ শোনে সেইরূপ ধারণাই তাহার মনে দৃঢ় হয়, এই জন্যই শান্তস্বভাব পিতা মাতার পুত্র কন্যাগণ প্রায়শঃই শান্ত প্রকৃতি হইত কিন্তু এক্ষণে শৈশবে পালনভার দাসদাসীর হস্তে পতিত হওয়ায় বালকগণ তাহাদেরই স্বভাব পাইয়া থাকে, তাহার পর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ বালক বালিকাদিগের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন পূর্ব্বক সেই শিক্ষার পূর্ণতা সাধন করে। সেই জন্যই এরূপ ঘটিয়া থাকে শিশুদিগের সমক্ষে নিরন্তর নৈতিক উদাহরণ বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই শিশুদিগের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তদবধি ৩।৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে যাহা কর্ত্তৃক লালিত হয়, তাহার স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ দেখে যেরূপ শোনে তদনুরূপ শিক্ষালাভ করে। তিন বৎসর বয়স হইতেই তাহার কার্য্য করিবার অভিলাষ হয়, মনেতে অনুসন্ধান স্পৃহা জন্মে কোন দ্রব্য লইলে তাহার ভিতরে কি আছে

তাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়। এজন্য কোন দ্রব্য নিকটে পাইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দেখিয়া আবার জুড়িতে চেষ্টা করে এসময়ে তাহাদিগকে যদি এরূপ খেলানা দেওয়া যায়-যাহা অনায়াসেই ভাঙ্গে ও জোড়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। বাক্যস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নানা বিষয় জানিবার জন্য নানা প্রকার প্রশ্ন করে, অনেক সময়ে এমন অনেক প্রশ্ন করে যাহার সদুত্তর দিতে গেলে বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হয়। কিন্তু তথাপি তাহাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য যথাসাধ্য সদুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাদের প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ বা তাহাদিগকে ভৎর্সনা করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়। এই সময়ে তাহারা কোন অকর্ম্ম করিলে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র স্বীকার করে সে সময়ে যদি তাহাদিগকে কৃতকার্য্যের জন্য দণ্ড দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা আর অকর্ম্ম করিলে কদাচ স্বীকার করিবে না, মিথ্যা কথা কহিতে শিখিবে, এজন্য তাহারা যাহাতে অকর্ম্ম করিতে না পারে সে জন্য সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য এবং যেরূপ কার্য্য করা উচিত নয় তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যদিও সে উপদেশে তখন কোন উপকার হয় না বটে কিন্তু কালে সে উপদেশে ফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগকে খেলা করিবার ও তাহাদের শিক্ষার উপযোগী দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার অনুরূপ প্রচুর ক্রীড়নক বহু ব্যয়সাধ্য। সেকালে ছেলেরা খেলার ঘর করিত; নারিকেলের মালা, হাঁড়ী কল্‌সী ভাঙ্গা খোলা এই সকল দ্রব্যের সাহায্যে গৃহস্থালী শিখিত, এখন সে সকল একেবারেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেকালের কপাটী-খেলার পরিবর্ত্তে ফুটবল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেকালে বালকবালিকারা কর্ম্মক্ষম হইতে শিখিত এখন বাবু হইতে শিখিতেছে।

ফলকথা, তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত শিশু-দিগকে কখনই দুর্নীতিপরায়ণ দাস দাসীর তত্ত্বাবধানে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। তৎপরে মাতার শিক্ষা দিবার সামর্থ থাকিলে আরও দুই তিন বৎসর তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হওয়া ভাল। কারণ স্নেহই শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ।

কিন্তু সে পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় এই আমাদের দেশের আধুনিক জননীগণ শিশুর লালন পালন কার্য্যে একান্ত অজ্ঞ। সেকালের জননীরা লেখাপড়া না জানিলেও, শিশুদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে ও তাহাদের সামান্য পীড়াদি হইলে তাহা সহজেই আরোগ্য করিতে জানিতেন। কিন্তু এখন এত কোট, ষ্টকিং পেনি-ফ্রক প্রচলিত হইয়াও শিশু রোগমুক্ত অবস্থায় অতি অল্প দিনই থাকিতে পায়।

বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু আখ্যানমঞ্জরী সীতার বনবাসের সঙ্গে সঙ্গে শুধু জুতা কম্ফর্টার বুনিতে না শিখাইয়া গৃহস্থালী ও সন্তান লালনপালন শিক্ষা দিলে যেন একটু ভাল হয়। সেকালে বালিকারা এত লেখাপড়া শিখিত না বটে কিন্তু এ দুটি কাজ ভালরূপে শিখিত।

যাহাতে শিশুদিগের দেহ ও মনের উন্নতি ক্রমে ক্রমে সাধিত হয়, অতি শৈশব হইতেই

তাহার চেষ্টা হওয়া উচিত। বালকের দেহের মধ্যে কোন অঙ্গ যদি দুর্ব্বল হয় তবে যাহাতে বলিষ্ঠ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিলে পরে ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাদিরও যাহাতে রীতিমত চালনা হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। এই দুইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া, যাহাতে তাহাদের জ্ঞান তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ যত্ন করিলেই, শিশুদিগের শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়।

বিউবনিক্ প্লেগ কি ?

১। তাহার লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদের কোন রোগের লক্ষণের সহিত মিল হয় না বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস; ডাক্তার মহাশয়েরা হয়ত বলিতেছেন ইহা সম্পূর্ণই নূতন। কবিরাজ মহাশয়দের ভিতরও মত ভেদ দেখা যাইতেছে। যে যাহাই বলুন আমি কিন্তু কোন মতেরই পক্ষপাতী নহি। কোন কোন খ্যাত নামা কবিরাজ মহাশয় ইহাকে "ব্রধ্ন" রোগ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; ব্রধ্ন রোগের লক্ষণের সহিত ইহার মিল খুবই কম, তাহাতো "দাসী নামক" মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ (১০ম ও ১১শ সংখ্যা অক্টোবর ও নবেম্বর মাহা ১৮৯৬ সাল।)

২। ইহা নূতন নহে, আয়ুর্ব্বেদে ইহা আছে।

আমার মত এই :—

ক। গণ্ডীয় মারী :—অসাধ্য অপচী বা গ্রন্থি বিসর্প রোগ। যথা—অপচী = গুড়কতুল্য গ্রন্থি।

ইহার—লক্ষণ এই :—

খ। বাতপিত্ত কফা বৃদ্ধা মেদশ্চাপি সমাচিতং।
জঙ্ঘয়োঃ কণ্ডরাং প্রাপ্য মৎস্যাণ্ড সদৃশান্ বহূন্।
কুর্ব্বন্তি গ্রথিতান্ তেভ্যঃ পুনঃ প্রকুপি
তোঽনিলঃ।
তান্ দোষানূর্দ্ধগো বক্ষঃ কক্ষা মন্যা গলাশ্রিতঃ।
নানাপ্রকারান্ কুরুতে গ্রন্থিন্ সাত্বপচী মতা॥
অপচী কণ্ঠ মন্যাসু রুক্ষা বক্ষণ সন্ধিষু।
গণ্ডমালাং বিজানীয়াদ শটীতুল্য লক্ষণাং॥

গ। পীনস পার্শ্বশূল কাস জ্বরশ্ছর্দ্দি যুতাস্ত
সাধ্যাঃ॥

(ভোজ. নিদান ৬। ১৪৪ পৃষ্ঠা।

এই হচ্চে গণ্ডীয়মারী; উপরোক্ত (খ) মার্কা লক্ষণের সহিত যদি (গ) মার্কা লক্ষণ বা উপদ্রব যোগ হয় তবে রোগটী অসাধ্য জানিবে। (ঘ) অসাধ্য হইবার আরও একটী যুক্তি এই হইতে পারে; ইহাতে যে লোককে এত শীঘ্র মারিয়া ফেলিতেছে তাহার কারণও এই সৎ-যুক্তির ভিতর আসিতেছে। প্রথম দেখ কি কি দোষ কুপিত হইয়া এই রোগটার উৎপত্তি হই-তেছে, তাহা এই—বায়ু পিত্ত কফ বৃদ্ধি হইয়া মেদ ধাতুর সহিত একত্রিত হইল। বায়ু, পিত্ত

কফ, যখন একত্রিত তখন ইহা সান্নিপাতিজ। তাহাতে মেদ ধাতুকে আশ্রয় করিল সুতরাং ইহা মেদোগত সন্নিপাতজ রোগ; আবার ইহাতে জ্বর আসিয়া যোগ দেওয়াতে ইহা মেদোগত সন্নিপাতজ জ্বর রোগে পরিণত হইল। আবার দেখ ঐ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) যখন জঙ্ঘাকে পাইয়াছে, তখন অতিরিক্ত কফ প্রধান * কেন না, "জঙ্ঘ্যাভাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরাস্তোহনিল সম্ভবঃ।" (২০ নিদান স্থান; মাধব)

শ্লৈষ্মিকঃ = শ্লেষ্মোল্বণঃ ইতি—বিজয় রক্ষিতঃ) ইহাতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহা হইলে ইহা মেদোগত কফোল্বণ সন্নিপাতজ জ্বর, ইহার উপরও আরার বায়ুর বল অতীব প্রধান।) তাহা যদি হইল তবে দেখ ভাব কি তন্ত্র হইতে বিজয় রক্ষিত কি লিখিয়াছেন ঃ—

(শেষের ছত্র এই)।

"মেদোগত সন্নিপাত কফ ফলং সমুদাহৃতঃ"।

তাহা হইলে মেদোগত সন্নিপাতের লক্ষণ আর কফোল্বণ সন্নিপাতের জ্বরের লক্ষণ একই হইল! সে লক্ষণ এই—

"কফোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য মন্তোঃ প্রকুপ্যতি॥
তস্য শীত জ্বর স্বপ্ন গৌরবালস্য তন্দ্রঃ।
ছর্দ্দি মূর্চ্ছা তৃষা দাহ তৃপ্ত্যরোচক হৃদ্ব্রহাঃ॥
জীবনং মুখ মাধুর্য্যং শ্রোতোবাগ্দৃষ্টিনিগ্রহঃ।
শ্লেষ্মণো নিগ্রহঞ্চাস্য যদা প্রকুরুতে ভিষক্॥
তদাতস্য ভৃশং পিত্তঃ কুর্য্যাৎ সোপদ্রকং জ্বরং।
নিগৃহীতে তু পিত্তে চ ভৃশং বায়ু প্রকুপ্যতি॥
নিরাহারস্য সোহত্যর্থং মেদো মজ্জাস্থিবাবতি।
তথাত্র স্নাতি ভুক্তে বা ত্রিরাত্রং নহি জীবতি।
মেদোগতঃ সন্নিপাতঃ কফফলং সমুদাহৃতঃ॥

তবে ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণ হইল যে কফোল্বণ সন্নিপাতজ জ্বর বলিয়া ৩ দিনের ভিতর মারিয়া ফেলিতেছে। তবে দোষের বলাবলের স্বল্পতা বা আধিক্য হেতু ৮।১০ দিনও সময় লইতে পারে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল Health officer. (ডাক্তারও) কাগজে লিখিয়াছেন যে জ্বরটা Typhus বা Typhoid আকারে হইতেছে তাহা হইলেই এই সিদ্ধান্তই যথার্থ। তবে এই রোগ সাংঘাতিক মহামারী হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

২। আর এক কথা ইহা সংক্রামক কি না?

ক। ইহার সংক্রামক হইবার আশ্চর্য্য কিছুই নাই। "চরক" মহামুণি যখন বলিয়াছেন যে, জল বায়ু দেশ কাল ঋতু ইত্যাদি বিকৃতি হইলে মহামারীর কারণ হইতে পারে। তখন গণ্ডীয় জ্বর যে বঙ্গে দেশে মহামারীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা অসম্ভব নহে, সুতরাং ইহাকে সংক্রামক বলা যায়।

খ আবার দেখ—যখন জ্বর ইহার প্রধান কারণ হইল তখন ইহা শাস্ত্রতঃ সংক্রামক হইতে পারে।

যথাঃ—(কুষ্ঠাবিকারে লিখিত, নিদানস্থান।)

"প্রসঙ্গাদ্গাত্র সংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ
একশয্যা সনাচ্চৈব বস্ত্র মাল্যানুলে পনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নবং॥ ১৬

তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই সংক্রামক রোগ।

৩। গণ্ডীয় জ্বরে যদি রক্ত পিত্তের প্রকোপ

---

* আমি কোন নবাগত বঙ্গেবাসী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে ইহা জঙ্ঘাকেই আশ্রয় করিয়া হইতেছে।

দেখা যায় তাহা হইলে তাহারও সিদ্ধান্ত এই যথাঃ— যে অপচী রোগে পীনস রোগ আসিবে তাহাতে রক্ত পিত্তও আসিতে পারে। কেন না পীনস নামা রোগের মধ্যে ১টা প্রধান রোগ, মুনিরা সেই নাসারোগে রক্তপিত্তেরও আগমন গণনা করিয়া নাসারোগের অপর ষোড়শ সংখ্যা পুরণ করিয়াছেন। যথাঃ—

অর্ব্বুদং সপ্তধা. শোথাশ্চত্বা রোহর্শ শ্চতুর্ব্বিধং।
চতুর্ব্বিধং রক্তপিত্ত মুক্তং ঘ্রাণেহপি তদ্বিদ্‌ঃ॥
(২১। নাসাধিকার নিদান স্থান)

অতএব ইঁহাতে রক্ত পিত্তেরও আগমন হইতে পারে।

৪। দেশকাল পাত্র ভেদে ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম ও ঋতুর বিকৃতি জনিত সামান্য সামান্য রোগও ভিন্ন ভিন্ন কম বেশী লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে। এক রোগের পুঁথি লিখিত সর্ব্ব লক্ষণ বিশিষ্ট রোগী অতীব দুর্লভ। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়না।

এখন পাঠকবর্গ দেখুন আয়ুর্ব্বেদে এ রোগ পাওয়া গেল কিনা।

তীর্থ।

বেলা দ্বিপ্রহর। তপনদেব স্বীয় প্রচণ্ড রশ্মিচ্ছটায় দিক্‌ বিদিক্‌ উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। যেন সমস্ত দগ্ধ করিতে তাঁহার উদয়। বিহঙ্গম সকল অসহ্য উত্তাপে উত্তাপিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া একপ্রকার ক্লেশজনক অস্ফুটধ্বনি করিতেছে, কিছুতেই নিস্তার পাইতেছে না। পথে ঘাটে মাঠে ফলকথায় যেখানে সূর্য্যের প্রখর কিরণ বিরাজ করিতেছে, তথায় কাহারও যাইতে সাহস হইতেছে না। বায়ুতাড়িত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ধূলিকণা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতেছে। শৃগাল কুক্কুরাদি প্রাণিসমূহ বিকৃত মুখ ব্যাদান এবং জিহ্বালোল করিয়া হাঁপাইতেছে। এই ভয়ানক সময়ে এক পথিক বহুদূর বিস্তৃত এক মাঠ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে বৃক্ষের লেশ মাত্র নাই, কোন আশ্রয় নাই, কেবল অতি বিস্তীর্ণ মাঠ। তিনি যে দিকে নয়ন ফিরাইতেছেন, সে দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ধূলিকণা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ সাড়াশব্দ নাই; যেন সমস্ত পৃথিবী সুপ্ত। বহুদূর পথ ভ্রমণে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করেন, কোথায় যান, বসিবার স্থান নাই যে তথায় বিশ্রাম করেন, দাঁড়াইয়া সুখ নাই, সে উত্তপ্ত ভূমিতে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য, আবার এই কষ্টের উপর উত্তপ্ত ধূলিকণা তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে; সুতরাং ক্লেশের অবধি নাই। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, অবাধে চলিয়াছেন। এক দিক লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু সেই লক্ষ্য পথে যাইতেছেন কি অন্য পথে যাইতেছেন,

তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কত দিন যে এই ভাবে যাইতে হইবে কে বলিতে পারে? শরীর এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে দাঁড়াইতে অক্ষম, তথাপি তাঁহাকে চলিতেই হইবে—বিরাম নাই।

বহুদূর গমনের পর একটী প্রবাহিতা নদী দেখিতে পাইলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ নাচিতে নাচিতে হেলিতে দুলিতে ছুটিতেছে, কথন পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত হইয়া অস্ফুটধ্বনি করিতেছে, কথন বা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিক দ্রুতবেগে ছুটিতেছে দেখিতে পাইলেন। সেই তৃষ্ণাতুর পথিক তাহার তটে উপস্থিত হইলেন। তটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদীর জল তট হইতে বিংশতি হস্ত দূরে অবস্থিত এবং তট জল হইতে সরল ও উচ্চভাবে দণ্ডায়মান, সুতরাং পথিক নিরুপায় হইয়া তটোপরি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার অন্তরে নানা ভাবের উদয় হইল। প্রথমতঃ তিনি মনে করিলেন, যে কোন প্রকারেই হউক তৃষ্ণাদূর করিবেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি যদি মৎস্য হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে জলে অবতরণ করিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইত না, কিন্তু তিনিত মৎস্য নহেন যে জলে ঝাঁপ দিবেন, সুতরাং তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা।

অতঃপর অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলেন, যে, যে তীর্থ (১) যে ঘাট অবশিষ্ট ছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক্ষণে কেবল ভগ্নাংশ টুকু রহিয়াছে। কিন্তু এই ভগ্নাংশ নির্ম্মাণ করে কে? যাঁহারা তীর্থ নির্ম্মানের জন্য প্রাণমন সমর্পন করিয়া ছিলেন তাঁহারা ত আর নাই; তাঁহাদিগের ক্ষমতা আমাদিগের মত ত স্বল্প নহে, তাঁহাদিগের অসীম ক্ষমতা। তাঁহারা তাঁহাদিগের অসীম ক্ষমতা দ্বারা যে কত শত তীর্থ নির্ম্মান করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম জীব হইয়া কি প্রকারে তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইব, কি প্রকারে ভগ্নাংবশিষ্ট তীর্থ নির্ম্মান করিব ইহা অসম্ভব। তাই বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া থাকা মানবোচিত কার্য্য নহে। সেই সকল মহাত্মা সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহা পাঠ না করিলে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মানসিক অবনতি ঘটে তাহা উপেক্ষা না করিয়া যদি আমরা সেই সকল মহাত্মাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে আমাদিগের অবনতি কোন কালেই হইবার সম্ভাবনা নাই।

আজি মানব ইহ সংসারে পুত্র কলত্র স্বজন পবিবারবর্গে উৎপীড়িত হইয়া ঠিক সেই তাপিত পিপাসার্ত্ত ও শ্রান্ত পথিকের দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু যিনি আধিব্যাধি পরিতপ্ত ইহ সংসারের বিষম ভার হইতে মুক্ত হইতে প্রয়াস করেন যিনি জ্বালা আলাময় সংসার অতিক্রম করিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের শান্তি ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতে প্রাণ মন সমর্পন করেন, যিনি ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হইয়া গন্তব্য পথানুসরনে প্রবৃত্ত হয়েন, যিনি সেই অনুগ্রহ পদার্থ প্রাপ্তির আশয়

(১) অবতরণিকা ঘাট যথা—
তীর্থে তদীয়ে গজসেতুবন্ধাৎ প্রতীপগা মুত্তর
তোহস্য গঙ্গাম্। ৩৩ শ্লোক, ১৬ সর্গ রঘুবংশ।

তীর্থ যাত্রা করেন, তিনি কখনই নিরাশ হয়েন না, তিনি কখনই তাঁহার প্রেম হইতে বঞ্চিত হয়েন না। কিন্তু মানব ইহ সংসারে জড়িত রহিয়াছে বলিয়া বিষম জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছে। মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রৌদ্র তাপিত শৃগাল কুক্কুরাদির মত হাঁপাইতেছে, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু জল পাইতেছেনা। যিনি শ্রান্ত পিপাসার্ত্ত পথিক সদৃশ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবাধে চলিতে আরম্ভ করিয়া পরমাত্মারূপ স্রোত বাহিনী নদীর তটে উপস্থিত হয়েন, তিনি তটে উপস্থিত হইয়াও জল পাইতেছেন না, প্রেম পাইতেছেন না, কারণ জল অর্থাৎ প্রেম নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। যে একমাত্র তীর্থ অবশিষ্টছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং অবতরণের স্থান কোথায় যে তৃষ্ণাদূর করিবেন, প্রেমাস্বাদনে তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন। যদি তিনি মৎস্য হইতেন জীবন্মুক্ত পুরুষ হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে জলে অবতরণ করিতে নিমগ্ন হইতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইত না, অল্পেই সিদ্ধিলাভ করিতেন; কিন্তু তিনিত মৎস্য নহেন, তিনিত জীবন্মুক্ত পুরুষ নহেন যে জলে ঝাঁপ দিবেন, প্রেমে ডুবিয়া থাকিবেন, সুতরাং তাঁহার সাধ্যাতীত।

কেহ বলেন ইহ সংসারে পলাইবার পথনাই কোন্ পথে যাইব। যে পথদিয়া পলায়নের চেষ্টা করিব, সে পথেও সুখ নাই দুঃখময়। এ দুঃখময় সংসারে থাকিয়া কোথায় সুখ পাইব? কে সুখ দিবে? এদুঃখময় সংসারে থাকিয়া কি সুখ প্রত্যাশা করা যায় না? মরুভূমে কি উর্ব্বরা ভূমি নাই! সংসারের জ্বালা আলায় জ্বলিত হৃদয়ের, একমাত্র জুড়াইবার স্থান উর্ব্বরা ভূমি—তীর্থ। সেই তীর্থ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু সপ্তকোটী ভারতবাসীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে তীর্থের মহিমা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। তবে কেন আজ তীর্থের এত দুর্দ্দশা তবে কেন আজ তীর্থের অবস্থা দর্শন করিলে চক্ষে জল আইসে, তবে কেন আজ তীর্থের নাম করিলে ভক্তির উদ্রেক হয়না, তবে কেন শূন্যময় তীর্থের কালিমা শ্রবন করিতে হইতেছে, তবে কেন আজ তীর্থ দর্শন করিতে পশ্চাৎ পদ হইয়া থাকি? ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কেবল জীবন্ত একাগ্রতার অভাব, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা এবং সময়ের পরিবর্ত্তন! সুতরাং আজ ভারতবাসীর অন্তঃকরণে তীর্থের, মাহাত্ম্য বিরাজিত থাকিলেও পূণ্যময় তীর্থের এত দুর্দ্দশা।

একটু প্রকৃষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে হিন্দুর হৃদয়ের অতি গূঢ়তম প্রদেশে তীর্থের মহিমা বিরাজিত ছিল, সেই হেতু তীর্থের সম্মান রক্ষার্থে তাঁহারা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেন না। তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রসন্নতা অবিচলিত অধ্যবসায় এবং জীবন্ত একাগ্রতা দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বহুদূর পথ ভ্রমণে শ্রান্ত, পিপাসায় কাতর, সর্ব্বশরীর গরলে পূর্ণ; তাহা হইতে রক্ত এবং পুঁজধারা অনর্গল বহির্গত হইতেছে। তপন-তাপ-তপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত দেব মন্দির প্রাঙ্গনে "জয় শিব শঙ্কর" উচ্চারণ করিতে করিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। কষ্টের সীমানাই তথাপি ভূমে লুণ্ঠিত হইতেছে,

তাঁহার বিশ্বাস অটল অচল, রোগ হইতে মুক্ত না হইলে গৃহে ফিরিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অটল অচল বিশ্বাস কাহার সাধ্য মন হইতে অপসারিত করে; কাহার সাধ্য তাঁহার হৃদয় হইতে সে আনন্দ টুকু কাড়িয়ালয়। যাঁহার কৃপালাভ করিবার প্রত্যাশায় বিজন পথ সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক প্রাণীর লালা নিঃসৃত মুখ ব্যাদান এমন কি জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন, কাহার মধ্যে তাঁহাকে সে পথ হইতে নিবৃত্ত করে, কাহার সাধ্য তাঁহার অটল অচল বিশ্বাস টলাইয়া দেয়।

পূর্ব্বে আজি কালির মত তীর্থ গমনের পথ নিরাপদ ছিল না। সে সময়ে নির্দ্দয় দস্যুর আক্রমন শার্দ্দুলাদি হিংস্রক জন্তুর ভয় এবং আশ্রয় বিহীন মরুভূমির ন্যায় ভয়াবহ ছিল। সে সময়ে তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলে গৃহে প্রত্যাগমনের আশা অতি অল্পই থাকিত। সেই ভয়াবহ সময়ে কত শত যাত্রী নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির নিকট প্রফুল্ল বদনে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন এবং জীবন্ত একাগ্রতা বলে বিনা আয়াসে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া ভূত—ভাবন—ভবানীপতির নিকট উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহার পাদ পদ্মে বিল্বদল পুষ্পাদি অর্পণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। আবার যখন তাঁহারা তীর্থ সমুদায় পর্য্যটন করিয়া সাত্ত্বিক ভাবে বিভোর হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, যখন স্বজন পরিবার বর্গে বেষ্টিত হইয়া তীর্থের গুণ গরিমা করিতে করিতে উন্মত্ত প্রায় হইতেন, তখন কোন্ নরাধম তীর্থ পর্য্যটন করিতে প্রয়াসী না হইতেন, তখন কোন্ নরাধমের পাষাণ হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় না হইত তখন কোন্ নরাধমের চক্ষে আনন্দাশ্রু বিগলিত না হইত! কিন্তু আজি কালি কি দুঃসময় পড়িয়াছে, সেই সকল তীর্থের তেমন সমাদর নাই, আছে কেবল তীর্থের নাম মাত্র।

প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক তীর্থ দর্শনে বহির্গত হয়েন। কিন্তু বলুন দেখি ভাই কয়জন ভক্তিভাবে দেবদেবী দর্শন করিয়া থাকেন। একটু উত্তমরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে অনেকে তীর্থে গমন পূর্ব্বক দেব দেবী দর্শনের কথা দূরে থাকুক, একবার মন্দিরের দিকে ভ্রম বশতঃও দৃক্‌পাত করেন না। ইহারা তমোভাবে বিভোর হইয়া সুন্দর আড়ম্বর যুক্ত পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিতে প্রস্তুত। কি করিলে আপনাকে সুন্দর দেখায়, কোথায় অমুক দ্রব্য অতিস্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়, এই সকল চিন্তাতেই সদা চিন্তিত, এই সকল তমোগুণ বিশিষ্ট লোকদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব কোথায় স্থান পাইবে? ইহারা তীর্থের দুই একস্থান ভ্রমণ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করেন, এবং তীর্থ সম্বন্ধে ভয়ানক বিসদৃশ ভাব আনিয়া দেয়, সুতরাং এই সকল অদ্ভূত জীবদিগের দ্বারা যত অনিষ্ট ঘটে, এমন আর কিছুতেই নহে। (১)

কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তীর্থের নাম শ্রবণ

---

(১) অদাম্ভিকো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্ব সঙ্গে যঃ স তীর্থ ফল মশ্নুতে॥
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকো ছিন্ন সংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থ ফল ভাগিনঃ॥" কাশীখণ্ড।

করিয়া হৃদয় তন্ত্রী নাচিয়া উঠে, চক্ষে আনন্দ প্রবাহ ছুটে, আজ সেই তীর্থের কলঙ্ক শ্রবণ করিয়া জীবিত রহিয়াছি। যথায় গমন করিয়া শত শত পাতকী শত শত পাপ, হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ণানন্দ লাভ করিয়াছেন, যথায় গমন করিয়া কতশত ভক্ত নুপুর পরিশোভিত লোহিত রাগ রঞ্জিত পাদযুগল, পরিধানে পীতাম্বর, বংশীর মোহন অপূর্ব্ব শোভা, নবনীরদ বর্ণ নবদূর্ব্বাদল শ্যামরূপ দর্শনে ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইয়া গদ গদ ভাবে তাঁহার পাদ পদ্মে লুণ্ঠিত হইতেন; আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন; আজ কি না তাঁহাদিগের বংশধরেরা তীর্থের অবমাননা করিয়া থাকেন। করুক ইহাতে তীর্থের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। যাহা ক্ষতি সকলই আমাদের। কাশী বৈদ্যনাথ, হিমালয়, তারকেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে শত শত লোকের সমাগম হউক আর নাই হউক, ইহাতে তীর্থের কিছুই ক্ষতি হইবেনা। যদি সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, যদি কি হিন্দু. কি মুসলমান, কি ইংরাজ, সকলই এক হইয়া যায়, যদি এই ভারত ম্লেচ্ছের আবাস স্থান হয়, কিন্তু যদি একজন মাত্র হিন্দু অবশিষ্ট থাকেন. তাহা হইলে সেই হিন্দুর হৃদয় হইতে তীর্থস্থান কেহই কাড়িয়া লইতে পারিবেনা।

সেই কুরুক্ষেত্র, সেই বারানসী, সেই বদরী, সেই বঙ্গসাগর সঙ্গম, সেই পুষ্কর, সেই ভাস্কর ক্ষেত্র, সেই হরিদ্বার, সেই কেদার, সেই সরস্বতী, সেই বৃন্দাবন, সেই গোদাবরী, সেই কৌশিকী, সেই ত্রিবেনী, সেই হিমালয়, সেই তারকেশ্বর, সেই কালীঘাট সকল তীর্থই রহিয়াছে, কিছুই লোপ হয়নাই, তবে আমাদিগের এদুর্দ্দশা কেন? সমস্তই ভূয়ো ভূয়ো বলিয়া বোধ হয় কেন? কেন তা কাহাকে বলিব? আমাদের অদৃষ্ট দোষেই যে এইরূপ হইতেছে ইহাকি আর বলিতে হইবে? তাহা না হইলে তীর্থের দিন দিন এ দুর্দ্দশা হইতেছে কেন? হিন্দু জানেন।

" সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেবচ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষ স্তীর্থ মুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থ মুদাহৃতং
তীর্থানামপি ত তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা॥"

মোহিনী।

প্রথম অধ্যায়।

বর্ষাকাল,—বেলা নয়টা একখানী ক্ষুদ্র পান্‌সী পাল ভরে কুল কুল শব্দে জল কাটিয়া বেগে পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে আসিতেছে। পূর্ব্ববাঙ্গলার পূর্ণ-বর্ষার মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর—বড়ই ভীষণ। নদীর জল স্ফীত হইয়া গ্রাম, মাঠ, ঘাট সমস্ত গ্রাস করিয়া বিপুল সাগর মূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছে। তবে কোথাও উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ, কোথাও, একটী ক্ষুদ্র গ্রাম এবং কোথাও বা দুই একটী জঙ্গল-স্তূপ অনন্ত জল রাশির মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ধূম পুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও পানা সমূহ সবুজ পদ্মমালার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। কোথায় স্রোত বেগে সমস্ত শস্য ক্ষেত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, যেন ভাসমান শস্য ক্ষেত্র মায়াবলে নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা দুই একটা মৃতজীব-দেহ স্ফীত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে গৃধিণীরা আনন্দে তদুপরি বসিয়া সুতীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। শ্রমজীবিগণ মগ্ন ক্ষেত্র হইতে ডুবিয়া ডুবিয়া ঘাস কাটিতেছে। বালক বালিকারা জল কেলী করিতেছে—কোথাও বা দুই একটী বালক, বালিকা ও যুবতী গণের বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্য সন্তরণ করিয়া চলিত-নৌকার গতি পরাভব করিতে চেষ্টা করিতেছে,—অথবা ডুবিয়া ত্রিশ চল্লিশ হাত অন্তর যাইয়া উঠিতেছে। কৃষক রমণীরা জলে পিঁড়ে ভাসাইয়া বীরাঙ্গণার ন্যায় দাঁড়াইয়া তদুপরি ক্ষার-সিদ্ধ বস্ত্র মহাশব্দে আঘাত করিয়া পরিষ্কার করিতেছে। কোথাও বা দুই একটী ব্রাহ্মণ বিধবা বক্ষঃজলে দাঁড়াইয়া ভাসমান তৈজসে শিব সংস্থাপন পূর্ব্বক নিমিলিত নেত্রে পূজা করিতে করিতে জলে ফুল ভাসাইতেছেন। কোথাও কদলি বৃক্ষ রচিত ভেলকে চড়িয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে। মৎস্যজীবিগণ কৃষ্ণবর্ণ জাল বিস্তার করিয়া মাছ ধরিতেছে, বহুলোক বৃহৎ মৃণ্ময় পাত্র জলে ভাসাইয়া মস্তকে কাপড় বান্ধিয়া ও গামছা পরিয়া মৎস্য কিনিতে আসিয়াছে। অতি উচ্চ খড়ের গাদায় দাঁড়াইয়া দুই একটা কুক্কুর তাহা দেখিয়া যথা সাধ্য ভেউ ভেউ করিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একখানি অনাবৃত নৌকা বিপুল ঘাস পুঞ্জ বক্ষে লইয়া ভাসিয়া যাইতেছে—আরোহিগণ তদুপরি বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে। আবার দুই চারিখানি অনাবৃত, অতি দীর্ঘ এবং অতি অপ্রশস্ত নৌকা তীর বেগে হাট বাজার লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। আরোহিগণ নৌকার অগ্র হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত সারিদিয়া বসিয়া—বাবরী ঝুলাইয়া লাল গামছা মাথায় বান্ধিয়া তালে তালে হস্তের ক্ষুদ্র বৈঠায় জল তাড়ন করিয়া এক এক বার এক যোগে সকলে নৌকায় খটা খট শব্দে আঘাত করিতেছে—আর সেই সঙ্গে "সারি" গাহিতেছে। এক নৌকার মাঝিরা গাইতেছে—

"ঐ কদমতলে বাজে বাঁশি, নাচে ব্রজবালা
ওরে হো ও ও ওঃ"।

তখন আর এক নৌকা হইতে গীত হইতেছে।

"আরে উপরে উঠিতে নারি বসন দাওরে কালা
ওরে হো—ও—ও ওঃ"।

"আরে উলঙ্গ গোপের মেয়ে হাসে খিলি খিলি।
(কালা কহে)
দিব বসন যদি দিবি দধি, আর পানের খিলি
ওরে হো—ও—ও—ওঃ॥

"গোপী বলে কত দধি খাবি কালা, কত
খাবি পান?
কালা বলে বুঝলি নারে আরে তোর সাথে
করব রে শয়ান

ওরে হো—ও—ও—ওঃ"।
"গোপী কয় মুরদ ভারি ওরে মাখন চোরা।
আরে হাসিয়া কানু-যে কয় ও তোর ভাঙ্গিব
পাসরা
ওরে হো—ও—ও—ওঃ"॥

সূক্ষ্ম ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে—শন শন শব্দে বাতাস বহিতেছে সূর্যাদেব অদৃশ্য। জলের উপরে সেই সারিগান শুনিয়া—একটী যুবা পুরুষ নিদ্রা হইতে জাগিয়া—পান্সীর নৌকার ছইর বাহিরে আসিয়া মাঝিকে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "মাঝি, এযে ভয়ানক নদী ?"

মাঝি হাসিয়া বলিল "কর্ত্তা—এ নদী না—জল অল্প—গামের মধ্যে দিয়া আর খ্যাতের মধ্যে দিয়া যাইতাছি।"

"যুবা পুরুষ বলিলেন" উঃ ভয়ানক বর্ষা হয়েছে"।

মাঝি বলিল "হয় কর্ত্তা—খ্যাত খোলা খাল বিল নদী নালা এক হইয়া গিছে"।

'বাড়ী যেতে কতক্ষণ হবে ?'

'কর্ত্তা, লাগাদ সন্ধ্যা ধর ধর করমু'।

'কত বেলা হয়েছেরে ?'।

'কর্ত্তা দ্যাড় পওরের কম না'।

'তবে একটা যায়গায় নৌকা বেন্ধে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে'।

মাঝি বলিল 'হয় কর্ত্তা ঐ আগের গাঁয় যাইয়া লই—ও গাঁয়ে ভদ্দর লোক আছে আপনারে নি ফ্যালা'য়া আমরা খাইতে পারি ?

যুবক বলিলেন—"আমার জন্য ভাবনা কি আমি কিছু খাবার খেয়ে নিব এখন"।

মাঝি বলিল—"না কর্ত্তা, তানি হয় বামন ফ্যালা'য়া নি আমরা খাইবার পারি। যুবক ছইয়ের ভিতরে প্রবেশ করিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত পান্সী নৌকা মাঠ পার হইয়া কাহারো গৃহের পশ্চাদ্দেশ দিয়া কাহারো বাগানের মধ্য দিয়া কাহারো বংশঝাড় ও কদলীঝাড়ের তলাদেশ দিয়া বেলা এক ঘটিকার সময় অবশেষে একটা পুষ্করিণীতে আসিয়া উপনীত হইল। পুষ্করিণীর দক্ষিণপারে এক অর্দ্ধভগ্ন অতি প্রাচীন ও ক্ষরিত সানবান্ধা ঘাট। তৎপার্শ্বে একটী জীর্ণ শিবমন্দির। মাঝিরা নৌকা সেই বান্ধাঘাটের একপার্শ্বে একটা গাছের সহিত দড়ি দিয়া বান্ধিল। যুবক বাহির হইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল এইরূপ মন্দির ও বান্ধাঘাট তিনি কোথায় দেখিয়াছেন।

এই সময়ে একটী যুবতী কলসী লইয়া ঘাটে আসিল যুবক তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এমন বর্ণ এমন অঙ্গসৌষ্টব এমন সুগঠিত নাসিকা, চক্ষু, মুখ, ভ্রূ এবং ঘননিবিড় সুদীর্ঘ চিকুরজাল তিনি জীবনে অল্পই দেখিয়াছেন যুবতীর বয়স বিংশতি বৎসরের উর্দ্ধ নহে। তাঁহার হস্তে শঙ্খবলয় ও ললাটে সিন্দুরবিন্দু ব্যতিত দেহে অন্য আভরণ নাই। বোধ হয় কোন আভরণই এ লাবণ্যপূর্ণ দেহের যোগ্য নহে—তাই রমণী সে সকল পার্থীব সম্পদ অপার্থীব লোষ্ট্রের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছেন।

রমণী ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া জলে

ঢেউ দিয়া কলসে জল পুরিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মাঝি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা আপনারা ?"

ব্রাহ্মণ

"পুকুরের উপরে এই বাড়ী আপনাদের" ?

"হাঁ"

"আমাদের বাবুর রাঁধিবার স্থান হতে পারে ?"

"বাবু" এই শব্দ শুনিয়া রমণী নৌকাস্থ যুবকের প্রতি চাহিলেন। সে আকর্ণলম্বিত ঢল ঢল ঘন কৃষ্ণনয়নে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। বালা একটু হাসিয়া জলপূর্ণ কলসি কক্ষে লইয়া বলিলেন—"হতে পারে"। বৃদ্ধ মাঝি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ললনার মুখে সেই মধুর হাসি দেখিয়া যুবকের মন বিচলিত হইল—তিনি মনে মনে ভাবিলেন "এ হাসির অর্থ কি ?"

সুন্দরী রমণিগণ পুরুষেরপানে চাহিয়া হাসিলেই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লন—রমণীর মন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। অতি কুৎসিৎ নির্গুণ পুরুষও তাহাই ভাবিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করেন—সমবয়সীর নিকট শাখা পল্লবে সজ্জিত করিয়া তাহার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন। ফলতঃ অনেক সময়েই রমণীর হাসির রহস্য ভেদ করিতে পারেন না।

আমাদের যুবকের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর। তাহার রূপ গুণ উভয়ই আছে। যদিও রমণী তাহার গুণের পরিচয় পান নাই তথাপি তাহার রূপপানে রমণীর লালসা হইয়াছে যুবক ইহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবকের এই আস্পার্দ্ধান্বিত কল্পনা সম্পূর্ণই মিথ্যা। রমণীর হাসিবার কারণ অন্যরূপ পাড়াগাঁয়ে চাটুয্যে মশায়, বাঁড়ুয্যে মশায় বোস্ মশায়, রায় মশায়, মিত্র মশায়, ঘোষ মশায়, মুখুয্যে মশায়, সেন মশায় ও গুপ্তমশায় বলিয়া একে অপরকে সম্বোধন করিয়া থাকে। পাড়াগেঁয়ে লোকের সংস্কার 'বাবু' একটা মস্ত জিনিষ। বাবু যে, সে হাতি ঘোড়া পাল্কী বা শাল ডিঙ্গি ছাড়া চলে না। সঙ্গে অনেক লোক-জন থাকে। বাবু কার্ত্তিকের ন্যায় রূপবান গণেশের ন্যায় স্থূলকায়, বাবু রেশমের কাপড় জড়িত পোসাকপরা, তাহার হাতে হীরক অঙ্গুরী সে বৃহৎ আল্‌বোলায় সুগন্ধ তামাকু টানিবে—ফলতঃ সে একটা কিম্ভুত কিমাকার জীব। তাহা না হইয়া বৃদ্ধ মাঝির নির্দ্দেশিত বাবু ক্ষীণ তনু বাবরী চুল, গোঁপ শ্মশ্রুযুক্ত এবং গৈরিক বসন পরিহিত সামান্য এক সন্ন্যাসী! রমণী জানেন না যে ইংরেজের হাতে পড়িয়া বাবুর এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। একজন নবাগত ইংরেজ তাঁহার মেথরকেও "মেথর বাবুকো বোলাও" অথবা তাহার সামান্য সরকারকে "হামারা বাবু" বলিয়া থাকেন। তাহাতেই তিনি বাবু শব্দ উচ্চারণমাত্র যুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিলেন। পাঠক রমণীর অজ্ঞতায় বিস্মিত হইবেন না। আপনিও ঐরূপ অনেক সময় কলিকাতার পথে ইংরেজ আমলের "রাজা বাহাদুরকে" ট্রামওয়ে ভাড়াটিয়া গাড়িতে—রেলগাড়ির ইণ্টরমিডিয়ট গাড়িতে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারে করজোড়ে ও ভীতি কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হাসিয়া থাকেন।

যাহা হউক মাঝি কিছুকাল পরে ফিরিয়া

আসিয়া বলিল "কর্ত্তা—শীগ্‌গির করে শিনান করেন—আমরা এই নায়ের উপরে রাঁধিয়া খাই—আপনি ঐ বাড়ীতে যান"। যুবক তদনুসারে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইলেন। মাঝি তাঁহাকে পুষ্করিণী তীরস্থ বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

বাটীর অবস্থা দেখিয়া ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি সহজেই অনুভূত হয়। বড় বড় আটচালা ঘর পড়িয়া গিয়াছে তাহার সান-বান্ধা ভিটা রহিয়াছে পূজার দালান প্রশস্থ ও সুন্দর কিন্তু আবর্জ্জনা পূর্ণ ও ভগ্ন তাহার গাত্রে সংখ্যাতীত বৃক্ষ উঠিয়াছে—ভিতরে দলে দলে চামচিকা ঝুলিয়া রহিয়াছে। অন্তঃপুরে প্রাচীর ও একটী মাত্র ইষ্টক গৃহ রহিয়াছে—অপর গৃহগুলি বাসোপযুক্ত নহে। রন্ধনাদি করিবার জন্য দুই খানী ক্ষুদ্র চালা ঘর উঠান হইয়াছে। বাড়ীতে অন্য লোক নাই কেবল আমাদের পরিচিতা যুবতী এবং তাহার মাতা বাস করেন। মাতা প্রাচীনা শোকে ও দুঃখে তাঁহাকে আরো প্রাচীনা করিয়া তুলিয়াছে। বাতরোগে তিনি এক প্রকার চলচ্ছক্তি রহিত। যুবক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন প্রৌঢ়া রোয়াকে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, যুবতী উল্লিখিত একটী চালাঘরে রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিতেছেন। প্রৌঢ়া যুবককে অঙ্গুলি সঙ্কেতে পাক গৃহ দেখাইয়া দিলেন।

যুবক গৃহে প্রবেশ করিলে—যুবতী আসন দেখাইয়া দিয়া জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন—যুবক জলযোগের অনুষ্ঠান দেখিয়া বলিলেন—রন্ধন না করিলেও চলিতে পারে—কেননা প্রচুর পরিমাণে আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, আতা, তরমুজ, ফুটি সসা, বেল, গৃহজাত—দধি, ক্ষীর, সর, দুগ্ধ ও চিনি জলযোগের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে।

যুবতী বলিলেন "আপনাকে রন্ধনের কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি চাল, ডাল, উননে চাপাইয়া দিতেছি প্রস্তুত হইলে শুদ্ধ নামাইয়া লইবেন। অবশেষ যুবক ইহাতে সম্মত হইলেন। সরলা প্রৌঢ়া বাতের বেদনায় অধিক কাল বসিয়া থাকিতে অসক্তা—বিশেষ আগন্তুক ব্রহ্মচারি—ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক অসদাচার অসম্ভব তাই বিশ্বাস করিয়া গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া শয়ন করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন "মোহিনী দেখিস্—যেন আহারাদির কোন ত্রুটি না হয়।" যুবতীর নাম মোহিনী।

ভুরি জলোযোগান্তে যুবক মোহিনীর নিকট হইতে হাতা, বেড়ীর কার্য্য বুঝিয়া লইলেন। মোহিনী স্থান, পরিস্কার করিয়া আসন ও থালা বাটী যথাস্থানে স্থাপন করিয়া এক পাশে বসিয়া রন্ধন দেখিতে লাগিলেন। যুবক রন্ধনপটু কিনা বলিতে পারি না—কিন্তু অদ্য তিনি রাঁধিতে বসিয়া বিলক্ষণ অপটুতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। মোহিনী ডালে লবণ দিতে বলিলে তিনি তাহা ভাতে দিলেন। ভাতে জল দিতে বলিলে ডালে জল ঢালিতে লাগিলেন। ঘৃত মশলা ডালে না দিয়া ভাতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—এই রূপ নানা বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল। ইহাতে মোহিনী কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু এ বিভ্রাটে একটা ফল এই ফলিল যে যেখানে

মোহিনীকে একটা কথা বলিতে হইত সেই খানে তাহাকে দশটা কথা কহিতে হইতেছে—আবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেও হইতেছে। সুতরাং রন্ধনের উপলক্ষে উভয়ের সহিত অনেক আলাপ অনেক হাসি অনেক বাদানুবাদ হইয়া এক প্রকার পরিচয় ও কথঞ্চিত মানসিক সংমিলন-অলক্ষে সংস্থাপিত হইল।

মোহিনী জীবনে কখনও কোন যুবকের সহিত এত কথা কহেন নাই, কোন যুবকের নিকট অসাবধানে বসিয়া এত হাসি হাসেন নাই। এ দিকে মেঘাড়ম্বর করিয়া মুশলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল।

যুবক অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ডাল, ভাত, ও একটা নিরামিশ ডাঁল্লা রাঁধিয়া আহারে বসিলেন। আহারে বসিলে তিনি কথা কহেন না—অদ্য সে নিয়মের অন্যথা করিয়া বলিলেন—' আপনাকে সধবা দেখিতেছি—আপনার স্বামী কোথায় তিনি কি করেন?" মোহিনী এ কথায় কোন উত্তর দিলেন না। একটী পঞ্জরভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া—ধরাবনত মুখী হইলেন। এবারে যুবক আপনা আপনি বলিলেন "আহা যে নিষ্ঠুর এমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রীকে সুখী করিবার চেষ্টা না করে তাহার বৃথা জীবন" মোহিনী সহানুভূতি পাইয়া অতি বিশ্বস্থ নয়নে যুবকের মুখপানে চাহিলেন। শিশির সিক্ত প্রভাত কমলের ন্যায় নয়নদ্বয় তাহার প্রতি ধীরে ধীরে স্থাপিত করিয়া একটু হাসিলেন। সে হাসিতে তাহার মনের সমস্ত বিকার সমস্ত অশান্তি সমস্ত দুঃখ এবং সমস্ত কাতরতার চিহ্ন প্রতিফলিত হইল। যুবক তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি আপনার মঙ্গল চেষ্টা করিব।" মোহিনীর চক্ষে অশ্রু দেখা দিল—তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন "ঈশ্বর—কোথা ঈশ্বর?"

তৃতীয় অধ্যায়।

আহার হইয়া গেল কিন্তু বৃষ্টি থামিল না। দুষ্ট যুবক সুবিধা পাইয়া বলিলেন "আপনি আমার কাছে সরিয়া আসুন আপনার হাত দেখিয়া ফলাফল গণনা করিয়া দেখি।" মোহিনী বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। যুবক তাহার চম্পক কোরকদাম তুল্য কর ধারন করিয়া পৃষ্ঠ করিলেন। মোহিনীর শরীর শিহরিয়া উঠিল গণ্ড রক্তিম হইল। যুবক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনার মত সুন্দরী রমণী পাইলে আমি গৃহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারি হইতাম না। মোহিনী নীরবে যুবকের মুখপানে চাহিলেন। যুবক বাম করে তাহার কর ধারণ করিয়া দক্ষিণ করে চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন —"মোহিনী,।" স্বর স্খলিত ও কম্পিত হইল আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মোহিনী অসাড় ও জড়বৎ এক ভাবে রহিলেন—কেবল তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল নয়ন অধিকতর উজ্জল ও বিস্ফারিত হইল। যুবক আর একটু অগ্রসর হইয়া মুখ মোহিনীর পক্ক বিম্ব তুল্য অধর যুগলে প্রায় স্পর্শ করিয়া পুনরায় বলিলেন "মোহিনী, আমায় গৃহি করিবে।" মোহিনীর মুখে উত্তর নাই—মোহিনীর ঘন ঘন উষ্ণশ্বাস বহিল নয়নে ধারা বহিল। যুবক সেই উত্তপ্ত ধারাসিক্ত সুরঞ্জিত সুগোল স্ফীত গণ্ডে আপনার অধর যুগল স্থাপিত করিয়া

আবার বলিলেন "মোহিনী ?" মোহিনী কাতর নয়নে তাঁহার মুখপানে সতৃষ্ণ দৃষ্টি করিলেন। এই সময় কড় কড় করিয়া মহাশব্দে মেঘগর্জ্জন করিল। উভয়ে চমকিত হইলেন—মোহিনী দাঁড়াইলেন।

* * * *

বৃষ্টি এবং ঝড় সমস্ত দিন হইল। সুতরাং যুবকের যাওয়া হইল না। রজনী সমাগতা হইলে মোহিনী পুনরায় রন্ধনের আয়োজন করিতে চাহিলেন—কিন্তু যুবক আর রন্ধন না করিয়া জলযোগ করিলেন। যুবক এত বৃষ্টিতে নৌকায় যাইতে পারিবেন না বলিয়া মোহিনী দালানের এক কুঠরিতে তাঁহার জন্য বিছানা করিয়া দিলেন। যুবক শয়ন করিতে গেলে মোহিনী পান সাজিয়া তাহার বিছানার প্রান্তে রাখিলেন। যুবক পান দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পুনরায় বলিলেন "আমাকে কি তবে সত্য সত্যই আবার গৃহি করিবে"। মোহিনী একটু লজ্জা পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন, যুবক তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন "মোহিনী আমার নিদ্রা হইবে না দ্বার খোলা রাখিব আবার আসিও—ব্রহ্মহত্যা অতিথীহত্যা করিও না"। মোহিনী নীরবে তাহার মুষ্টিবন্ধন খুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

* * * * *

গভীর রজনী সকলেই ঘুমাইতেছে। ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে ভেক নিরহ কায়মনোপ্রাণে ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ঘোঁ ঘোঁ শব্দে ডাকিতেছে—তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ শব্দ মিসিয়া এক অদ্ভুত সঙ্গীত সৃষ্টি করিতেছে। তাহার পর গৃহকোণে কচুপত্রে টপ টপ স্বরে জল পড়িতেছে সেই সঙ্গে অদূরে এক খালের জল অন্য খালে কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে মধ্যে মধ্যে দুই একটা জন্তু ছপ ছপ করিয়া জল দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সকলেই ঘুমাইতেছে কেবল মোহিনীর চক্ষে নিদ্রা নাই। সপ্তমবর্ষে মোহিনীর বিবাহ হইয়াছিল. তদবধি আর স্বামী সাক্ষাৎ তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই—এখন সেই মোহিনীর বয়স বিংশতি বর্ষ। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পুরুষ সংসর্গ লালসা হৃদয়ে পুষিয়া রাখিয়া আসিতেছেন। তদবধি রজনীতে তাহার নিদ্রা নাই। রজনীর ঘোরান্ধকারে অনেক পাপ তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে উদয় হয়। অনেক নারকীয় বিষধর তাহাকে আদিমাতার ন্যায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিতে প্রলোভিত করে। তিনি কতদিন রজনীতে মনে করেন "কাল সাহস করিয়া অমুক পুরুষের সঙ্গে কথা কহিব—বাহুপাশে তাহাকে জড়াইয়া ধরিব—তাহাকে লইয়া কলঙ্কিত হইব"। কিন্তু রজনী প্রভাতে আর সে সাহস থাকে না লজ্জায় তাহারপানে চাহিতে পারেন না।

আজ মোহিনীর মস্তিষ্ক অধিকতর বিকারগ্রস্থ। আজ নিষিদ্ধ ফলের প্রলোভিত গন্ধ পাইয়াছেন, আজ সেই সুবর্ণ সুপক্ক ফলে করস্পর্শ অধর স্পর্শ করিয়াছেন। আজ সে ফল অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—আজ লালসা শতমুখী—আজ লোভ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে—আজ বাসনা অবরোধ ভগ্ন—আজ মহাবেগে গর্জ্জিয়া সেই ভৈরবী বাসনার স্রোত ছুটিয়া চলিতেছে।

মোহিনী একবার সাহসে ভর করিয়া বুকে হাত দিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছেন—আবার দাঁড়াইলে সে সাহস থাকিতেছে না। আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুইয়া পড়িতেছেন—হৃদয়ের ভিতব দুড় দুড় দপ দপ করিতেছে। আবার সাবধানে উঠিতেছেন—হস্ত পদ অবশ হয়ত একটা বাক্‌স বা কিছুর উপর পড়িয়া শব্দ হইতেছে—ভয়ে আবার শুইতেছেন।

মোহিনী এইরূপে বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষ যুবকের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন—দ্বার বন্ধ নহে, ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে—ভিতরে আলো জ্বলিতেছে—সেই আলোতে যুবকের উজ্জ্বল নয়ন সুন্দর মুখের উপর জ্বলিতেছে। যুবক গাইতেছেন—

একিরে ছলনা!

প্রিয়ে, কে শিখালে বল এ বঞ্চনা?

হায়, কে বুঝায়ে দিবে তোমায় আমার এ বেদনা।

দহিছে হৃদয় জ্বলিছে প্রাণ।

লইয়া মন হয়েছ জ্ঞান॥

দেহলো দান প্রাণ সহে না এ যাতনা।

ঝড় বৃষ্টির আরাবে যুবকের স্বর লহরী মোহিনী ইতঃপূর্ব্বে শুনিতে পান নাই। কিন্তু যুবা নৈরাশ্যের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে শুনাইবার জন্যই এই গভীর রজনীতে গাহিতে ছিলেন।

তাহার পরে কি হইল তহা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার অঙ্গীয় নহে। ঝড় বৃষ্টি ক্রমে তিন দিন রহিল—যুবকও তিন দিন রহিলেন। মোহিনী তিন দিনই রজনীযোগে যুবকের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। যুবক যাইবার দিন মোহিনী বলিলেন "আমায় সঙ্গে লইয়া যাও" যুবক বলিলেন—"আমি এখানেই মধ্যে মধ্যে আসিব তাহার পর রাখিবার স্থান ঠিক করিয়া তোমায় লইয়া যাইব"। মোহিনী সরল মনে একথা বিশ্বাস করিলেন। যুবক চলিয়া গেলে মোহিনী কাঁদিয়া নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

আজ কাল নুতন একদল লোক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাদের উদ্দেশ্য কি, ধর্ম্ম কি অথবা সংসারে ইহাদের আবশ্যকতা কি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। বন্যজীব জন্তুর মত ইহাদের চুল শ্মশ্রু নরসুন্দরের অস্ত্র স্পর্শ করে না। গৈরিক বসন ইহারা পরিধান করেন। পদে জুতা নাই হাতে কমণ্ডলু সঙ্গে গাঁজা ও গাঁজার কলিকা। গৃহে স্ত্রী আছে, বৎসর বৎসর তাহাদের সন্তানাদি হইতেছে। স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে তাহারা সুবর্ণ গহনায় ও বারাণসী সাড়িতে সজ্জিতা হইতেছেন—হাতে বেশ দুপয়সা সঞ্চয়ও করিতেছেন। ইহাদের কেহ স্বামী কেহ পরিব্রাজক। ইহারা সচরাচর হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া পরিচিত। দুঃখের বিষয় ইহারা হিন্দুধর্ম্ম কি অনেকেই নিজে জানেন না। ইহারা সংসারে কাহারও উপকার করেন না কেবল উপকৃত হওয়াই ইহাদের ব্যবসা। তবে ইহাদের একটা উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। থিয়েটরের ব্যবসা দৃষ্ট হইয়া অবধি যেমন যাত্রাওয়ালার অন্ন দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে—সেইরূপ অর্দ্ধ শিক্ষিত ও আস্পর্দ্ধার্চিত এই নূতন

দল সম্ভবতঃ নিরক্ষর ঘৃত ও ময়দা প্রার্থী—সন্ন্যাসী দলের অন্ন মারিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। কি কুক্ষণে নীলকণ্ঠ বাবু ও বঙ্কিম বাবু গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন—অমনি তাহাদের দেখাদেখি আবার নবীনচন্দ্রও গীতা ধরিলেন।

আর যাবে কোথা দামোদর শর্ম্মা এ শর্ম্মা ও শর্ম্মা অবশেষ বঙ্গের সকল শর্ম্মাই গীতা ধরিলেন। আবার কামার পুখুর হইতে গদাই ভট্টাচার্য্য কলিকাতার দক্ষিনেশ্বরে আসিয়া গৈরিকবসন পরিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস হইলেন—অমনি এক দল লোক পরমহংস সাজিল। আমাদের যুবক গীতা ও হংসের হুজুকে মাতিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া পরিব্রাজক হইয়াছেন। লেখা পড়া শিখিয়া এরূপ পরিব্রাজক হওয়ায় অজ্ঞ লোকের নিকট একটা বাহাদুরি আছে; কেননা ইংরেজি শিখিয়া এরূপ একটা অদ্ভুত সং সাজিলে অনেকেই একটু বিস্মিত হয় আমাদের যুবক কিয়ৎ পরিমাণে সে বাহাদুরী লইবার জন্যই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। আমাদের যুবকের নাম শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কিন্তু ইনি ব্রহ্মানন্দ পরিব্রাজক নামে সম্প্রতি পরিচিত। ইহাঁর মতে প্রাচীন হিন্দুর যাহা কিছু সকলই ভাল, ইংরেজের যাহা কিছু সকলই মন্দ। ইহাঁর মতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের শত্রু ন্যাসেন্যাল কংগ্রেসের সম্পাদক ও সভাপতি প্রভৃতি তাঁহার ন্যায় সন্ন্যাসীদের হওয়াই উচিত। তাঁহার মতে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তাঁহার মত না হইলে দেশের নিস্তার নাই তাঁহার মতে গীতাই কলির ধর্ম্মগ্রন্থ—গীতা পাঠ করিলেই কলিতে মুক্তি লাভ হইবে। গীতাই এক মাত্র ব্যবস্থা। তিনি বলেন গীতার মতে চলিলে সকল প্রার্থীর সুখ সম্ভোগই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কচিত্তে, করিতে পারা যায়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি গীতা হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সকল সময়ই আবৃত্তি করিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাখ্যা করেন যথা—

"যদহংকার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি"॥

মনোবিকারের বশবর্ত্তি হইয়া নিজবুদ্ধির উপর নির্ভর পূর্ব্বক যুদ্ধ না করিতে চাহিলেও সে বুদ্ধিপণ্ড হইবে প্রকৃতিবশে চলিতেই হইবে যুদ্ধ করিতেই হইবে। অর্থাৎ জীব নিজকর্ম্মে দায়ী নহে জীব কেবল প্রকৃতির আদেশই পালন করে।

"স্বভাব জেন কৌন্তেয় নিবদ্ধস্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ"॥

তোমার স্বভাবের সহিত যে কার্য্য করিবার সম্বন্ধ বন্ধন হইয়া রহিয়াছে—তাহা করিবার ইচ্ছা না করিলেও তোমার স্বভাব সেই কাজ তোমাকে দিয়া করাইবেই করাইবে। অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি করাইবেন বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখেন জীবকে শত অনিচ্ছা স্বত্বেও তাহা করিতেই হইবে।

ব্রহ্মানন্দের গীতার ব্যাখ্যা এইরূপ এবং সম্ভবতঃ এই দেববচন পালন করিতে গিয়াই তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহিনীর সহিত গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কেননা তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একর্ম্ম না করিলে তাঁহার স্বভাবে ইহা তাঁহাকে করাইবেই করাইবে।

এই জন্যই কোন কাজ করিয়াই ব্রহ্মানন্দের মনে অনুতাপ হয় না। সময় সময় পরের দ্রব্যকে

লোষ্ট্র মনে করিয়া অগোচরে গ্রহণ বা ব্যবহারও করিয়া থাকেন—কেননা তিনি জানেন ইহা না করিয়া পারিবেন না—প্রকৃতি তাঁহাকে উহা যেমন করিয়া হউক করাইবে। যাহা হউক ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে আসাম ত্রিপুরা ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন ফিরিয়া আসিবার সময় ঢাকা হইতে নৌকা করিয়া আসিতেছিলেন—এবার তাঁহার অদৃষ্ট ভাল ধর্ম্ম এবার তাঁহাকে নগদ পাঁচশত টাকা দিয়াছেন আবার গীতার আদেশ পালন করিতে যাইয়া মোহিনীর নিকটও কিছু পাইয়াছেন।

বাড়ীতে ব্রহ্মানন্দের পিতা মাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃবন্ধু নিজের স্ত্রী এবং দুইটী পুত্র। সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মবল অতি প্রবল তাই এখন অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। ব্রহ্মানন্দের পিতা গৌরব করেন যে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন, মাতা ভয় করেন পাছে তাঁহার সোনার যাদু নিমাইর মত গৃহত্যাগ করিয়া যান, আর ভ্রাতা হিংসা করেন যে তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইয়া কিছুই করিতে পারেন না; তাঁহার দাদা এক গেরুয়া কাপড়ের জোরে অযস্র অর্থ ঘরে আনিতেন। এবং পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের কাছে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার কত প্রতিষ্ঠা!

এবার ব্রহ্মানন্দ হৃষ্টমনে বাড়ীতে আসিয়াছেন। এবার পিতা মাতার অনুরোধে তিনি দুই মাসকাল বাড়ীতে থাকিবেন। তৎপর আবার প্রচারে বহির্গত হইবেন।

—

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দের যে গ্রামে বাড়ী ঐ গ্রামে যদুনাথ মিত্র নামে এক যুবক বাস করেন। তিনি ক্ষুদ্র জমিদার—তাঁহার শিক্ষা পিতৃগৃহেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ও ইংরেজী দুই ভাল জানেন। দেবগ্রামের সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় * তাঁহার চরিত্র গঠনের আদর্শ। তিনি বহ্বাড়ম্বর, সাময়িক হুজুক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামী ঢোল বাজাইয়া দান করা প্রভৃতি কার্য্য বড়ই ঘৃণা করেন। এদিকে অন্নকষ্ট হইলেই তিনি প্রজার কর বন্ধ করেন। দুঃখী দরিদ্র দেখিলে নীরবে ও নিশ্চুপে দান করেন। দুর্ব্বল বলবান কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করেন। দরিদ্র প্রতিবেশীর রোগ হইলে বিনা মূল্যে ঔষধ পথ্য দেন। তিনি রাজনীতির সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন না। দেশের সভাসমিতি ও সমাজ কিম্বা সংস্কারের কোন ধার ধারেন না। কেবল নিজ বাহুবল ও অর্থ বলের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিজের দ্বারা যত টুকু সাধুকার্য্য সম্ভবে তত টুকুমাত্র করেন। বাবুগিরি কাহাকে বলে তিনি জানেন না। তাঁহার যেমন এই সকল গুণ আছে তেমনই আবার প্রবল দোষও কতকগুলি আছে। তাঁহার প্রধান দোষ তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। স্ত্রী পুরুষ যেই হউক গর্ব্বিত অহঙ্কারী ও কপটাচারি দেখিতে পাইলে ঢের কথা বলিয়া তাহাদের মনোকষ্ট

* গ্রন্থকারের "মায়ামুকুর" নামে একখানি বৃহৎ উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসের নায়ক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমনাথের ধর্ম্ম "নরপূজা" সোমনাথের ব্রত "পরহিতে আত্মত্যাগ"

দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সময় সময় সুরাপান করেন। বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ হইলে যদি সে বালিকা যৌবনে ভ্রষ্টাচারিণী হয়, তাহাতে তিনি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। তাঁহার ক্ষমতাধীন যদি কোন ব্যক্তি কন্যাপন বা পাত্রপন অসঙ্গতরূপে গ্রহণ করে তবে তিনি তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হন। বিধবা নারীকে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে দেন না, কৃতদারকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে দেন না। বহুবিবাহ করিলে তিনি তাহার শত্রু হন এবং কোন ব্যক্তি অপরের নিন্দা বা কোন অসঙ্গত প্রস্তাব করিলে তিনি দশ জনের সমক্ষে তাঁহাকে অপ্রতিভ করেন।

যাহা হউক যদুনাথ একদিন পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন সেই সময়ে একটী কৃষাঙ্গী ষোড়শী কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়া তাহার পানে চাহিয়া হাসিল।

যদুনাথ বলিলেন "বা, তুই যে আমাকে দেখলেই হাসিস্ আমি কি একটা সং?" ষোড়শী এবারে আর একটু বেশী হাসিয়া এক অঞ্জলী জল লইয়া যদুর মাথায় দিল। যদুনাথ বলিলেন "কি উচ্ছিন্ন যাবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি?"

রমণী বলিল "এমন সং দেখলে না হয় কার?"

"তবে সত্যই উচ্ছিন্ন যাবে?"

"যাব"

"ঠিক তো"

'তবে কি মিথ্যা?"

"আচ্ছা তবে তাই হবে।"

রমণীর নাম বিরাজমোহিনী দেবী। এইরূপ কথোপকথন হইয়া গেলে বিরাজ যখনই যদুকে দেখিতে পায় তখনই বলে "কৈ এই বুঝি?" যদু বলেন—"দুটা দিন সয়ে থাক সব হবে—এত ব্যস্ত কেন?"

মুখে এই পর্য্যন্ত—কিন্তু বিরাজ সুবিধা পাইলেই গান লিখিয়া ও কবিতা লিখিয়া যদুকে পাঠায়। উহাতে অনেক প্রণয়ের কথা—"প্রাণ সখা" "প্রাণকান্ত" "হৃদয় রত্ন" "যৌবন কাণ্ডারী" প্রভৃতি লেখা থাকে। যদুনাথ তাহার উত্তর দেন না কিন্তু চিঠিগুলি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন। কেন এরূপ করেন বলিতে পারা যায় না। যদুনাথের জীবনের প্রধান কলঙ্ক এই তিনি পর-চিত্ত-দুর্ব্বলতা দেখিলে দুঃখিত হইয়া নির্জ্জনে অশ্রু বর্ষণ করেন না। উপহাস ও ঘৃণার টিট্‌কারি দিয়া দুর্ব্বল হৃদয়ের কঠোর শাস্তি বিধান করেন! বিরাজের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শরচ্চন্দ্র বাড়ী আসিল এবার গ্রামের অনেকেই অনুরোধ করিলেন—যে তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন—কেননা দেশে তাঁহার বক্তৃতা কেহই শ্রবণ করেন নাই। তদনুসারে দিন স্থির হইল এবং নির্ণীত হইল। বক্তৃতার দিনে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা হইবে সুতরাং না আসিলে লোকে নিন্দা করিবে। এই জন্য প্রাচীন প্রাচীনারা—যাহারা যাত্রা শুনেন না থিয়েটার দেখেন না তাঁহারাও আসিলেন। এমন কি কেহ কেহ কৃষ্ণ কথা

শুনিয়া কাঁদিবার জন্য অগ্রেই প্রস্তুত হইয়া আসিলেন।

—যদুনাথ শুনিতে পাইয়া তিনিও আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া শরচ্চন্দ্রের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। যদুনাথ বলিলেন "শরত, বক্তৃতা করিবে তা বেস কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব এবং গৌরাঙ্গের সহিত অভিন্নত্ব প্রমাণ করিতে পারিবে"? শরতের মুখ শুকাইল আগত্যা স্বীকৃত হইয়া বলিলেন "তাহাই হইবে"।

বক্তা আর কি বলিবে—যাহা সকল হিন্দু বলেন যাহা গীতায় বলে, বাইবেলে বলে, কোরাণে বলে তাহাই পরিস্ফুট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মানব পাপমগ্ন হইলে পরিত্রাণ হেতু ভগবান যুগে যুগে নানা কলেবরে আবির্ভূত হন"। সুতরাং কৃষ্ণ ও চৈতন্য ভিন্ন নহে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে ভগবান"। বক্তৃতা সুদীর্ঘ হইলেও উহার স্থূল মর্ম্ম এই। শুনিয়া সকলেই বাহবা দিতে লাগিলেন কেহ কেহ বা ভক্তিবেগে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

শ্রোতা ও বক্তার ভণ্ডামি দেখিয়া যদুনাথ বিরক্ত হইলেন—তিনি উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যাহারা এরূপ বক্তৃতা শুনিয়া কান্দে আর অন্নক্লীষ্ট উপবাসী দরিদ্র দেখিয়া কান্দে না, প্রত্যুত বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয় তাহারা ভণ্ড। আর যাহারা অন্য জাতির সংসর্গ ও হাতে খাইতে ঘৃণা করে আর চৈতন্যকে দেবতা বলে তাহারাও ভণ্ড। কৃষ্ণ প্রাচীন, প্রাচীন গল্পের নায়ক—ব্যাস কল্পিত আদর্শ পুরুষ তাঁহার অস্তিত্বে যে বিশ্বাস করে সেও ভণ্ড। চৈতন্য সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ বহুল পাঠ করিয়াছিলেন, সমাজের অবস্থা ও ভণ্ডামি দেখিয়া ব্যথিত ও পীড়িত হইয়া সমাজ ত্যাগ প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বীজ মন্ত্র লইয়া সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। জাতিবন্ধন সমাজবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিলেন—এ চারি শত বৎসরের কথা—এবং সত্য কথা। যে জাতি যে সমাজ তাহাকে ঈশ্বর বলেন—অথচ সঙ্কীর্ণ সমাজকে আরো সঙ্কীর্ণ করিয়া জাতি গৌরব করেন—তাঁহারাও ভণ্ড। যে সমাজে এই বক্তা ও শ্রোতার ন্যায় সকল লোক সে সমাজ ভণ্ড, পাপী স্বার্থপর কুটিল অজ্ঞ অসার অসভ্য এবং মূর্খ। বক্তা বলিলেন "ভগবান পাপিকে উদ্ধার করিতে যুগে যুগে আবির্ভূত হন—সুতরাং চৈতন্যের আবির্ভাব মানবের আবির্ভাব নহে, তিনি ঈশ্বরের অবতার ও পাপোদ্ধার জন্য কলিযুগের নূতন অবতার" আর শ্রোতা অমনি তদগদচিত্ত হইয়া কান্দিলেন! তবে বক্তা বা শ্রোতা চৈতন্যের কথা গ্রাহ্য করিয়া ও তাহার মতে চলিয়া আপনাপন পাপ মোচন করেন না কেন? তাঁহার মতে চলা ত কঠিন কথা নহে। যে চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিবে—সে কেশবকে ও খৃষ্টকেও ঈশ্বর বলুক। যে চৈতন্যের নামে কান্দে সে কেশব ও যিশুর নামেও কান্দুক—নতুবা আমি তাহাদিগকে ভণ্ড, গাধা ও শূকর ও পাজি বলিব"। যদুনাথের কথা শুনিয়া কেহই লজ্জিত বা দুঃখিত হইলেন না। প্রথমতঃ যদুনাথ গ্রামের বড়মানুষ। দ্বিতীয়তঃ যদুনাথের ওরূপ বলিবার অভ্যাস আছে। তৃতীয়তঃ বিপদকালে যদুনাথের নিকট সকলেই উপকার প্রাপ্ত হন।

চতুর্থতঃ যদুনাথের শাসনে গ্রামে অত্যাচার ও উৎপীড়ন নাই। পঞ্চমতঃ যদুনাথ উচিতবক্তা ও সত্যবাদী। ষষ্ঠতঃ যদুনাথ দরিদ্রের পিতা মাতা অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, অন্ধের যষ্টি এবং অত্যাচারি দস্যুর কৃতান্ত। সভা ভঙ্গ হইল নীরবে সকলে বাড়ী চলিয়া গেল।

সপ্তম অধ্যায়।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস গত হইল—নবীন সন্ন্যাসী আর মোহিনীকে দেখা দিল না। তখন মোহিনী অনুতপ্ত হইল—বুঝিতে পারিল নরাধম তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে—আরো বুঝিতে পারিল পাপ আর গোপন রাখা যাইবে না। সুতরাং মাতাকে বলিল "মা আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব"? মাতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন

"তোমায় নেবে কেন"

"টাকা দিতে পারিলেই নেবে"

"টাকা কোথা পাবে মা"

"কেন—আমার গয়না বেচিলে হাজার টাকা হবে"

"হাজার টাকা দিলে কি নেবে"

"টাকা দিব, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পা ধরিয়া কান্দিব"।

"এতদিন পরে এত অপমান সহিতে সাধ হ'য়েছে"!

মায়ের কথা শুনিয়া মোহিনী কান্দিল—মনে মনে ভাবিল "সাধে কি অপমান সহিতে যাই"।

মোহিনীর অল্প বয়সে বিবাহ হয়। যখন বিবাহ হয় তখন মোহিনীর পিতা জীবিত ছিলেন। বিবাহে নগদ দুই হাজার টাকা দিবেন—এবং জামাইয়ের পাঠের ব্যয় দিবেন এরূপ কথা থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের অল্প দিন পরেই মোহিনীর পিতার মৃত্যু হয় সুতরাং অবস্থা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়—আর টাকা ও পাঠের ব্যয় দেওয়া হয় না। এই অপরাধে মোহিনীর শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহাকে পরিত্যাগ করেন—এবং পুত্রকে আর এক বিবাহ দেন।

মোহিনী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ক্রমে দুইবার তাহার মাতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার শ্বশুরবাড়ী লইয়া যান দুইবারই তাহারা অপমান করিয়া ফিরাইয়া দেন। তদবধি মোহিনী ক্রোধে ও অভিমানে আর তথায় যাইতে চাহেন না। তাহার মাতা তাহাকে পাঠাইতে চাহিলেও ক্রোধ করিয়া বলে "আমি বিধবা বিধবার আবার একটা শ্বশুরবাড়ী কি"। তাই এতকাল পরে মোহিনী স্বয়ংই শ্বশুরবাড়ী যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাহার মাতা বিস্মিত হইলেন।

অবশেষে মোহিনীর তাড়নায় একখানি নৌকা করিয়া তাহাকে লইয়া চলিলেন। গহনা বিক্রি করিতে হইল না। তাহার মায়ের নিকট সোনা রূপা তামা পিতল কাঁসা যাহা ছিল তাহা বেচিয়াই হাজার টাকা হইল। সেই টাকা মোহিনীকে দিলেন। মোহিনীকে তাহার গহনা পরাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে নৌকা যাইয়া মোহিনীর শ্বশুরবাড়ীর কোণে লাগিল। মোহিনী একখানি রূপার থালায় হাজার টাকা সাজাইয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত

হইল। মোহিনী সেই মূল্যবান থালা শ্বাশুড়ীর চরণপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিল। শ্বাশুড়ী বধূর রূপ অলঙ্কাররাশি তৎপর এই টাকা পাইয়া বড় আনন্দিতা হইলেন। ঘরের বধূ ঘরে বসিলেন। অল্পদিন মধ্যেই মোহিনী সকলের প্রিয় হইলেন তাহার শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে লাগিলেন এমন কি টাকা কড়ি হিসাবপত্র ও বাক্স সিন্দুকের চাবি সকলই তাহার হাতে পড়িল। মোহিনীর স্বপত্নি পর হইল— তাহাকে এখন আর শ্বশুর শাশুড়ী ভালবাসেন না। মোহিনীর স্বামী বিদেশে।

স্ত্রীলোকের অবস্থা স্ত্রীলোকে ভাল বুঝিতে পারে। মোহিনী দিন দিন অধিকতর সুশ্রী হইতে লাগিল অথচ তাহার কিছু কিছু জ্বরও হয় আবার প্রাতে উঠিয়া বমন করে—তাহার শরীর অলসতায় পূর্ণ ও স্তনাগভাগ নীলবর্ণ এসকল তাহার স্বপত্নি দেখিয়া আনন্দিতা হইল— বুঝিল উহার গর্ভ হইয়াছে—এবং তাহা শ্বাশুড়ীকে জানাইল। কিন্তু যে শ্বাশুড়ী একদিন মোহিনীকে তাড়াইয়া দিয়াছেন অর্থলোভে আজ তিনি মোহিনীর দোষ উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। বলিলেন "যে এমন কথা মুখে আনিবে তাহাকে তাড়াইয়া দিব"। এদিকে পুত্রকে শীঘ্র বাড়ী আসিতে লিখিলেন। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর এই ব্যবহারে মোহিনার স্বপত্নি মর্ম্মাহত হইয়া প্রতিহিংসার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায়।

যদুনাথের এক বিধবা ভগিনি আছে, তাহার নাম বিজয়া বিজয়া বিরাজের সই। যদুনাথ অনেকবার তাহার, বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু বিজয়া কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সমাজের এমনই অকাট্য বন্ধন যে বিজয়া চরিত্র নষ্ট করিতে প্রস্তুত তথাপি সমাজ ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। হিন্দু সমাজের যদি কিছু গৌরব থাকে সে হিন্দুর বিধবা। অনেক হিন্দু বিধবাই অতি পবিত্রা শুদ্ধাত্মা এবং পূজনীয়া। চন্দন কাষ্টের ন্যায় পরের জন্য নিস্বার্থভাবে দেহ ক্ষয় করেন। লাভ সৌরভ বিতরণ—সৌরভ গ্রহণ। এই সৌরভের আশায় দুশ্চরিত্রা বিধবাও প্রকৃত বিধবার দলস্থ হইয়া থাকিতে চান। কিন্তু সকলেই কি প্রকৃত বিধবা হইতে পারে। মেদ শূণ্যা ক্ষীনাঙ্গি বিধবা দেখিতে কমল-পত্রের ন্যায় কোমল ও লঘু হইলেও তাহাদের হৃদয় মহাশক্তি ধারণ করিয়া থাকে। সেই ভীম-শক্তি বলে হিন্দুর বিধবা ব্রহ্মাণ্ড তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন—জগতের প্রলোভন অজেয় পরাক্রম হইলেও হিন্দু বিধবার হৃদয়ে প্রতিহত হইয়া চূর্ণীকৃত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়।

বিজয়া সেরূপ বিধবা নহে। বিজয়া পুরুষের রূপে উন্মাদিনী হয়। সুন্দর পুরুষ দেখিলে যতক্ষণ সে সৌন্দর্য্য পান করিতে না পায় ততক্ষণ তাহার জ্ঞান থাকেনা। ইহা বিষ ইহা পাপ তাহা সে বেস্ বুঝিতে পারে কিন্তু তাহার বিশ্বাস এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত, ব্রাহ্মণ ভোজন, গঙ্গাস্নান, তীর্থ দর্শন প্রভৃতি। বোধ হয় যাহাদের হৃদয় পবিত্র নহে তাহারাই এই বাহ্য অনুষ্ঠানে অধিক অনুরাগিণী। বিজয়ার অর্থের অভাব নাই, উত্তম আহার করে, উত্তম বস্ত্র পরিধান করে, উত্তম পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ

শয্যায় শয়ন করে, এবং অর্থবলে ব্রত নিয়ম যাগ যজ্ঞ, পূজা, গঙ্গাস্নান ও তীর্থ দর্শন করে আর গর্ব্বে ফাটিয়া মরে তাহার মত ধর্ম্মকর্ম্ম কেহ করেনা। এবং পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া সকলের ছিদ্র অন্বেষন করিয়া কেবল কোন্দল করিয়া ফেরে গ্রামে সকলেই তাঁহার ভয়ে শশঙ্কিত।

আজি বিরাজ হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট বসিয়া বলিল " সই এক মজার কথা শুনেছিস্?" বিজয়া শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইল তখন বিরাজ তাহার কানে চুপে চুপে কি বলিল বিজয়া অমনি করতালী দিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ কিছু ভীতা হইয়া বলিল " দেখিস সই আমার মাথার দিব্য আমার নাম করিসনি "।

পরদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই বিজয়া পাড়ার পাড়ায় ছুটিল। এবং যাহাকে যেখানে পাইল, তাহাকেই বলিল " আর শুনেচ ভট্টাচায্‌ দের নূতনবউ পেটনিয়ে এসে উপস্থিত"। একথা বিদ্যুৎ বেগে গ্রামে প্রচার হইল। গ্রামময় হুলস্থুল পড়িয়াগেল, সামাজিক বৈঠক বসিল বৃদ্ধগণ নস্য গ্রহণ করিতে করিতে সঙ্কল্প করিলেন, এ ভয়ঙ্কর পাপের জন্য সে বাটীর সকলেই সমাজচ্যুত হইবে যাহারা সংস্পর্শ দোষে না জানিয়া দোষি হইয়াছে তাহাদিগকে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।

অল্পদিনের মধ্যেই মোহিনীর শ্বশুর শাশুড়ী এসংবাদ শুনিলেন। তাঁহারা অর্থব্যয়ে প্রায়-শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সমাজে উঠিলেন মোহিনী সকলের ঘৃণা ও টিট্‌কারিরা পাত্রী হইয়া মরিয়া রহিল। একখানি ক্ষুদ্রঘর ইহার থাকি-বার স্থান হইল তিনি কোন গৃহে যাইতে বা কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে পান্‌না তথাপি তাহার ভরসা স্বামীর বাড়ী আসিলে তাঁহার পদে পড়িয়া ক্ষমা চাহিবেন; তাঁহার স্ত্রী নহে পরিচারিকা হইয়া থাকিবেন।

মোহিনীর প্রতি বিবাহের পর হইতে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যদুনাথ জানেন সুতরাং মোহিনীর পাপ সমাজ যেমন কঠোর নয়নে দেখিল তিনি সেরূপ দেখিলেন না। মোহিনীর জন্য তাঁহার দয়া হইল। সুতরাং মোহিনীর মানসিক যন্ত্রনা ব্যতিত আর কোন কষ্ট রহিলনা। তাঁহার যাহা অভাব তাহা যদুনাথ যোগাইতে লাগিলেন এবং স্বামী যাহাতে তাহাকে গ্রহণ করেন তাহা তিনি করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। মোহিনী বুঝিতে পারিলেন যদুনাথ ব্যতিত তাঁহার আর বন্ধুনাই কিন্তু যদুনাথ কি কারণে তাহাকে এত ভাল বাসেন এ বিষয় তাঁহার মনে একটু একটু সন্দেহ হইতে লাগিল।

এদিগে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যদুনাথ মোহিনীকে এত ভাল-বাসে কেন? অনেক স্ত্রীলোকও অশুদ্ধ চরিত্র পুরুষের বিশ্বাস স্ত্রীলোক পুরুষকে এবং পুরুষ স্ত্রীলোককে নিঃস্বার্থরূপে ভাল বাসিতে পারেনা, যে খানে এই ভালবাসা সেই খানেই একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যদুনাথের চরিত্রে একটা কলঙ্ক আরোপিত হইল। এক দিন যদুনাথের একটী বয়স্য কৌতুক করিয়া তাহাকে বলিল কিটস্ বলিয়াছেন

"Love in a hut, with water and a

crust, Is—lord forgive us !—cinders, ashes, dust."

এই বয়স্ক একজন ডাক্তার। সুরাপান, নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থপরতা. ইহার জীবনের প্রধান. কার্য্য শিক্ষা পাণ্ডিত্য ইহার নিকট অস্থানে পাতিত। গর্ব্ব অভিমান আড়ম্বরে ইহার চরিত্র গঠিত। ইহার নাম কৃষ্ণকান্ত সরকার। ইনি যদুনাথের সমবয়সি এবং সমসামাজিক। যদু এই অপদার্থ ব্যক্তিকে ঘৃণা করিলেও তাহার পাণ্ডিত্যের, জন্য একবিন্দু শ্রদ্ধা করিতেন। যদুনাথ কৃষ্টকান্তের রসিকতা বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন

Don't put too fine a point to your wit lest it should get blunted."

এই সময়ে একটী লোক আসিয়া বলিল শরত ভট্টাচার্য্যের নূতন স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে বোধ হয় মরিবার জন্য বিষটিষ কিছু খেয়েছে। যদুনাথ তখনি বলিলেন "কৃষ্ণচল ?" কৃষ্ণবলিল ভিজিট্ কে দিবে, যদুবলিলেন "তুমি অতি পাজি—চল আমি দিব"।

দুর্ব্বল হৃদয়ে বিষাদের গহ্বর হইতে সহসা আনন্দের শিখার উৎক্ষিপ্ত হইলে—বেগে যন্ত্রবদ্ধ হইয়া যায়। মোহিনীর কি জানি কি কারণে সেইরূপ হইয়াছে। তাহার দেহযন্ত্র নিস্পন্দ, নয়নে অবিরল অশ্রুস্রোত—হৃদয়ের উপরে শরতের ফটোগ্রাফ। কৃষ্ণকান্ত এমনিয়ার শিশি মোহিনীর নাশিকায় ধরিয়া—তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিল "I would set my ten command ments in your face." বলা বাহুল্য মোহিনী প্রকৃতিস্থ হইলেন।

নবম অধ্যায়।

বিজয়া মধ্যে মধ্যে মোহিনীর নিকট বসিয়া গল্প করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য—যদুনাথের সঙ্গে মোহিনীর কোন অবৈধ সদ্ভাব জন্মিয়াছে কিনা সেইটী জানা। আজ মোহিনীর সঙ্গে অনেক কথোপকথন হইল—অবশেষ বিজয়া, বলিল "এ গাঁয় তোমার জন্য কেবল দাদাই দুঃখ করেন" মোহিনীর চক্ষে জল আসিল তিনি বলিলেন, "তিনি না থাকিলে আমার যে কিদুর্দ্দশা হইত ভগবান জানেন।

বিজয়া বলিল তিনি তোমায় ভাল বাসেন বোধ হয় তুমিও তাঁহাকে ভাল বাস—দাদার পরিবার নাই—তা তুমি তাঁর কাছে থাকিলেই বা ক্ষতি কি—অধিক সুখে থাকিতে পারিবে রাজ বাড়ীর মত সুখ হইবে—বল সেইরূপ সুবিধা কি করিব ? আমাকে পর মনে করিওনা।

এই কথা শুনিয়া মোহিনী কাঁদিলেন—তাহার পর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিলেন "আপনার দাদা আমার পিতা, পিতৃতুল্য স্নেহ করেন আমি তাহার নিরাশ্রয়া কন্যা তাঁহার নিকট থাকিতে বাধা কি। তবে অদৃষ্টে কি আছে তাহাই দেখিয়া লই—অনেক দিন দেরি নাই।"

বিজয়া হাসিয়া বলিল বুঝিয়াছি ভাবিয়াছ স্বামী বাড়ী আসিয়া তোমায় গ্রহণ করিবেন,—তাকি হবে,—তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহা পারিবেন না—তোমার স্বামিকে কি কখন দেখিয়াছ,—দেখিলে এ সাহস করিতে না এই দেখ তাহার ফটোগ্রাফ্।

ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া অকস্মাৎ মোহিনীর বদন উজ্জ্বল হইল—উহা দুই হস্তে হৃদয়ে চাপিয়া

ধরিলেন—একবারে অনেক কথা বিজয়াকে কহিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু একটী কথাও মুখ হইতে বাহির হইল না অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। বিজয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা যদুনাথের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—"মোহিনী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।"

মোহিনী চৈতন্য লাভ করিলে যদুনাথ ও কৃষ্ণকান্ত ফিরিয়া যাইতেছেন। পথিমধ্যে এক দরিদ্র বিধবা কান্দিয়া কৃষ্ণকান্তের পদতলে পড়িয়া বলিল "বাবা আমার আর নাই এক্ মাত্র ছেলে ভরসা তার ওলাউঠা হইয়া নাড়ি নাই—বাঁচে না—রক্ষা কর বাবা—দুঃখিনীর ধন রক্ষা কর পুণ্য হবে যশ হবে একটী বার দেখে যাও।" কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হইয়া স্বভাব সুলভ রূঢ় ভাষায় বলিল—"পা ছেড়েদে—বল ভিজিট দিতে পারবি কি না?" বৃদ্ধা কাঁদিয়া বলিল "অনাহারে মরি বাবা—চৌকিদারির পয়সা দিতে পারিনি বলে চৌকিদার ঘটি বাটী লয়ে গেছে"—টাকা কোথা পাব—দয়া করে দেখে যাও ধর্ম্ম হবে।" কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"যা মাগি—এ কাঁদার কর্ম্ম নয় তাহার পর হাসিয়া যদুনাথের দিকে চাহিয়া বলিল—Tears are useless—they contain a little phosphate of lime, some chloride of sodium and water.

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আর ভাল ডাক্তার নাই—এই জন্য যদুনাথ অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন "চল কৃষ্ণকান্ত আমিই ভিজিট ও ঔষধের দাম দিব।" তখন কৃষ্ণকান্ত চলিল। যাইতে যাইতে যদুনাথকে বলিল "you are a fool." আক্ষেপের বিষয় যদুনাথের মত 'ফুল' আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। যাঁহারা নিজের পয়সা দিয়া পরের উপকার করেন আজ কাল্ অনেকের বিচারেই তাঁহারা "ফুল" কৃষ্ণকান্তের দোষ কি?"

যদুনাথ ও কৃষ্ণকান্ত রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। রোগীর যুবতী স্ত্রী ও ভগিনী উভয়েই সুন্দরী—শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিল—তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী যুবতী দেখিলে কৃষ্ণকান্ত বড়ই সন্তুষ্ট হয়—তাহাদিগকে দেখিয়া যদুনাথকে বলিল "I scarcely thought the case could be so inviting" সুন্দরী রমণীর নিকট কৃষ্ণকান্তের মুখে বড়ই ইংরেজী ছুটিতে থাকে। যাহা হউক যদুনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আগে রোগী দেখ" কৃষ্ণকান্ত রোগী দেখিয়া প্রথম মুখ বিকৃত করিলেন তৎপর একটু হাসিলেন—যদুনাথ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপ দেখিলে,—চিকিৎসকের মুখ হইতে কি কথা বাহির হয় শুনিবার জন্য সরলা রমণীদ্বয় সজল নয়নে তাহার প্রতি চাহিল—তখন কৃষ্ণকান্ত মনে করিল ঐ উজ্জ্বল চারি চক্ষু তাহার হৃদয়ে শত শত শর বিদ্ধ করিতেছে সুতরাং ভয়ে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—

"Why, it is only a corrustified exegesis, antispasmodically emanating from the germ of the animal refrigerator, producing a prolific source of irritability in the pericranial epedermis of the mental profundity"

যদুনাথ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না—বলিলেন " যাক্ তবে ওলাউঠা নয় ? কৃষ্ণকান্ত হাহা করিয়া হাসিয়া বলিলেন Nonsense

* * * *

পীড়া ভাল হইয়াছিল।

দশম অধ্যায়।

বিজয়াকে কৃষ্ণকান্তের মাতুল পুত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সম্পর্কে কৃষ্ণকান্ত দেবর। দেশের কুপ্রথানুসারে ভ্রাতৃবধূগণ দেবরের সঙ্গে হাস্য পরিহাসাদি করিয়া থাকেন এবং কখন বা সেই পরিহাস অব্যক্ত ও ঘৃণিত রসিকতায় গিয়া দাঁড়ায়। বিজয়া ও কৃষ্ণকান্তে সকল রকমের পরিহাসই চলিত। বিজয়া সুন্দরী নহে তবে তাহার হাতে অনেক টাকা। যাহারা এ টাকার কথা জানিত তাহারা বিজয়াকে সুন্দরী দেখিত। বিজয়া যখন সধবা তখন হইতেই বিজয়াতে ও কৃষ্ণকান্তে বড় ভাবছিল। বিজয়ার স্বামী কৃষ্ণকান্তকে ভাল বাসিতেন বিশ্বাস করিতেন কিন্তু সরল ভদ্রলোক কৃষ্ণকান্তের বিশ্বাস ঘাতকতা ইহ জীবনে বুঝিতে পারেন নাই। বিজয়া ও কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে ফাঁকিদিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। এইরূপে কৃষ্ণকান্ত বিজয়ার নিকট অনেক সোনারূপা ও তাহার স্বামীর নিকট অনেক জমী জমা পাইয়াছিলেন। বিজয়ার স্বামী, কৃষ্ণকান্তের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সপরিবারে নানা দেশের জল বায়ু গ্রহণ করেন। সামান্য ব্যাধি কৃষ্ণকান্ত আরাম না করিয়া ঔষধী ও কুপথ্যে দীর্ঘকাল রাখিতে যাইয়া অবশেষে বিজয়ার স্বামীকে মারিয়া ফেলেন। স্বামী মরিলে বিজয়ার মোহ ভাঙ্গিল—চৈতন্য হইল। নিজের দোষ কৃষ্ণকান্তের দোষ বুঝিতে পারিলেন।

বিজয়ার স্বামী বিয়োগ হইলে কৃষ্ণকান্ত প্রস্তাব করিল—"তোমার টাকা কড়ি ও বিষয়াশয় রক্ষার ভার আমার উপর দাও"। বিজয়ার মন ভাঙ্গিয়াছিল সুতরাং তাহা করিলনা এদিকে কৃষ্ণকান্তও বিরক্ত হইল। এই বৈরক্তি ক্রমে এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে উভয়ের মধ্যে সাক্ষ্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। দীর্ঘকাল এই অবস্থায় গিয়াছিল তাহার পর আবার কথা বার্ত্তা চলিতে থাকে।

মোহিনীর ঐ ঘটনার পর একদিন বিজয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিল—ছোটঠাকুর বেয়ারামটা কি হ'য়ে ছিল গা" কৃষ্ণকান্ত বলিল ব্যাম যাইহউক তার বেস ভাল কর্ত্তেগিয়ে এখন আমি যে মরি।

"কেন মাথা ঘুরে গেছে বুঝি"

"হাঁ"

"অনেক দেরি এতো বিজয়া নয় ?"

"তোমার দাদার কথাটা কি সত্য ?"

"তা জানিনা বোধ হয় মিথ্যা জনরব।"

"তোমার সঙ্গে ভাব কেমন ?"

"খুব"

"তুমি ঘটকালি কর্ত্তে পার"

"কি দিবে ?"

'যা চাও'

"যা চাই"

"হাঁ"

"আমার স্বামীর সেই সোনার বাটা ও আলবোলা চাই"

"তা দিব"

"আমিও ঘটকালি করে দিব"

"ক'দিনে ঠিক্ হবে"

"একদিনেই"

"বটে"

"জিনিষ কবে দিবে"

"কাজ করিয়া দিলে"

'তাকে কি দিবে?"

"যা চায়"

অন্য রমণী হইলে, অভিমান করিত—ক্রোধ করিত। কিন্তু বিজয়া পূর্ব্ব হইতে এখন অনেক চতুরা তাই এ অসৎ প্রস্তাবে রাগে নাই। কেননা পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণকান্তকে কিছু শিক্ষা দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল এখন সেই সুবিধা ঘটিয়াছে।

এই ঘটনার দুইদিন পরে বিজয়া নিজেই যাইয়া কৃষ্ণকান্তকে কহিল—

"সব ঠিক্"

"কোথা দেখা হবে?"

"রায়েদের বাড়ীতে"

"আজই"

"আজই"

"কত রাত্রে"

"বারটার সময়"

"কোন্ ঘরে"

"দালানে"

"তা বেশ"

"বেশত বটে কিছু টাকা সঙ্গে নিও"

"কত"

"হাজার"

"এত টাকা!"

"দিতে হবেনা দেখালেই হবে"।

"হাজার টাকা চায় নাকি"

হাঁ

"যদি কেবল দেখালে চলে—দুহাজারও নিতে পারি"।

বেশ—তা নিও, "চেয়েছে বলে এখনি কি সব দিতে হবে"।

এই সংবাদে কৃষ্ণ আনন্দে অধীর হইল। ভাবিল তিন হাজার টাকার নোট তাহার আছে সবই লইয়া যাইবে। পাড়া গেঁয়ে স্ত্রীলোক দেখিলেই সন্তুষ্ট হইবে—আর মনে করিবে যে, হাজার চাহিলে যে তিন হাজার আনিতে পারে সে না জানি পরে কত টাকাই দিবে।

এই যুক্তি স্থির করিয়া কৃষ্ণকান্ত যথা সময়ে টেরি ফিরাইয়া ল্যাভেণ্ডর ও অটোডিরোজ মাখিয়া একটী কোট গায়ে দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বাহির হইলেন। আজ ব্রাণ্ডির মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়াছিল, তদুপরি ব্যাধি সুবর্ণ চশমা। চক্ষুরোগ না থাকিলেও আজকাল এ কৃতব্যাধি ফ্যাশিয়ান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গমন কালে বুকের পকেটে তিন সহস্র টাকার নোট লইয়া চলিলেন।

রায় মহাশয়েরা বাড়ী থাকেন না—পূজার সময় কেবল আসেন। সুতরাং বাটী জনশূন্য। আজি গভীর রজনীতে সেই জনশূন্য বাটীর পূজার দালানে কৃষ্ণকান্ত প্রবেশ করিল। গৃহে আলো নাই। কৃষ্ণকান্ত প্রবেশ মাত্র কে তাহার কানে কানে বলিল "আজ মোহিনীর জীবন সার্থক"। কৃষ্ণকান্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়া এক হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিল আর একহস্ত দিয়া বুকের পকেট হইতে নোটের

তাড়া লইয়া বলিল—"তুমি হাজার টাকা চাহিয়াছিলে এই দেখ তোমার জন্য তিন হাজার আনিয়াছি। রমণী নোট লইয়া বলিল আলো জ্বালাই এখানে কোন ভয় নাই "উন্মত্ত কৃষ্ণ আর একটী চুম্বন করিয়া অতি কষ্টে রমণীকে আলো জ্বালিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। আলো জ্বলিল—একি! কি সর্ব্বনাশ! কি ঘৃণা! কি লজ্জা!—মোহিনী নহে; পিশাচিনী!—লোলিত চর্ম্ম—দোলিত স্তন—দন্তহীন—নাশাহীন কুষ্ট রোগাক্রান্ত শুভ্র কেশা বৃদ্ধা—রোগে হস্তপদের দুএকটী অঙ্গুলি খসিয়া পড়িয়াছে ওষ্ঠদ্বয় খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে কোটর গত পিঙ্গল চক্ষুকোন হইতে দুর্গন্ধময় ক্লেদ নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণকান্তের ভয়ে ও ঘৃণায় মোহ ভাঙ্গিল নেশা ছাড়িয়া গেল—কৃষ্ণকান্ত পশ্চাৎ হটিলেন। বৃদ্ধা বৰ্ত্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিল "কৃষ্ণকান্তবাবু চারিটি টাকা না দিলে মরিলেও গরীব রুগি দেখনা—ভিক্ষা চাহিলে দুঃখীকে এক মুঠো চাল না দিয়া মেরে তাড়িয়ে দাও—মনে আছে কৃষ্ণবাবু—তোমার কাছে সে দিন—না খেতে পেয়ে দুটী পয়সা চাইতে গেছিলুম্ কি বলে ছিলে—আর আজ মহাপাপ কর্‌বার জন্য এত রাতে একতাড়া নোট নে এখানে এসেছ। তোমার দোষ কি কৃষ্ণবাবু তোমার দেশের অনেকেই তোমার মত—তাদের মুখে ছাই—পেচোচ্ছ কেন—এসনা,—গলা জড়িয়ে ধর চুম খাও মিষ্টি কথা কও?" তখন সেই পাণ্ডিত্যাভিমানি কৃষ্ণকান্ত সজল নয়নে স্বর্গপানে চাহিয়া বলিলেন—"Angels and minsters of grace defend us!" বৃদ্ধা হাসিয়া অগ্রসর হইয়া শুষ্ক হস্ত বাড়াইয়া বলিল 'কি আসবে,"—কৃষ্ণকান্ত ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইয়া আপনা আপনি বলিল—"Oh! a slight touch of leprasy may be called a retaining fee on the part of death." দপ্ করিয়া আলো নিবিয়া গেল—সেই ঘোরান্ধকারে কৃষ্ণকান্ত ভয়ঙ্করী বৃদ্ধার অবয়ব ও নিজের কার্য্য ভাবিয়া মনে মনে বলিল—

"Which way shall I fly,
Infinite wrath, and infinite despair?
which way I fly is Hell; myself am
hell;——"

একাদশ অধ্যায়।

বেলা নয়টা গ্রামের লোক মাধ্যাহ্নিক আহারের আয়োজনে নিযুক্ত আছে। গ্রামের পুরহিত ঠাকুরেরা যজমান বাড়ী হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ জন্য এ বাড়ী ও বাড়ী ছুটাছুটী করিতেছে। প্রাতঃ স্নানান্তে মৃত্তিকার ছাপ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া টিকিতে ফুল গুঁজিয়া অবস্থাপন্ন লোকদের মঙ্গল প্রার্থনা ও দুরবস্থাপন্ন লোকের নিন্দা করিতেছেন। উত্তমর্ণ সম্প্রদায় সুধের পয়সা আহরনার্থে দরিদ্রকে নিপীড়িত ও অবস্থাপন্নকে বিনয় ও মিনতি করিয়া ফিরিতেছে। ট্যাক্‌সের পেয়াদাগণ অবস্থাপন্নকে সেলাম করিয়া ট্যাক্‌স্ আদায়ের ইঙ্গিত করিয়া ও দরিদ্রের ঘটি বাটী কাড়িয়া লইয়া বেড়াইতেছে। বধূরা ঘাটে বসিয়া আপনাপন সুখ দুঃখের কথা কহিতেছে ও অঙ্গ মার্জ্জন করিতেছে। প্রৌঢ়ারা শিব পূজা করিতে বসিয়া ও ইষ্টমন্ত্র যপ্ করিতে করিতে লোকের

নানা কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিতেছেন। বালকেরা মুড়ি ও পান্তাভাত খাইয়া স্কুল পাঠশালায় যাইতেছে—পণ্ডিত মাষ্টারেরা সম্পাদকের মনস্তুষ্টি করিয়া বাকি বেতনের কিঞ্চিৎ আদায়ের চেষ্টায় আছে। বৃদ্ধেরা তামাকু খাইতে খাইতে "স্কুলে পড়িয়া ছেলে গুলা বয়েগেল, আগে এক টাকায় তিনমোন চাউল মিলিত এখন দশ সের মেলেনা, এবং ইংরেজের মুলুক অধঃপাতে যাক্" প্রভৃতি নানা আলাপে ব্যস্ত আছে। যুবকেরা দল বাঁধিয়া শিগারেট খাইতেছে ও সঙ্গোপনে কোথায় কুক্কুট মাংশ রাঁধিয়া খাইবে তাহার বন্দোবস্ত করিতেছে ও রুষিয়া গবর্ণমেণ্ট ভাল ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারি এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মুশলমানকে ভাল বাসিয়া ও হিন্দুর প্রতি অবিচার করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে গৃহ বিবাদ সংস্থাপনের চেষ্টায় আছে" প্রভৃতি নানা রাজনৈতিক আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কেহ কেহ বা চিঠি পত্র পাইবার বাসনায় গ্রাম্য ডাক ঘরের মধ্যে বসিয়া তামাকু সেবন ও নানা বিষয়ের গল্প তুলিয়াছেন—পোষ্টমাষ্টার বাবু মাদুরে বসিয়া তহবিল মিল করিতেছেন ও পিয়ন ব্যারিং পত্রের মাসুল ফেলিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। এমন সময় রাণার ডাকের পুলিন্দা লইয়া আসিল। চিঠি অল্পই আসিল—এবং তাহা ডাকঘরেই প্রায় বিলি হইয়া গেল। পূজার অল্পদিন বিলম্ব আছে, সুতরাং আসিল বেশী ছাপান বিজ্ঞাপনের প্যাকেট। কলিকাতার জুয়াচোরেরা একটাকায় বড়মানুষ করিয়া দিবে আট আনায় অষ্টাদশ পুরাণদিবে সোনারফুল আতরের শিশি জ্ঞানভাণ্ডার ও ব্রহ্মাণ্ডের অনুসন্ধান দিবে প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রলোভন পূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়াছে তাহাই আসিল। যাহারা চিঠি পাইল না তাহারা এই সকল বিজ্ঞাপন পাইল।

গ্রামের রামদাস মুখোপাধ্যায় ডাকঘরে ছিলেন তিনি তাহার পিতার নামের চিঠি খুলিয়া পড়িয়া বলিলেন বিলাত হইতে দাদা কলিকাতা আসিয়াছেন তিনি আজই বাড়ী আসিবেন। অল্প ক্ষণের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা গ্রামময় প্রচার হইল। "গ্রামে আজ ডাকাৎ পড়িবে গ্রাম আজ লুণ্ঠিত হইবে"—যদি এরূপ সংবাদ আসিত তাহা হইলেও গ্রামের লোক এত ভীত হইতনা। গ্রামে আসিলে কিরূপে তাহাকে অপমান করিতে হইবে কিরূপে তাহাকে ঘৃণা করিতে হইবে—তিনি যে অস্পৃশ্য হইয়াছেন তাহা কিরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এই বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। গলিভরকে দেখিয়া লিলিপথের লোক যেরূপ চিন্তিত ও ভীত হইয়াছিল রামদাসের ভ্রাতা শিবদাসের আগমন সংবাদে আজি গ্রামের লোকের সেইরূপ চিন্তা ও ভয় উপস্থিত হইল।

বেলা তিন ঘটিকার সময় শিবদাস বাটীতে আসিলেন। তিনি বাঙ্গালীর সাজে ধুতি পরিয়া আসিলেন। পাছে শিবদাস ঘরের ভিতর প্রবেশ করে এজন্য তাহার মাতা দৌড়িয়া উঠনে বাহির হইলেন। শিবদাস মাতৃপদ স্পর্শ করিতে পাইলেন না মাতা ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পিতাও সেইরূপ করিলেন। শিবদাসকে কোথায় স্থান দিবেন বলিয়া ললাটে চিন্তার রেখা উদয় হইল। গ্রামবাসিরা হিংসা ও ঘৃণার নয়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

শিবদাস ইংলণ্ড যাইবার পূর্ব্বে গ্রামের প্রকৃতি যাহা দেখিয়াছিলেন এখন ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার আশা ভরসা কল্পনা সকলই নৈরাশ্যের কালীমায় মলিন হইয়া গেল হাসিমুখ বিষাদে বিকৃত হইল। মনে হইল একি সেই মাতা সেই পিতা সেই গ্রামবাসী হা নিষ্ঠুর সমাজ কোন্ পাপে আমায় ত্যাগ করিতেছ!

শিবদাস দুইদিন বাহিরের একখানি অনাবৃত গৃহে ভৃত্য পরিবেশিত অন্ন সেবন করিয়া এবং কাহারো সহানুভূতি না পাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। যদুনাথ কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গিয়াছিলেন অদ্য আসিয়াই এই কথা শুনিলেন; তিনি স্বাধীনচিত্ত সাহসী এবং সত্যপ্রিয় লোকভয়ে ও সমাজভয়ে ভীত হইলেন না। অতি যত্ন সহকারে শিবদাসকে নিজের বাটীতে লইয়াগিয়া একত্রে ভোজন পান করিতে লাগিলেন। তৎপর নিজব্যয়ে নবদ্বীপ বিক্রমপুর ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের বড় বড় পণ্ডিতের পাঁতি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সমাজে তুলিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল। নিষ্ঠুর এবং নির্ব্বোধ সমাজ সকল পণ্ডিতের ব্যবস্থা পদে ঠেলিয়া ফেলিল। প্রত্যুত যদুনাথকে সমাজ হইতে রহিত করিল।

কৃষ্ণকান্তের ইংরেজী চাল চলন, তিনি, সকল অখাদ্যই ভক্ষণ করেন সকল মহাপাপই করিয়া থাকেন তথাপি তিনি এ যাত্রা সমাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়া যদুনাথকে বিপদ গ্রস্থ করিতে দাড়াইয়াছেন। তাহার তিন হাজার টাকা গিয়াছে তিনি অন্ধকার রজনীতে প্রতারিত হইয়াছেন তাহা গ্রামের সকলেই জানে তথাপি তিনি আজ সমাজের নেতা। কৃষ্ণকান্তের এরূপ করিবার তিনটী কারণ প্রথমতঃ তাহার বিশ্বাস যদুনাথের ষড়যন্ত্রে তাহার দুর্দ্দশা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ সমাজ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, তাহার চরিত্রের ঘৃণা করিবেনা। তৃতীয়তঃ যদুনাথকে বিপদ গ্রস্থ করিয়া কৌশলে তাহার অর্থ দোহন করিবেন।

এদিকে শিবদাস সমাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। হ্যাট্ কোট পরিয়া সাহেব হইলেন বাবুর্চ্চির রন্ধন ভোজন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যদুনাথ ব্যতিত গ্রামের অন্য লোকের মুখ দেখিবেন না। অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত হিন্দু সমাজ তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল তিনি কাহারো উপকার করেন না—চাকরী করিয়া দেননা। সচরাচর যাহা সকল ইংলণ্ড প্রত্যাগত যুবকের অদৃষ্টে ঘটে তাঁহারও তাহাই ঘটিল। প্রতি হিংসায় তাঁহাকে পাকা সাহেব করিল—প্রতি হিংসায় তাহাকে মিষ্টর এস, মুখার্জি করিল। ইংলণ্ড প্রত্যাগত যুবকের হৃদয়ের অন্তস্তল নিরীক্ষণ না করিয়া যাহারা তাহাদের সাহেবিয়ানায় গালি দেন তাহারা যথার্থই নিষ্ঠুর এবং অবিবেচক।

এখন সমাজ-স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হইয়া যদুনাথ কি করিয়াছিলেন তাহাই দেখা যাউক।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যদুনাথ সমাজচ্যুত হইয়াছেন শুনিয়া ঘৃণার হাসি হাসিলেন। দূর গ্রাম হইতে নূতন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। স্বগ্রামস্থ কর্ম্মচারিদের জবাব দিয়া বিদেশের লোক আনিয়া নিযুক্ত করিলেন

গ্রাম তাঁহার দান দয়া এবং সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। এবং তিনি অধিকতর দৃঢ় ও কঠোর নিয়মে গ্রামের শান্তিরক্ষা ও সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন গেলে গ্রামের লোক যখন দেখিল যদুনাথ ব্যতিত তাহাদের উপায় নাই তখন তাহাদের সামাজিক একতা শিথিল হইয়া পড়িল। তাহারা কৃষ্ণকান্তের পরামর্শকে কুপরামর্শ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এবং সকলে মিলিয়া এমন অভিপ্রায় জানাইল যদুনাথ সমাজচ্যুত হন নাই। যদুনাথ উহা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষ গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল—তাঁহাকে লইয়া আহার করিল এবং তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতে লাগিল। এই খানে অর্থ ও মানসিক শক্তির নিকট সমাজ পরাস্ত হইল। যে মানসিক শক্তি বলে রাজশক্তি ও ধর্ম্মাধিকরণ শক্তি লুথরের নিকট অবনত মস্তক হইয়াছিল—যে মানসিক শক্তি বলে রাজ শক্তি হাম্‌ডান্‌ ও ক্রমওয়েলের নিকট খর্ব্ব হইয়াছিল। যে মানসিক শক্তি বলে রোম রিইক্সি ও সার্দ্দুল ফরাসী রিশলাইর চরণ তলে লুটাইয়াছিল—সেই মানসিক শক্তি বলে আজি সমাজ যদুনাথের চরণে লুটাইল। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-যুবার হৃদয়ে সেই মানসিক শক্তিই দেখিতে চাই।

সমাজ যদুনাথকে গ্রহণ করিল সুতরাং আপনা আপনি কৃষ্ণকান্ত পতিত হইল কিন্তু দুষ্ট কৃষ্ণকান্ত উদ্ধারের পথও বেশ জানে। সে অল্প দিনের মধ্যে যদুনাথকে বুঝাইয়া দিল যে "কৃষ্ণকান্ত ব্যতিত কাহার সাধ্য যে একটা সমাজকে যদুর পদে স্থাপিত করিতে পারে,—শুদ্ধ সমাজের শক্তি ও সমাজের বিষদন্ত চূর্ণ করিবার জন্যই কৃষ্ণকান্ত সমাজের দলপতি হইয়া যদুনাথকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল।"

কৃষ্ণকান্তের প্রকৃতি দৃষ্টে যদুনাথ একথা সহজেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণকান্ত ধীরে ধীরে পুনরায় যদুর সহিত পূর্ব্বভাব স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

বিজয়া মনে করিয়াছিল কৃষ্ণকান্ত সেই রজনীর ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় লজ্জায় মরিয়া আছে—এবং এ জন্মে আর তাহার সহিত কথা কহিবে না। বিজয়ার এ সিদ্ধান্ত ভুল সে কৃষ্ণকান্তকে চিনিয়াও চিনিতে পারে নাই। একদিন বেলা দুই ঘটিকার সময় বিজয়া আহারান্তে গৃহের বারান্দায় মাদুরে শুইয়া কৃষ্ণকান্তের উইল পড়িতেছে ও নিশাকর দাসের আকৃতি কল্পনায় চিত্র করিতেছে—এমন সময় কৃষ্ণকান্ত তথায় উপস্থিত হইল। বিজয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে উঠিয়া বসিল। কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া মাদুরের একপার্শ্বে বসিয়া বলিল—"বৌ ভয় কি;—তুমি উচিত কাজই করেছ—ভালবাসার অভিমানে ঐরূপই হইয়া থাকে। মোহিনীরূপে উন্মত্ত হইয়াছি,—একথা শুনিলে তুমি কি করিবে তাই জানিবার জন্যই এতটা করিয়াছি। মোহিনী কোন্ ছার তিলোত্তমা রম্ভায়ও এ মন আকৃষ্ট হইবার নহে।" বিজয়ার ভয় দূর হইল যথার্থই অভিমান ভরে কহিল "তবে অত রাত্তে টাকা নে গিয়াছিলে কেন?" কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিল—"আশা ছিল তোমাকেই মোহিনীরূপে পাইব—আর তোমাকেই টাকা দিয়া একটা

বড় গোছের আমোদ করিব—এ কথাটা না বুঝিতে পারিয়া এমন একটা কুৎসিৎ কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলে ইহাই আশ্চর্য্য!”

এই কথায় বিজয়া অনুতপ্ত হইল—কৃষ্ণকান্তের সকল অপরাধ ভুলিয়া গেল—লজ্জায় অধোবদন হইল। চতুর কৃষ্ণকান্ত তাহা বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে স্বুবর্ণ তাম্বুল করঙ্ক বাহির করিয়া তাহার পদ মূলে স্থাপন পূর্ব্বক বলিল “প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—নেও এই তোমার সোনার বাটা। আলবলা আমি নিজে ব্যবহার করি—যদি চাও তাও এনে দিব”। বিজয়া বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকান্তের মুখপানে চাহিল—তাহার বোধ হইল আবার যেন ঐ মুখে বাল্যলাবণ্য সরলতা সহ ক্রিড়া করিতেছে। অবোধ বিজয়া আবার মুগ্ধ হইল। আবার হরিণী ব্যাধের জালে পড়িল—বলিল—“আর কেন যথেষ্ট হয়েছে যদি অপরাধ করে থাকি দুবা মার—আর তোমার —ঐ বাটা লয়ে ফিরে যাও”। কৃষ্ণকান্তের মনোরথ পূর্ণ হইল বলিল—বাটা লইয়া কোথা যাইব—তুমি পান সাজিবে আমি এই খানে বসে পান খাইব—কেমন?” বিজয়া মোহবসে বলিয়া ফেলিল—“যদি নূতন বাটায় পান না খাওয়াতে পারি তবে কিসের ভালবাসা”। বিজয়া পুনরায় নূতন বাটায় কৃষ্ণকান্তকে নিত্য রজনীতে পান খাওয়াইতে আরম্ভ করিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোহিনীর সামাজিক নিগ্রহ হইল—পাপ প্রকাশ হইল ইহাতে বিরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল বিজয়া হইতে ইহা হইয়াছে—সুতরাং বিজয়ার সহিত তাহার আত্মীয়তা আরও বাড়িয়া গেল। বিরাজ নিত্য দুবেলা তাহার কাছে আইসে।

এক দিন বেলা ঠিক এক ঘটিকার সময় বিরাজ বিজয়ার কাছে আসিতে ছিল—এ সময়ে গ্রামের সকলেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছিল। বিরাজ গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দুই ব্যক্তির কথোপকথন শুনিতে পাইয়া নীরবে গৃহের কোনে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত বলিতেছে “যদু আর বিবাহ করিবেনা তাহার উত্তরাধিকারি নাই তাই বলি তুমি একটী দত্তক গ্রহণ কর—সব রক্ষা পাইবে।” বিজয়া বলিতেছে “দত্তক কিরূপে রাখিব—অনুমতি নাই।”

“অনুমতির আবশ্যক কি,”

“যদি লোকে দত্তক অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা করে”

“আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিব এবং আরো সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারায় সাক্ষ্য দেওয়াইব”

“তুমি কি সাক্ষ্য দিবে,”

“উইল যথার্থ”

“কোথা উইল,”

“প্রস্তুত করিব”

“জাল করিবে”

“তোমার মঙ্গলের জন্য করিব।”

“দাদাকে জানাই দেখি তিনি কি বলেন”

“সর্ব্বনাশ!—একথা বলিও না”

“কেন?”

"তোমার দাদা তোমাকে ঘৃণা করেন—তিনি বিরোধী হইবেন।"

"বিজয়ার বদন গম্ভীর হইল বলিল "কি, ঘৃণা করেন?"

হাঁ—খুব,

"কেন?"

"তুমি বিবাহ করিতে রাজি হও নাই"

"সে তো ভালই করিয়াছি হিন্দু বিধবা কি বিবাহ করে?"

"হিন্দু বিধবা কি উপপতি করে"?

বিজয়ার ক্রোধ হইল—তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল বদন রক্তিম হইল—বলিল "তিনি কি আমায় অসতী বলেন"? কৃষ্ণকান্ত বিজয়ার সেই পোষিত ভ্রাতৃস্নেহের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য বলিল—"তিনি তোমাকে অসতী ও পিশাচিনী বলেন, তিনি তোমাকে খুব ঘৃণা করেন—তুমি মরিলে তিনি শান্তিবোধ করিবেন—তিনি বিষ দিয়া তোমাকে মারিবার চেষ্টায় আছেন—যদি তোমাকে আমি ভাল না বাসিতাম তবে বোধ হয় অর্থলোভে তোমাকে এত দিন মারিতাম—তোমাকে মারিবার ভার আমার উপরেই আছে—এখন সব বুঝ্‌লে তো"?

বিজয়া এই কথা শুনিয়া কিছুকাল চিন্তা করিল পরে বলিল—"আমায় মারিলে কত টাকা তুমি পাইবে"?

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিল "তিন হাজার টাকা"।

বিজয়া উঠিয়া বাক্‌স খুলিল—তৎপর একতাড়া নোট কৃষ্ণকান্তের হাতে দিয়া বলিল—"এই নেও তোমার কসাইগিরির দক্ষিণা"। কৃষ্ণকান্ত বলিল "এতো আমারই সেদিনকার নোট"। বিজয়া বলিল—"তোমার—একদিন ছিল—কিন্তু এখন আমার"। কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিল "তা বেশ—কসাইগিরি না করে টাকা নিব কেন?" বিজয়া বলিল "নেও—নয় কসাইগিরিই করিও"। কৃষ্ণকান্ত সেই টাকা হস্তগত করিয়া মনে মনে বলিল "কসাইগিরি করিরই—এখন যাকেই হউক"। তৎপর প্রকাশ্যে বলিল—"দাদার হাতের কোন লেখা কাগজ তোমার কাছে আছে," বিজয়া বলিল "কেন"?

"জাল উইল তৈয়ারি করিব"।

"তাঁহার হাতের লেখা চিঠি আছে"

"বেস তা হলেই ভাল হবে"।

"এখনই চাও,"

"এখনই"

বিজয়া আল্‌মারি খুলিয়া এক তাড়া প্রাচীন চিঠি বাহির করিয়া—তাহা হইতে একখানি চিঠি লইয়া কৃষ্ণকান্তের হাতে দিল। কৃষ্ণকান্ত সেই চিঠি পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। চিঠিতে পরিষ্কার অক্ষরে এই কয়টী মাত্র কথা লেখা।

প্রাণের বিজয়া।

আমি এখন মুঙ্গেরে আছি—এবং এক প্রকার ভালই আছি। তুমি লিখিয়াছ তোমার শরীর ভাল নয় বিশেষ আমার জন্য অধৈর্য্য ও চিন্তিতা হইয়াছ—তুমি সাধ্বী ও পতিপ্রাণা তাই অল্প দিন অদর্শনে ব্যাকুলা হইয়াছ। কৃষ্ণকান্ত আমায় দেশে যাইতে নিষেধ করেন এবং তোমার শরীর অসুস্থ বলিয়া তোমাকে এখানে আনার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন

সুতরাং আমারও তাহাই ইচ্ছা। বাড়ীতে বিশ্বাসী এমন কেহ নাই যে তোমাকে এতদূরের পথ সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে এই জন্য কৃষ্ণকান্তকে আগামী ১০ই তারিখে পাঠাইব—তুমি নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে আসিতে পারিবে। ইতি তোমারই শশিশেখর মিত্র।

উদার চরিত—সরল প্রাণ শশিশেখর কৃষ্ণকান্তকে বিশ্বাস করিতেন—এবং সুচিকিৎসক মনে করিয়া তাহার পরামর্শ ছাড়া এক পদও চলিতেন না। তাই বিশ্বাস করিয়া বিজয়াকে মুঙ্গেরে আনিবার জন্য কৃষ্ণকান্তকে পাঠাইয়া দিলেন—কিন্তু কৃষ্ণকান্ত এই মুঙ্গেরের পথে বিশ্বাস ঘাতকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বিজয়ার সতীত্ব নাশ করে। তাহাতেই এই চিঠি পড়িয়া কৃষ্ণকান্ত শিহরিল। বিজয়া তাহাতে লক্ষ্য করিল না।

* * * * *

জাল উইল প্রস্তুত হইল। একদিন যদুনাথকে ঐ উইল দেখাইয়া বিজয়া বলিল—"দাদা এতদিন উইলের কথা জানিতাম বটে কিন্তু খুঁজিয়া পাই নাই—আজ হঠাৎ কতকগুলি কাগজের সঙ্গে ছোট আলমারির দেরাজে পাইয়াছি।—উইলে দত্তক রাখিবার কথা আছে—আমি রাখিব।

যদুনাথ ভাল করিয়া উইলখানি দেখিয়া বলিলেন এ উইল জাল। প্রথম কারণ তোমার স্বামী অল্প বয়সে হঠাৎ মরেন। দ্বিতীয় কারণ যখন তিনি বেস সুস্থ শরীরে ছিলেন সেই সময়ের তারিখ ইহাতে দেওয়া রহিয়াছে। তৃতীয় কারণ আমাকে একদিনও উইলের কথা বলেন নাই। চতুর্থ কারণ তিনজন বদ্‌মাইস্ লোক ইহার স্বাক্ষী এই তিনজন এক সময়ে এক স্থানে পূজার সময় ব্যতীত কখনই মিলিত হইতে পারে না—এ দেখিতেছি চৈত্র মাসের একই তারিখে সকলেরই স্বাক্ষর। পঞ্চম কারণ আমাকে এক্‌সিকিউটর করা হইয়াছে। প্রকৃত উইল হইলে কৃষ্ণকান্তের সমস্ত থাকিত কেননা কৃষ্ণকান্তকে তিনি বড়ই বিশ্বাস করিতেন এবং আমার অপেক্ষাও আত্মীয় লোক মনে করিতেন যদিও তাহার ন্যায় নীচাশয় ও দুশ্চরিত্র আর নাই। উইল আমার কাছে রহিল যাহা দ্বারা এরূপ কাজ হইয়াছে—অল্প দিনের মধ্যেই তাহা আমি বুঝিতে পারিব। আমার বিশ্বাস তুমি নিজে সকলই জান"।

যদুনাথের কথা শুনিয়া বিজয়া কান্দিতে লাগিল। বিজয়াকে কান্দিতে দেখিয়া যদুনাথ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ছেলে রাখিবার সাধ হইয়াছে রাখিতে পার তারজন্য জাল উইলের প্রয়োজন কি? আমি বিরোধী না হইলে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমা করিবেনা। তবে আমার সন্তানাদি নাই বা পুনরায় বিবাহও করিবনা যদি সেই জন্য আমার বিষয়ের প্রতি তোমার লোভ হইয়া থাকে তবে পুত্র রাখিলেও আমার অভাবে সে কিছু পাইবেনা। আমার বিষয় আমার নহে ইহা সাধারণের উপকারের জন্য সাধারণ সম্পত্তি করিয়া যাইব স্বার্থপর হইয়া একজনকে বড় মানুষ করিয়া যাইবনা। এই জন্যই আর বিবাহ করিনাই এবং করিবও না। পরকে ধরিয়া বিষয় দিবার কি প্রয়োজন? পোষ্যপুত্রে তোমার কি উপকার করিবে? আমার বিষয়ের তুলনায় তোমার

বিষয় সম্পত্তি অতি সামান্য সেই সামান্য সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয় করা উচিত যদি যশঃ ও নামের অভিলাষ থাকে পুত্রের দ্বারা তাহা হইবেনা যদি তোমার অর্থে না কুলায় তুমি যত ইচ্ছা আমার অর্থব্যয় করিও আমি কিছু বলিবনা। সৎকাযে ব্যয় করিলে আমার সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থ তোমার নিজের বলিয়া মনে করিও।

বিজয়া এ সকল কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেবল এইমাত্র বলিল "দাদা আমি যদি একটী ছেলে রাখি তায় তোমার আপত্তি কি ?" যদুনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন " আমার কোন আপত্তি নাই "। বিজয়া চলিয়া গেল।

—০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রভাত সমীর ধীরে ধীরে বহিয়া সেফালিকার শুভ্র বদন চুম্বন করিতেছে ফুলরাণী হাসিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার মধুর সৌরভে দিক্ পুলকিত করিতেছে। শরতের শুভ্র চন্দ্রকিরণ এখনও জগত সুধা-ধৌত সুন্দর। এই সময় কে গাহিতেছে।

"ও মন শঙ্কা কিরে ও তুই ডঙ্কা মেরে
এলি ঘরে।
এবার দেখ্‌ব চেয়ে কে যায় ধেয়ে তেমনি
করে অহঙ্কারে।
দৈব বসে কারাবাসে, ছিলাম যেন বনবাসে
এখন রাবণ মলো রাজা এলো
দুখ্ ফুরালো ক দিন পরে "।

গানের তীব্রস্বরে যদুনাথের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি মনোযোগ করিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে দয়াল চাঁদ চট্টোপাধ্যায় ঐ গান করিতেছে আজ দশবৎসর পরে দয়াল ঘরে আসিয়াছে। যদুনাথ ভ্রুকুটি করিয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

বেলা নয়টার সময় গ্রাম উৎসব পূর্ণ হইল। স্ত্রীলোক বালক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলে দলে দলে দয়ালের গৃহ পূর্ণ করিল। সকলেই খাবার জিনিষ ও অন্যান্য উপহার লইয়া উপস্থিত। গ্রামের আজ সকলের নিমন্ত্রণ হইল কেননা আজ সকলে দশ-বৎসর পর পরমাহ্লাদে দয়ালকে লইয়া ভোজন করিবেন। রোম বিজয়ী শিজরকে যে রূপ অভ্যর্থনা করিয়াছেন আজি এই ক্ষুদ্র গ্রাম দয়ালকে সেইরূপে সমাদর করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

দয়াল চাঁদ কে ?—তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? দয়ালচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বাল্যকাল হইতেই চরিত্র হীন্ এবং শিক্ষায় ও শীলতায় অমনোযোগী। বয়স হইলে ক্রমে চুরি জুয়াচুরি ও ডাকাইতি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে। অনেক বার পুলিষের হাতে পড়িয়াও প্রমানাভাবে শাস্তি পায়না। অবশেষ একটা ডাকাতি করিয়া ধরা পড়ে এবং বিচারে দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হয়। এখন সেই দশবৎসর পরে দয়াল পোর্টব্লেয়ার হইতে ফিরিয়া দেশে আসিয়াছে তাই তাহাকে লইয়া সকলে আনন্দে মাতিয়াছে। গত দশবৎসর দয়াল কোথায় কোন্ সংশ্রবে ছিল কোথায় কাহার হাতে খাইয়াছে জাহাজে গিয়াছে এবং আসিয়াছে এ সকল প্রশ্ন কাহারও হৃদয়েই উদয় হয় নাই। ব্যবস্থা আছে "কারাগারে নিয়ম নাস্তি" সুতরাং দয়ালের জাতিপাত হয় নাই সে পবিত্র। সে দস্যুবৃত্তি করিয়া দ্বীপান্তরে যবনান্ন উদরসাৎ

করিয়াছে তথাপি সে পবিত্র। কিন্ত শিবদাস লেখা পড়া শিখিবার জন্য তিনবৎসর ইংলণ্ডবাস করিতেছিলেন, সমাজের চক্ষে তিনি অস্পৃশ্য ও অপবিত্র হইলেন। বলা বাহুল্য কেবল যদুনাথ এই উৎসবে যোগ দেন নাই।

পরদিন যদুনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন নিকটে কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্ত অতিশয় ধুম্র পায়ী, অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিতেনা পাইয়া বলিল "ওহে তোমার বাড়ী এলে তামাক না খেতে পেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়"। যদুনাথ বলিলেন "আমি তামাক খাইনা, স্থতরাং তামাক দিতে বলাটা আমি ভুলে যাই, এখানে চাকর দেখ্ছি না একটা চুরট খাবে?" কৃষ্ণকান্ত অমনি বলিল "তা বেস্ বায়রণ চুরটের বড় প্রশংসা করেছেন শুন্বে?

Devine in hookahs, glorious in a pipe;
When tipp'd with amber, mellow, rich and ripe;
Like other charmers, wooing the caress;
More dazzling fly when daring in full dress;
Yet thy true lovers more admire by far;
Thy naked beauties—Give me a cigar.

কৃষ্ণকান্ত চক্ষুমুদ্রিত করিয়া চুরট টানিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মৃদুপদ বিক্ষেপে একটী খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়া একপাশে বসিল। যদুনাথ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তাহার পানে চাহিলেন। কৃষ্ণকান্ত হাসিতে হাসিতে বলিল।

The Devil was sick,
The Devil a monk would be;
The Devil was well;
The Devil a monk was he."

খর্ব্বাকার পুরুষ বলিল "মা জগদম্বার কৃপায় আবার আপনাদের দর্শন পাইলাম।" যদুনাথ বলিলেন "জগদম্বা তোমাকে সৎপ্রবৃত্তি দিন এখন থেকে ভাল হবেতো?" খর্ব্বাকার পুরুষ বলিল "যদি ভাল না হই আবার জেলে যাব"। অমনি কৃষ্ণকান্ত বলিয়া উঠিল—

A prison is a house of care,
A place where none can thrive,
A touch stone true to try a friend,
A grave for one alive;
Sometimes a place of right,
Sometimes a place of wrong,
Sometimes a place of rogues and thieves,
And honest men among.

যদুনাথ বলিলেন "এবার কি ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, খর্ব্বকায় পুরুষ বলিল মাতৃ ভাষার উন্নতি এবং দেশের জুয়াচোরের দমন করিব—শীঘ্রই কলিকাতা যাইয়া ডিটেক্টিভ্ নামে একখানী বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রচার করিব—ইহার আয়ে সংসার একরূপ চলিবে তাই কিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি"।

কৃষ্ণকান্ত বলিল—"I know a trick worth two of that."

যদুনাথ হাসিয়া বলিলেন "কি?"

কৃষ্ণকান্ত বলিল "To rob a thief—to swindle the honest."

যদুনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কাগজে লিখিবে কে? খর্ব্বকায় পুরুষ বলিল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এবং নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি, যদুনাথ বলিলেন "তা হতে পারে না ইহারা সকল কাজেই বিনা পয়সায় লিখিয়া দরিদ্র লেখা ব্যবসায়ীর অন্ন মারেন কিন্তু তাঁরা যে লিখিবেন, তুমি কে তা তাঁরা জানেন?"

"না,—পত্র লিখিয়া সম্মতি লইয়াছি"

"আমি তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া তোমার গুনের পরিচয় দিব।"

"আপনি এমন কাজ করিবেন না?"

"আমি সাধুকে অসাধু কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'তে দিবনা"। সেই সময় কৃষ্ণকান্ত বলিল "A crafty knave needs no broker."

খর্ব্বকায় পুরুষ গতিক বুঝিতে পারিয়া তথা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিয়া যাইবার কালে কৃষ্ণকান্ত বলিল "দয়াল কাল প্রাতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও"।

—০—

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে দয়াল কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্ত তাহাকে আদর করিয়া বসাইয়া বলিল "দয়াল, যদুর বড় অহঙ্কার, মানুষকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেনা দেখলেনা তুমি এতকাল পরে দেখা করিতে গেলে তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিল—আমার ইচ্ছা বেটাকে কিছু অপদস্থ করি কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে তো পারিনা" ।দয়াল যদুর উপর অসন্তুষ্ট সুতরাং একথায় তাহার স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি নাচিয়া উঠিল, বলিল "কি করিতে হইবে বলুন আমি প্রস্তুত"।

তখন কৃষ্ণকান্ত বলিল অদ্য যদুনাথ জেলায় যাইবে, সুতরাং রাত্রে আসিতে পারিবেনা। বিজয়ার অনেক গহনা ও নগদ টাকা আছে, আজ রাত্রে সেই গুলি হস্তগত করিতে হইবে ইহাতে তোমার কিছু হইবে আমারো কিছু হইবে। যাহাতে সহজে একাজ সিদ্ধ হইতে পারে তাহার উপায় আমি করিব।

দয়াল বলিল আমার ভয় হয়, পাছে ধরা পড়ি" কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিল "ভয় নাই এ কার্য্য যদুদ্বারা হইয়াছে ইহা আমি বিজয়ার বিশ্বাস লওয়াইতে পারিব চারি পাঁচজন লোক মুখস পরিয়া গেলেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। রাত্র চারটার পরে যাইবে আমি দরজা খোলা রাখিব"।

এই কথা বার্ত্তার পর দয়াল বিদায় হইল। এদিগে কৃষ্ণকান্ত রজনীতে বিজয়ার গৃহে উপস্থিত হইল। বিজয়া বলিল আজ এত শীঘ্র শীঘ্র যে?" কৃষ্ণকান্ত বলিল আজ যদুর ওখানে গিয়াছিলাম সে চারি পাঁচজন লাঠিয়াল গোছের লোক কোথা হইতে আনাইয়াছে, কাহার সর্ব্বনাশ আজ করিবে কে জানে কিন্তু একটা কথায় আমার বড় সন্দেহ হইতেছে কেননা তোমার সম্বন্ধে কথা হইতেছিল, কহিতে কহিতে যদু ক্রোধ স্বরে বলিল "বিজয়া জাল উইল করেছে পুষ্যপুত্র রাখবে দেখ্‌ব কিকরে রাখ্‌বে পয়সা দিয়া রাখতে হবে তো। হাতে পয়সা না থাক্‌লেই তার বদমাইশি দূর হবে"।

বিজয়ার সঙ্গে যদুর যেরূপ কথোপকথন হইয়া ছিল তাহা মনে করিয়া বিজয়া একথা

বিশ্বাস করিয়া বলিল আমি তো ছেলে রাখ্‌ব দেখি তিনি কি করেন। •

বিজয়ার বাড়ীর সমস্তই একতলা ঘর। সদর-দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে ভিতরে একটী পূজার দালান একটী ভোগের ঘর, একটী বৈঠকখানা—এবং আর একটী অতিরিক্ত ঘর, একটী বর্হিবাটী এখানে একজন দ্বারবান্‌ এবং একজন পাচক ব্রাহ্মণ মাত্র থাকে। রজনীতে ভৃত্য ও দাসী নিজ বাড়ী গিয়া থাকে। তারপর একটী দ্বার সেই দ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সেটী লৌহদ্বার, ভিতর হইতে বন্ধথাকিলে দস্যু প্রবেশ করিতে পারেনা। অন্তঃপুরেও চারিপাশে চারিটী ঘর। ইহার একটিতে বিজয়ার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী অপরটীতে বিজয়া থাকে। আর দুটী শূন্য পড়িয়া থাকে। বাড়ীর চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। পুষ্করিণীতে যাইবার জন্য একটী খিড়কি দ্বার, এই দ্বার দিয়া দিনে অপর বাড়ীর মেয়েবউ আসিয়া থাকে রজনীতে কৃষ্ণকান্ত আইসে। অদ্য কৃষ্ণকান্ত দ্বার খোলা রাখিয়া আসিয়াছে।

রজনী দ্বাদশ ঘটিকার সময় আটজন ছদ্মবেশী দস্যু খিড়কীদ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। বিজয়া ঘুমাইয়াছিল, কৃষ্ণকান্ত নিঃশব্দে গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল দস্যুগণ কৃষ্ণকান্তকে বান্ধিতে লাগিল গোলমাল শুনিয়া বিজয়া জাগিল। অমনি এক জন দস্যু তাহার মস্তকের উপর তরবারী ধরিয়া বলিল "কথা কহিলে কাটিয়া দুইখণ্ড করিব"। এদিকে অপর দস্যুগণ নিশ্চিন্তচিত্তে স্বর্ণ রৌপ্য টাকা মোহর গহনা সমস্ত সংগ্রহ করিতে লাগিল দুই ঘটিকার সময় বিজয়াকে বান্ধিয়া রাখিয়া এবং কৃষ্ণকান্তকে বহন করিয়া দস্যুদল প্রস্থান করিল দলপতি যাইবার বেলা কৃষ্ণকান্তকে দেখাইয়া বলিল "এটাকে আজ কালীবাড়ী বলি দিয়া যাইব"। বিজয়া কান্দিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

দস্যুগণ চলিয়াগেলে বিজয়ার রোদন ধ্বনি শুনিয়া বহুলোক আসিল। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল সকলেই বলিতে লাগিল দয়াল একাজ করিয়াছে। কিন্তু বিজয়ার বিশ্বাস ইহা তাহার দাদার কার্য্য।

এদিকে যদুনাথ জেলা হইতে ফিরিয়া আসিবার কালেই কৃষ্ণকান্ত বিজয়ার বাড়ী উপস্থিত হইল। ডাকাতেরা কৃষ্ণকান্তকে কাটেনাই ইহাতে বিজয়া বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট হইল। কৃষ্ণকান্ত বলিল এখন তো পুলীষে এজাহার দিতে হইবে। বিজয়া বলিল "দিতে হয় দাও"। কৃষ্ণকান্ত একটী মালের তালিকা করিল এবং তৎসঙ্গে উইল হারাইয়াছে, ইহাও লিখিল। কিন্তু একথা সম্প্রতি বিজয়াকে জানাইল না।

যথারীতি পুলিষে এজাহার দেওয়া হইল। পুলীষের লোক আসিয়া তদারক ও বিজয়ার জবানবন্দী লইল। বিজয়া কৃষ্ণকান্তের নামোল্লেখ করিলনা আর আর সকল কথা যেরূপ যাহা ঘটিয়াছিল সত্য সত্যই বলিল। ডাকাতি বা চোর ধরিয়া দিতে না পারিলে পুলিষের লোক সহসা চুরি ডাকাতি বিশ্বাস করিতে চাহে না। কৃষ্ণকান্ত অনেক বাদানুবাদ করিয়া পুলিষ কর্ম্মচারিকে বিশ্বাস লওয়াইল যে ডাকাতি মিথ্যা নহে। কিন্তু তথাপি সেই কর্ম্মচারি বিজয়ার সন্দেহ কাহার প্রতি এই কথা শুনিবার জন্য

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বিজয়া নিজে কিছুই বলিলনা কৃষ্ণকান্ত তাহার হইয়া বলিল "ডাকাতি উদ্দেশ্যে এ ডাকাতি হয় নাই উদ্দেশ্য উইল অপহরণ করা। উইলে যাহার স্বার্থ আছে, এমন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই এই কাজ হইয়াছে সকলেরই এইরূপ ধারণা"। দারোগা ইতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার পুর্ব্বে যদুনাথ বাড়ীতে আসিয়া ডাকাতির কথা শুনিলেন—শুনিয়াই বিজয়ার বাটীতে আসিলেন।

তখন বিজয়ার নিকট আর কেহ ছিল না— সে একাকিনী বসিয়া কান্দিতে ছিল। বিজয়াকে কান্দিতে দেখিয়া যদুনাথ বলিলেন—"কান্দিস্ না—টাকা কড়ি যাবে কোথা ?—আমি বুজেছি এ দয়ালের কাজ্ বেটা আবার জেলে যাবে"।

বিজয়া স্ফীত ও আরক্ত নয়নে যদুর মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। যদুনাথ দেখিয়া লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন—সে চাহনি বিশ্বাসের চাহনি নহে। তথাপি পুনরায় সান্তনার স্বরে বলিলেন "বিজয়া যেমন করে পারি ডাকাত্ ধরে জেলে দিব"।

এবারে বিজয়া বলিল—"দাদা, নির্দ্দোষী লোক ধরে জেলে দিও না"।

"প্রমাণ না হলে কেহ জেলে যায় না"।

"অর্থবলে নির্দ্দোষিকেও দুষি করা যায়"।

"আমার অর্থ তেমন কাজে ব্যয় হয় না"।

"বোধ হয় এবার বা তাই হয়"।

যদুনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন—বলিলেন "কেন্ দয়ালকে নির্দ্দোষী বলে বোধ হয় ?"

"এবার তো বটে"।

"তবে কার প্রতি তোমার সন্দেহ হয় ?"

বিজয়া একটু ভাবিল সেই ভাবনার সহিত তাহার ক্ষীণ মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল এবং সেই আলোড়নে মস্তকে কুমতির উদয় হইল আর হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া বলিয়া ফেলিল "তোমারই প্রতি আমার সন্দেহ"।

যদুনাথ জীবনে এহেন সাংঘাতিক কথা এই প্রথমে শুনিলেন এবং তাহা তাঁহার আপনার ভগিনী মুখের উপরে সদর্পে বলিল।"

যদুনাথের হস্তে লাঠি ছিল—ঐ কথা শুনিয়া তাহার ইচ্ছা হইল বিজয়ার মুখে তাহার একঘা মারেন কিন্তু ক্রোধ সংযত করিয়া বলিলেন—

"আমি তবে ডাকাতি করেচি ?"

"তোমার লোকে"

"আমার লোকে ?"

"হাঁ, তোমার হুকুমে"।

"আমি দরিদ্র—আমার চুরি ডাকাতি না করে চলে না" ?

"তুমি কি অর্থলোভে করেচ ?"

"তবে কেন করবো ?"

"আমায় জব্দ ও অর্থশূন্য করবার জন্য"

"তা করে আমার লাভ ?"

"স্বার্থ,—দত্তক গ্রহণ করতে দিবে না"।

এই কথা শুনিলে যদুনাথের ক্রোধ শান্তি হইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমার স্বার্থ!—কেন আমি কি বিবাহ করিতে পারি না—কিম্বা স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করিতে অশক্ত— যে তোমার দত্তক আমার বিষয় সম্পত্তি পাইবে বলিয়া ভয় পাইব এবং তজ্জন্য তোমার গৃহে

চুরি ডাকাতি করিয়া তোমাকে অর্থশূন্য এবং দত্তক ক্রয় করিতে অশক্ত করিব!”

এই কথা কয়টী বিজয়ার কঠিন হৃদয়কে সহসা কোমল করিল—বিজয়া যতুনাথের মুখপানে চাহিয়া দেখিল তাহার মুখে হাসি কিন্তু নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। বিজয়া বালিকার ন্যায় যতুনাথের হাত তুখানি ধরিয়া বলিল—“দাদা—দাদা,—”

যতুনাথ করবন্ধন মোচন করিয়া চক্ষু জল মুছিতে মুছিতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

যতুনাথ কলিকাতার কয়েক জন ধার্ম্মিক ও যশস্বী লোকের সহিত মিলিত হইয়া একবার একটী যৌথ কারবার খুলিয়া ছিলেন কিন্তু অনেক গরীব তুঃখী ও বিধবার গচ্ছিত টাকা শুদ্ধ কারবার এক লক্ষ আশি হাজার টাকার দায়ে ফেইল পড়িয়া গেল। কিন্তু যশস্বী ও ধার্ম্মিক প্রবরেরা আপনাপন সততা রক্ষায় প্রয়াসী হইলেন না। যতুনাথ নীরবে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়া পতিত কারবারের দেনা শোধ করিয়াছিলেন। এ টাকা দিতে তাঁহার ভূসম্পত্তির এক ভাগ বিক্রী করিতে হইয়াছিল। অথচ না দিলে কেহ তাহাকে কিছুই বলিত না। বিজয়া ইহা জানিত। যতুনাথ চলিয়া গেলে সেই কথা ও একে একে ঐরূপ আরো অনেক কথা বিজয়ার মনে পড়িয়া গেল। বিজয়া কান্দিয়া ফেলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল “হায় কি মহাপাপ করিলাম—কি করিলাম—নরকে যাইবার পথ পরিষ্কার করিলাম,—দাদাকে বলিলাম স্বার্থপর! শুদ্ধ তাই নয় দাদাকে বলিলাম চোর—ডাকাত।”

এই সকল চিন্তার পর বিজয়ার সঙ্কীর্ণ মন ক্রমে অসীম বিস্তৃতি লাভ করিল—সেই অনন্ত পরিসর ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া যতুনাথের বিরাট দেহ দাঁড়াইল—উচ্চ গগণে সেই দেবতার মস্তক ঠেকিল। বিজয়া সহসা উন্মাদের ন্যায় ছুটিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

যতুনাথ বিজয়ার গৃহ হইতে আসিবার সময় পথে কে তাঁহার বস্ত্র ধরিল। অন্ধকারে ভাল চিনিতে পারিলেন না। যে বস্ত্র ধরিয়া ছিল সে বলিল—“দাঁড়াও”। গলার স্বর শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য যতুনাথ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন “একি—ভয় নাই—এ সময়ে তুমি এখানে?” আগন্তুক বলিল “তোমার বিপদ—সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমায় খুঁজিতেছি—তোমার বাগানে চল সেইখানে বলিব”। যতুনাথ বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া বাগানের দিকে চলিলেন।

বাগান বেশী দূর নহে—তিন মিনিটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যান গৃহে উপস্থিত হইয়া দিয়াশিলাই দিয়া মোমবাতি ধরাইলেন—সঙ্গিনী অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাহার পানে চাহিল। যতুনাথ দেখিয়া তুই পদ পশ্চাৎ হটিলেন—বলিলেন “বিরাজ একি তুমি কুলবধূ”।

বিরাজ বলিল আমি কুলবধূ—কুল মজাইতে আসি নাই তোমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া বিজয়া ও কৃষ্ণকান্তের যে সকল কথা হইয়াছিল আদ্যোপান্ত বলিল। যতুনাথ কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন “বুঝিলাম তুমি যাহা বলিলে বিশ্বাসও করিলাম কিন্তু আমার

জন্য তুমি এতকষ্ট স্বীকার ও লজ্জাত্যাগ করিয়াছ ইহাতেই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি।" বিরাজ যদুনাথের প্রতি দৃষ্টি স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া বলিল "মানুষ স্বার্থশূন্য নহে আমার স্বার্থ আছে তাই—"

যদুনাথ বলিলেন—"স্বার্থ!—কি স্বার্থ?"

বিরাজ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"তবে শুন—তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয়—আজি দশ বৎসর হইতে নিষ্ঠুরতা করিয়া আমার বধ করিতেছ আমার স্বার্থ যদি তোমায় সদয় করিতে পারি। তোমার জন্য দগ্ধ হইতেছি তোমার জন্য প্রাণের ভয় না করিয়া অন্ধকার রজনীতে তোমার শত্রুদের ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকি তোমার জন্য শরীরে জ্বর লইয়াও তুমি যখন স্নান করিতে ঘাটে আইস স্নান করিতে আসি, তোমার জন্য লজ্জা সরম ছাড়িয়া আজিও এখানে আসিয়াছি আর কি বলিব।"

যদুনাথ সকলই জানেন—বলিলেন "আমি তোমার প্রতি নির্দ্দয় নই তুমি আমায় ভালবাস তা জানি আমিও তোমায় ভালবাসি তবে তুমি যাহা চাও তা আমি দিতে পারি না তাহা অসামাজিক, অন্যায় অবৈধ ও চৌর্য্য। পরের বাগানের পাকা ফল সুন্দর সৌরভযুক্ত আস্বাদে মিষ্ট হউক কিন্তু আমি তাহা ভোগ করিয়া চোর হইব কেন?"

বিরাজ বলিল—"আমার জন্য,না হয় একটা অপবাদ স্কন্দে লইলে এই ক্ষুদ্র স্বার্থ কি ত্যাগ করিতে পার না রাধার জন্য কৃষ্ণ কত অপবাদ কত কষ্ট কত টিটকারি সহিয়াছেন তাতে কি তাঁহার দেবত্যের কিছু হানি হইয়াছে, দেখ ব্যাস তাকে দেবতা বলিয়াছেন আর আমাদের বঙ্কিম বাবুও তাকে দেবতা বলিয়াছেন।"

যদুনাথ হাসিয়া বলিলেন যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন তিনি না হয় একটা রমণীর সতীত্ব হরণ করিলেন তাই বলিয়া কি আমরা উহা পারি?"

বিরাজ বলিল "তুমি আমার সহিত কত তর্ক করিবে? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা গোহনন করিতেন তাই দেশ গাভিশূন্য হইতেছিল দেখিয়া কৃষ্ণ পর্ব্বতের উপর গাভি রক্ষার স্থান করিয়া গোজাতীর বর্দ্ধন করিতেন গোহননকারিগণকে তাড়াইয়া দিতেন তাই সেই পর্ব্বতের নাম গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। কিন্তু তুমি কি গোবর্দ্ধন ধারণ হইতে বড় একটা কাজ করিতেছ না? তুমি কি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অতি বড় দেবতা নও? কে তোমার মত দরিদ্র সেবা দরিদ্র পালন করিতে পারে? কে ইচ্ছা করিয়া দরিদ্রের জন্য পরের জন্য তোমার মত নির্ব্বংশ হইতে প্রস্তুত হয়, কে তোমার মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নাম যশের ভয়ে গোপনে সর্ব্বস্ব বিতরণ করিতে পারে—কে তোমার মত রাজতুল্য হইয়াও নিজ হস্তে পীড়িত দরিদ্রের মলমূত্র পরিষ্কার করিতে পারে, তুমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে কম কিসে তুমি দেবতার দেবতা মহতের মহৎ গুরুর গুরু তোমায় ভজিলে পাপক্ষয় হয়,তোমায় ভজিলে স্বর্গে গতি হয় আমি সামান্য ক্ষুদ্র মানব ভজিব না, আমি তোমায় ভজি তোমায়ই ভজিব স্বর্গ নরক বুঝিনা তোমাকে বুঝি, আমার শরীরে তুমি, মনে তুমি, হৃদয়ে তুমি, জগত আমার তুমিময় যেখানে তুমি নাই সেখানে জগত নাই, স্বর্গ নাই অন্ধকার, আমার আঁধার দূর কর, দয়া কর, পদে

নাথ, রক্ষা কর" এই কথা বলিতে বলিতে বিরাজের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল, বিরাজ যদুনাথের পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যদুনাথ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বিছানায় শয়ন করাইয়া সুরাই হইতে জল লইয়া তাহার মাথায় ও মুখে সেচন করিতে লাগিলেন, ঠিক এই সময় কে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "একি" যদুনাথ চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন বিজয়া।

ক্রমশঃ

পাণ্ডুয়া-স্তম্ভ।

কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান যাইবার সময়ে পাণ্ডুয়া ষ্টেসনে পৌছিবার একটু পূর্ব্ব হইতে রেলগাড়ীর দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কিছু দূরে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত স্তম্ভ দেখা যায়। এই স্তম্ভই পাণ্ডুয়াস্তম্ভ বা 'পেঁড়োর মন্দির' নামে খ্যাত, "পেঁড়োর মন্দির" অধিকাংশ বাঙ্গালিই জানে, কিন্তু ইহার ইতিহাস জানে কয়টা লোক ?

পশ্চিম বাঙ্গালায় বর্দ্ধমান ও কলিকাতার প্রায় সমদূরে পাণ্ডুয়া সহর অবস্থিত ; ইহা সামান্যতঃ ছোট পাণ্ডুয়া নামে খ্যাত কারণ মালদহের অন্তর্গত 'হজরৎ পাণ্ডুয়া' সহর ইহা অপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ। ছোট পাণ্ডুয়ায় একটি প্রাচীন স্তম্ভ, একটি দীর্ঘায়ত মসজীদ ও একটি চতুরস্র মসজীদ আছে। বাঙ্গালায় যখন ইউসুফ শাহ রাজা তখন (৮৮২ হিজিরায়) এই চতুরস্র মসজীদটি নির্ম্মিত হয়। এই মসজীদে হজরৎ শাহ সফিউদ্দিন নামে এক ব্যক্তির কবর আছে। কথিত আছে যে শাহ সফিউদ্দীন দিল্লীসম্রাট্ ফিরোজ সাহের ভ্রাতুষ্পুত্র। ৭৯১ হিজিরায় সম্রাট্ ফিরোজের মৃত্যু হয় তাহার ৯১ বৎসর পরে এই মসজীদ নির্ম্মিত হয়। জৌনপুরের কেল্লায় যে প্রাচীন মসজীদ আছে তাহা ৭৭৮ হিজিরায় অর্থাৎ ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়, পাণ্ডুয়ার মসজীদও যে তাহারই অনুকরণে বা সেই ধরণে নির্ম্মিত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাহার খিলান, প্রাচীর, থাম, দরজা প্রভৃতি যে পরিমাণে নির্ম্মিত এখানেও সে সকলের সেই পরিমাণ দেখাযায়, কানিংহাম সাহেব এই স্তম্ভটিকে 'মাজিনা স্তম্ভ' বলিয়া অনুমান করেন। যে মসজীদ দুইটির কথা বলা হইল, ঐ দুই মসজীদে নমাজের সময় মাতোয়ালীরা এই স্তম্ভে উঠিয়া আজান দিত। এই অনুমানের কারণ এই যে মসজীদ হইতে ইহার দূরতা ১৭৫ ফিট মাত্র। ইহার প্রবেশদ্বার পশ্চিমমুখী। এই তিনটি অট্টালিকাই যে এক ব্যক্তির নির্ম্মিত তাহা নহে।

প্রধান মসজীদটি দীর্ঘায়ত, লম্বে ২৩১ ফুট দীর্ঘতায় ২১টি খিলান আছে। ছাদে ৬৩টি গম্বুজ। খিলানগুলি নানাবিধ হিন্দু-প্রণালীর সেকালের থামের উপর অবস্থিত। এই খিলানগুলি বড় কৌশলে রচিত। প্রাচীরের গায়, যেখানে খিলান আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে আধলা থাম বা প্রাচীরে কোনরূপ আধার নাই একবারে প্রাচীরের বুকের

উপরেই খিলানের পায়া গাঁথা হইয়াছে। মস্‌জীদের সম্মুখের প্রাচীরে যথেষ্ট কারুকার্য্য আছে কিন্তু এত ক্ষুদ্র ২৩১ ফিট দীর্ঘ প্রাচীরের গাত্রে তাঁহা দৃষ্টিগোচরই হয় না। পার্শ্বের এবং পশ্চাতের প্রাচীরে কোন কারুকার্য্য নাই। ইহা একটি পুরাতন হিন্দুমন্দিরের ভিত্তির উপর স্থাপিত। সেই মন্দিরের স্তম্ভগুলিই বজায় রাখিয়া তদুপরি খিলান গাঁথিয়া মস্‌জীদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ খোদিত লিপি নাই।

চতুরস্র মস্‌জীদটির প্রস্থে ২৫½ ফিট বহির্ভাগ দীর্ঘে অন্তর্ভাগ ৬ ফুট ১০½ ইঞ্চি। ইহার সম্মুখে তিনটি দুইপার্শ্বে দুইটি খিলান। পশ্চাতের প্রাচীরে তিনটি খিলান আছে কিন্তু খোলা নহে, তাহাতে উপাসনার গর্ভগৃহ নির্ম্মিত। চারিকোণে চারিটি মিনার আছে। মিনারগুলি মস্‌জীদ গৃহ হইতে ৩½ ফিট দূরে ও প্রত্যেকটি ৪½ ফিট। ইহার ছাদ এক-গম্বুজ। মিনারগুলির শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মস্‌জীদের মধ্যভাগও অষ্টকোণী। গম্বুজটির পায়া গাঁথিবার জন্য কোণগুলিতে লটকান গাঁথা আছে। বহির্ভাগে দেওয়ালের গাত্রে খোদিত ইষ্টকে বহু কারুকার্য্য ছিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ কলি দেওয়ায় তাহা আর বুঝা যায় না। ইহার নাম 'কড়িয়া মস্‌জীদ'; সম্ভবতঃ কড়ি-পোড়া কলিদিয়া ইহার প্রথম চূণকাম হইয়াছিল। ইহার সম্মুখের মাঝের খিলানের মাথায় এক-খানি খোদিত লিপি আছে। তাহাতেই ইউসুফ্ শাহের রাজত্বকালে ৮৮২ হিজিরায় ইহার নির্ম্মাণ কথা লিখিত আছে।

স্তম্ভটি বড় কৌতুহলোদ্দীপক। ইহা সম্পূর্ণরূপে গোল এবং পঞ্চতলে বিভক্ত। পঞ্চতলের পরিমাণ এইরূপ—

	ব্যাস—	উচ্চতা
ঊর্দ্ধতল—	১২ ফুট অগ্রভাগ	১৮ ফুট
	১৫ ফুট তলভাগ	
৪র্থ তল—	২৩—১০ অগ্রভাগ	১৮"
	২৬ ফুট তলভাগ	
৩য় তল	৩৪—৮ অগ্রভাগ	৩০
	৩৭—৫ তলভাগ	
২য় তল—	৪৭—৬ অগ্রভাগ	১৫
	৪৮—৪ তলভাগ	
নিম্নতল—	৫৮—২ অগ্রভাগ	২৫
	৬০ ফুট তলভাগ	
	চূড়ার উচ্চতা————	৯ ফুট
	মোট ঊর্দ্ধতা	১২৫ ফুট

স্তম্ভের অভ্যন্তরে একটি গোল সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক তলের মুখে সিঁড়ির দরজা আছে তাহা দিয়া স্তম্ভের বহির্ভাগে সরু গোল বারাণ্ডায় যাওয়া যায়, এই বারাণ্ডাগুলি স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে ঘোরান। এখানেও কোন খোদিত লিপি নাই।

এই সকল অট্টালিকার গাত্রে বড় বড় গাছ হইয়া ইহাদের ধ্বংস করিবার আয়োজন করিয়াছে। চতুরস্র মস্‌জিদের গম্বুজটি এবং স্তম্ভের চূড়া বলিতে গেলে একবারে নষ্টই হইয়াছে। দীর্ঘ মস্‌জীদের খিলানগুলি ফাটিয়া গিয়াছে। কীর্ত্তিরক্ষক রাজা আমাদের নাই সুতরাং এই সকল কীর্ত্তি মন্দিরের রক্ষা কে করিবে! (*)

(*) পেঁড়োর মন্দিরের দীর্ঘস্থায়িতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া বাঙ্গলায় একটি গালির সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল অল্পবয়স্ক বিধবারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে এবং পিতামাতার অবাধ্য হয়, তাহাকে প্রাচীনারা "পেঁড়োর মন্দির" "ধর্ম্মের ষাঁড়" ইত্যাদি বলিয়া শ্লেষ করে।

প্রাপ্ত।

দ্বন্দ্ব নহে—সম্মিলন। *

কুম্ভকর্ণ ছমাস নিদ্রা যাইত, আমার প্রিয় সখালোক মহাশয় কুম্ভকর্ণকে টেক্কা দিয়া তাহার দ্বিগুণ সময় পরে যখন নিদ্রা হইতে উঠিলেন; তখনই যে একটি মহালঙ্কাকাণ্ড ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার 'ভোঁতা' বাণ কাহারও অঙ্গে প্রবৃষ্ট হয় নাই। তথাপি অতবড় একটা দিগ্‌গজ বীর! বলিতে হইবে, এবার তাঁহারই জয়, তাঁহারই জয়।

একটি তীরে তিনটি পাখী;—শিশিরবাবু, অচ্যুতবাবু, আর 'রঘুনাথ' প্রকাশক; একি সামান্য লাভ? কিন্তু প্রকাশকের জন্য এত ভয় কেন বাবু? সে ত "অবরুদ্ধ।" † আপনার আজ্ঞায় সে ত "অবরুদ্ধ" ভাবে পচিতেছে, তার কি আর নড়িবার শক্তি আছে?

প্রকাশক "সুদের সুদ আদায়" করিয়াছে। কিন্তু আপনিও ত বাবু, ছাড়েন নাই? সাইলককেও আপনার কাছে হার মানিতে হইবে। আপনি সুদের সুদ তস্যসুদ আদায় করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন, প্রকাশক বেচারাকে "অবরুদ্ধ" করিয়া ফেলিতে ব্যস্ত। বলি—"অভিসম্পাতের" ভয় করিবেন না, আপনার উপর আমার যাদৃশ কৃপার উদয় হইয়াছে, তাহাতে অক্লেশে আপনার পাঁচটা কথা আমি হজম করিতে প্রস্তুত আছি। এ কথাটা বলিয়া দিবার জন্য পুনর্ব্বার "বাহন" সমীরণের স্কন্ধে আরোহন করিতে হইল।

অঘোর 'বাবুর জন্ম "দুর্ব্বাসার জাতিতে," তাহার পরিচয় খুব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আপনার কোন্ জাতিতে জন্ম, তাহা ত আমি গণিয়া বাছিয়া অবধারণ করিতে পারিলাম না। আপনি শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব নহেন; আপনি সার্ব্বভৌমিক সমাজের লোক, একথাও আমার বিশ্বাস হয় না, কেননা তাঁহারাও আপনার "তেমনি ভাবেই" "কুটলল্লাটে" ভাষা ব্যবহার করিতে জানেন না। তবে আপনি কোন্ দেবতা? আকার ইঙ্গিতে দেবী বিষহরীর প্রিয় পুত্র বলিয়াইত বোধ হয়।

"অঘোর বাবু বহুদিন হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনি শিক্ষিত, জ্ঞানবান।" আর বোধ হয় শিশির বাবু ও অচ্যুত বাবু বৈষ্ণব সাহিত্যে অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, জ্ঞানহীন! এই জন্যই ত আমার প্রিয় মহাশয় বলিতে বাধ্য যে, "অঘোর বাবুর রঘুনাথ প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ।" এই জন্যই ত মাননীয় শিশির বাবুর অমিয় নিমাই চরিতে সত্য বিবরণ নাই! তাহা "কাব্যগ্রন্থ!" এবং এই জন্যই অচ্যুত বাবুর রঘুনাথকে "সে কালের ইতিহাস বলা যাইতে পারে!" ইহাও তাঁহার করুণা, কেননা তবু কাছে রাখিয়াছেন।

---

* সমীরণ ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে ২। ৪ টা কথা।

† " " উদ্ধার চিহ্নমধ্যে যে কথাগুলি দেওয়াগেল, তাহা উক্ত "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব" প্রস্তাব হইতে গৃহীত।

ইহাঁরা ত সত্য সংগ্রহ করিতে জানেন না। কিন্তু জীবনী গ্রন্থকে "ইতিহাস" বলা খুব সত্য; এবং "উত্তর কেন্দ্র আবিষ্কারকগণ দুই হাতে বরফের চাপ কাটিয়া গন্তব্যপথ পরিষ্কার করিয়া লক্ষ্যস্থানে (উত্তর কেন্দ্রে) গিয়াছিলেন। (উপস্থিত হইয়াছিলেন)।" এ কথাটি পরম সত্য বটে।

এক ১৩০০ সালে দুই খানি রঘুনাথ প্রকাশ হওয়ায় "আশ্চর্য্যান্বিত" হইবারই কথা। কিন্তু এক সালে কালিপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের হরিদাসের জীবন বক্তের পরে 'হরিদাস ঠাকুর' প্রকাশ হওয়া অবশ্যই "ধর্ত্তব্যের বিষয় নহে।" যাহা হউক, আমার প্রিয় সমালোচকের ভাষা জ্ঞানের বাহাদুরী আছে; কেননা অচ্যুত বাবুর রঘুনাথ হইতে তিনি কএকস্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টি এক দিকে কেন? তাঁহার এক চক্ষে প্রবল দৃষ্টি শক্তি, ও অপর চক্ষে সেই শক্তির সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া প্রিয়তমকে যথার্থই কৃপার পাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। যা হোক, অঘোর বাবু দুই তিন খানি পুথি লিখিয়াছেন। আমরা প্রিয়তমের জন্য অঘোর বাবুর গ্রন্থ হইতে বিশুদ্ধ ভাষার নমুনা ঝুড়ি ঝুড়ি উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু বিশেষ কোনও কারণে তাহা করিব না।

আর রঘুনাথের ও অদ্বৈতের 'স্বরূপ 'নির্ণয়' সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হিন্দুগণই—বৈষ্ণবগণই মাত্র বিশ্বাস করিতে পারেন, ইহা আমরা বেশ জানি। আর গ্রন্থ খানিও ত আমার ঐতিহাসিক সমালোচকের জন্য সৃষ্ট হয় নাই—বৈষ্ণবগণের জন্যই লিখিত, একথা ভূমিকায়ও আছে। এ স্থূলকথাটাও প্রিয়তমের মনে আসিল না, ইহাই দুঃখ। কিন্তু ইহাও বলি, "ঐতিহাসিক" ৺জগদীশ্বর গুপ্ত মহোদয়ও ত নব্যভারতে ঐরূপ ছাঁচের 'স্বরূপ' তত্ত্বটা, গদাধর প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই! তখন সমালোচক প্রবর কোথায় ছিলেন? রঘুনাথের মানসিক সেবার কথা বড় জোরের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। অলৌকিক বলিয়া খোদ অঘোর বাবুও একবার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'হরিদাস ঠাকুর' গ্রন্থে সর্পের ও মায়াদেবীর যে বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তাহা কি অলৌকিক নহে?—তাহাও পূর্ব্ব কথার ন্যায় এক ছাঁচের। অতএব আমার প্রিয় সমালোচক "হংস যেমন জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষীর গ্রহণ করে" একথা অঘোর বাবু সম্বন্ধেও বলিতে পারেন। যাহা হোক, ঐ সকল রহস্য—বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত যাহার তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই, তাহাই যে মিথ্যা ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা পাণ্ডিত্য বটে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে এরূপ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া সত্যে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে। আমরা বুদ্ধির বহির্ভূত যে সকল ঘটনাকে অতি প্রাকৃত আখ্যা প্রদান করি, তাহা একদিন প্রকৃতই সত্য ঘটনা বলিয়া বুঝিয়া লইতে পারি, একদিন এ সকল মিথ্যা হইতেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে মনস্বী ৺বঙ্কিম বাবু স্পষ্টাক্ষরে একথা বলিয়াছেন; কিন্তু আমার বুদ্ধিমান সমালোচক প্রবরকে ইহা বলা বৃথা।

হরিদাসের হিন্দুত্ব বা যবনত্ব সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তাহা জানিবার

জন্য যদি প্রকৃত অভিলাষ থাকিত, তবে অচ্যুত বাবুর উল্লিখিত প্রাচীন শিক্ষাগীতাদি গ্রন্থ দেখিতেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ত' তাহা নহে? দুই চারিটি কথা বলিয়া আসর জাঁকাইবেন, তা' জাঁকিয়াছে বেশ!

আর একটি কথায় আমার প্রিয়তমের ভুল দেখিলাম। বাদানুবাদ হইলেই যে "সেকালে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ হয়," ইহার কোন মানে নাই। এই বাদ প্রতিবাদ হইতে অচ্যুত বাবু ও অঘোর বাবুর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে; তাহা আমার প্রীতিভাজনের কল্পনার অতীত। এই সম্মিলনের ফল অতি শুভ। এই সম্মিলন না হইলে অঘোর বাবুর 'হরিদাস ঠাকুর' অন্যরূপ হইত। সজ্জনতোষণী পত্রিকায় অঘোর বাবুর 'হরিদাস' প্রথম মুদ্রিত হয়, তাহাতে একটি বিষম ভ্রম ছিল, অচ্যুত বাবুর পত্র পাইয়া অঘোর বাবু, পরে তাহা (১৩০২ সালের) সজ্জনতোষণীর ৬৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনিতে শোধন করেন। বস্তুতঃ বাদ প্রতিবাদে দ্বন্দ্ব নহে, তাহাদের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই সম্মিলনের শুভফল দেখাইবার জন্যই একটি গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলাম; ইহাতে শ্রীযুক্ত অঘোর বাবু এ অধমকে ক্ষমা করিবেন।

যাহা হো'ক আমার প্রিয়তম সমালোচক "মাঝ খানে পড়িয়া" যে 'মণ্ডল গিরি করিয়াছেন, তাহার আবশ্যক ছিল না; কেননা যাহাঁর উদ্দেশে 'ভোতা' বাণ ছাড়িয়াছেন ও যাঁহার জন্য লম্প ঝম্প দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাপ্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এখন তাঁহারা এক জন অন্যের সহোদর তুল্য। অতএব জানিয়া রাখিবেন, হে আমার প্রিয়তম! বৈষ্ণবের বিবাদে বিষ উঠে না—সুধা উঠে।

শ্রীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী।

ভগ্নী বিয়োগে।

কেন হিয়া তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা

১

স্মরিলে যাঁহারে কেঁদে উঠে প্রাণ
খুঁজি আশে পাশে—না মিলে সন্ধান।
কেঁদে কেঁদে হই সারাদিন সারা
কেঁদে কেঁদে হই পাগলের পারা।
পাগলের ভাব থাকে নাক, হায়
এই আসে আর এই চ'লে যায়।
পাগলের ভাবে ভুলিব যাতনা
ভাবি মনে মনে—ভুলিতে পারি না।
সহি এত শোক মরম বেদনা
কেন হিয়া-তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা?

২

যারে ভাল বাসি চাহেনা থাকিতে
শুধু ভালবাসে মোরে কাঁদাইতে

জানিনা কি দোষে ছাড়িয়া পলায়
শূন্যে উড়ে যায়, ফিরে নাহি চায়।
তাই মনে মনে আকাশের পানে
চাহি বারবার ভাবি নবঘনে,
আছে লুকাইয়ে মেঘ চলে যায়
আশার কুসুম কোরকে শুকায়।
বহে আঁখিজল মানে নাক মানা
কেন হিয়াতুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা ?

৩

কেঁদে বলি " দিদি গিয়াছ কোথায় "
প্রতিধ্বনি বলে " নাই নাই নাই। "
হতাশে নয়ন চারিদিকে চায়
পোড়া প্রতিধ্বনি আকাশে লুকায়।
শূন্য পানে শুধু আঁখি চেয়ে রয়
শূন্য মন, প্রাণ, অবশ হৃদয়।
পরক্ষণে বহে শ্বাস ঘন ঘন,
কাঁপে কলেবর, হেরে না নয়ন,
শ্রবণ শুনেনা, চরণ চলেনা
কেন হিয়া তবে ভেঙ্গেও ভাঙ্গেনা ?

৪

একে একে সব ফুরাইছে এবে
যে যায় ফিরেত আসেনা এভবে।
শোক দুখ বুঝি নাই সেই দেশে
তাই ভবে কেহ ফিরে নাহি আসে।
তবে কেন আমি এখানে বসিয়া
যাইব সেখানে মা তেয়াগিয়া।
"যাব" ভাবি মনেকরি আয়োজন
কাটিতে না পারি ভবের বন্ধন
চলেনা চরণ একি বিড়ম্বনা
কেন হিয়া তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা ?

৫

জনম দুখিনী প্রাণের ভগিনি
কোথা চ'লে বল গেছ একাকিনী।
নিতি মোর লাগি পেয়েছ যাতনা
তাই বুঝি আর ফিরে আসিবেনা।
দুখ বড় জ্বালা দিয়েছে তোমায়
মোর লাগি বড় কাঁদায়েছে হায় ;
খেয়েছে তোমার শোনিত শুষিয়া
ভাবিলে সেকথা স্ফুরেনা রসনা
কেন হিয়া তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা

৬

ত্যেজি মোরে কেন গেছ তুমি চ'লে
কিদোষ আমার দাওনা গো ব'লে।
কেন বিধি এত আমারে কাঁদাও
দিয়ে নিধি কেন পুন কাড়ি লও।
তুমি কি জাননা নয়নের জল
ক্ষয়করে দেহ হৃদয়ের বল,
দয়া ক'রে আর দিও না নিও না
তবপাশে আর কিছু মাগিব না।
বার বার এত সহ বিড়ম্বনা
তবু হিয়া তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা।

৭

স্নেহময়ী মোর ভগিনী কোথায়
"দিদি" ব'লে আর ডাকিব কাহায়।
"এস, দাদা এস" বলিয়া এখন
কে বলিবে আর অমিয় বচন
আশাভঙ্গ হ'লে কতই যতনে
ভুলাতে আমায় অশ্বাস বচনে।
পুণ্যবতী তাই গেছ তুমি চ'লে
পাপেতে গোঁয়াই আমি ধরাতলে।

সহি বার বার পাপের যাতনা
কেন হিয়া তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা।

৮

গিয়াছ যেখানে নাহিক তথায়
শোক, তাপ, জ্বালা, জরা, মৃত্যুভয়।
পুণ্যধামে থাকি অধম সোদরে
ভুলোনা—মিনতি করি যোড়করে।
জান অভাগার কিছু নাহি আর
কেবলি সম্বল নয়ন আমার।
তাই শোকফুলে আঁখি গঙ্গাজলে
কাঁদিব না ভাবি—থাকিতে পারিনা
কেন হিয়া তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা।

স্বপ্নছায়া।

চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে;
বিহগের গানে,
তটিনীর তানে,
কা'র যেন স্নিগ্ধ ভালবাসা
রয়েছে জড়িত,
প্রেম-পুলকিত,
চায় প্রাণ যেন কা'র আশা
স্মৃতি-ছায়া—একি—স্বপন ?
নহে স্বপন,
স্মৃতি-উদ্দীপন,
হৃদয়ের প্রেমের বিকাশ!
এই প্রেমে প্রাণ,
করে আত্মদান,
এই প্রেমে নন্দন কানন—
ঘুচে মর্ম্ম ব্যথা,
অতীতের কথা,
সংসারের ঘোর মায়া ফাঁস।

কোথায় ?

পাপে তাপে এ জীবন মলিন—আঁধার
মলিন বিবেক-জ্যোতি!
সংসারের অসরল পথে ঘুরে ঘুরে,
হইয়াছি শ্রান্ত অতি!
কোন্ পথে যাব আমি কে দেখাবে পথ
ভীষণ আঁধার মাঝ ?
সাধের সংসার তব দেখ কি বীভৎস
মূরতি ধরেছে আজ।
ব্যাকুল অন্তরে সখা তাই হে তোমারে
ডাকিতেছি অবিরল।
সৃষ্টি হ'তে তুমি দূরে ব'লে প্রাণ সখা
কে রাখিবে এ সকল ?
ফিরাও ফিরাও দেব বিপথ হইতে
মানবের এ সংসারে।
নতুবা সংহার মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
নাশ সৃষ্টি একেবারে!
বিশ্বাস আশ্বাস শূন্য জীবন লইয়া
নিশিদিন—অনিবার।
একটু একটু করি মরণের পথে—
পারি না ছুটিতে আর!

আবার ভারত সঙ্গীত।

"রাবণের মৃত্যুবান রাবণের ঘরে।"
"হরিষে বিষাদ হ'লে দুর্য্যোধন মরে॥"
বিপদে পতিতা যত মানব সকলে,
সদ্দয় পূর্ব্বগত যত ঋষি দলে,
দেখাইলা পুরাণের বর্ণনার ছলে,
যার যেই অস্ত্র সেই লাগিলে সে মরে॥

* * *

দেশী শিল্পের হইতেছে নাশ,
বাণিজ্যের আর কিবা আছে আশ,
সে জন্য মোদের দরিদ্রতা পাশ,
দিনে দিনে দেখ ঘেরিছে সজোরে॥
কেমনে বন্ধন হইবে মোচন,
বড়ই ব্যাকুল হতেছি এখন,
তাই বলি স্মর ঋষির বচন,
মন্ত্রের সাধন করিবার তরে।
বণিকের জাতি যথা তার নীতি,
দেখায় নূতন দ্রব্য নিতি নিতি,
বুঝি তব মন করি পাঁতি পাঁতি,
হরিতে তোমার ধন রতনেরে॥
লইয়া তাহার জিনিষ চিকন,
দিও নাক আর রজত কাঞ্চন,
পরোনাক আর বিলাতী বসন,
বিলাতী জিনিষ আনিও না ঘরে।
বিলাতী আহারে বিলাতী বিহারে
ভারত সন্তান আর মোজনারে।
ফেলে দাও দূরে বিলাতী ব্যাভারে,
তা হলে তোমার কেবা ধন হরে।
স্বদেশের যত বসন ভূষণ,
প্রেমিকের চক্ষে দেখ দেখি মন,
ভাব দেখি সব স্বজাতি আপন,
দেখ দেখি কেবা পরাজয় করে॥
কিন্তু ইথে কার নাহি আরি জুরী,
ব্যক্তিগত ইথে নাহি বাহাদুরী,
মাতৃপদে বলি এই মাত্র স্মরি,
স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ জননীর তরে॥
দ্বেষ হিংসা ভরা ভারত ভিতরে,
কে আছে এমন এই মন্ত্র ধরে,
আত্ম বলিদান জনীর তরে,
কয় জন দিবে বলিব কি করে।
সকলে সস্তায় কিনিবে বসন.
"আমি" কেন দিব এ কষ্টের ধন,
লইতে স্বদেশী বসন ভূষণ,
এই বুদ্ধি ধরে জ্ঞান হীন নরে॥
কিন্তু দেখ ভাই সুবোধ যে জন,
সুদিনের আশা ছাড়ে না কখন,
ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি অনুক্ষণ,
এ কথাও দেখ শাস্ত্রের ভিতরে।
ভাবিয়া দেখ না দেবকী-নন্দন,
কেমনে মোচন করিল বন্ধন,
সপ্ত জন পরে করি আগমন,
যে সপ্তের নাম জানে না পরে।
যদি না আসিত সেই সাত জন,
তবে ত হ'ত না অষ্টম কখন,
একে একে সাত শৃঙ্খল কর্ত্তন,
না হইত কভু কৃষ্ণের কারণে॥
তাই বলি ভাই তোমরা ক জন,

প্রতীক্ষা করহ কৃষ্ণ আগমন,
না লয়ে স্বনাম করহ মোচন,
একে একে তব মায়ের বন্ধনে॥
এবে এ শৃঙ্খল করিতে মোচন,
হয় নাক কোন অস্ত্র প্রয়োজন,
একে একে সব হও এক মন,
চাই মাত্র সবার আত্ম সংযম।
দ্বেষ হিংসা ভরা ভারত ভিতরে,
কে আছে এমন এই মন্ত্র ধরে,
তিলে তিলে আত্ম বলিদান করে,
করিতে মায়ের করম সাধন॥
স্বজাতির মাঝে দয়া মায়া নাই।
পরদেশী পেলে বল ভাই ভাই,
আপনার জনে দিয়া জলাঞ্জলি,
পর পদ ধূলি লয়ে কুতূহলী,
"বিশ্বপ্রেমী" নাম লইতে ব্যাকুলী,
'ভ্রাতৃদ্বেষী' কিসে বিশ্বপ্রেমী ভাই?
ফলা কাঙ্ক্ষা হীন সাধনা তোমার,
এই ত তোমার শাস্ত্রের বিচার,
এই কিরে ভাই পরিচয় তার,
করম কি নয়—জননী উদ্ধার,
তবে কেন নাহি হও অগ্রসর,
দেখাইতে নিজে আর্য্যের কুমার।
এমন সময় পাবে না পাবে না,
নাহি রক্তপাত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা
নীরবে সংযমে হইবে সাধনা,
সাধকের জাতি দেখাও আপনা,
ধর্ম্মচ্যুত আর হ'য়ো না হ'য়ো না,
শীঘ্র ফেলে দাও বিলাতী বাসনা। (১)

(১) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ২য় অঃ ৩৩ শ্লোক।

বুঝিয়া তোমার সাধনার বল,
বিধাতা আপনি ঘটায় সকল,
শুভ কাজে আর বিলম্ব না করে,
দেশী দ্রব্য শুধু খুঁজিবে বাজারে,
খুঁজিলে নিশ্চয় দু-দিনের পরে,
পাইবে দেশীয় জিনিষ কেবল।
ভারত সন্তান হিন্দু মুসল্মান্
মায়েরে সেবিতে হও এক প্রাণ
আচারের ভেদ রবে চিরদিন,
আবিপ্র চণ্ডাল দেখ রে প্রবীন,
হিন্দুয়ানী মাঝে হয়েছে বিলীন,
তবে কেন আর কর ভেদ জ্ঞান।
আবার শুনরে বলেন শ্রীহরি
যেন বা লইয়া মধুর বাঁশরী
"যে আমারে ভজে যেই ভাব স্মরি
আমিও ভজিত সেই রূপ ধরি,
আমারি পথেতে যত নর নারী,
চিরদিন চলে (১) স্রোতে যেন তরি,
"অতএব নিজ অজ্ঞান জনিত,
হৃদয়ের ভ্রম করিয়া ছেদিত,
জ্ঞানরূপ তব সানিত কৃপাণে,
সত্বরে আশ্রয়—করহ সাধনে,
উত্তিষ্ঠ ভারত (২) সবে এক মনে
ত্যজিবারে দ্রব্য বিদেশী নির্ম্মিত।

(১) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ৪ অঃ ১১।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ৪ অঃ ৪২।

কিশোরী।

ঝটিকার পূর্ব্বে যেন মেঘ—আড়ম্বর,
মুহুর্মুহু দামিনীর ক্রীড়া সুভীষণ,
পাষাণে নিরুদ্ধবেগ—সংক্ষুব্ধ সাগর
কখন হইবে লীন—প্লাবিবে ভুবন।
অগ্নিগর্ভ বোমা যেন—প্রাণ-বিঘাতিনী
আপন গরবে ফেটে পড়িবে কখন;
মন্ত্রমুগ্ধ রুদ্ধ বীর্য্য যেন ভুজঙ্গিনী
ছাড়া পেলে ধরা শুদ্ধ করিবে দংশন।
নীরব—নিদ্রিত যেন আগ্নেয় ভীষণ,
কখন দহিবে বিশ্ব—হবে উদ্‌গত;
অবরুদ্ধ মর্ম্মোচ্ছ্বাস সীতাকুণ্ড যেন,
আপনি আপনি মনে কোঁপায় সতত।
হৃদয়ে সুমেরু শিশু—বিরহী-স্বপন
শিহরিছে থেকে থেকে—জাগিবে কখন।

সন্ধ্যায়।

পশ্চিম গগন-গায়
এলাইয়া শ্রান্তকায়
ক্রমশঃ ডুবিছে রবি, আসিছে আঁধার।
ক্ষুদ্র তটিনীর বুকে
হেলিয়া দুলিয়া সুখে
তরীগুলি চলে যায় দূরদেশ পার।
শ্রম করি সারা দিনে
হলস্কন্ধে দীন হীন
কৃষকেরা ফিরিতেছে গৃহে আপনার।
সরলতার আধার
ছেলে মেয়ে পত্নী তার
আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষায় তার।
নিকটে আসিলে চাষী
অমনি মধুর হাসি
শিশুগুলি ছুটে গিয়ে পড়ে তার গায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি যত
সেই ক্ষণে অপগত,
এমনি মানব মুগ্ধ সংসার মায়ায়!
সন্ধ্যায়—তটিনী-কূলে
ক্ষুদ্র সংসারটি ভুলে
আমরা দুইটি বন্ধু ছিনু মুগ্ধ চিতে।
সুদূর ভবিষ্য ঘরে
আমার তুলিকা ধরে
কতটি সুখের চিত্র ছিলাম আঁকিতে।
সহসা সে অস্তমান
রবিপানে দেখিলাম
কি এক উদাস ভাবে ছেয়ে গেল প্রাণ।
ভাবিনু—ঐ রবি মত
এই জীবনেরো যত
আছে উষা, আছে সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন বিধান।
ওই তপনের(ই) মত
সাধি নিজ নিজ ব্রত
অবশেষে ডুবে যায় এমনি সন্ধ্যায়।
প্রাণের বন্ধনগুলি
একে একে যায় খুলি;
ছায়ার মতন নর ভালবাসা হায়!
দেখিলাম—বুঝিলাম
তবু এ অবুঝ প্রাণ
বুঝে না মানিল হায়! পুনঃ স্নেহ-ডোরে
বাঁধিলাম পরস্পরে অন্তরে অন্তরে!

আজি হোলি খেলব অলি, বঁধুয়া কি সাথ।

১

আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাথ।
সাজায়েছি হেমথালে,
বাসন্তি মল্লিকা কত,
এনেছি লো চুরি ক'রে,
অমরার পারিজাত,
মালতীর চারু হার
বড় ভালবাসে কালা,
তাইতে আপন হাতে
গেঁথেছি মোহন মালা,
(আজি) কানুয়া আসিবে বলে,
(কালি) জেগেছিনু সারারাত,
আজি হোলি খেলব আলি বঁধুয়া কি সাথ।

২

আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাথ।
ভকতি কুসুম ওই,
সাজায়েছি থরে থরে,
প্রণয় কস্তুরী সখি,
রাখিয়াছি বুক ভরে,
সাধ মিটায়ে আজি,
খেলিব লো হোলি খেলা,
আবিরে কুঙ্কুমে সই,
বৃন্দাবন হবে আলা ;
(আজি) কানুয়া আসিবে বলে,
(কালি) জেগেছিনু সারা রাত,
আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাথ্।

৩

আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাথ্।
ললিতা, বিশখা আয়,
পরিয়ে গোলাপী সাটী,
গোলাপী বুকের পরে,
গোলাপী কাঁচলি আঁটি,
রাঙ্গা গালে রাঙ্গা ঠোঁটে,
রাঙ্গা আবিরের খেলা,
মধু বৃন্দাবনে আজ ;
হবে লো চাঁদের মেলা ;
(আজি) কানুরে দেখিব বলে,
(কালি) জেগেছিনু সারা রাত,
আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাথ্।

৪

আজি হোলি খেলব আলি বঁধুয়া কি সাথ্।
আঁচোল উড়া'য়ে দিয়ে,
মৃদুল-দখিনাবায়,
আয় লো কণককান্তি,
উষারাণী নেমে আয় ;
সবে মিলে যাব মোরা,
কানুরে ধরিতে আজ্,
দেখিব কেমন ক'রে,
(আজি) কানুরে দেখিব ব'লে,
(কালি) জেগেছিনু সারা রাত,
আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাথ্।

৫

আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাথ্।
মুখভরা হাসি নিয়ে,
আয় লো কমল আয়,
মৃণালের ফাঁদ করে,

পরাব কানুর পায়;
কপটের রাজা সে যে,
কাঁদান স্বভাব তাঁর,
রমণী হৃদয় সে যে,
ভেঙ্গে করে চুরমার;
(আজি) কানুরে দেখিব বলে,
(কালি) জেগেছিনু সারা রাত,
আজি হোলি খেলব আলি, বঁধুয়া কি সাধ।

সেদিন ও এদিন।

সখি, সেই একদিন!
প্রবল যৌবন ভরে বেড়া'তাম যবে
উপেখিয়া এইধরা আনন্দ গরবে
যবে সেই যৌবনের উন্মত্ত লালসা
জাগা'ত মোদের হৃদে দুরান্ত পিপাসা।
নব আশা, নব সাধ, হৃদয়ে পুষিয়া
জীবনের লক্ষ শুধু মনেতে রাখিয়া
কর্ত্তব্যের মহামন্ত্রে হইয়া চালিত
লাগিনু কাটাতে কাল আনন্দ সহিত।
আসিবে কি আর সেই মধুর যৌবন,
পা'ব তাহা এজনমে আর কি কখন?
সখি, সেই একদিন!
পরিনু পুলকে যবে বিবাহ বন্ধন,
হইল মোদের, হায়, সুখের মিলন!
পাশাপাশী হয়ে মোরা বসিয়া যখন
ভাবিতাম কেবা সুখী মোদের মতন!
ভাসিত হৃদয় যবে প্রণয় সাগরে
বহিত সুরভি যবে মলয় সমীরে;
হৃদয়ে হৃদয় রেখে বদন চুমিয়া
থাকিতাম যবে মোরা জগত ভুলিয়া।
সে মধু সময় মোর আর কি আসিবে,
সুখের নাগরে হেরি আর কি ভাসিবে?
সখি, সেই একদিন!

তনয় তনয়া যবে হইল তোমার,
কর্ত্তব্যের ভার মধ্যে পড়িল আমার!
আনন্দ হৃদয়ে তারা আসিত যখন
অধরে তাদের যবে দিতাম চুম্বন!
আধ আধ কথা বলি হৃদয় তুষিত
ফিরিয়া তোমার পাসে পুলকে হাঁসিত
আসিয়া আমার কোলে জুড়া'ত হৃদয়
বহিত চৌদিকে যবে মধুর মলয়।
সে সুখের দিন মোর কভু কি আসিবে,
আর কি তাহারা মোর হৃদয় জুড়াবে?
সখি, আজ একদিন!
নাহি সে যৌবন আজি দুরন্ত পিপাসা!
নাহি সে চাঞ্চল্য প্রবল তিয়াষা!
গেছে আশা, গেছে সাধ, গিয়াছে সকলি!
গিয়াছে শুকায়ে কবে প্রণয়ের কলি!
গিয়াছে তনয় মোর তনয়া সকলি!
গিয়াছে আমার তারা আনন্দ পুতলি;
গিয়াছে হৃদয় মোর প্রণয়েরে ভড়া,
গিয়াছে সকলি, এবে ধরা! দুখময়
যায় নাই শুধু সেই ক্ষীণ স্মৃতিরেখা!
যায় নাই ধরা আর সুখদুখ মাখা!

প্রশ্নোত্তর।

প্র—১। বল দেখি শর্করায় কিবা আস্বাদ?
২। কার আগমনে বয় মলয় পবন?
উ। মধুর।

প্র—১। বল দেখি কিসে হয় শক্তুর স্বজন?
২। কোন শব্দ পদ্যপাঠে বুঝায় যখন?
উ। যবে।

প্র—১। হরকোপে কোন সতী স্বপতি হারায়?
২। কি হলে ঈশ্বর পদে জীব মোক্ষ পায়?
উ। রতি।

প্র—১। কোথা করে হনুমান সীতা অন্বেষণ?
২। কিসে হয় ব্যঞ্জনের কটু আস্বাদন?
উ। লঙ্কায়।

প্র—১। তাম্বুল কোথায় রয় গৃহস্থ আলয়?
২। হরিদ্রার পীত বর্ণ কিসে পরিচয়?
উ। বাটায়।

প্র—১। কোন বৃক্ষ ধনাঢ্যের শীত নিবারণ?
২। কোন বৃক্ষ নির্যাসেতে ধুনার স্বজন?
উ। শাল।

প্র—১। কে করে কমল কোলে মধু আহরণ?
২। কেশ মধ্যে বাস করে হেন কোনজন
উ। ষট্‌পদ।

প্র—১। কোন শিশু মারে দশরথ হানি বাণ?
২। কোন নদী পঞ্জাবের মধ্যে বহমান?
উ। সিন্ধু।

প্র—১। ত্রিদেবের মধ্যে কেবা রজো গুণময়?
২। বিক্রমে মাতঙ্গে কেবা করে পরাজয়?
উ। হরি।

সমালোচনা।

গোবিন্দ গীতামৃত।—প্রথম সংস্করণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

বলিতে পারিনা যিনি যে ভাবেই লিখুন না কেন বৈষ্ণব কবিদিগের পথানুবর্ত্তী হইলেই তাঁহার লেখার কোন না কোন একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য থাকিবে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস গোবিন্দ দাস প্রভৃতি মহাজন দিগের পথানুবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা কাব্যজগতের রত্নময় তোরণ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারা নিজেও মাতিয়াছেন ও অপরকেও মাতাইয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ শিশির-কুমার ঘোষজ মহাশয় আজকাল যে ভাবের মনোহর উৎস সাধারণের সম্মুখে "অমিয় নিমাই চরিতে" খুলিয়া দিয়াছেন নব্যবাঙ্গলা তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া স্পেন্সের কঠোর তত্ত্ব, চেসামের কূট-সূত্র মিলের গম্ভীর মীমাংসা ও হক্সলীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তীব্রতে জে অনুপ্রাণিত হইয়াও টেনিসন হইল বরণ প্রভৃতির মিত্রশিষ্য হইয়া, প্রাচীন কবিদের অমানুষী প্রেমময় কল্পনার মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদিগের লুপ্ত গ্রন্থাবলীর পুনঃ সংশোধিত সংস্করণই আমাদের এ কথার সার্থকতা প্রমাণ করিবে।

গোবিন্দ গীতামৃতের গ্রন্থকার অমৃত বাবু

একজন কৃতবিদ্য যুবক ও মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার। যাঁহার জীবনের উদ্দামময় অংশ রোগসংকটে ব্যবহারে অতিবাহিত করিবার তিনি যে শেষে লেখনীর সদ্ব্যবহারে করিয়াছেন ইহাতে আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। প্রেমিক না হইলে ভগবৎ প্রেমে ভগবানের চির ভোগ্য গোপিকা প্রেমে মজিবার শক্তি কাহারও থাকিতে পারে না। গোপী প্রেমের সুগভীর স্তরে নিমগ্ন হইয়া যিনি বাহ্যজগত হইতে সম্পূর্ণ আত্ম বিসর্জ্জন করেন তিনিই তাহার ভাব ও সৌন্দর্য্য রাশির প্রখর তীব্রোচ্ছাসে সিক্ত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। অমৃত বাবু যে একজন শ্রেষ্ঠদরের কবি তাহা আমরা বলিতেছি না তবে তিনি এতদিন পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে একটী নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতেই আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি।

এই ছাই পাঁশ নাটক নবেল না কিনিয়া যিনি চির অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া একটী নূতন পথে অগ্রসর হন তাঁহারই একটু বিশেষত্ব আছে। অমৃত বাবু তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি সাধারণকে আমরা ইহার এক একখণ্ড ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রথমাংশের গোপীপ্রেম, দ্বিতীয় অংশে বস্ত্রহরণ, তৃতীয় অংশে রাসলীলা চতুর্থ অংশে নিকুঞ্জলীলা পঞ্চম অংশে ব্রজলীলা অবসাদ ও ষষ্ঠ অংশে রাই উন্মাদিনী এই কয়েকটী শ্রেণী বিভাগ আছে। ভাগবত প্রদর্শিত পথের অনুযায়ী হইয়া গ্রন্থকার এইগুলি পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে কবিতার শিল্পচাতুরী তত বেশী কিছু নাই তবে স্থানে স্থানে ভাবের বেশ জমাট বাঁধিয়া পুস্তক খানিকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের উন্নত দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে ইচ্ছা করি।

পুস্তকের কয়েক স্থানে লিপি প্রমাদ ঘটিয়াছে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান নাই ভবিষ্যত সংস্করণে গ্রন্থকার সেগুলির পরিশোধন করেন এই আমাদের অনুরোধ।

কবিরাজি শিক্ষা— চতুর্থ সংস্করণ। গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত। পুস্তক খানির চতুর্থ সংস্করণেই ইহার শ্রেষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কবিরাজ নগেন্দ্র বাবু পাশ্চত্য ও প্রাচ্য উভয় বিধ চিকিৎসা শাস্ত্রেই অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। কলিকাতার মধ্যে তিনি একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হিন্দু ভিষক; এবং সম্প্রতি তিনি ফ্রান্সের পারিসমান নগরীর রাসয়নিক সমিতির একজন ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ সম্মান এপর্য্যন্ত কোন কবিরাজের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার কবিরাজী শিক্ষা শিক্ষার্থীর জন্য নহে ইহা এরূপ সরল ভাষার লিখিত যে সাধারণ গৃহস্থ এমন কি আমাদের অন্তঃপুরের মহিলারা পর্য্যন্তও পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পুস্তক খানির আর একটী বিশেষত্ব এই যে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান সমূহের বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইহা হইতে অনেক শিখিবার বস্তু আছে। নানা স্থানের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞাতব্য ইতিবৃত্তে নগেন্দ্র বাবু একটু বিশেষ বিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বশেষে বিলাতী বড় ডাক্তারী পুস্তকের ন্যায় বৃহৎ সূচি

পত্র। এই ২নী পত্রে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি বিশেষ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

এই মহোপকারী চিকিৎসা গ্রন্থখানি পাঁচটী খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে নাড়ীপরীক্ষা নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা রোগোৎপত্তির বিবরণ, জরাদি যাবতীয় পীড়ার বিবরণ, লক্ষণ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় খণ্ডে, পরিভাষা. বিষ,উপবিষ, শোধন, ধাতু ও উপধাতু শোধন, ধারণ মারণ প্রণালী তৈল ঘৃতাদি মূর্চ্ছনা ও পাকবিধি মকরধ্বজ প্রভৃতি বহুমূল্য ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী।

তৃতীয়খণ্ডে সর্ব্বরোগের পাচন ও পাচন প্রস্তুত বিধি।

চতুর্থখণ্ডে সর্পাঘাত, অগ্নিদাহ, জলমগন সর্দ্দিগর্ম্মি, ক্ষত প্রভৃতি রোগের মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ ইত্যাদি।

পঞ্চমখণ্ডে আয়ুচর্য্যা অর্থাৎ কি প্রকারভাবে চলিলে দেহ নীরোগ ও আয়ুর বৃদ্ধি হয় এবং আপনার আহার বিহারাদি সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।

এই গ্রন্থখানি সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সার সংকলন বলিলে অত্যুক্তি হয়না। ডিমাই আটপেজি ৬৫০ পৃষ্ঠারও অধিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। আমরা আশীর্ব্বাদকরি নগেন্দ্র-নাথের প্রতিভা ও যশঃ দূর দূরান্তরে ব্যবস্থিত হউক ও তিনি মহা গৌরবময় জগতের চিকিৎসা শাস্ত্রের আদিগ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে যেন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠেন।

রোগীচর্য্যা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য—একআনা। এখানি একখানি ৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তিকা। কবিরাজি শিক্ষার ন্যায় এখানেও গৃহস্থের মহোপকারে আসিবে। কি করিয়া রোগীর সেবা করিতে হয় কি করিয়া পথ্য প্রস্তুত করিতে হয় প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর রোগে কি আহার ও পথ্যাদি ব্যবহার করিতে হয়; কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারা যায় এই সমস্ত কথা সরল ভাষায় এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ। অঙ্গের ভিতর গ্রন্থখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

অভিনয়।

আমরা শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাসের সম্প্রদায়ে "অভিমন্যু বধের" অভিনয় দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইয়াছি। নাটকীয় চরিত্রগুলি অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে। অভিমন্যুর স্নিগ্ধ কৌমদীপ্রভ কোমল মাধুর্য্যময় প্রশান্ত মূর্ত্তি ও মনমুগ্ধকর অভিনয় অতীব হৃদয়গ্রাহী ও প্রশং-নীয়। দুষ্টবুদ্ধি কৌরবগণের কুমন্ত্রণা, ভীম জয়-দ্রথের যুদ্ধ, সপ্তরথীর অভিনব সমরসজ্জা, ও পার্থ-বিলাপ অতীব সুন্দর ও মনোমদ। পরি-শেষে আলুলায়িতা কুন্তলা, পতিবিরহ বিধূরা উত্তরার মর্ম্মোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতগুলি শ্রবণ করিলে, ভাবুক হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব, অননুভূত, অনৈ-সর্গিক প্রেমে, বিভোর হইয়া পড়ে। রচনার ভাবুকতায় ও দৃশ্যাবতরণের মনোহারিত্বে, চরিত্রাঙ্কন বেশ সুন্দর ও সরস হইয়াছে। আমরা রচয়িতার উদ্যমের প্রশংসা করি।

এই পত্রিকা [illegible]